বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি

সত্যগোপাল মিশ্র

বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি

"আর মনে করো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
অরণ্যের মর্মর-ধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন।"

সুকান্ত ভট্টাচার্য : ঐতিহাসিক

কলিকাতা, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ, বিশ্বভারতী, যাদবপুর প্রভৃতি
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত পূর্ণাঙ্গ পুস্তক

বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি

[বিষয়-পদ্ধতিসহ পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ]

অধ্যাপক সত্যগোপাল মিশ্র এম. এ., বি. টি., সাহিত্য-ভারতী,
শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ,
পাঁশকুড়া আর. এস.,
মেদিনীপুর

সোমা বুক এজেন্সী
৪২/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
কমলেন্দ্র চক্রবর্তী বি, এস, সি. (অনার্স)
সোমা বুক এজেন্সীর পক্ষে
৪২।১, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ :
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত) :
দোল পূর্ণিমা, ১৯৭৭

তৃতীয় সংস্করণ
মহালয়া, ১৯৭৯

আর্থিক মূল্য—আঠারো টাকা মাত্র

আংশিক ভারত সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত স্বল্প মূল্যের কাগজে এই গ্রন্থ মুদ্রিত ।

মুদ্রাকর :
জয়কালী প্রেস
শঙ্করনারায়ণ প্রেস
সনেট প্রিন্টিং হাউস
ইমপ্রেশন
কলিকাতা

উৎসর্গ

দেশে দেশে

ভাষা-আন্দোলনের

অমর শহীদদের উদ্দেশ্যে—

ভাষা-চর্চার এই পুস্তকটি

উৎসর্গীকৃত হল।

"যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।"

—রবীন্দ্রনাথ ঃ শিক্ষার হেরফের

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

১। ভাষার ইতিবৃত্ত—ডঃ সুকুমার সেন
২। O. D. B. L.—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩। ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ— ,,
৪। ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা— ,,
৫। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস—ডঃ কৃষ্ণপদ গোস্বামী
৬। চলন্তিকা—রাজশেখর বসু
৭। সাহিত্য সন্দর্শন—শ্রীশচন্দ্র দাস
৮। সাহিত্য ও পাঠক—ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৯। কাব্য জিজ্ঞাসা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত
১০। অলঙ্কার চন্দ্রিকা—শ্যামাপদ চক্রবর্তী
১১। বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—ডঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
১২। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩। সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
১৪। শিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৫। *The teaching of the Mother tongue—W. M. Rhyburn*
১৬। শিক্ষা-পদ্ধতি ও পরিবেশ—রণজিৎ ঘোষ
১৭। বাংলা পড়ানোর নূতন পদ্ধতি—সুধীর রায়
১৮। বাংলা পড়ানো—প্রিয়রঞ্জন সেন
১৯। বাংলা ভাষার শিক্ষা-পদ্ধতি—কল্যাণী কার্লেকার
২০। মাতৃভাষার সাহিত্য অনুশীলন ও পড়ানোর নূতন রীতি ও পদ্ধতি —সুধীরকুমার বিশ্বাস
২১। মাতৃভাষা শিক্ষণ-পদ্ধতি—বীরেন্দ্রমোহন আচার্য
২২। প্রশ্নোত্তরে বাংলা শিক্ষণ-পদ্ধতি—প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়
২৩। বাংলা পাঠন-পদ্ধতি—সুখময় সেনগুপ্ত
২৪। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ-পদ্ধতি—বিষ্ণুপদ পাণ্ডা
২৫। বাংলা শেখার রূপরেখা—দীনেন্দ্রকুমার সরকার
২৬। বাংলা ভাষার পাঠন-পদ্ধতি—নরেশচন্দ্র দাস
২৭। বাগর্থ—ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

Contents and Methods of Teaching Bengali

Syllabus

Group—A

(1) A brief history of Bengali language and literature.
(2) Advanced Bengali Grammar—its characteristics.
(3) Rhetoric and Prosody.
(4) The Bengali script.
(5) The Bengali spelling—old and new forms.
(6) Study of the prescribed courses in Bengali in the High and Higher Secondary schools of West Bengal.

Group—B

(1) Importance of the mother tongue in education. Place of the mother tongue in the curriculum of High and Higher Secondary Schools.

(2) Aims of Teaching the mother tongue, principles and methods of teaching.

(3) Bengali—spoken and written. The influence of local dialects on speech habits. The importance of the study of phonetics for language teachers.

(4) Stages in the learning of Bengali—Differences in methods, Scope and Standards.

(5) Written and oral work :—
   (*i*) Loud reading and silent reading, qualities of good reading, accuracy speed, comprehension, intensive and extensive reading, Rapid reading.
   Types of prose reading, stories, essays—other forms. Methods of teaching—Types of poetry—Nursery Rhymes. Methods of teaching. Literary appreciation. Requisites of a good reader.
   (*ii*) Recitation. Elocution. Debates and discussions.
   (*iii*) Grammar—different methods of teaching.
   (*iv*) Composition—oral and written, picture-composition, Free composition ; precis, substance and essay writing. Creative writing.
   Dictation. Spelling. Punctuation. Handwriting. Different styles, Methods of Teaching.
   (*v*) Translation—its place in the curriculum. Methods of teaching.

(6) Literary activities—Dramatisation and role playing. Dramatic reading, literary clubs, wall newspaper, bulletin, boards, collections, albums, class and school magazines.

(7) Tests and evaluation.

"To evoke in oneself a feeling one has experienced and having evoked it in oneself, then by means of movement, hues, colours, sounds, or forms expressed in words so to transmit that feeling that others experience the same feeling—this is the activity of art."

—Tolstoy

ভূমিকা

এপার বাংলা ওপার বাংলা মিলে প্রায় বারো কোটি মানুষের মাতৃভাষা হ'ল বাংলাভাষা, তার সঙ্গে আছে ত্রিপুরা ও কাছাড়ের (আসাম) বাঙালী-অধ্যুষিত এলাকা। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশবিভাগের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিভক্ত হ'লেও দশ কোটি বাঙালীর আত্মিক অপমৃত্যু ঘটে নি। স্বাধীনতার পরেও আসামে 'বাঙালী খেদাও' আন্দোলন সম্পূর্ণ সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। রাজনীতি, প্রাদেশিকতা, দলীয় স্বার্থসিদ্ধি, অর্থনীতি প্রভৃতির প্রচণ্ড আঘাত স্বাধীনতার আগে ও তথাকথিত স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরে বাংলা ভাষাভাষীদের উপর এসেছে বারে বারে। তবুও বাংলাভাষা ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়েছে, সাহিত্য-সম্পদে ও ভাষা-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আরও সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। বাংলাভাষা আজ তাই ভারতবর্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী ভাষা। সেই বাংলাভাষা চর্চা, অনুশীলন ও শিক্ষাদানের চিন্তাধারার উপর রচিত 'বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি' প্রকাশিত হ'ল। বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে ও ভাষা-বিজ্ঞানের চর্চায় গ্রন্থখানি যদি কিছুমাত্র ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়, তবে আমার শ্রম সার্থক হবে।

'বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি'র মধ্যে অনেক বিদগ্ধজনের চিন্তাভাবনার বিচিত্র ফসল ছড়িয়ে আছে। বইটি লিখতে গিয়ে বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছি,—'গ্রন্থপঞ্জী'তে তার একটি তালিকাও দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে তাঁদের বক্তব্য তুলে দিয়েছি—অনেক ক্ষেত্রে ভুলক্রমে তাও সম্ভব হয় নি। এই প্রসঙ্গে তাঁদের ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। পূর্ব-সূরীদের কাছে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সকলেরই থাকে ; এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

ব্যক্তিগতভাবে আরও অনেকের ঋণ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করছি। শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়দ্বয়ের উৎসাহ, আগ্রহ ও প্রেরণা না থাকলে এই গ্রন্থটি প্রকাশের আলো দেখতে পেতো না। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও বিদ্যুৎ-বিভ্রাটে মুদ্রণ-সংকট সত্ত্বেও প্রধানতঃ ওঁদেরই প্রচেষ্টায় গ্রন্থটি প্রকাশ পেলো। অধ্যাপক মদনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন, অধ্যাপক শিশিররঞ্জন মজুমদার আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এঁরা সকলেই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁদের সঙ্গে আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর সম্পর্ক নয়। ব্যক্তিগত পরিচয়ের প্রীতি-ভালোবাসায় আরও অনেকের সুন্দর সাহচর্য ও মধুর দূরত্ব আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে, তা আমার অনুভূতির রাজত্বে অটুট হয়ে থাকুক।

গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ত্রুটিমুক্ত হ'ল না। তাড়াতাড়ি করে লেখা প্রস্তুত করতে গিয়ে চিন্তা-ভাবনার কিছু ত্রুটি থেকে গেছে, সতর্কতা সত্ত্বেও মুদ্রণপ্রমাদ এড়ানো সম্ভব হয় নি। তা সত্ত্বেও গ্রন্থটি সুধিজনের সমাদর লাভ করবে বলে আশা করি।

শিক্ষক-জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ভাষা-শিক্ষাদানের যে সম্পদ আহরণ করতে সক্ষম হয়েছি, এই গ্রন্থে তার প্রতিফলন করতে চেষ্টা করেছি। গ্রন্থটি লেখার সময় কলিকাতা, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ, কল্যাণী, যাদবপুর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষার প্রশ্নধারার কথা বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছে। বাংলাভাষা-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গও গ্রন্থটি পড়ে উপকৃত হবেন।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ — সত্যগোপাল মিশ্র
পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ,
পাঁশকুড়া আর. এস., মেদিনীপুর

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মাত্র তিন বছরের মধ্যে বইটি যে প্রতিষ্ঠিত হবে, সে আশা করি নি। এর জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষক, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

দ্বিতীয় সংস্করণে বইটিকে আরও পরিমার্জিত ক'রার চেষ্টা করেছি,—কয়েকটি অধ্যায় ও অংশ নতুন ক'রে সংযোজন করেছি। ফলে, বইটি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে বলে আশা করছি।

তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিবেকানন্দ দাস, কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজের অধ্যাপক মোহিনীমোহন মাইতি, হুগলী সরকারী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উলুবেড়িয়া বি. এড., কলেজের অধ্যাপক অজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বইটিকে যেভাবে সমাদরে গ্রহণ করেছেন, তার জন্য তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার প্রীতিভাজনীয়া ছাত্রী শ্রীমতী শুক্লা বসুরায় বইটির একটি অধ্যায় ও তিনটি পাঠ-টীকা তৈরি ক'রে দিয়েছেন।

বইটি বিদগ্ধ শিক্ষক-সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হ'লে আনন্দিত হব।

জানুয়ারী, ১৯৭৭ — সত্যগোপাল মিশ্র
তমলুক, মেদিনীপুর

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অনেকখানি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে 'বাংলা পড়ানোর রীতি পদ্ধতি'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হোল। এতে অনেক নতুন ও সর্বাধুনিক তথ্য আছে।

বইটি আগের মতো সকলের প্রত্যাশা পূরণ করবে বলে আশা করি।

পাঁশকুড়া, — সত্যগোপাল মিশ্র
মহালয়া, ১৩৮৬

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব ঃ পদ্ধতি—METHOD

বিষয় চতুর্দশ অধ্যায় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পর্ব ঃ বিষয় (CONTENTS)

তৃতীয় পর্ব : পাঠটীকা (LESSON PLAN)

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব

[Importance of the Study of the Mother tongue in Education]

মাতৃজঠরে আশ্রিত শিশুকে ঘিরে আত্মীয়-পরিজনদের কত আগ্রহ উৎসাহ! আশা-নিরাশার সব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে একদিন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। ছোট্ট শিশু, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা অনন্ত। ছোট্ট শিশুকে নিয়ে কত আদর-আপ্যায়ন, কত আলাপ-আলোচনা! এই শিশুর আগমন আত্মীয়-পরিজনমণ্ডলে যেন এক অভাবনীয় আনন্দের জোয়ার বয়ে আনে। বিচিত্র জগতের অনির্বচনীয় পরিস্থিতিতে শিশু তার মনের ভাব প্রকাশ করে কান্নার মাধ্যমে। কান্নাই তখন তার একমাত্র ভাষা, আপন ভাব ও অনুভূতি প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন। কান্নার স্তর পেরিয়ে শিশু ক্রমশঃ বড়ো হয়। বয়স বাড়ে, শরীর বাড়ে, বুদ্ধিও বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-ব্যবহারের কৌশলগুলি সে আয়ত্ত করে। আধো আধো বোলে শিশু তার মনের ভাব প্রকাশ করে। ভাষা-ব্যবহারের সঠিক কৌশল তখনও সে আয়ত্ত করতে পারেনি। তারপর ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিকের সাহচর্যে শিশু ভাষা-ব্যবহার শিক্ষা করে। এই শিক্ষা হয় মূলতঃ অনুকরণ থেকে। শিশুর চারপাশের মানুষ যেসব ভাষা ব্যবহার করে, শুনে শুনে শিশু তা আয়ত্ত করে। ক্রমশঃ শিশু তার বাল্য, কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিকালের স্তরগুলি পেরিয়ে ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তখন সে ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করে এবং তার শিক্ষা-জীবনে আরও দু'তিনটি ভাষা আয়ত্ত করে। মনের ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করতে তখন সে সম্পূর্ণ সক্ষম।

শিশুর জীবন ও ভাষা ব্যবহার

মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করবার পর শিশু তার স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে ভাষা শিক্ষা করে, তা হ'ল মাতৃভাষা। জীবজগতে আগন্তুক শিশু তার মা, আত্মীয়-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী প্রভৃতির কাছ থেকে স্বাভাবিক অনুকরণের সাহায্যে মাতৃভাষা আয়ত্ত করে। মাতৃভাষা তার নিজস্ব ভাষা, অন্তরের ভাষা। ব্যক্তির মনন ও চিন্তনের ভাষাও হ'ল মাতৃভাষা। মানুষের ব্যথা-বেদনা-মান-অভিমান মূর্ত হয়ে ওঠে মাতৃভাষার মাধ্যমে। মানুষের হাসি-কান্নার ভাষা হ'ল মাতৃভাষা। ছোটবেলায় যে ভাষা মায়ের স্নেহভালোবাসায় শেখে, বড় হ'য়ে সেই ভাষাই জীবনের পরম সুখ-দুঃখের অভি-ব্যক্তির বাহন হ'য়ে দাঁড়ায়। মাতৃভাষাই সামাজিকতার বন্ধন সুদৃঢ় করে। সমাজে মেলামেশা করতে গেলে সচরাচর যে ভাষার প্রয়োজন হয়, তা হ'ল মাতৃভাষা। মাতৃভাষা জাতীয় ও বংশগত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। মাতৃভাষাতেই সাহিত্যচর্চা

মাতৃভাষা

সর্বাধিক সম্ভব। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের ভাষা মাতৃভাষা, মানুষের অনুভূতি-রাজ্যের ভাষা মাতৃভাষা, মানুষের সামাজিকতার ভাষা মাতৃভাষা, মানুষের সাহিত্য ও সৌন্দর্য-সৃষ্টির ভাষা মাতৃভাষা। মাতৃভাষার সঙ্গে মানুষের প্রাণের সম্বন্ধ, মনের সম্বন্ধ, অনুভূতির সম্বন্ধ, আনন্দ-বেদনার সম্বন্ধ। জীবনের অনন্ত অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র মননের মাধ্যম হ'ল মাতৃভাষা। মাতৃভাষা মানুষের জীবনের অঙ্গ, প্রকাশের মাধ্যম।

মাতৃভাষার গুরুত্ব
(The Importance of the Mother tongue)

মানুষের জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অসীম, শিক্ষার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষা অপরিহার্য। বিভিন্ন দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, মনীষী মানুষের জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্বকে স্বীকার ক'রেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্বও আজ স্বীকৃত। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য মাতৃভাষার গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়েছে—

মাতৃভাষার মাধ্যমেই সর্বাধিক আত্মপ্রকাশ সম্ভব

॥ প্রথমতঃ ॥ **মানুষের পক্ষে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বাধিক আত্ম-প্রকাশ সম্ভব**। প্রকাশের বেদনায় সারাজগৎ ব্যাকুল। মানুষও আপনাকে প্রকাশ করতে চায়। মনের ভাব সূক্ষ্ম ও সৌন্দর্যময় ক'রে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যায় মাতৃভাষার মাধ্যমে। মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষের অনুভূতিপ্রবণ মন বিচিত্রভাবে আপনাকে প্রকাশ করে।

মাতৃভাষা সামাজিকতা ও মানবিক সম্পর্ক রক্ষা করে

॥ দ্বিতীয়তঃ ॥ **মাতৃভাষা সামাজিকতা ও মানবিক সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করে**। এক-একটি অঞ্চল বা এলাকা এক-একটি ভাষা-অধ্যুষিত। এই অঞ্চলে অবশ্য অন্যান্য ভাষাও থাকতে পারে, তবে কোন-একটি ভাষা প্রধান স্থান অধিকার করে। ঐ প্রধান ভাষাটিকে অধিকাংশ মানুষ তাদের ব্যবহারিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে। ঐ এলাকায় কোন শিশু জন্মগ্রহণ ক'রলে ঐ প্রধান ভাষাটি হবে তার মাতৃভাষা। ঐ শিশু বড় হয়ে সামাজিকতা ও মানবিক সম্পর্ক রক্ষা ক'রতে পারবে মাতৃভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান ক'রে। মাতৃভাষা এইভাবে সমাজবন্ধনকে সুদৃঢ় করে।

মাতৃভাষা জাতীয় ও বংশগত ঐতিহ্যের ধারক

॥ তৃতীয়তঃ ॥ **মাতৃভাষা জাতীয় ও বংশগত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক**। আমাদের বর্তমান জীবন অতীতের অগণিত মানুষের অনেকদিনের অভিজ্ঞতার ফল। ভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করে। লেখার মাধ্যমে মানুষ আপন আনন্দ-বেদনা রেখে যায় আগামী দিনের মানুষের জন্য। আমাদের পূর্বসূরী-দের অভিজ্ঞতার ফসল এইভাবেই আমরা পেয়েছি। এর মাধ্যম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যসম্পদ জাতীয় ঐতিহ্য গড়ে তোলে। কিংবদন্তী, বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচন, রূপকথা, ধর্মীয় সাহিত্য, আঞ্চলিক সাহিত্য, লোকসাহিত্য ইত্যাদি মাতৃভাষার মাধ্যমে

রচিত হয়ে জাতীয় ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথায়—"যে জাতির সাহিত্য নাই, সে জাতির কখনও উন্নতি হইতে পারে না"। তাই জাতীয় সাহিত্য স্থষ্টির জন্য মাতৃভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

॥ **চতুর্থতঃ** ॥ **মাতৃভাষা মানুষের অনুভূতি-রাজ্যের ভাষা।** মাতৃভাষা হ'ল মনের ভাষা, মনন ও চিন্তনের ভাষা। মানুষের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ ও হৃদয়ার্তি মাতৃভাষার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুর অভিব্যক্তির প্রকাশ, সারাজীবন মাতৃভাষার মাধ্যমে ব্যবহারিক জীবনের প্রকাশ, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও মাতৃভাষার মাধ্যমেই সব জ্বালা-যন্ত্রণার প্রকাশ। মাতৃভাষা তাই মানুষের অনুভূতিরাজ্যের ভাষা—হাসিকান্না ও অন্তর্বেদনার ভাষা।

মাতৃভাষা ব্যক্তির অনুভূতি-রাজ্যের ভাষা

॥ **পঞ্চমতঃ** ॥ মাতৃভাষা শিক্ষার্থীর জীবনের সত্তার সঙ্গে অঙ্গীভূত, কেবলমাত্র পাঠ্য বিষয় নয়। **শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্ব নয়, মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে শিশুর জীবন।** মাতৃভাষাকে অবলম্বন ক'রে শিশু ধীরে ধীরে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে। *George Sampson*-এর মতে মাতৃভাষা *"Is not a school subject at all. It is a condition of school life……It is a condition of existence rather than a subject of instruction.……It is not merely one occasion for the inclucation of knowledge ; it is part of the child's imitation into the life of man".* মাতৃভাষা-শিক্ষাদানের গুরুত্ব অস্বীকৃত হ'লে সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি বিপর্যস্ত হবে।

শিশুর জীবনের সঙ্গে মাতৃভাষার যোগ

॥ **ষষ্ঠতঃ** ॥ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা বাহন। আমরা লেখা, পড়া, চিন্তা, আবৃত্তি প্রভৃতি ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব করি। শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার গুরুত্ব তাই অবশ্য-স্বীকার্য। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যক্তির জন্মসাথী। মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন সহজ, সুন্দর ও সার্থক হয়। মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার প্রতিনিয়তই সমৃদ্ধ হচ্ছে। মানুষের অনন্ত জ্ঞানপিপাসা ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম তাকে নূতন নূতন আবিষ্কারের সন্ধান দিয়েছে। যুগ যুগ ধ'রে এই পরিশ্রম ও জিজ্ঞাসা মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে ক্রমশঃ সমৃদ্ধিশালী করেছে। এই **অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের সংগে পরিচিত হ'তে ভাষার মাধ্যম অত্যাবশ্যক; এবং সেক্ষেত্রে মাতৃভাষাই সর্বাধিক উপযোগী।** দেশ-বিদেশের অনন্ত জ্ঞানরাজ্যের চর্চা মাতৃভাষার মাধ্যমে ক'রতে পারলেই শিশুর অন্তর্নিহিত সত্ত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্ব

॥ **সপ্তমতঃ** ॥ ভাষা ভাবেরও বাহন। ভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার বিচিত্রমুখী ভাবধারাকে প্রকাশ করে। মনের জগতেরও একটা ভাষা আছে। **মানুষ যত বেশী-সংখ্যক ভাষা শিক্ষা করুক না কেন, মাতৃভাষাই হ'ল তার চিন্তা-**

জগতের ভাষা। মানুষ একটি সুনির্দিষ্ট ও সুসংযত পথে চিন্তা করে। চিন্তন (*thinking*) ও মননের ভাষা হ'ল মাতৃভাষা। সেই চিন্তারাশিকে আমরা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করি। সেক্ষেত্রেও মাতৃভাষার গুরুত্ব সর্বাধিক। *P. B. Ballard*-এর মতে—"*Training in the eye of the mother tongue—the tongue in which a child thinks and dreams—becomes the first essential of schooling and the finest instrument of human culture*". (*Thought and Language*)। তাই ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্ব স্বীকার ক'রে নিয়ে সেই অনুযায়ী বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-কার্য সুসম্পন্ন ক'রতে হবে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে ভাবপ্রকাশ

॥ অষ্টমতঃ ॥ মানুষের মন শিল্পপ্রবণ। **মানুষের এই শিল্পপ্রবণ মন আপন সৃষ্টির সৌন্দর্যময় জগতে আত্মপ্রকাশ করে মাতৃভাষার মাধ্যমে।** মানুষ সৌন্দর্য-পিপাসু। মাতৃভাষাকে ভিত্তি ক'রেই মানুষের রসচেতন, চৈতন্যময়, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক, সৌন্দর্যময় ও অপরূপ প্রকাশ। ভাব তাই ভাষাতে রূপ পায়, আবার ভাষার মায়াজালে ভাবের রসানুভূতি সৌন্দর্য-সৃষ্টির অপূর্ব মূর্ছনায় ধরা পড়ে। মাতৃভাষাই এই রস, শিল্প, সৌন্দর্য ও কলার সর্বোত্তম বাহন। সাহিত্যের আনন্দের ভোজে মাতৃভাষার মাধ্যমে মানুষের স্বচ্ছন্দ বিহার।

মাতৃভাষা সৌন্দর্য-সৃষ্টির বাহন

॥ নবমতঃ ॥ **মানুষের যে-সব মানসিক বৃত্তি আছে, তার বিকাশ সম্ভবপর হয় মাতৃভাষার মাধ্যমেই।** মানুষের মনের কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ ও সংস্কার আছে। এই প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ ও সংস্কারগুলি বিপথে পরিচালিত হ'লে সমাজকে কলংকিত করে। সেই সব প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ ও সংস্কার-গুলিকে অবদমন ক'রলে তা মানসিক জটিলতার সৃষ্টি করে। মাতৃভাষার চর্চা ও অনুশীলন কাব্য, সাহিত্য, নাটক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষের প্রবৃত্তি ও সংস্কারগুলিকে পরিশীলিত ক'রে নন্দনচেতনা ও সৌন্দর্য-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ক'রে ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করে। তাই ব্যক্তির আবেগের বিমোক্ষণ (**catharsis**) ঘটিয়ে প্রবৃত্তিগুলির উদ্‌গতি (***Sublimation***) ক'রতে সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য। সাহিত্য মাতৃ-ভাষা অবলম্বন ক'রেই সমৃদ্ধ। তাই প্রবৃত্তি (***Instinct***) ও প্রক্ষোভ (*Emotion*)-ঘটিত সমস্যার সমাধানে মাতৃভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। *Emotional Thrill* সৃষ্টি করতে—রোমাঞ্চকর অনুভূতিময় নন্দনচেতন পরিবেশ সৃষ্টি ক'রতে—মাতৃভাষা তাই অপরিহার্য।

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ-জনিত সমস্যার সমাধানে মাতৃভাষা

॥ মাতৃভাষার উপযোগিতা ॥

মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের মত। মাতৃদুগ্ধ যেমন ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশকে সম্ভব করে তুলে, মাতৃভাষা তেমনি মানবিক সত্তার স্বাভাবিক জাগরণ ঘটায়। জন্মের পর মানুষ তার স্বাভাবিক পরিবেশে মাতৃভাষা শিক্ষা করে;—মাতৃভাষার মাধ্যমে ভাবপ্রকাশ

করে। মাতৃভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান ক'রে মানুষ তার সামাজিকতা বজায় রাখে এবং মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখে। মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষের মানসিক সত্তাগুলি বিকশিত হয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে মানুষ তার হাসি-কান্না ও দুঃখ-বেদনার কথা প্রকাশ করে,—তার অনুভূতি-রাজ্যের আলোড়ন আনে। এইভাবে ধীরে ধীরে শিশু ব্যক্তিতে পরিণত হয়। মানুষ মাতৃভাষার মাধ্যমে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন মাতৃভাষার মাধ্যমেই সর্বাধিক সার্থক হয়। মাতৃভাষার সঙ্গে তাই মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক,—তার মনের মিল। মাতৃভাষার এই স্বাভাবিক ব্যবহার এক-একটি ভাষাগোষ্ঠীর জন্ম দেয়। এইভাবে ধীরে ধীরে জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে। মাতৃভাষা তখন একটি বলিষ্ঠ রূপ পরিগ্রহ করে। নানান দেশে নানান ভাষা, কিন্তু স্বদেশী ভাষা বিনা আশা মেটে কি? মাতৃাভাষার মতন এমন দুঃখ ও ক্লান্তিনাশা ভাষা কোথায় পাওয়া যাবে? W. M. Ryburn-এর ভাষায়,—"*The mother tongue is at once a tool, a source of joy and happiness and knowledge, a director of taste and feeling, and a means of using the highest powers that God has given us where we come closest to Him ; that is, our creative powers.*" (The Teaching of the Mother tongue)।

মাতৃভাষার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতা ও দক্ষতা মাতৃভাষার সাহিত্য ও শিল্প-সৃষ্টির মাধ্যমে সার্থকরূপে ধরা পড়ে। মাতৃভাষা তাই শুধুমাত্র মানুষের সামাজিক আদানপ্রদানও ভাবপ্রকাশের ভাষা নয়, সাহিত্য ও সৌন্দর্য-সৃষ্টির মাধ্যমও বটে। বিদেশী ভাষায় সাহিত্য-চর্চা করে রসাস্বাদন সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। মাতৃভাষাই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। মানুষের চিন্তা-জগতের ভাষা হল মাতৃভাষা। চেতন, অবচেতন ও মনের বিভিন্ন স্তরে যে চিন্তন-প্রক্রিয়া কাজ করে, তার অবলম্বন হল মাতৃভাষা। তথাপি বিদেশী-ভাষা ও অন্যান্য ভাষার চর্চাও করতে হবে। তা আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ ক'রবে, অনুভুতিকে আরও সূক্ষ্ম ক'রবে। এ ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। কিন্তু অন্যান্য ভাষার অনুশীলন ক'রতে গিয়ে মাতৃভাষার অবহেলা করা কোনক্রমেই সমর্থন-যোগ্য নয়। মাতৃভাষার যথাযথ চর্চা ছাড়া কোন মানুষ কখনই বড় হ'তে পারে না, তার ব্যক্তিত্বের যথাযথ পরিস্ফুটন ক'রতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন আসে,—জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই দ্রুত উন্নতির যুগে আমরা মাতৃভাষার চর্চায় অধিকতর সময় দেব কেন? বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি আজকে পৃথিবীর গণ্ডী ছাড়িয়ে গ্রহান্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। সভ্যতা ও মানবিক কল্যাণের স্বার্থে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাকে আজ সকলে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা অবশ্যই ক'রতে হবে। কিন্তু তার জন্য মাতৃভাষাকে অবহেলা করা চলবে না। মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ক'রলে তা সার্থক ও ফলপ্রসূ হয়। শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা,—এমন কি বিজ্ঞানশিক্ষারও।

জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ও মাতৃভাষার উপযোগিতা

কারণ মাতৃভাষার সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক ; মাতৃভাষার মাধ্যমে মানবিক সত্তাগুলি সর্বাধিক বিকশিত হয়। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা মাতৃভাষার মাধ্যমে ক'রতে পারলে তা সার্থক ও পরিণত হয়। মাতৃভাষার গুরুত্ব ও উপযোগিতা তাই অনস্বীকার্য। মাতৃভাষার গুরুত্ব ও উপযোগিতা সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, শিক্ষা প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য। এগুলি একে একে আলোচনা করা যেতে পারে ;—

॥ এক ॥ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা ঃ—

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজে বসবাস ক'রতে গিয়ে তাকে ভাবের আদান-প্রদান ক'রতে হয়। ভাষার এই জৈব ও ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে মাতৃভাষা। সমাজ-সচেতন ব্যক্তি তার মনের ভাবকে যথাযথভাবে প্রকাশ ক'রতে পারে,—অপরের সঙ্গে ভাষার ব্যবহার ক'রতে পারে। মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার সামাজিক সত্তাগুলি বিকশিত হ'য়ে উঠে। ধীরে ধীরে জাতীয় সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। মাতৃভাষা জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। সমাজ-জীবনের সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তাধারা মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এইভাবে জাতীয় ভাবগত সংহতি (*National Emotional Integration*) সম্ভব হয়। কাজেই দেখা যায় যে, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ক'রলে মাতৃভাষার গুরুত্বকে স্বীকার ক'রতেই হয়।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ

॥ দুই ॥ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা ঃ—

শিশু-মনস্তত্ত্ব স্বীকার করে যে, মাতৃভাষার মাধ্যমেই ব্যক্তির অন্তর্মুখী সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করা যায়। মাতৃভাষার মাধ্যমেই সর্বোত্তম আত্মপ্রকাশ সম্ভব, স্বাভাবিক পরিবেশ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষা করে। মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেএবং ধীরে ধীরে নিজের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রে সমাজ-জীবনে অনুপ্রবেশ করে। মাতৃভাষা তার হাসিকান্নার ভাষা, অনুভূতি-রাজ্যের ভাষা,—মাতৃভাষার সঙ্গে তার হৃদয়ের যোগ। কাজেই মনস্তত্ত্বের বিচারে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও উপযোগিতা অনস্বীকার্য। সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক স্বীকার ক'রেছেন যে, মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত, মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কারণ, মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা তাদের অন্তর্নিহিত অনন্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ বিকশিত ক'রতে পারে।

মনস্তত্ত্বের বিচার

॥ তিন ॥ শিল্প ও সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে মাতৃভাষার গুরুত্ব ঃ—

শিল্প-সাহিত্যের সার্থক অনুশীলন মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। মাতৃভাষা ব্যক্তির অনুভূতি-রাজ্যের ভাষা,—হাসি-কান্নার ভাষা। এই সব অনুভূতিগুলি মাতৃভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক শিল্পচেতনা আছে, তার প্রতিফলন মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে হয়। শিল্প, সৌন্দর্য, সূক্ষ্ম অনুভূতি, ভাবাবেগ, নন্দনচেতনা, আনন্দানুভূতি, প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলি সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমেই সজীবতা লাভ করে, এবং তা মাতৃভাষাতেই সম্ভব।

শিল্প ও সাহিত্যের দিক্

॥ চার ॥ শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গীতে মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা :—

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত দৃষ্টিভঙ্গী

শিক্ষাকে সফল ও সার্থক করতে হলেও মাতৃভাষার চর্চা প্রয়োজন। সমস্ত শিক্ষাবিদ্ই স্বীকার করেছেন যে, শিক্ষার সাফল্যের জন্ম মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার উপযোগিতার কথা সকলেই বলেছেন। শিক্ষাকে বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত ক'রতে, জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার (*Life-centric Education*) প্রবর্তন ক'রতে মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ-সাধন হয়, তবে সেক্ষেত্রে মাতৃভাষার উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, মাতৃভাষার মাধ্যমেই সর্বাধিক আত্মপ্রকাশ সম্ভব। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাই মাতৃভাষার গুরুত্ব, উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

পাঠক্রমে মাতৃভাষার স্থান
(The place of the Mother tongue in the curriculum) :

মাতৃভাষার অবহেলা

আমাদের দেশে মাতৃভাষার অবহেলা ঐতিহাসিক ও বিস্ময়কর। শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা অবহেলিত। মাতৃভাষাকে সকলে ঘৃণার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করে। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ, দেশবাসী, সরকার—কেউই মাতৃভাষাকে যথাযথ গুরুত্ব দেন না। স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরেও মাতৃভাষার এই অবহেলা বিস্ময়কর। আমাদের মাতৃভাষা এখনও তার যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করে নি। শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেও মাতৃভাষা যথেষ্ট পরিমাণে অবহেলিত। মাতৃভাষার এই অবহেলা শিক্ষার্থীর স্বাধীন শিক্ষা-গ্রহণ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধনের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধক।

ইংরেজ আমলে মাতৃভাষার নিষ্পেষণ

ইংরেজ আমলে স্বাধীন শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষা তখন ছিল সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের হাতের কব্জায়। শিক্ষা ছিল কিছু কেরানী তৈরি করবার কারখানা বিশেষ। ব্রিটিশ প্রশাসন যন্ত্রকে চালু রাখতে কিছু ইংরেজী-জানা আমলা ও কেরানীর প্রয়োজন ছিল। সে উদ্দেশ্যেই তখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালিত হ'ত। সেকালের মাতৃভাষা-নিষ্পেষণের ঘটনা ঐতিহাসিক। ধীরে ধীরে মানুষের মনে মাতৃভাষা-বিরোধী মনোভাব সৃষ্ট হ'য়ে ইংরেজী ভাষা-প্রীতি গ'ড়ে উঠেছিল, এবং তা ছিল জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। ফলে, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল কৃত্রিম ও যান্ত্রিক, এবং ব্যক্তিত্ববিকাশের পরিপন্থী। তাই মাতৃভাষাও অবহেলিত হ'য়েছে। মাতৃভাষার এই অবহেলা আমাদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ খর্ব ক'রেছে। তাই শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা এত পিছিয়ে পড়েছি।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা-লাভের পরও মাতৃভাষার চর্চা ও অনুশীলন যথাযথ গুরুত্ব পায় নি। বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয়

শিক্ষানীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। কিন্তু এখনও অনেক আঞ্চলিক ভাষা তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা পায় নি। মাতৃভাষার প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব এখনও সকলের আছে। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ, দেশের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ ও সরকার এখনও মাতৃভাষাকে সুনজরে দেখেন না। কোন শিক্ষার্থী ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী হ'লে আমরা খুশী হই, কিন্তু কারও মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করবার ব্যাপারে আমরা উৎসাহী নই। বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষার তুলনায় অন্যান্য বিষয়গুলিতে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। মাতৃভাষার প্রতি আমাদেরও একটা হীনমন্যতার ভাব আছে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন ও মাধ্যম হিসাবে গুরুত্ব দিতে আমাদের একটা অসংকোচ বলিষ্ঠ ভূমিকা নেই। গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে আমরা এখনও পুরাতন শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই প্রায় ধ'রে রেখেছি। ফলে, স্বাধীন শিক্ষার প্রবর্তন এখনও সম্ভব হয় নি।

স্বাধীন ভারতে মাতৃভাষার অবহেলা

উপমহাদেশপ্রতিম এই দেশ ভারতবর্ষ। এখানে অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে। ভাষা-সমস্যা তাই এদেশের এক জাতীয় সমস্যা। স্বাধীনতার পর একটি রাষ্ট্রভাষা (*Federal Language*) প্রচলিত ক'রে জাতীয় সংহতি-রক্ষার প্রচেষ্টা চলেছে, কিন্তু দীর্ঘ তিরিশ বছর পরেও সে প্রচেষ্টার সাফল্য খুবই কম ; তাই ইংরেজী ভাষার গুরুত্ব এখনও আমরা অস্বীকার ক'রতে পারি না। সরকার ১৪টি আঞ্চলিক ভাষাকে (*Regional Language*) স্বীকৃতি দিয়েছেন। এইসব আঞ্চলিক ভাষাগুলির মাধ্যমে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হ'য়েছে। বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষাগত স্বার্থরক্ষা ক'রবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তবুও আমাদের দেশে ভাষা নিয়ে কম সংঘাত হয় নি। ভাষাবিদ্বেষ অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামেরও জন্ম দিয়েছে। এ নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবপর হয় নি। বহু ভাষা, ভাষা-সমস্যা, ভাষা-আন্দোলন ও সরকারের অস্থির ভাষানীতি আমাদের মাতৃভাষাকে যথাযোগ্য স্থানে মর্যাদার সঙ্গে আরোহণ ক'রতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি ক'রেছে। হিন্দী ভাষার উপর সরকারের বিশেষ ঝোঁকও মাতৃভাষার চর্চা ও অনুশীলনকে অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত ক'রেছে।

ভাষা-সমস্যা ও মাতৃভাষার অবস্থা

তা সত্ত্বেও মাতৃভাষা শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নরূপ ত্রি-ভাষা সূত্রকে স্বীকার করা হ'য়েছে :—

১। মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা।

২। বর্তমান রাষ্ট্রভাষা (অর্থাৎ হিন্দী), অথবা সহযোগী রাষ্ট্রভাষা (অর্থাৎ ইংরেজী)।

৩। একটি আধুনিক ভারতীয় অথবা বিদেশী ভাষা, যা (১) এবং (২)-এর মধ্যে আসে না। এই ভাষা হ'বে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত ভাষা ছাড়া অন্য একটি ভাষা।

মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা হ'বে বিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন। মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা স্বীকৃত

হ'য়েছে, তবে বিকল্প হিসেবে ইংরেজী ভাষারও প্রচলন আছে। বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা এখনও স্বীকৃতি পায় নি।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরের (***Primary stage***) বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন বাংলা ভাষা অর্থাৎ আমাদের মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা। প্রাথমিক স্তরের ব্যাপ্তিকাল প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী (৬ হইতে ১০ বৎসর) পর্যন্ত। এই স্তরে বাংলা ভাষা ছাড়াও ইংরেজী ভাষা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূ ত। এত কম বয়সে শিক্ষার্থীদের উপর একটা বিদেশী ভাষার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যুক্তিগ্রাহ্য কি না, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরও কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গে মাতৃভাষার শিক্ষাদান করা হয়। এই পর্যায়ে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এমন একটি অবস্থায় আছে যেখানে শিক্ষাদান ও গ্রহণের পরিস্থিতিই নেই। মাতৃভাষা-শিক্ষাদানের বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি অনুসৃত হয় না। মাতৃভাষার মাধ্যমে সার্থক ও কার্যকর শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিক্ষকরাও উদাসীন। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে লিখিত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাও অল্প। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'কে গ্রহণ ক'রেছেন ;—'কিশলয়' গ্রন্থের সম্পাদনা ক'রে প্রকাশ ক'রেছেন। এতে সমস্যা অনেকটা মিটেছে। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা-চর্চার উপর আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষার মাধ্যমও বাংলা (ইংরেজী ছাড়া)। তবুও মাতৃভাষার উপর ভিত্তি ক'রে প্রাথমিক স্তরে আরও বৈজ্ঞানিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলন ক'রতে পারলে ভাল হ'ত।

প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার চর্চা

নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে (ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে) মাতৃভাষা শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন। তার সঙ্গে ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে হয়। নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়েও মাতৃভাষা পাঠ্যক্রমে যথাযোগ্য মর্যাদা, গুরুত্বও স্থান পায় নি। এই স্তরে শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাগ্রহণ ক'রতে হয়। শিক্ষার্থীদের উপর এতগুলি ভাষা-শিক্ষার চাপ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য মাতৃ-ভাষার কোন বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যপুস্তক নেই। বিদ্যালয়েও গুরুত্ব-সহকারে মাতৃভাষা-শিক্ষাদানের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। মাতৃভাষা-শিক্ষাদান পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বসম্মত নয়। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্রম নেই। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্য-চেতনা সৃষ্টি ও শিল্পশৈলী বিকাশের কোন ব্যবস্থা নেই। বাংলাভাষা শিক্ষাদানের জন্য সাহিত্যানুশীলনের সহায়ক বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর (আবৃত্তি, অভিনয়, পত্রিকা-প্রকাশ, আলোচনা, পাঠাগার-ব্যবহার) বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা এবং ইতিহাস, গণিত ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের উপর যতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়, মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষাদানের জন্য ততখানি গুরুত্ব, সচেতনতা ও

নিম্নমাধ্যমিক স্তর ও মাতৃভাষার অনুশীলন

সক্রিয়তা দেওয়া হয় না। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরেও তাই মাতৃভাষা শিক্ষাদান এখনও অবহেলিত হ'চ্ছে।

মাধ্যমিক স্তরে (নবম-দশম শ্রেণীতে) শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হ'ল মাতৃভাষা বা বাংলা ভাষা। পাঠ্যক্রমে বাংলা ভাষা একটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। সুসম্পাদিত 'পাঠ-সংকলন' গ্রন্থ, ব্যাকরণ, দ্রুতপঠন (গদ্য, প্রবন্ধ ও কবিতার কয়েকখানি নির্বাচিত গ্রন্থ), অনুবাদ প্রভৃতি বাংলা ভাষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূ'ত। পাঠ্যক্রমে ইংরেজী ভাষাও বাংলা ভাষার প্রায় সমান মর্যাদা পেয়েছে। বাংলা ভাষা শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হ'লেও ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত ভাষাও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলা ভাষার প্রতি একটা অবহেলার ভাব সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সাহিত্যানুশীলনের ব্যবস্থা নেই। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী হিসেবে বাংলা ভাষার চর্চা ও অনুশীলন বিদ্যালয়ের সময়তালিকায় (*Time Table*) কম পাওয়া যায় বা কম নির্দিষ্ট থাকে। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হ'লেও তা পাঠ্যক্রমে যথাযোগ্য স্থান পায় নি।

মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষার স্থান

বর্তমানে আবার নতুন ক'রে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন করা হচ্ছে। **১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিদ্যালয়ের নতুন যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে, তাতে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষা-ব্যবস্থার বিলোপ ক'রে মাধ্যমিক শিক্ষাকে দশম শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।** এর ফলে প্রায় সমস্ত শ্রেণীতেই পাঠক্রমের রদবদল হয়েছে। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন হয়েছে। ইংরেজী ভাষা পাঠ্যক্রমে থাকলেও তার গুরুত্ব কমেছে। সংস্কৃত তৃতীয় ভাষা হিসেবে পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মাতৃভাষা হিসেবে পূর্ণ গুরুত্ব নিয়ে পাঠ্যক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐ বিষয়টির পুরাতন পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে। এবং মাতৃভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য-গুণ ও রসসমৃদ্ধ বিষয় ও *topic*গুলিকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূ'ত করার প্রচেষ্টা হয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থা ও পরিবর্তন কতখানি কার্যকর হয়, তার বিচার হবে আগামী দিনে। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব ক্রমশঃই প্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে।

১৯৭৪ সালের নতুন পাঠ্যক্রম ও মাতৃভাষা-চর্চা

মহাবিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন বাংলা ভাষা, বিকল্প ইংরেজী ভাষা। তবে বিজ্ঞানচর্চায় ও *Honours course*-এ ইংরেজী ভাষা এখনও একচেটিয়া অধিপত্য চালিয়ে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা যথাযোগ্য মর্যাদা পেয়েছে। *Pass course*-এ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হিসাবে স্বীকৃত হলেও বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও বিকল্প ভাষা হিসাবে ইংরেজীর ব্যবহার সর্বাধিক। পরিভাষা সৃষ্টি হলে এবং উপযুক্ত পাঠ্য-পুস্তক রচিত হলে একদিন বাংলাভাষা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাবে। সে

উচ্চশিক্ষা ও বাংলা ভাষা

প্রচেষ্টা সফল হ'লে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বাংলা ভাষা তার মর্যাদার আসনটি দখল ক'রে নিতে পারবে।

॥ মাতৃভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম ॥

(The Mother tongue and the medium of Instruction)

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও উপযোগিতা সমস্ত শিক্ষাবিদ্‌ই স্বীকার করেছেন। শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষা-মনোবিদ্যা অনুযায়ী বিষয়টিকে বিশ্লেষণ ক'রলে শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম ও বাহন হিসেবে মাতৃভাষার গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। **নিম্নলিখিত কারণে মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম করা উচিত ঃ—**

॥ এক ॥ মাতৃভাষার মাধ্যমেই সাহিত্যচর্চা, সাহিত্য-অনুশীলন ও সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলে শিক্ষার্থীরা সাহিত্যানুশীলন ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ক'রতে পারবে, কারণ মাতৃভাষাতেই সর্বাধিক আত্মপ্রকাশ সম্ভব।

॥ দুই ॥ মাতৃভাষার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের জীবনের যোগ। জন্মলগ্ন থেকেই শিশু তার স্বাভাবিক পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাতৃভাষা শিক্ষা করে। বিদ্যালয়ে অনুপ্রবেশ ক'রবার পূর্বেই শিশু তার মাতৃভাষার মাধ্যমে ভাবপ্রকাশ ক'রতে সক্ষম। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন ক'রলে শিক্ষার সঙ্গে জীবন ও বাস্তবের যোগসেতু স্থাপিত হয়।

॥ তিন ॥ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ ক'রলে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি বিকশিত হয়। মনন ও চিন্তন ধারালো হয় এবং ধারণা সম্পূর্ণ হয়। মাতৃভাষা চিন্তার সঙ্গে শিক্ষার মিলন ঘটায়, ফলে শিক্ষা সহজ ও স্বাধীন হয়।

॥ চার ॥ অন্য ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে হ'লে সেই ভাষা আয়ত্ত ক'রতে শিক্ষার্থীর অনেক শ্রম ও শক্তি ব্যয় হয়। অনেক সময় অপর একটি ভাষাকে যথাযথ-ভাবে আয়ত্ত করা যায়ও না। সেক্ষেত্রে মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হ'লে সুবিধে অনেক।

॥ পাঁচ ॥ শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা না হ'লে ব্যক্তির পক্ষে তার অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ ও যথাযথ বিকাশসাধনে অসুবিধা হয়। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে অন্তর-সম্পদের উপলব্ধি করা শক্ত। মাতৃভাষা আমাদের হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনার ভাষা। এই ভাষাতেই তাই ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের বিকাশ সম্ভব।

এদেশের বিভিন্ন শিক্ষাকমিশন ও শিক্ষাবিদ্ মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের **অ্যাডামের রিপোর্টে** মাতৃ-ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণের সুপারিশ করা হ'য়েছে। অ্যাডাম জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার চেয়েছিলেন। এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু মেকলে ছিলেন মাতৃভাষা-নিষ্পেষণ ও ইংরেজী ভাষা-গ্রহণের পক্ষপাতী; তাঁরই প্রচেষ্টায় এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য রীতিতে সজ্জিত করা হয়। শিক্ষার মাধ্যম হ'ল ইংরেজী ভাষা,—উদ্দেশ্য হ'ল ব্রিটিশ প্রশাসন-যন্ত্র পরিচালনার জন্য কিছু ইংরেজী-জানা কেরানী ও আমলা উৎপাদন করা। সেই থেকেই মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা শুরু হ'ল। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

অ্যাডামের রিপোর্ট ও স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ

প্রচেষ্টায় শিক্ষার এই ভাষা-মাধ্যম সংক্রান্ত সমস্যাটি নূতন পথে মোড় নেয়। বাংলা ভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম ক'রতে রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অবদান কম নয়। ১৯১৭-১৯ খ্রীষ্টাব্দে **স্যাডলার কমিশনের সুপারিশে** মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন করবার প্রস্তাব করা হ'য়েছে ;—"*The mother tongue aught to be given a place as the medium of instruction throughout the high school class*"...

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাতৃভাষা ও বাংলাভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে,—"*There is nothing like cultivating and enriching our mother tongue. .. Our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish.*" **স্বামী বিবেকানন্দ**ও মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেছেন, —"যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, যে ভাষায় নিজের দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় ত নিজের মনে পাঁচজনে ও সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক ভাষায় আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি··· তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত কথা কয়, মরে গেলে মরা ভাষা কয়।"

শরৎচন্দ্র বলেছেন,—"যথার্থ স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার সাক্ষাৎ মাতৃভাষা ভিন্ন ঘটে না। যথার্থ বড় চিন্তার ফল সংগ্রহ করিবার পথ মাতৃগৃহদ্বারের ভিতর দিয়াই।"

মাতৃভাষা ও বাংলা ভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম ক'রবার জন্য **রবীন্দ্রনাথের** অনলস প্রচেষ্টা ও সার্থক যুক্তিবিন্যাস ভাষা-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি বলেছেন

শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা প্রসঙ্গ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য

"ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটা চালনা সম্ভব হইয়াছিল, শিক্ষা জিনিযটা যথাসম্ভব আহার ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যের প্রথম কামড়টা দিবা মাত্রেই তার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়। পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে—তাহ'তে জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালীর পক্ষে ইংরেজী শিক্ষায় এটি হবার জো নাই। তার প্রথম কামড়েই দুটি পাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে—মুখ-বিবরের মধ্যে একটা ছোটোখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়। তারপর সেটা যে লোষ্ট্রজাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে পাক করা মোদকবস্তু, তাহা বুঝিতেই বয়েস অর্ধেক পার হইয়া যায়। বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া 'নাক চোখ দিয়ে' অজস্র জলধারা বহিয়া যাইতেছে, অন্তরটা তখন একেবারেই উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহুকষ্টে অনেক দেরীতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া।" (জীবনস্মৃতি)

রবীন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষাকে বাহন ক'রতে ব'লেছেন। তিনি বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করবার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হেরফের', 'শিক্ষার বাহন', 'শিক্ষার বিকিরণ', 'ছাত্র-সম্ভাষণ', 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' প্রভৃতি প্রবন্ধে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ ক'রবার জন্য জোরালো যুক্তি উপস্থাপিত ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন,—

"দেশের এই মনকে মানুষ করা কোন মতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব, কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না; আমরা চিন্তা করিব, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে; আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না—সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কি হইতে পারে!"

'তোতা কাহিনী'-তে রবীন্দ্রনাথ রূপক ও সংকেতের মাধ্যমে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-গ্রহণের কুফল বর্ণনা করেছেন। শিশুকাল থেকে আমরা বি. এ. এম. এ. পাশ করবার জন্য যত সচেষ্ট হই, শিক্ষা-গ্রহণ ও জ্ঞানার্জনের জন্য তত আগ্রহী হই না। "বিদেশী ভাষার অবগুণ্ঠনে অবলুণ্ঠিতা বিদ্যা জাতীয় মনের সহধর্মিণী হয়ে চলতে পারে না। তাই যে পরিমাণে আমরা বিদ্যা পাই, সে পরিমাণে শিক্ষা পাই নে।"

স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে সহযাত্রী ছিল জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন। জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের অন্যতম স্লোগান ছিল 'মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা'। আবুল কালাম আজাদ, ডঃ জাকির হোসেন, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাতৃভাষা ও বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও শিক্ষা-গ্রহণের জন্য সক্রিয় ছিলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলাভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রেছিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়-স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম রূপে (ইংরেজী ছাড়া) স্বীকৃত হ'ল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। তারপর থেকে বাংলা ভাষা আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে স্বীকৃত হ'য়েছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে।

জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন ও মাতৃ-ভাষার প্রসঙ্গ

॥ রাধাকৃষ্ণন কমিশন ॥

রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৯৪৮ খ্রীঃ) বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-গ্রহণকে অযৌক্তিক (*It is educationally unsound to make a foreign tongue the means of acquiring knowledge.*) ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন। এই কমিশন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের সুপারিশ ক'রেছেন। কমিশনের সুপারিশ হ'ল—"*For the medium of instruction for higher education English be replaced as early as practicable by an Indian language, higher education be imparted through the instrumentality*

শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণন কমিশন

of regional language with the option to use the medium of instruction either for some subjects or for all subjects."

॥ মুদালিয়ার কমিশন ॥

মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন করা হয়। মুদালিয়ার কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব স্বীকার ক'রেছেন। কমিশন মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন ক'রবার সুপারিশ ক'রেছেন,—"*Mother tongue or the regional language should generally be the medium of instruction throughout the secondary stage.*" কমিশনের মতে—"*The mother tongue is the most suitable language as medium of instruction for the child begining its study. If the same advance had taken place in regional languages as has been taken place in many foreign languages, mother tongue or regional language would have been the medium of instruction at all stages of the educational laddar. As the regional language is likely to be the language used by the majority in the region it is desirable to acquire knowledge of this language.*" যে ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা পৃথক, সেক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ভাষা সাম্প্রদায়ের মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগকে প্রসারিত ক'রতে হ'বে।

ভাষার মাধ্যমে প্রসঙ্গে মুদালিয়ার কমিশন

॥ কোঠারী কমিশন ॥

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে *The Central Advisory Board of Education* ভাষার ক্ষেত্রে 'ত্রিভাষা সূত্র' (*Three language Formula*) উত্থাপন করেন। ১৯৬৪-৬৬-র *Education Commission* (কোঠারী কমিশন) 'ত্রিভাষা সূত্র'কে গ্রহণ ক'রে ব'লেছেন,—'*We recommend a modified or graduated three language formula to include :*

(1) The mother tongue or the regional language ;

(2) The office language of the Union or the associate language of this Union so long as it exists ; and

(3) A modern Indian or foreign language not covered under (1) and (2) and other than that used as medium of instruction.

কমিশন *Lower primary stage*-এ মাতৃভাষাকে শিক্ষার একমাত্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কোঠারী কমিশন *Higher Primary stage* এ মাতৃভাষা ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট রাষ্ট্রভাষাকে *(1) the mother tongue or the regional language, and (2) the official or the associate official language of the Union*] গ্রহণের জন্য সুপারিশ ক'রেছেন। *Lower Secondary stage (VIII-X)* এ কোঠারী কমিশন

শিক্ষার মাধ্যম প্রসঙ্গে কোঠারী কমিশন

তিনটি ভাষাকে গ্রহণের কথা ব'লেছেন— অহিন্দী ভাষা-ভাষী অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা মাতৃ ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ ক'রবে ; আর হিন্দী-ভাষী অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা হিন্দী, ইংরেজী ও একটি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা শিক্ষা গ্রহণ ক'রবে। কমিশন মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন ও মাধ্যম হিসেব স্বীকার ক'রলেও *'library language'* হিসাবে ইংরেজী ভাষার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

॥ ইংরেজীর স্থান ॥

আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরেজীর গুরুত্ব কম নয়। ইংরেজী সর্বশ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক ভাষা। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-দর্শন ইত্যাদির অধিকাংশই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে অনুশীলিত হয়েছে। আমাদের দেশে প্রায় দেড়শত বছর ধ'রে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। তাই হঠাৎ ইংরেজী শিক্ষার অপসারণ অবিবেচনা-প্রসূত হবে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এখনও ইংরেজী ভাষার প্রয়োজন আছে। **আবুল কালাম আজাদের** কথায়,—*"One hundred and fifty years of intimate contact has made English an integral part of our educational system and this cannot be changed without injury to the cause of education in India."* **রাধাকৃষ্ণান কমিশন**ও শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার গুরুত্ব স্বীকার ক'রে নিয়ে ব'লেছেন,—*"English, however, must continue to be studied. It is a language which is rich in literature—humanistic, scientific and technical."* **মুদালিয়ার কমিশন**ও এ প্রসঙ্গে ব'লেছেন,—*"English should be a compulsory subject of study in the secondary school."* ইংরেজী পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা। ভাষা হিসেবে ইংরেজী সর্বাপেক্ষা বেশী সমৃদ্ধ। ঝোঁকের বশে বা সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে এমন একটি ভাষাকে বর্জন করা উচিত হ'বে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার স্থান

এ বিষয়ে **কোঠারি কমিশন** বলেছেন,—*"As English will for a long time to come continue to be needed as a 'library language' in the field of higher education, a strong foundation in the language will have to be laid at the school stage."* শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার অবস্থানকে স্বীকার ক'রে নিয়েও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানকে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে গ্রহণ ক'রতে হয়।

॥ পরিভাষা প্রসঙ্গ ॥

মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন ক'রতে অনেকে অস্বীকার করেন এই কারণে যে, উচ্চশিক্ষার উপযোগী বই-পত্র মাতৃভাষা বাংলায় নেই,—বাংলাভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উপযোগী পরিভাষার অভাব। এ যুক্তি ঠিক নয়। এই বিষয়ে **রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য** হল,—"আমি জানি তর্ক এই উঠিবে, 'তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলা ভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই ?' নাই সে কথা মানি, কিন্তু

শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, শৌখীন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে,—কিংবা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে ঘাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার যোগাড় আগে হওয়া চাই, তার পরে গাছের পালা এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।" বাংলা ভাষায় লেখা জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, কারিগরী চিকিৎসা প্রভৃতির উপযুক্ত বই নেই। কিন্তু বাংলাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম ক'রলে উপযুক্ত বই পেতে অসুবিধা হ'বে না। স্নাতক শ্রেণীতে বাংলা শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর আজ আর সেক্ষেত্রে বই-এর অভাব নেই। উপযুক্ত পরিভাষাও ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠবে। অক্ষয়কুমার দত্ত, যোগেশচন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় পরিভাষার সমস্যা অনেকখানি মিটেছে। বিভিন্ন সংস্থাও (যেমন,—সাহিত্য পরিষদ) এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। রাজ্য পর্যায়ে বাংলা ভাষা সরকারী কাজকর্মে ও যোগাযোগের ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হওয়ায় অনেক নতুন নতুন পরিভাষা রচিত হ'য়েছে। বাংলা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ক'রলে ধীরে ধীরে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উপযোগী পরিভাষা ও পুস্তক গ'ড়ে উঠবে। বহু প্রচলিত ও শ্রুতিমধুর কিছু কিছু বিদেশী শব্দকে আমরা অবিকৃতভাবে গ্রহণ ক'রতে পারি। টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, বোর্ড প্রভৃতি শব্দকে তো আমরা গ্রহণ ক'রেছি; এমনি আরও কিছু শব্দ গ্রহণ ক'রতে দোষ কি? এতে আমাদের ভাষা সমৃদ্ধ হ'বে।

পরিভাষার সমাধান স্বাভাবিক পথেই হবে

॥ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট সরকারের ভাষানীতি ॥

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট সরকারের নতুন ভাষানীতি শিক্ষাক্ষেত্রে বিতর্কের অবতারণা করেছে। এই ভাষানীতিতে শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব আরও বেশী ক'রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে (পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) ইংরেজী ভাষা পাঠ্য হিসাবে থাকছে না;—এই স্তরে মাতৃভাষা হবে একমাত্র শিক্ষণীয় ভাষা। শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে (ষষ্ঠ হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত) এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে মাতৃভাষা ও ইংরেজী ভাষা অবশ্যপাঠ্য হিসাবে থাকবে; সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষা ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে পাঠ্যক্রমে স্থান পাবে। ডিগ্রী-স্তরে কোন ভাষাই অবশ্যপাঠ্য থাকবে না,—এমনকি কলা বিভাগেও নয়। তবে সমস্ত শিক্ষার্থীরা-ই বাংলা অথবা ইংরেজী যে কোন একটি ভাষাকে অতিরিক্ত বিষয় (*Additionɪl subject*) হিসাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়া যে কোন শিক্ষার্থী ডিগ্রী-স্তরে বাংলা, ইংরেজী এবং সংস্কৃত এই তিনটি বিষয়ের সাহিত্যরচনা এক বা একাধিক বিষয় হিসাবে ঐচ্ছিক বিষয় (*optional subject*) হিসাবে গ্রহণ ক'রে পড়াশুনা করতে পারবে। শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার আধিপত্যের উপর এই ভাষানীতি একটি বলিষ্ঠ আক্রমণ—এতে মাতৃভাষা বিকাশের সম্ভাবনা বিস্তৃত হবে।

॥ **সিদ্ধান্ত** ॥

মাতৃভাষা ব্যক্তির সর্বোত্তম বিকাশের বাহন। তাই মাতৃভাষাকে মনস্তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কারণে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ ক'রতে হ'বে। শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষার রাজত্বকে বিস্তৃত ক'রতে হবে। তাতে সামাজিক ও জাতীয় প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। জাতীয় ভাবধারা সমৃদ্ধ হ'য়ে সমাজের সর্বস্তরে তা বিস্তৃত হবে। বিদেশী ভাষা এতদিন আমাদের আত্মিক বিকাশের প্রতিবন্ধক ছিল। আজ সে বাঁধন থেকে মুক্ত হ'য়ে আমরা স্বাধীন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কর'তে পারি। আর সেজন্য মাতৃভাষাকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ কর'তে হবে ;—মাতৃভাষাকে শিক্ষার সর্বস্তরে গ্রহণ করতে হবে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হিসাবে। মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন ক'রলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, কারিগরী প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রথম প্রথম পরিভাষা ও বই-এর অভাব হবে সত্য ; তবে ধীরে ধীরে সে সমস্যার সমাধান হবে এবং মাতৃভাষা শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষার্থীদের আত্মিক বিকাশের বাহন হ'য়ে স্ব-মহিমায় বিরাজ ক'রবে।

শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে বাহন করতে হবে

॥ মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ॥

(*Aims of Teaching the Mother tongue*)

মাতৃভাষা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রয়োজন। কেন ও কিসের উদ্দেশ্যে আমরা শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা শিক্ষা দিতে চাই, ভাষা-শিক্ষককে সে বিষয়ে অবহিত থাকতে হবে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা শিশুর জীবনে কল্যাণ করতে পারে না। মাতৃভাষার মাধ্যমে ব্যক্তি সর্বোত্তমভাবে আত্মবিকাশ ক'রতে পারে। কাজেই মাতৃভাষা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত সত্তাকে পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রস্তুত করা। মাতৃভাষার চর্চা ও অনুশীলন শিক্ষার্থীকে মনন ও চিন্তনের স্বাধীনতা এনে দেবে। জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা হ'ল মাতৃভাষা শিক্ষাদানের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যেই একটি জাতির মানসিক প্রতিফলন দেখা যায়। কাজেই মাতৃভাষার শিক্ষাদান সেদিকে লক্ষ্য রেখে আবর্তিত হবে। **শিল্পচেতনা, সৌন্দর্য-চেতনা, নন্দনচেতনা ও রসচেতনা প্রভৃতি শিল্পমণ্ডন-কলার দিক্‌গুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকশিত করা হবে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।** শিক্ষার্থী যেন তাদের মনের ভাব যথাযথভাবে প্রকাশ ক'রতে পারে এবং সুন্দর-ভাবে পরিস্ফুট ক'রতে পারে। মাতৃভাষার চর্চা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ সাধনে সহায়তা ক'রবে। মাতৃভাষাকে তাই কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক নয়। মাতৃভাষা শিক্ষার্থীদের অনুভূতি-রাজ্যের ভাষা ; তাদের হাসিকান্না ও আনন্দ-বেদনার ভাষা। জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সুকুমার ভাবগুলি মাতৃভাষার স্পর্শেই সজীব হ'য়ে উঠে; এবং মন তখন সৌন্দর্য ও আনন্দের রাজ্যে উধাও হ'য়ে যায়। শিক্ষার্থীদের অনুভূতি ও সুকুমার ভাবগুলিকে (*Fine Sentiments*) বিকশিত করা

মাতৃভাষা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিভিন্ন দিক্

মাতৃভাষা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মাতৃভাষার শিক্ষাদান হবে এমন দিকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ক'রে যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতার ফসল সংগ্রহ ক'রে জীবনকে সমৃদ্ধ করে। সামাজিকতা ও মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ও সুদৃঢ় করা মাতৃভাষা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মাতৃভাষার চর্চা অন্য বিষয়ের জ্ঞানার্জন ক'রতেও শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট সাহায্য ক'রবে। তাই যথেষ্ট গুরুত্ব ও সচেতনতার সঙ্গেই মাতৃভাষার শিক্ষাদান ক'রতে হবে।

॥ বিত্যালয়ের নূতন পাঠ্যক্রম ।

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে একাদশ শ্রেণীর বিলোপ ক'রে দশম শ্রেণীর যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত হ'য়েছে তাতে মাতৃভাষার গুরুত্বকে নতুন ক'রে প্রতিষ্ঠা করা হ'য়েছে এবং মাতৃভাষার শিক্ষা-প্রসঙ্গে সাহিত্যগুণ বা রসসমৃদ্ধি প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা সঠিকভাবেই বলা হ'য়েছে ;—

"মাতৃভাষা (প্রথম ভাষা) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য

শিশুর শিক্ষাসূচিতে ভাষার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভাষা ভাব-চিন্তার ধারক এবং ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই অনুভূতি, মনোভাব, রূপকল্পনা, মৌখিক, লিখিত বা ভাষায় অন্য প্রকার প্রকাশের ভিতর দিয়া যথার্থ রূপ পরিগ্রহ করে, ভাষার উপর সাবলীল অধিকার ছাড়া চিন্তার যথাযথ প্রকাশ বা মনের ভাবের স্বচ্ছতা কখনই সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, ভাষার মাধ্যমেই শিশুকে তাহার দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-ভাবনার সহিত পরিচিত করানো হয়। ইহার ভিতর সে খুঁজিয়া পায় সুরুচি সৌন্দর্য প্রকাশের পথ, আনন্দের উৎস এবং সৃজনাত্মক উপাদান। যথাযোগ্যভাবে মাতৃভাষা শিক্ষাদানই সব শিক্ষার ভিত্তি, কারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও মনোহর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ দানই বহুলাংশে ইহার উপর নির্ভর করে।

এই গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং শিক্ষার্থীগণের বয়স ও মনন-শক্তির ক্রমবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া সেই অনুসারে পাঠ্যবিষয়ের গভীরতা ও বিস্তৃতি সম্পাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য (ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণী)

মাতৃভাষার প্রধান উদ্দেশ্য হবে, ছাত্রছাত্রীগণ যেন—

১। স্পষ্ট উচ্চারণে, অর্থপ্রকাশক ভাবে এবং সঠিক স্বরভঙ্গীতে পদ্য ও গদ্য রচনা পড়িতে পারে, একঘেয়ে শ্রুতিক্লান্তিকর পাঠ-অভ্যাস বর্জন করিতে হইবে।

২। ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রকাশে কথা বলিতে ও কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিতে সমর্থ হয়।

৩। স্পষ্ট সুন্দর ও মোটামুটি দ্রুত হস্তাক্ষরে লিখিতে অভ্যস্ত হয়।

৪। তাহার জ্ঞান-পরিধির বহির্ভূত নয়, এমন পাঠ্যবিষয় নীরবে পড়িয়া বুঝিতে পারে।

৫। প্রতিদিনকার ঘটনা, আনন্দানুভূতির অভিজ্ঞতা, কোন বিশেষ কাজ বা পর্যবেক্ষণের বিবরণ সহজ সাবলীল ভাষায় লিখিতে সক্ষম হয়।

৬। অভিধান ইত্যাদি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া জ্ঞান-বৃদ্ধি করিতে পারে।

৭। স্বীকৃত লেখকদিগের রচনা বা সংক্ষেপিত অংশ-বিশেষের সহিত পরিচিত হয়।

নিম্ন শ্রেণীর পাঠক্রমে অনুসরণ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ক্রমে মাতৃভাষার জগতে প্রবেশ করিতে হইবে, সেখানে ইহার গঠন ও সম্পদ, বিস্তার ও স্বপ্নকল্পনার সহিত তাহাদের পরিচয় হইবে।

উপরের শ্রেণীতে মাতৃভাষা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে ঃ—

১। মাতৃভাষার মৌল গঠন, ব্যাকরণের মূল রীতি ও বাগ্বিধির সহিত ছাত্র-ছাত্রীর পরিচয়-সাধন।

২। পূর্বে-দেখা এবং অ-দেখা রচনাংশ অর্থ-প্রকাশকভাবে, দ্রুত এবং যথার্থ স্বরভঙ্গীতে পাঠ করিতে ছাত্র-ছাত্রীকে সক্ষম করা ; সে যেন নীরব দ্রুত পাঠ করিয়া রচনার অর্থ বুঝিতে পারে।

৩। ছাত্র-ছাত্রী যেন—

(ক) সঠিকভাবে, ভদ্রভাবে জড়তাবিহীনভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয়। (খ) নিজের মনোভাব ও বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় যুক্তিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে। (গ) কোন বিষয়ের আলোচনায় ও পরস্পর ভাব আদান-প্রদানের সময় সহজ ও স্বাভাবিক সৌজন্য সহকারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

৪। সৎ সাহিত্যের রস আস্বাদন, তাহা হইতে আনন্দলাভ এবং তাহাতে নিহিত মহৎ ভাব ও আদর্শ গ্রহণে নিজের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করিতে ছাত্র-ছাত্রী যেন উৎসাহী হয়।

৫। স্বাধীন চিন্তা ও সুরুচিকর আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়া সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যকর্মে ছাত্র-ছাত্রীকে অনুপ্রাণিত করা।" (পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্যদ প্রকাশিত পাঠ্যক্রম)।

মাতৃভাষা শিক্ষাদানের সময় সমস্ত ক্ষেত্রেই উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। পাঠ্যক্রম-রচনা (Curriculum construction), শিক্ষাদান (Teaching) ও মূল্যায়নের (Evaluation) সময় এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি যাতে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়, তার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যিক চর্চা কেন অতি প্রয়োজনীয় এবিষয়ে আলোচনা কর। (কলিঃ বিশ্বঃ, বি. টি. ১৯৫৫)

২। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদানের সময় মাতৃভাষার গুরুত্ব কতখানি ? গত দশ বৎসরে এই গুরুত্ব-বোধের পরিবর্তন হইয়াছে কি ? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখাইতে হইবে। (কঃ বিঃ, বি. টি. ১৯৫৭)

৩। শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আপনার মত ব্যক্ত করিয়া (অনধিক ৪৫০ শব্দের মধ্যে) একটি প্রবন্ধ লিখুন। (কলিঃ বিশ্বঃ, বি. টি. ১৯৬১)

৪। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় ছাত্রদের সম্যক আত্মবিকাশের জন্য শিক্ষার মাধ্যমরূপে ও কর্মজীবনের প্রস্তুতির জন্য ছাত্রদের মাতৃভাষার কিরূপ শিক্ষা দিবেন? (কলিঃ বিশ্বঃ, বি টি, ১৯৬৩)

৫। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা সম্পর্কেও আপনার অভিমত সর্বাংশে প্রযোজ্য কিনা তাহা যুক্তি সহকারে প্রদর্শন করুন। (কঃ বিঃ, বি. টি, ১৯৬৬)

৬। শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আপনার অভিমত যুক্তিসহকারে ব্যক্ত করুন। উচ্চ শিক্ষার বাহন হিসেবেও মাতৃভাষাকে গ্রহণ করা যায় কিনা তাহা আলোচনা করুন। (কলিঃ বিশ্বঃ বি. এড্. ১৯৭১)

৭। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান কোথায় আলোচনা করুন। (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৬)

৮। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন। (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৮)

৯। বৈজ্ঞানিক যুগে ভাষা ও সাহিত্য পড়ানোর সার্থকতা কি? মাতৃভাষা অন্য কোন ভাষা হইতে শিক্ষায় বিশেষ সহায়ক কেন? (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি, ১৯৬৬)

১০। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চা কেন প্রয়োজনীয়? এই সম্পর্কে আলোচনা করুন। (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৮)

১১। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি নাতি-দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন। (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি, ১৯৬৯)

১২। বুদ্ধি ও চিন্তা প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক কি? মাতৃভাষায় এই সম্পর্ক স্থাপন আরও সহজসাধ্য হয় কেন, তাহা আলোচনা করুন। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড্. ১৯৬৩)

১৩। শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার ব্যবহার করিতে হইলে উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠক্রমের ঐচ্ছিক শাখাগুলির বিষয়সমূহের পাঠোপযোগী কি কি ধরনের শব্দসম্পদ ছাত্রদের অধিগত করার প্রয়োজন তাহার উল্লেখ করিয়া শিখাইবার পদ্ধতির নির্দেশ দাও। (বর্ধ বিশ্ব, বি. এড্. ১৯৬৭)

১৪। সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্ব কতখানি? ইহা প্রচলন করিবার পথে বাধা-গুলি আমরা কিভাবে অপসারণ করিতে পারি? (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি, এড্ ১৯৬২)

১৫। ছাত্র ছাত্রীদের সম্যক আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের অবদান সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন। (কলিঃ বিশ্বঃ, বি. এড্. ১৯৭২)

১৬। সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন। (কলিঃ বিশ্বঃ, বি. এড্. ১৯৭৩)

১৭। শিক্ষায় মাতৃভাষা ও সাহিত্যের স্থান সম্পর্কে আলোচনা করুন। (কঃ বিঃ, বি. এড্. ১৯৭৪)

১৮। শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে একমাত্র বাহনরূপে গ্রহণ করার নীতিটি বাস্তব এবং শিক্ষাবিজ্ঞান সম্মত আলোচনা করুন। (কলিঃ বিশ্বঃ, বি. এড্. ১৯৭৫)

১৯। শিক্ষায় মাতৃভাষা ও সাহিত্য পাঠের যথাযথ ভূমিকা সম্পর্কে আপনার স্বাধীন চিন্তা-ভাবনাকে ব্যক্ত করুন। (কলিঃ, বিশ্ব., বি. এড্. ১৯৭৬)

২০। শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে একমাত্র বাহনরূপে গ্রহণ করা কতখানি যুক্তি-যুক্ত আলোচনা করুন। (কলিঃ বিশ্বঃ, বি. এড্.. ১৯৭৬)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুখের কথা ও লেখার ভাষা

[Bengali—Spoken and Written]

ভাষা হ'ল ভাবের বাহন। ভাষার মাধ্যমে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি, আমাদের অনুভূতিকে প্রকাশ করি। **ভাষার প্রধান গুণ হ'ল তার প্রতীক-দ্যোতকতা।** এক একটি-শব্দের সঙ্গে এক-একটি ভাব বা বস্তু জড়িত। প্রতিটি শব্দ এক-একটি অর্থ প্রকাশ করে। এই অর্থ হয় কোন ভাব, নয় কোন বস্তু। শব্দ যে ভাব বা বস্তুকে আশ্রয় করে, উচ্চারণ বা লেখবার সময় তারই প্রতীক বা প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের মনের ভাব প্রকাশ ক'রবার সবচেয়ে বড় অবলম্বন হল ভাষা। ভাষার মাধ্যমে আমরা অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর নিকট পৌছে দিই। অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছ পর্যন্ত মনের ভাব পৌছে দেওয়ার জন্যও ভাষার প্রয়োজন। মনের ভাব প্রকাশ করা ও প্রতীকদ্যোতকতা হ'ল ভাষার মৌল উপাদান।

ভাষার মৌল উপাদান

ভাষার দু'টি রূপ; একটি হল লিখিত স্থায়ী রূপ, অন্যটি প্রচলিত কথ্য রূপ। লেখ্যরূপে ভাষা সৃজনধর্মী ও সৌন্দর্যসৃষ্টির সম্ভাবনাময়। কথ্য ভাষা ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে। লেখ্য ভাষা লিখন-নির্ভর, কথ্য ভাষা বাচন-নির্ভর। অনুপস্থিত ব্যক্তি ও আগামী দিনের মানুষের কাছে মনের ভাব, চিন্তাধারা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি পৌছে দেওয়ার জন্য লেখ্য ভাষার প্রয়োজন। কথ্য ভাষা বর্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এক্ষেত্রে কেবলমাত্র সম্মুখস্থ বক্তা মনের ভাব জানতে পারে। লেখ্য ভাষা সৌন্দর্য ও রসসৃষ্টির জন্য; কথ্য ভাষা কাজের জন্য। মুখের কথায় আমাদের দৈনন্দিন জৈব প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। লেখার ভাষায় মানুষের সৌন্দর্য ও রস-পিপাসু মন সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্বীয় অনুভূতি ও উপলব্ধির বিচিত্রতা ও নিবিড়তার পরিচয় রেখে যায় আগামী দিনের মানুষের জন্য। এক অঞ্চলের কথ্য ভাষা অন্য অঞ্চলে অপ্রচলিত; হয়ত অবোধ্যও। তাই সর্বজনবোধ্য ও মার্জিত একটি সুনির্দিষ্ট রূপের জন্য লেখ্য সাধুভাষার প্রয়োজন। কথ্য ভাষার রূপ নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন কখনও খুব দ্রুত হয়। কিন্তু সাধুভাষার রূপ স্থায়ী। লিখিত ভাষায় কতকগুলি নিয়ম আছে। নিয়মগুলি আবশ্যিক। তাই লেখ্য ভাষার একটি সুনির্দিষ্ট স্থায়ী রূপ আছে। কথ্য ভাষা পরিবর্তিত হ'তে হ'তে যখন একটি স্থির মানে বা রূপে এসে স্থিতিশীল হয়, তখনই তাকে আমরা লিখিত ভাষায় গ্রহণ করি। বৈদিক ভাষা থেকে এইভাবে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলি সৃষ্ট হ'য়েছে।

কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষা

॥ সাহিত্যে সাধুভাষার নিদর্শন ॥

লিখিত ভাষারূপে সাধু বাংলারই প্রচলন বেশী। দীর্ঘকাল ধ'রে বহু সাহিত্যিক সাধু ভাষায় বহু উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা ক'রেছেন। আনুষ্ঠানিক চিঠিপত্রে এখনও সাধুভাষা ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন লেখকের সাধুভাষার কিছু কিছু নিদর্শন নীচে দেওয়া হ'ল—

॥ **এক** ॥ "এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রাবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ-বিস্তার করিয়া, প্রবল বেগে গমন করিতেছে।'

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

॥ **দুই** ॥ "যাহাকে ভালবাস, তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেম-বন্ধন দৃঢ় রাখিবে, তবে সূতা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে। যাহাকে বিদায় দিবার সময় কত কাঁদিয়াছ, মনে করিয়াছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে না, কয় বৎসর পরে তাহার সহিত আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছ – "ভাল আছ ত ?" হয়ত সে কথাও হয় নাই—কথাই হয় নাই —আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে।"

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

॥ **তিন** ॥ "তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গলির রেখা সঙ্কীর্ণ হইয়া যেখানে বড়ো রাস্তায় পড়িয়াছে সেখানে খোলা আকাশে কালো পাথরের মতো অন্ধকারের উপর তারা দেখা যাইতেছে।......রাজ্য সাম্রাজ্যের কত উত্থানপতন, যুগযুগান্তরের কত প্রয়াস ও প্রার্থনাকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া ওইটুকু আকাশ এবং ওই ক'টি তারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে; অথচ, অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্য হইতে এক হৃদয় যখন আর এক হৃদয়কে আহ্বান করে তখন নিভৃত জগৎ প্রান্তের সেই বাক্যহীন ব্যাকুলতা যেন ওই দূর আকাশ এবং তারাকে স্পন্দিত করিতে থাকে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

॥ **চার** ॥ "পাখীর গানে মাধুর্য আছে কিনা, কোকিল পঞ্চমে ডাকে কি ডাকে না, আকাশপটে কার রঙ তুলি ফলায়, নদীর জল কুল কুল শব্দে কোন বাণী ঘোষণা করে, কামিনী কাঞ্চন সংসারে কতখানি অনর্থের মূল, এ সব সূক্ষ্ম তত্ত্ব কোন কালেই তাহার মাথায় প্রবেশ করে নাই এবং সেজন্য দুঃখ করিতে তাহাকে কেহ দেখে নাই। সে সোজা মানুষ, সংসারের কারবার সে সোজা করিয়াই করিতে পারে। যাহাকে ভালবাসে তাহাকে নির্বিচারেই ভালবাসে এবং তাহাতে ঘা পড়িলে কি করিবে ভাবিয়া পায় না।"

(শরৎচন্দ্র)

॥ চলিত ভাষা গ্রহণের সমস্যা ॥

দীর্ঘকাল ধ'রে সাধুভাষা আমাদের সাহিত্যের মাধ্যম ছিল। কথ্যভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে

বিভিন্ন। ডঃ স্বকুমার সেন বাংলা ভাষার পাঁচটি উপভাষা ও একটি বিভাষার অস্তিত্ব স্বীকার ক'রেছেন। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কথ্যভাষা বিভিন্ন। ছোট্ট অঞ্চল হ'লেও বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলে কথ্য ভাষার বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আরাকান-ব্রহ্মদেশের ভাষা, অসমিয়া, ওড়িয়া, হিন্দী ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষার বিভিন্নতার কারণ। ভৌগোলিক পরিবেশও বাংলা ভাষার কথ্য ভাষাকে প্রভাবান্বিত করে। নদীমাতৃক পেলব অঞ্চল, রাঢ় বাংলার ধূসর অঞ্চল, চা-বাগীচা অঞ্চল, কয়লাখনি অঞ্চল, পাটশিল্প অঞ্চল, অন্যান্য শিল্পাঞ্চল প্রভৃতিতে কথ্যভাষা বিভিন্ন। কাজেই, কথ্যভাষার সাহিত্য রচনা ক'রতে হ'লে কোন্ অঞ্চলের কথ্যভাষাকে গ্রহণ করা হবে? কারণ, এক অঞ্চলের কথ্যভাষা অন্য অঞ্চলে অপ্রচলিত, হয়ত অবোধ্যও।

কোন্ অঞ্চলের কথ্য-ভাষা গ্রহণ করা হবে?

কোলকাতা শহরের পত্তনের পর এ সমস্যার সমাধান হ'য়েছে। কোলকাতা শহর পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হ'য়েছে। বাঙালীর সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হ'ল কোলকাতা। কোলকাতা শহর ও ভাগীরথীর তীরস্থিত শিল্পাঞ্চলের মধ্যে প্রচলিত কথ্য ভাষাকেই সাহিত্যে ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত, –"...বাঙলা দেশের স্থানে স্থানে রকমারী ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ ক'রব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হ'চ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়েছে সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কোলকাতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম যেদিক হ'তেই আস্থক না, একবার কোলকাতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়, তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষায় লিখতে হবে। যত রেল এবং গতাগতির স্থবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিম ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হ'তে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ এক কোলকাতার ভাষাই রাখবে।"[১] কোলকাতা রাজধানী—শিল্প-বাণিজ্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। শিক্ষিত বাঙালীর সঙ্গে কোলকাতার যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। পূর্বেকার নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের স্থান দখল ক'রেছে কোলকাতা। কোলকাতা এখন শিক্ষা-সংস্কৃতির উৎসস্থল। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ লেখকের সঙ্গে কোলকাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। কোলকাতার কথ্য ভাষা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ কোলকাতার কথ্য ভাষার সঙ্গে পরিচিত। কাজেই বাংলা সাহিত্যে কোলকাতার কথ্য ভাষাকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কোলকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষা

॥ বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার অনুপ্রবেশ ॥

বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার অনুপ্রবেশ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) **'আলালের ঘরের দুলাল'** একটি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'আলালের ঘরের দুলাল' পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'আলালের ঘরের দুলাল' চলিত ভাষায় লেখা নয়; ক্রিয়াপদগুলির অধিকাংশই সাধুভাষায়। কিন্তু গ্রন্থটিতে বহু গ্রাম্য শব্দ স্থান পেয়েছে।

আলালী ভাষা

১। 'ভাববার কথা'—স্বামী বিবেকানন্দ

বাংলাভাষা সংস্কৃত তৎসম ও সমাসবদ্ধ পদের শৃঙ্খল মোচন ক'রে অনেকখানি স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে 'আলালের ঘরের দুলালে'র মধ্যে।

'আলালী' ভাষার দৃষ্টান্ত : "ছেলেটাকে একবার কাঁকে কর—এদিকে বাসন মাজা হয় নি ওদিকে ঘর নিকন হয় নি, তারপর রাঁদাবাড়া আছে—আমি একলা মেয়ে মানুষ এসব কি করে করব আর কোন্‌দিকে যাব ?—আমার কি চাটে হাত চাটে পা ?" নাপিত অমনি খুর-ভাঁড় বগল দাবায় করিয়া উঠিয়া বলিল—"এখন ছেলে কোলে করবার সময় নয়—কাল বাবুরাম বাবুর বিয়ে, আমাকে এখুনি যেতে হবে।"

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের **"হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা"** প্রকাশিত হয়। বইটিতে কোলকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষাকে গ্রহণ করা হ'য়েছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, "বইটির ভাষা পুরাপুরি কলিকাতার কথ্য ভাষার উপর গঠিত, সাধুভাষার শব্দ ও বাক্যাংশ আছে এবং স্ল্যাং (অভব্য) শব্দ ও বাক্যাংশও আছে।"[১] 'হুতোম প্যাচার নক্সা'য় কোলকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষাকে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে ; চলিত বাংলার বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গী গ্রন্থটির অনেক অংশে উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে রয়েছে। তবে চলিত ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে সচেতনতা ও তদনুযায়ী কোন পরিকল্পনা লেখকের ছিল না। হয়ত বইটির বিষয়বস্তুকে ঐ ভাষাতে প্রকাশ ক'রতে সুবিধে হ'ত বলে এই প্রচেষ্টা হ'য়েছিল।

হুতোমী ভাষা

'হুতোমী' ভাষার নিদর্শন :—"নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গ্যালো মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছিন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুন্‌সী, ছিরে বেণে, ও পুঁটে তেলি রাজা হলো।"

রবীন্দ্রনাথের অভিমত :— রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষার সচেতন ও সার্থক শিল্পী। 'সবুজপত্রে'র ফসল থেকে রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় চলিত ভাষাকে তাঁর সাহিত্যের বাহন হিসেবে গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁর চিঠিপত্র, কিছু কিছু ছোটগল্প, কোন কোন উপন্যাসের মধ্যে চলিত ভাষার সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। চলিত ভাষার শক্তিকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে প্রকাশ ক'রেছেন। তাঁর চলিত ভাষার নিদর্শন হ'ল,—"সন্ধ্যা তারা উঠেছে, জোয়ার এসেছে গঙ্গায়, হাওয়া উঠল ঝির্ ঝির্ করে ঝাউগাছগুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে শিকড়ে উঠল স্রোতের ছল্‌ছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদীঘি, সেইখানে খিড়কির নির্জন ঘাটে পা ধুয়ে চুল বেঁধেছ। তোমার এক একদিন এক-এক রঙের কাপড়, ভাবতে ভাবতে যাব আজকে সন্ধেবেলার রঙটা কী।" (শেষের কবিতা)

রবীন্দ্রনাথের চলিত ভাষা

বিবেকানন্দের বক্তব্য :—স্বামী বিবেকানন্দ চলিত ভাষায় সাহিত্য-রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি চলিত ভাষাকে শুধুমাত্র লঘু বিষয় নয়, বিষয়বস্তু-নির্বিশেষে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও জটিল জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও বাহন ক'রে তুলবার পক্ষপাতী ছিলেন।

১। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)—সুকুমার সেন।

তাঁর মতে, "চলিত ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরের কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর। তবে লেখবার বেলায় একটা কি-কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শনবিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে চিন্তা কর-সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে ওসকল তত্ত্ব বিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তেই পারে না। সেই ভাব, সেই ভঙ্গী, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ঘোরাও সেদিকে ঘোরে, তেমন কোন তৈয়ারী ভাষা কোনোও কালে হবে না। ভাষাকে ক'রতে হবে যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল-ঐ এক চাল নকল করে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে। ভাষা হ'চ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।"[১] স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন রচনায় চলিত ভাষার ব্যবহার ক'রেছেন।

চলিত ভাষার স্বপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য

চলিত ভাষার সংগ্রামী লেখক প্রমথ চৌধুরী:- বাংলা চলিত ভাষার সবচেয়ে সার্থক শিল্পী হ'লেন **প্রমথ চৌধুরী**। সাহিত্যে চলিত ভাষার অনুপ্রবেশের সপক্ষে তিনি সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। সাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহারের সচেতন প্রয়াস ও সক্রিয় আন্দোলনের হোতা হ'লেন প্রমথ চৌধুরী। বাংলা গদ্য রচনায় 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' যুদ্ধের চলিত ভাষার পক্ষের নেতা হিসেবে প্রমথ চৌধুরী সুপরিচিত। সাধুভাষার একাধিপত্য ও কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে তিনি সক্রিয় লেখনী চালনা ক'রেছিলেন। বাংলা গদ্যে সংস্কৃতের অনুযায়ী সাধুরীতির সর্বস্বতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রমথ চৌধুরীর সক্রিয়, সচেতন ও আক্রমণাত্মক নেতৃত্বের মূল্য অপরিসীম। ফলে পরবর্তী কালে বাংলা গদ্যের উপর প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি চলিত ভাষার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন ক'রে চলিত ভাষাকে আর্টের অনুকূল ব'লে প্রমাণ করেন। তাঁর 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাঙলা ওরফে সাধুভাষা' ও 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি আক্রমণাত্মক সরল ভাষায় যুক্তি দিয়ে চলিত ভাষা ব্যবহারের সপক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি আশ্চর্য গতিশীল প্রসাদ গুণসম্পন্ন এবং বলিষ্ঠ ওজস্বী অননুকরণীয় বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত চলিত রীতিকে আশ্রয় করে সাহিত্যে প্রতিফলিত ক'রেছেন। তীব্র মননশীলতার আলোকে প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষাশ্রিত সাহিত্য প্রোজ্জ্বল। বীরবল ছদ্মনামে প্রমথ চৌধুরীর বহু গদ্য রচনা চলিত ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির অপূর্ব নিদর্শন। তাঁর চলিত

বাংলা গদ্যে প্রমথ চৌধুরী হলেন চলিত ভাষার সংগ্রামী লেখক

১। 'ভাববার কথা'-বিবেকানন্দ

বাংলার নিদর্শন হল, —"বহু শক্তিশালী স্বল্প-সংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে স্বল্প-শক্তিশালী বহু সংখ্যক লেখকের দিন আসছে। আমাদের মনোজগতে যে নবসূর্য উদয়োন্মুখ, তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন ক'রে অন্ততঃ ষষ্টিসহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন, এরূপ হবার কারণও সুস্পষ্ট। আজকাল আমাদের ভাববার অবসর থাকলেও লেখবার যথেষ্ট সময় নেই, লেখবার অবসর থাকলেও লিখতে শেখবার অবসর নেই; অথচ আমাদের লিখতেই হবে, নচেৎ মাসিক পত্র চলবে না।" (বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ)

এককালে বাংলা গদ্যে সাধুভাষার অপ্রতিহত গতি ছিল। চলিত ভাষা তখন অবহেলিত ছিল, এমন কি অপাঙ্‌ক্তেয়ও। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের লেখকেরা ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। কাজেই তাঁদের লেখা বাংলা গদ্যে সাধুভাষার ব্যবহার যে থাকবে, তা বলা বাহুল্য। এ ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "যাঁহারা সাধু ভাষার অতিমাত্র পক্ষপাতী, তাঁহারা যদি কখনো দায়ে ঠেকিয়া একটা চলিত শব্দ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েন, তবে সেটা উদ্ধরণ চিহ্নের মধ্যে লেখেন; যেন শব্দটা অপাঙ্‌ক্তেয়, সাধু ভাষার শব্দগুলি সংস্পর্শজনিত পাপে লিপ্ত না হয়, তার জন্য এই সাবধানতা। ইহা কি জাতিভেদের দেশে অনাচরণীয় জাতিদিগের প্রতি সামাজিক ব্যবহারের অনুবৃত্তি?" পরবর্তী কালে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সচেতন প্রচেষ্টায় চলিত ভাষা বাংলা গদ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে চলিত ভাষা বর্তমানে সাধু ভাষার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে ভদ্রচরিত্রগুলিতে সাধুভাষা ও ভদ্রেতর চরিত্রগুলিতে চলিত ভাষা আরোপ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই সেক্ষেত্রে চলিত ভাষার সার্থকতা ও শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রমাণিত হ'য়েছে। পরবর্তী কালে কথাশিল্পীদের প্রচেষ্টায় চলিত ভাষার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে সাহিত্য-রচনায় চলিত ভাষা প্রাধান্যলাভ করেছে। ফলে গদ্য-সাহিত্যে সাধুভাষা এখন কোণঠাসা।

বিভিন্ন গদ্যে চলিত ভাষা বর্তমানে সাধু ভাষার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী

॥ সাহিত্যে চলিত ভাষার নিদর্শন ॥

চলিত ভাষা যে কত শক্তিশালী, তা কয়েকজন লেখকের রচনা থেকে উপলব্ধি করা যায়; —

॥ এক ॥ "বাবা বাবু মানুষ। নতুন বাবু, রূপো বাঁধানো ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়ান, কোঁচা বাঁ হাতে নিয়ে; ঘড়ির চেন ঝোলে বুকে, হাতে থাকে ঝকমকে আংটি। প্রজাপত্তরের কাছে খুব খাতির।" **—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

॥ দুই ॥ "পরদিন সকালে ক'জন চাষা দেখ্‌তে পেলে, একটি বৃদ্ধ বাঘ পগারের ভেতর ধুঁকছে। চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল ডেপুটিবাবুর বাড়ি। তিনি বল্‌লেন — এমন বাঘ তো দেখিনি, গাধার মত রং! আহা, শেয়ালে কামড়েছে, একটু

সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা—প্রমথ চৌধুরী

হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দি'। একটু চাঙ্গা হোক্, তারপর আলিপুর নিয়ে যেও; বকশিস মিলবে।"
—রাজশেখর বসু (পরশুরাম)

॥ **তিন** ॥ "চতুর্দিকে হুলস্থূল কাণ্ড; কিন্তু নিঃশব্দে। মেঘে-মেঘে আকাশে আকাশে পাহাড়ে-পর্বতে ঘর-বাড়িতে এমন কি জলে-বাতাসে এই যে বিরাট অগ্নিকাণ্ডটা হ'য়ে যাচ্ছে, তাকে নেভাবার জন্য চেঁচামেচি চীৎকার হ'চ্ছে না, আগুনের তাপে কাঠ বাঁশ ফেটে যাওয়ায় ফট্ ফট্ দুদ্দাম শব্দ হ'চ্ছে না, ঐ যে লেকের পাড়ে সোনালী বেঞ্চিতে বসে আছে মেয়েটি, তার সাদা ফ্রকে আগুন লেগেছে, সেও চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌ছে না। একী কাণ্ড!"
—সৈয়দ মুজতবা আলী (পঞ্চতন্ত্র)

॥ সাধুভাষা ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য ॥

সাধুভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সাধুভাষায় তৎসম শব্দ বাহুল্য, বড় বড় সমাসবদ্ধপদ ও যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দের প্রয়োগ অধিকমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। সাধুভাষা অনেকটা সংস্কৃতের অনুসারী। তবে সাধুভাষায় তদ্ভব শব্দ, দেশী-বিদেশী শব্দও লক্ষ্য করা যায়। সাধুভাষার একটি সুষমা-মণ্ডিত গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য আছে। বহু সাহিত্যিকের রচনায় সাধুভাষা চমৎকার-ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সংস্কৃত থেকে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলি বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট হ'য়েছে। বাংলাভাষায় যদি বেশী সংখ্যার তৎসম শব্দ (অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ) ব্যবহার করা যায়, তবে তার সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির যোগ থাকাই স্বাভাবিক। সাধুভাষার চমৎকার প্রয়োগ সাহিত্য-সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সক্ষম। দীর্ঘকাল ধ'রে বাংলা গদ্য সাহিত্য সাধুভাষার সাহায্যে সমৃদ্ধ হ'য়েছে।

সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য

চলিত ভাষার মধ্যেও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। চলিত ভাষার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার। চলিত ভাষায় বহু সংখ্যক অর্ধতৎসম শব্দ, দেশী শব্দ, বিদেশী শব্দ ও গ্রাম্য শব্দ ব্যবহৃত হয়। চলিত ভাষায় তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহারও বেশ লক্ষ্য করা যায়। বাগ্‌ধারা ও সুভাষিতগুলি চলিত ভাষার বিশিষ্ট সম্পদ। বাগ্‌ধারা ও সুভাষিত যে কোন ভাষারই বিশেষ সম্পদ বলে গণ্য হয়। চলিত ভাষায় বাংলা ভাষার সার্থক উচ্চারণ-রীতিটি বিদ্যমান। এই উচ্চারণ-রীতি হ'ল শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত বা বা ঝোঁকের ফলে দ্বিমাত্রিকতা; ফলে শব্দের অন্তে স্বররীতি ব্যতিরেকে শুদ্ধ ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ। এতে ভাষার শক্তি বৃদ্ধি হয়। প্রকাশের তীব্রতার মধ্য দিয়ে পাঠক লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার সম্যক্ উপলব্ধি লাভ ক'রতে পারে। অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতির মত স্বরধ্বনির পরিবর্তন চলিত ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য চলিত ভাষা বিশেষ শক্তিশালী হ'য়েছে। চলিত ভাষা তাই এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য

॥ সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মৌল পার্থক্য ॥

সাধুভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করা যায়; –

॥ **এক** ॥ **ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে ঃ** ক্রিয়াপদের কিছুটা সংকুচিত রূপ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপই চলিতভাষার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ—

খেলিতেছে>খেলছে, করিতেছি>করছি, যাইতেছিলাম>যাচ্ছিলাম, চলিয়া গিয়াছে>চলে গেছে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে>ঘুমিয়ে পড়েছে ইত্যাদি।

॥ **দুই** ॥ **সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে ঃ** সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্ত রূপ ও চলিত ভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সর্বনাম পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও চলিত ভাষা সাধু ভাষা থেকে পৃথক। উদাহরণ—

তাঁহার>তাঁর, তাহাদের>তাদের, ইহার>এর, তাহা>তা, ইহাকে>একে ইত্যাদি।

॥ **তিন** ॥ **স্বরসংগতির জন্য স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঃ** স্বরসংগতির সাহায্যে স্বরধ্বনির পরিবর্তন চলিত ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শব্দ-মধ্যস্থিত স্বরবর্ণগুলির মধ্যে একটি অপরটির উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে, স্বরধ্বনির পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন অধিকাংশ সময় একটা সংগতিযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। একে স্বরসংগতি বলে। সাধু ভাষার বহু শব্দ স্বরসংগতির সাহায্যে স্বরধ্বনির পরিবর্তনসহ চলিত ভাষায় এসেছে। উদাহরণ—দেশী>দিশি, বিলাতি>বিলিতি, মুলা>মূলো, কুড়াল>কুড়ুল, না>নে ইত্যাদি।

॥ **চার** ॥ **অভিশ্রুতিজনিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঃ** চলিত ভাষার অন্যতম সম্পদ হ'ল অভিশ্রুতিজনিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন। সাধুভাষার বহুশব্দ অভিশ্রুতির ফলে পরিবর্তিত হয়ে চলিত ভাষায় এসেছে। উদাহরণ—চলিয়া>চলে, করিয়া>করে, খাইয়া>খেয়ে ইত্যাদি।

॥ **পাঁচ** ॥ **সমীভবন ঃ** সমীভবনের ফলে ধ্বনি-পরিবর্তন চলিত ভাষায় লক্ষ্য করা যায়। শব্দের মধ্যস্থিত একটি বর্ণ একে অপরের প্রভাবে বা পরস্পরের প্রভাবে পড়ে সমধর্মিতা লাভ ক'রলে সমীভবন হয়। সমীভবনের সাহায্যে বহু শব্দ সাধুভাষা থেকে চলিতভাষায় এসেছে। উদাহরণ—করছ>কচ্ছ, করল>কল্ল, করতো>কত্তো ইত্যাদি।

॥ **ছয়** ॥ **স্বরাগম ঃ** শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত্যে স্বরধ্বনির আগমন চলিত ভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ—স্কুল>ইস্কুল, ইস্টেশন>স্টেশন, সূর্য>সুর্যি, বেঞ্চ>বেঞ্চি, ইঞ্চ>ইঞ্চি ইত্যাদি।

॥ **সাত** ॥ **বর্ণ-বিপর্যয় ঃ** চলিত ভাষার বহু শব্দের মধ্যে বর্ণগুলিকে পরস্পর স্থান পরিবর্তন করতে দেখা যায়। একে বর্ণ-বিপর্যয় বলে। উদাহরণ বাক্স<বাস্ক, রিক্সা>রিস্কা, ট্যাক্সি>ট্যাস্কি, পিশাচ>পিচাশ ইত্যাদি।

॥ **আট** ॥ **ধ্বনি-সংক্ষেপ ঃ** চলিত ভাষায় বহু শব্দের ধ্বনি-সংক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ—

ই-কার লোপ—আজি>আজ, কালি>কাল

উ-কার লোপ—থাকুক>থাক

এ-কার লোপ - একেলা>একলা, পনের>পনর।

ও-কার লোপ—বাম<বাঁও<বাঁ, পাদ<পাও - পা ইত্যাদি।

॥ **নয়** ॥ **চন্দ্রবিন্দু** : সাধু থেকে চলিতে আসবার সময় চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়। যেমন—কাইঞ্চা>কাঁচি, রান্ধা>রাঁধা, তাম্বু>তাঁবু।

যুক্তব্যঞ্জনের একটি লুপ্ত হ'লে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়।

যেমন—ইষ্টক>ইঁট, উচ্চ>উঁচু, চন্দ্র>চাঁদ।

অনেক সময় অকারণে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়।

যেমন—হাসি>হাঁসি, পাউরুটি>পাঁউরুটি, হাসপাতাল>হাঁসপাতাল।

॥ **দশ** ॥ **উচ্চারণ সৌৎকর্ষ** :—অনেক সময় উচ্চারণের সৌন্দর্য-সৃষ্টির জন্য চলিত ভাষায় ধ্বনি-পরিবর্তন হয়, যেমন—উঁচা>উঁচু, দুপর>দুপুর, উপর>ওপর, কুচা চিংড়ি>কুচো চিংড়ি, তিতা>তেতো ইত্যাদি।

॥ **এগারো** ॥ **অকারণ বিকৃতি** :—সাধুভাষার অনেক শব্দ চলিত ভাষায় এসে অকারণ বিকৃত হ'য়ে যায়। যেমন—মণ্ডল>মোড়ল, জানানা>জেনানা ইত্যাদি।

॥ সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ও প্রতিকার ॥

কবিগুরু তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি 'সাজাহান' ('বলাকা' কাব্যগ্রন্থ) কবিতার প্রারম্ভেই সাধু-চলিতের মিশ্রণ ক'রেছেন,—

'এ কথা **জানিতে** তুমি ভারত-ঈশ্বর সাজাহান
কালস্রোতে **ভেসে** যায় জীবন যৌবন ধন মান।"

কবিতার ক্ষেত্রে এই জাতীয় মিশ্রণ চললেও বাংলা গদ্যে সাধু-চলিতের মিশ্রণ মারাত্মক ভুল। সাধু চলিতের মিশ্রণের মধ্যে লেখকের ভাষাবোধ ও চিন্তার দৈন্য ধরা পড়ে। সাধু-চলিতের মিশ্রণ সাধারণতঃ মুখের ভাষায় ধরা হয় না। কিন্তু লেখার সময় সাধু-চলিতের মিশ্রণ মারাত্মক অপরাধ। সাধু-চলিতের মিশ্রণ শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। কারণ, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য লিখিত নির্দেশ থাকে, "সাধুভাষা ও চলিত ভাষায় মিশাইয়া উত্তর করিবে না।" কাজেই এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের যত্ন নেওয়া উচিত। নতুবা তাদের ভাষা-শিক্ষাও সার্থক হয় না।

সাধু-চলিতের মিশ্রণ মারাত্মক ভুল

সাধু-চলিত মিশ্রণের কারণ :

শিক্ষার্থীরা যে সাধু চলিতের মিশ্রণ করে, তার অনেক কারণ আছে। এই জাতীয় মিশ্রণের ভুল থেকে বয়স্ক ব্যক্তিরাও বাদ যান না। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি দায়ী :

॥ **এক** ॥ পারিপার্শ্বিকের উচ্চারণ প্রক্রিয়ার ছাপ শিশুমনে প্রভাব বিস্তার করে। প্রচলিত উচ্চারণে সাধু চলিতের মিশ্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না, তারই প্রভাব লেখ্য ভাষার উপর এসে পড়ে।

॥ **দুই** ॥ ভাষাশিক্ষা-ক্ষেত্রে দৈন্য সাধু-চলিতের মিশ্রণকে প্রভাবিত করে। আমাদের দেশে মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে নিষ্ঠার অভাব আছে। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি কেউই মতৃভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয় না। তার ফলে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে দৈন্য থেকে যায়।

॥ **তিন** ॥ শিশু তার প্রাত্যহিক জীবনে চলিত ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়। কিন্তু যখন সে বিদ্যালয়ে আসে, তখন তাকে সাধু ভাষা শিক্ষা ক'রতে হয়। চলিত ভাষা শিশু-মনে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু বিদ্যালয়ে লেখা-পড়ার সময় শিক্ষার্থীকে সাধুভাষা আয়ত্ত ক'রতে হয়। ফলে, তারা ভাষা-ব্যবহারের সময় সাধু চলিতের মিশ্রণ ক'রে ফেলে।

॥ **চার** ॥ সাধু ভাষার একটি স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য থাকে, চলিত ভাষারও। ভাষা-ব্যবহারের সময় সেই বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা ক'রতে হয়। শিক্ষাদানের সময় গুরুত্ব সহকারে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য, প্রয়োগ রীতি ও পার্থক্যগুলি শিক্ষা দিতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই সাধু ও চলিতের পার্থক্য অনুধাবন ক'রতে পারে ; সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্যের ব্যাকরণগত দিক্ শিক্ষার্থীদের ভাল করে শিক্ষা দেওয়া হয় না। সাধু-চলিত রীতির পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন থাকলে শিক্ষার্থীরা এ জাতীয় ভুল করবে না।

॥ **পাঁচ** ॥ মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে নিষ্ঠার অভাব সাধু-চলিত মিশ্রণের জন্য অনেকখানি দায়ী। বিদ্যালয়গুলিতে যথেষ্ট গুরুত্ব ও নিষ্ঠা সহকারে মাতৃভাষা শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীরা সাধু ও চলিত ভাষার রীতিগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি আয়ত্ত করতে পারবে। তারা ব্যাপক পাঠের মাধ্যমে বড় বড় সাহিত্যিকের সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে অবগত হবে। তখন ভাষা-প্রয়োগে তাদের সতর্কতা ও সচেতনতা আসবে। ফলে, তাদের লেখায় সাধু-চলিতের মিশ্রণ অনুপ্রবেশ ক'রবে না।

॥ **ছয়** ॥ দেশ-বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে বহু সংখ্যক উদ্বাস্তু এদেশে। এসেছেন। ভাগীরথী অঞ্চলের কথ্য ভাষার সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল না ব'লে তাঁরা তাঁদের লেখায় সাধু ভাষাকেই ব্যবহার ক'রেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে কথ্য ভাষায় লিখতে গিয়ে সাধু-চলিতের মিশ্রণ ক'রে ফেলেছেন।

সাধু-চলিত মিশ্রণের প্রতিকার ঃ

যে কারণেই সাধু-চলিতের মিশ্রণ প্রচলিত হোক না কেন, তা ভুল। সাধু-রীতি ও চলিত-রীতির পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে ; লেখবার সময় সেগুলিকে রক্ষা ক'রতেই হয়। সাধু ও চলিত ভাষা—আপন আপন নিয়ম মেনে চলে। তাই লেখায় এই দুই রীতির মিশ্রণ অত্যন্ত দোষের। কিন্তু এ-জাতীয় মিশ্রণ ছাত্রছাত্রী এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখা যায়। এর প্রতিকারের কথা চিন্তা করা হ'য়েছে। কারণ, তা না হ'লে শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষায় ত্রুটি থেকে যায়। মাতৃভাষা শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে, শিক্ষার্থীরা যেন নিষ্ঠার সঙ্গে ভাষা শিক্ষা করে। এ ব্যাপারে ছাত্র,

শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃ-ভাষাকে গুরুত্বদিতে হবে

শিক্ষক, অভিভাবক ও বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ—সকলকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। পাঠ্যক্রমে ও পরীক্ষায় মাতৃভাষার স্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে।

শিক্ষার্থীরা ভাষা-ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত ক'রবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শব্দ-চেতনার সৃষ্টি ক'রতে হবে। শব্দের প্রতীকদ্যোতকতা তারা যেন সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি ক'রতে পারে। শিক্ষার্থীদের চিন্তার সঙ্গে ভাষার সুষ্ঠু যোগাযোগ ক'রতে হবে। সাধুভাষা ও চলিতভাষার রীতি, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যগুলি শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে শিক্ষা দিতে হবে। তারা যেন দু'টি ভাষারীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ও সতর্ক হয়। সাহিত্য-পাঠে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তরিকতা ও আগ্রহের সৃষ্টি ক'রতে হবে। তখন তারা বড় বড় সাহিত্যিকের রচনা থেকে সাধু ও চলিত রীতি সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি ক'রতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের ভাষাগত ক্ষমতা অর্জনের শিক্ষা দিতে হবে

প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় সাধু-চলিত মিশ্রণের প্রতিকারের জন্য দু'টো পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, (১) সাধু ভাষা থেকে চলিতভাষার রূপান্তর, চলিত ভাষা থেকে সাধু ভাষায় রূপান্তর ; (২) ভুল সংশোধন। কিন্তু এ দু'টো পদ্ধতি হ'ল অবৈজ্ঞানিক, অমনস্তাত্ত্বিক ও নেতিবাচক। এই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন ক'রে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক, মনস্তত্ত্বনির্ভর, ইতিবাচক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলন ক'রতে হবে।

পুরাতন পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক

ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে সাধু-চলিত রীতির পার্থক্য প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দিতে হবে। স্বরসংগতি ও অভিশ্রুতির বৈশিষ্ট্য ও সেক্ষেত্রে সাধু-রীতি ও চলিত-রীতির পার্থক্য সম্বন্ধেও শিক্ষার্থীরা অবহিত হবে। আলোচনা, বিতর্ক, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে *speech habit* গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীরা যেন মুখের ভাষা ব্যবহারের সময় সাধু-চলিতের মিশ্রণ না করে। **শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখার অভ্যাস গড়ে তোলাই সাধুভাষা-চলিতভাষা মিশ্রণজনিত ভুল প্রতিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।** নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা লিখবে,—এই লেখা স্বরচিত সাহিত্যধর্মী হ'লে ভাল হয়। এইসব লেখাগুলিকে সংশোধন ক'রে দিতে হবে। ভুল ধ'রে দেওয়া যেন আক্রমণাত্মক বা অপমানাত্মক না হয়। শিক্ষককে যথেষ্ট সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাদের ভুলগুলি সংশোধন ক'রে দিতে হবে। **এ ব্যাপারে শিক্ষকের একটি ভূমিকা আছে।** তাঁর সযত্ন প্রয়াস, নিষ্ঠাপূর্ণ শিক্ষাদান শিক্ষার্থীদের সাধু-চলিতের মিশ্রণ-জনিত অপরাধ থেকে রক্ষা ক'রতে পারে। ভাষার প্রতি অনুরাগ ও ভাষা-চর্চার প্রতি আগ্রহ-ই শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সাধু-চলিতের মিশ্রণজনিত অবস্থার প্রতিকার ক'রতে পারে।

শিক্ষাদানের সঠিক পদ্ধতি

সাধুভাষা ও চলিতভাষার পৃথক রীতি ও বৈশিষ্ট্য থাকলেও বর্তমানে সাধুভাষা

চলিতভাষার অনেক সম্পদ গ্রহণ ক'রেছে, আর চলিতভাষাও সাধুভাষা থেকে অনেক কিছু গ্রহণ ক'রেছে। বর্তমানে সাধুভাষা দেশী-বিদেশী বহু শব্দ, অর্ধতৎসম শব্দ, -এমন কি অনেক গ্রাম্য শব্দকেও গ্রহণ ক'রেছে। বাগ্‌ধারাগুলির প্রয়োগ এখন সাধুভাষায় লক্ষ্য করা যায়। বড় বড় সমাসবদ্ধ পদ ও তৎসম শব্দবাহুল্য সাধুভাষাকে যে পরিমাণ কাঠিন্য দান ক'রেছিল, বর্তমানে সাধুভাষা তা থেকে মুক্ত। কারণ সাধুভাষায় এখন বড়বড় সমাসবদ্ধ পদ ও অধিক সংখ্যক তৎসম শব্দ ব্যবহার করা হয় না। সাধুভাষা এখন অনেক সহজ ও সরল হয়েছে। চলিতভাষার মধ্যেও এখন অনেক তৎসম শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। **কেবলমাত্র ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে এ দু'টি রীতির প্রাচীনত্ব ও বৈশিষ্ট্য এখনও বিদ্যমান। তার সঙ্গে অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতির বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা ক'রতে পারলে সাধুরীতি ও চলিতরীতির প্রয়োগ অনেক সহজ হয়ে যায়।** তবে সাধুরীতি ও চলিতরীতির সাহিত্যিক প্রয়োগ ভাষার যে শক্তি ও গতির পরিচয় রেখেছে, তার যথাযথ অনুশীলন প্রয়োজন।

সাধুভাষা ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে চলিত ভাষার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রচেষ্টা হ'য়েছে। এ জাতীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাদপ্তর রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'কে পাঠ্যতালিকাভুক্ত ক'রে সঠিক কাজ ক'রেছেন। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য সংকলন-পুস্তকে (কিশলয়) চলিতভাষা ব্যবহার করা হ'য়েছে। **কিশলয়** গ্রন্থের ভূমিকাতে বলা হ'য়েছে, "পূর্বের সংস্করণগুলিতে কেবল চলিত রীতিতে লিখিত রচনাই স্থান পেয়েছিল। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি ; তবে এবার সাধুভাষায় লিখিত রচনা চলিত ভাষায় রূপান্তরিত, সংক্ষেপিত বা পরিবর্তিত না ক'রে কেবল চলিত ভাষায় লিখিত রচনা অথবা তার অংশ বিশেষ সংকলন করা হ'য়েছে।" লেখক যখন কোন রচনায় সাধুভাষা বা চলিতভাষা প্রয়োগ করেন, তখন ধরে নিতে হবে যে, তিনি সচেতন হ'য়েই তা করেন। যে রচনায় সাধুভাষা উপযোগী মনে করেন, সাহিত্যিক সেই রচনায় সাধুভাষা ব্যবহার করেন। আবার যখন চলিত ভাষাকে গ্রহণ করেন, তখন সেই রচনা চলিত ভাষায় লেখবার উপযোগী বলেই তা করেন। সেক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা আছে। কাজেই লেখকের সাধুভাষায় লেখা কোন রচনাকে "চলিত ভাষায় রূপান্তরিত ক'রে সংকলন-গ্রন্থে স্থান দেওয়া ঠিক নয়। তাতে তার সাহিত্যিক মূল্য কমে যায়। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের চলিত ভাষাই শিক্ষা দেওয়া উচিত। তার কারণ, তারা গৃহপরিবেশে সর্বত্র চলিত ভাষার ব্যবহারই দেখে ; এবং তারা নিজেরাই অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই চলিত ভাষা শিখে ফেলে। প্রাথমিক স্তরে তাই চলিত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া উচিত, পাঠ্যপুস্তকও রচনা করা উচিত। ফলে পরবর্তী কালে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সাধু-চলিতের মিশ্রণের সম্ভাবনা কম থাকে।

প্রাথমিক স্তরে চলিত ভাষার শিক্ষা দেওয়া ও পাঠ্য পুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তা

॥ উচ্চারণের ক্ষেত্রে উপভাষা বা আঞ্চলিকতার প্রভাব॥
(The Influence of local dialects on Speech habits)

ভাষা-উচ্চারণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার প্রভাব সুস্পষ্টভাবেই দেখা যায়। ভৌগোলিক পরিবেশ ভাষা-উচ্চারণকে প্রভাবান্বিত করে। বাংলা ভাষা অধ্যুষিত এলাকা ছোট হ'লেও এর মধ্যে কয়েকটি অঞ্চল সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাষা-উচ্চারণের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্য ও প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক আঞ্চলিক উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত এলাকার ভাষাকে উপভাষা ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন। কোন ভাষা-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট দল বা অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষারূপের নাম উপভাষা। বাংলা ভাষায় পাঁচটি উপভাষাকে ভাষাতাত্ত্বিকেরা স্বীকার ক'রেছেন ; সেগুলি হ'ল,—

উপভাষা

(১) **রাঢ়ী**—মধ্য-পশ্চিম বঙ্গের উপভাষা ;
(২) **ঝাড়খণ্ডী** – দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের উপভাষা ;
(৩) **বরেন্দ্রী**—উত্তর বঙ্গের উপভাষা ;
(৪) **বঙ্গালী** – পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা ;
(৫) **কামরূপী**—উত্তর-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা।

এই পাঁচটি অঞ্চলের পাঁচটি বিভিন্ন উপভাষার মধ্যে কতকগুলি উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি সম্পর্কে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ এক ॥ রাঢ়ী উপভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) রাঢ়ী উপভাষায় অভিশ্রুতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।
রাখিয়া > রেখে, করিয়া > করে ইত্যাদি।

(খ) রাঢ়ী উপভাষায় স্বরসঙ্গতি সাহায্যে ধ্বনি-পরিবর্তনের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। দেশী > দিশি, বিলাতি > বিলিতি ইত্যাদি।

(গ) উচ্চারণে অ-কারের ও-কার প্রবণতা দেখা যায়।
অতুল > ওতুল।

(ঘ) রাঢ়ী উপভাষার অনুনাসিক স্বর লুপ্ত হয় না।
চাঁদ, আঁট, কাঁটা।

অনেক স্থলে অস্থানে অনুনাসিক বর্ণের আগম হয়।
হইছে, চাঁ (বাঁকুড়া-মালভূম-বীরভূম অঞ্চলে)।

(ঙ) শব্দের প্রথম স্বরধ্বনিতে শ্বাসঘাত সুস্পষ্ট হওয়ার ফলে পদান্তস্থিত ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা বা ঘোষবত্তা লোপ পায়।
দুধ > দূদ, মধু > মদু, লর্ড > লাড > লাট।

(চ) অঘোষধ্বনি ঘোষবৎ হয়।
ছত্র > ছাদ, কাক > কাগ, শাক > শাগ ইত্যাদি।

॥ দুই ॥ ঝাড়খণ্ডী উপভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য ঃ—

(ক) অনুসর্গবিহীন সম্প্রদান কারক।

'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল,' ঘাসকে গেল্ছে।

(খ) নামধাতুর বাহুল্য।

পুখুরের জলটা ভারি গঁধাচ্ছে,

রাতে ভারি জাড়াবে।

॥ তিন ॥ বরেন্দ্রী উপভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য ঃ

বিহারের ভাষা ও উচ্চারণ-রীতির প্রভাব বরেন্দ্রী উপভাষায় পড়েছে, রাঢ়ী উপভাষার সঙ্গে বরেন্দ্রী যোগ আছে। এর উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল ;—

(ক) পদের আদিস্থিত 'র'কারের লোপ প্রবণতা ও স্বরধ্বনির আগে 'র'কারের আগম। আমের রস>রামের অস।

(খ) জ্-এর ২ উচ্চারণ।

॥ চার ॥ বঙ্গালী উপভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) অপিনিহিত আছে ; এবং সেজন্য স্বরধ্বনির প্রাচীনত্ব বিদ্যমান।
রাখিয়া>রাইখিয়া>রাইখা, করিয়া>কইরিয়া>কইরা।

(খ) য-ফলায় ও যুক্তব্যঞ্জনে অপিনিহিতির মত স্বরাগম।
সত্য>সইত্ত, রাক্ষস>রাইক্খস, ব্রহ্ম>ব্রাইম্ভ।

(গ) পদমধ্যস্থিত 'হ'-কারের লোপ এবং শ, ষ, স-এর হ-কারে পরিণতি।
হয়>অয়, সে>হে।

(ঘ) এ-কার প্রায়ই 'অ্যা'-কারে এবং ও-কার উ-কারে পরিণত হয়।
বেলা>ব্যালা, বোন>বুন।

(ঙ) শ্বাসঘাতের নির্দিষ্ট স্থান নাই।

(চ) ক্রিয়ারূপের পার্থক্য আছে।
করতেছি>কইরত্যাছি, করছি>কোরছি

বঙ্গালী উপভাষায় **'চাটিগ্রামী'** বিভাষার অস্তিত্ব ভাষাতাত্ত্বিকেরা স্বীকার ক'রেছেন।

॥ পাঁচ ॥ কামরূপী উপভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য ঃ

কামরূপী উপভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বরেন্দ্রী ও বঙ্গালীর মাঝামাঝি ;— কতক উত্তরবঙ্গের ও কতক পূর্ববঙ্গের উপভাষার অনুরূপ, তবে বরেন্দ্রীর সঙ্গে কামরূপের সম্পর্ক নিকটতর। এর উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল,—

(ক) চতুর্থবর্ণ পদের আদিতে বজায় থাকে, অন্যত্র তৃতীয় বর্ণ হ'য়ে যায়।

(খ) ড়>র, ঢ়>র্‌হ উচ্চারণ হয়।

(গ) শ্বাসঘাতের নির্দিষ্ট স্থান নাই।

ভাষার ক্ষেত্রে উচ্চারণ-তত্ত্ব বিশেষ প্রয়োজন। সঠিক উচ্চারণ ও সাধুভাষা

চলিতভাষা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ভাষা-শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। বাংলা চলিত রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই সাধু-রীতির সহিত চলিতের এবং চলিত-রীতির সহিত সাধুর সংমিশ্রণ করিয়া ফেলে—এই ত্রুটির কারণ কি এবং কি উপায়ে ইহা নিবারণ করা সম্ভব তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করুন।
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৫)

২। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার 'কিশলয়' নামক বাংলা প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তকে সাধুভাষা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া "সবগুলি গদ্য রচনাই কথ্য ভাষায়" প্রকাশ করিতেছেন। এমন কি "সাধুভাষায় লিখিতমূল রচনাগুলিও কথ্য রীতিতে রূপান্তরিত" করিয়াছেন—বাংলাভাষার শিক্ষক হিসাবে এই সংস্কার-কার্যের ঔচিত্য বা অনৌচিত্য সম্বন্ধে আপনার অভিমত যুক্তিসহকারে প্রতিষ্ঠিত করুন।
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৮)

৩। রচনায় সাধু ও চলিত দুইটি ভাষা যাহাতে মিশিয়া না যায়, ইহা ভাল করিয়া শিখাইবার জন্য রচনা শিক্ষার্থীকে সাধু ও চলিত বাংলার রূপগত পার্থক্য কিরূপ নির্দেশ দিবে?
(কলিঃ বিশ্বঃ, বি, টি. ১৯৬৪)

৪। সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে আপনি কোন্‌টি ব্যবহারের পক্ষপাতী এবং কি কারণে পক্ষপাতী, তাহা যুক্তিসহকারে প্রকাশ করুন। (কলিঃ বিশ্বঃ, বি. টি, ১৯৬৯)

৫। বাংলা ভাষার সাধুরীতি ও চলিতরীতি সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করুন। চলিত রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিবৃত করুন। (কলিঃ বিশ্বঃ, বি. টি. ১৯৭১)

৬। বাংলা ভাষার চলিতরীতির বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষিত করুন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যে প্রায়ই সাধুচলিত রীতির সংমিশ্রণ করিয়া ফেলে তাহার কারণ ও নিবারণের উপায় উল্লেখ করুন। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৭)

৭। ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের রচনায় প্রায়ই সাধু-রীতির সহিত চলিত-রীতির সংমিশ্রণ করিয়া ফেলে। এই ত্রুটি কিভাবে নিবারণ করা যায়? পূর্বে কিশলয় পড়িবার সময় একই গ্রন্থে শিশুরা সাধু-রীতি ও চলিত-রীতির রচনা পাইত। শিশুদের ভাষা-শিক্ষার সময় তাহার প্রভাব কিরূপ হইত বলিয়া আপনি মনে করেন, যুক্তি সহকারে আলোচনা করুন। (কল্যাণী বিশ্বঃ, বি. টি. ১৯৬৮)

৮। কথ্য ও লেখ্য ভাষার পার্থক্য উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করুন। ভাষার এই দুই রূপের সঠিক পরিচয় দেবার জন্য শিক্ষকের কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত?
(বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড্. ১৯৭০)

৯। দৃষ্টান্ত সহযোগে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন—
বাংলা ভাষায় সাধু ও চলিত রীতির প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য। (কলিঃ বিশ্বঃ, বি. এড্. ১৯৭৫)

১০। বাংলা ভাষার চলিত-রীতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন। ছাত্রছাত্রীরা যে প্রায়ই সাধু ও চলিত রীতির সংমিশ্রণ করিয়া ফেলে, তাহার কারণ ও নিবারণের উপায় উল্লেখ করুন।
(কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড্. ১৯৭২)

তৃতীয় অধ্যায়

ধ্বনিতত্ত্ব
(**Phonetics**)

ভাষার দু'টি রূপ ;- লেখার ভাষা ও মুখের কথা। লেখার ভাষা লিখন-নির্ভর ; এর রূপ স্থায়ী। লেখবার জন্য ভাষার ভিত্তি হ'ল কতকগুলি বর্ণ (*letter*)। বর্ণগুলি অর্থহীন কতকগুলি আঁকাবাঁকা রেখার সাহায্যে গঠিত প্রতীক-চিহ্ন মাত্র। অথচ এগুলিই ভাষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। কয়েকটি বর্ণকে নিয়ে যখন কোন অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়, তখন তাকে শব্দ (*word*) বলে। প্রত্যেকটি শব্দ কোন একটি বস্তু বা বিষয়ের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভাষার প্রধান গুণ হ'ল প্রতীকদ্যোতকতা। কতকগুলি শব্দ যখন একত্রিত হ'য়ে মনের কোন সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে, তখন তাকে বাক্য (*Sentence*) বলে। মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা সচেতন মানুষের বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি। বর্ণগুলির মাধ্যমেই ভাষা লিপিরূপ লাভ ক'রে স্থায়িত্ব অর্জন করে। মুখের কথায় বক্তার সম্মুখস্থ শ্রোতা মনের ভাব গ্রহণ ক'রতে পারে। মুখের ভাষা ধ্বনি-প্রধান, বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে আমরা আমাদের মনের ভাবকে উচ্চারণ করি। মুখ-গহ্বরের বিভিন্ন অংশ ধ্বনিবৈচিত্র্যের সৃষ্টির মাধ্যমে ভাষার সৃষ্টি করে। এক বা তার অধিক ধ্বনি নিয়েই অর্থযুক্ত শব্দ উচ্চারিত হয়। কতকগুলি শব্দ যখন মনের কোন সম্পূর্ণ ভাবকে প্রকাশ করে, তখন তাকে বাক্য বলে। "বাক্যে প্রযুক্ত ধ্বনিময় অর্থসমৃদ্ধ শব্দ সমষ্টিকেই ভাষা বলে।" ভাষার লিপিরূপ বা ধ্বনিরূপের মাধ্যমেই আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি বা গ্রহণ করি। লিখিত ভাষা পড়বার সময় ও ধ্বনি-উচ্চারণের সময় প্রয়োজন হয়। ধ্বনিবৈচিত্র্যই ভাষার প্রাণসম্পদ। ভাষার মাধ্যমে কি বলা হল এবং কেমন ক'রে বলা হ'ল তা নির্ভর করে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের উপর। ভাষার ক্ষেত্রে ধ্বনি বা উচ্চারণ তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

লেখার ভাষা ও মুখের কথা

প্রত্যেক ভাষার কিছু কিছু নিয়ম ও রীতি আছে। ভাষার এই জাতীয় নিয়ম ও রীতি সমৃদ্ধ বিজ্ঞানশাস্ত্রের নাম ব্যাকরণ। ব্যাকরণের বিভিন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে ভাষা আবদ্ধ থাকে। ফলে ভাঙ্গন ও অবক্ষয়ের মুখ থেকে ভাষা রক্ষা পায়। ধ্বনিতত্ত্ব ব্যাকরণের অন্তর্ভূ'ত। ভাষার মধ্যে ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়ম ইত্যাদি নিয়েই ধ্বনিতত্ত্ব। জাতীয় অধ্যাপক ও প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ **ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের** মতে ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্ভূ'ত বিষয়গুলি হ'ল,—

১। উচ্চারণতত্ত্ব (*phonetics*)

২। শব্দমধ্যে ধ্বনিগুলির পরস্পর প্রভাব, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া (*phonology*)

৩। ছন্দ (*prosody*)

৪। ভদ্র সমাজের প্রচলিত উচ্চারণ-রীতি (*orthoepy*)

৫। যতিচিহ্ন স্থাপনের নিয়ম (*punctuation*)
৬। লেখবার সময় যথাযথ বর্ণবিন্যাস (*o thography*)

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, ধ্বনিতত্ত্বের বিষয়বস্তু হ'ল ধ্বনি-পরিবর্তনের ইতিহাস। **ডঃ মুরারিমোহন সেন** ভাষা-বিজ্ঞানের পাঁচটি প্রধান শাখার মধ্যে ধ্বনিতত্ত্বকে (*phonology*) অন্যতম বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে ধ্বনিতত্ত্বের বিষয়বস্তু হ'ল, "ভাষার ধ্বনিসমূহ ও তাহাদের পরিবর্তন। ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে যে সকল ধ্বনিগত পরিবর্তন হইয়াছে, কিংবা ভাষার আঞ্চলিক রূপে যে সকল রূপান্তর লক্ষিত হয়, তাহাই ধ্বনিতত্ত্বের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।" **ডঃ কৃষ্ণপদ গোস্বামী** ধ্বনিতত্ত্ব (*phonology*) বলতে বাংলা উচ্চারণ ও ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মের কথা বলেছেন।

উচ্চারণতত্ত্ব

সমস্ত ভাষাতাত্ত্বিকেরাই ধ্বনিতত্ত্বের মধ্যে **উচ্চারণতত্ত্ব** ও ধ্বনি-পরিবর্তনের কথা বলেছেন। উচ্চারণতত্ত্ব ভাষার প্রাণসম্পদ। ভাষার লিপিরূপকে স্বীকার ক'রেও ধ্বনিগত উচ্চারণকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হয়। অনেকে ধ্বনিতত্ত্বের মধ্যে যতিচিহ্ন স্থাপন ও ছন্দকে অন্তর্ভূ'ত করতে চেয়েছেন। উচ্চারণের ক্ষেত্রে তু'টিই প্রয়োজনীয় উপাদান। যতি-চিহ্নগুলি বাংলা উচ্চারণকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ভাষাকে অর্থপূর্ণ ক'রে তোলে। ছন্দ ভাষার উচ্চারণকে সৌংকর্ষ ও সৌন্দর্য-সুষমা দান করে। ধ্বনিতত্ত্বে ও উচ্চারণতত্ত্বে যতিচ্ছেদে ও ছন্দ তাই প্রয়োজন হয়। অনেকে ধ্বনিতত্ত্ব বলতে কেবলমাত্র উচ্চারণতত্ত্বের (*phonetics*) কথা বলেন। কিন্তু উচ্চারণতত্ত্বের কথা বললে ধ্বনিগুলির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যতিচিহ্নগুলির কথা এসে পড়ে। কবিতার উচ্চারণ তো ছন্দ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত!

ধ্বনি-পরিবর্তনের কারণ

ভাষা পরিবর্তনশীল। অনেক সময় এই পরিবর্তন খুব দ্রুত হয়। এই পরিবর্তনের স্রোতে ধ্বনিও পরিবর্তিত হয়। **ভাষার পরিবর্তন মূলতঃ ধ্বনিরই পরিবর্তন।** ধ্বনিপরিবর্তনের অনেক কারণ আছে। ভৌগোলিক পরিবেশ ধ্বনিগুলির উচ্চারণকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং বিভিন্ন উচ্চারণকে প্রভাবিত করে। বাংলা ভাষার অঞ্চল বা এলাকা খুব বেশী না হ'লেও এই এলাকার মধ্যে ভৌগোলিক বিভিন্নতা কম নয়। পার্বত্য অঞ্চল, নদী অঞ্চল, খনি অঞ্চল, শিল্প অঞ্চল, রাঢ় অঞ্চল, চা-বাগীচা অঞ্চল প্রভৃতির ভৌগোলিক বিভিন্নতা ধ্বনির উচ্চারণকে প্রভাবিত করে। অন্যান্য ভাষার উচ্চারণগত প্রভাবও বাংলা ভাষার উচ্চারণের উপর প্রভাবিত করে। জিহ্বার জড়তা ও শ্রবণ-শক্তির অপ্রখরতাও ধ্বনি-পরিবর্তন ও উচ্চারণের বিভিন্নতার জন্য দায়ী। ভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রভাবও উচ্চারণের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে ধ্বনি পরিবর্তনে সাহায্য করে। **শব্দমধ্যে ধ্বনিগুলির পরস্পর প্রভাব ধ্বনিপরিবর্তনের সবচেয়ে বড় ভাষাতাত্ত্বিক কারণ।** ব্যক্তি বিশেষে যে উচ্চারণ-বৈষম্য আছে, তা ধ্বনি-পরিবর্তনে সাহায্য করে। শিশুর উচ্চারণে বয়স্ক ব্যক্তির উচ্চারণের প্রভাব থাকে। কাজেই দেখা যায় যে, বিভিন্ন কারণে ধ্বনি-পরিবর্তন হয়; এই ধ্বনি-পরিবর্তন ধ্বনির উচ্চারণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

॥ স্বরধ্বনির উচ্চারণ ॥

আমাদের বর্ণমালা অন্তরঙ্গরূপে সংস্কৃত বা দেবনাগরীর অনুগামী, কিন্তু তার বহিরঙ্গরূপ হ'ল বাংলা। অর্থাৎ উচ্চারণের ক্ষেত্রে বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে সংস্কৃত বর্ণমালার যোগ আছে। কিন্তু বাংলা স্বরবর্ণগুলি উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা লাভ করেছে।

॥ **এক** ॥ বাংলা লিপিমালায় হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বরের সংস্থান থাকলেও উচ্চারণে সাধারণত তা হয় না। তাই অ-আ, ই-ঈ, উ-ঊ প্রভৃতির উচ্চারণ-কাল প্রায় একই। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে দীর্ঘস্বরগুলির যথার্থ উচ্চারণ হয়। 'মহাভারত'-এর 'আ'-এর উচ্চারণ যথাযথ তান ক'রে বিলম্বিত উচ্চারণের সময় বা জোর দিয়ে উচ্চারণের সময় দীর্ঘস্বর যথাযথভাবে উচ্চারিত হয়।

॥ **দুই** ॥ বাংলা 'অ'-এর উচ্চারণ বিভিন্ন, যেমন,—

সম্বৃত, অর্থাৎ ইংরেজী o বা বাংলার ও-এর মত।

হরি>হোরি, করি>কোরি>ক'রি, ভাল>ভালো, বড়>বড়ো, **মত**>মতো।

বিবৃত, অর্থাৎ বর্ণটির যথার্থ উচ্চারণ।

হত, বিগত, আগত।

লুপ্ত, অর্থাৎ ব্যঞ্জনধ্বনি থেকে বিযুক্ত।

মন>মন্, চল>চল্, মূল>মূল্।

॥ **তিন** ॥ বাংলা 'ঋ' বর্ণের নিজস্ব উচ্চারণ নেই। ধ্বনিটি 'রি'-এর মত উচ্চারিত হয়।

॥ **চার** ॥ ঋ ও ঌ— বাংলা বর্ণমালার এই দু'টি বর্ণের উচ্চারণ নেই, ব্যবহারও নেই।

॥ **পাঁচ** ॥ 'এ'-এর উচ্চারণ অনেক সময় স্বাভাবিক হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে 'এ'-এর উচ্চারণ বিকৃত হ'য়ে 'অ্যা'-এর মত হয়। যেমন- মেলা>ম্যালা, পেঁচা>প্যাঁচা।

॥ **ছয়** ॥ 'ঐ' ও 'ঔ'—এই দুটি বর্ণ 'যৌগিক স্বর'; উচ্চারণ যথাক্রমে অ+ই এবং অ+উ। লেখা ও উচ্চারণে ঐ বর্ণ দু'টি যৌগিক স্বরের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখে। যেমন—

কৈ>কই, দৈ>দই, সৈ>সই

বৌ>বউ, মৌ>মউ, নৌকা>নউকা (উচ্চারণে)

॥ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ ॥

বাংলা বর্ণমালার ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে উচ্চারণগত কতকগুলি সাধারণ কথা আছে।

॥ **এক** ॥ বাংলার জ-য, ব-ব, ন-ণ, শ-ষ-স-এর উচ্চারণগত বিশেষ পার্থক্য নেই। বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণে পার্থক্য নেই, লেখবার সময়ও পার্থক্য নেই। ন-ণ-এর উচ্চারণ ন-এর মত।

জ-য-এর উচ্চারণ জ-এর মত, কোথাও বা ই-এর মত।

শ-ষ-স-এর উচ্চারণ 'শ', তবে যুক্তাক্ষরে 'স'।

॥ দুই ॥ ং-এর উচ্চারণ 'ঙ'-এর মত, আবার ঙ-এর উচ্চারণ ং-এর মত। যেমন – রঙ>রং, গঙ্গা>গংগা, মঙ্গল>মংগল।

॥ তিন ॥ 'হ'-এর উচ্চারণ 'য' ফলার সঙ্গে যুক্ত হ'লে 'জ্ ঝ'-এর মত। যেমন—সহ্য>সজ্ঝ, লেহ্য>লেজ্ঝ।

॥ চার ॥ ঞ-এর উচ্চারণ ই অ-এর মত। চ, ছ-এর পূর্বে ঞ সংযুক্ত হ'লে ন্-এর মত উচ্চারিত হয়। চঞ্চল>চন্চল্, অঞ্চল>অন্চল্, ঝঞ্ঝা>ঝন্ঝা। জ-এর পরে ঞ যুক্ত হ'লে তার উচ্চারণ 'গ গ্যঁ' বা 'গাঁ'-এর মত হয়। যেমন—সংজ্ঞা>সংগাঁ, বিজ্ঞ>বিগগঁ>বিগ্যঁ।

॥ পাঁচ ॥ শব্দের শেষে 'ঃ' থাকলে তার উচ্চারণ বাংলায় হয় না। যেমন—ক্রমশঃ, সাধারণতঃ।

শব্দের মধ্যস্থিত বিসর্গ (ঃ) পরবর্তী বর্ণকে দ্বিত্ব করে।

যেমন—দুঃখ>দুখ্খ, অতঃপর>অতপ্পর।

ঃ-এর সঠিক উচ্চারণ কতকগুলি অব্যয় পদে হয়। যেমন,—উঃ, আঃ।

॥ ছয় ॥ ঁ-এর উচ্চারণ অনুনাসিক হয়। নাসিক্য ধ্বনির ঙ, ঞ, ন, ণ, ম, ং, ঁ) সংস্পর্শে বর্ণের উচ্চারণও অনুনাসিক হয়।

॥ সাত ॥ ড়, ঢ় ও ড, ঢ-এর উচ্চারণ শক্ত।

॥ আট ॥ র-এর উচ্চারণ যখন ড়, ড়-এর উচ্চারণ যখন 'র' হয়, তখন অর্থ-বিভ্রান্তি দেখা যায়, যেমন—বারি>বাড়ি, নারী>নাড়ী।

॥ সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ ॥

সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণের ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণগুলির উচ্চারণ বজায় থাকে। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

॥ এক ॥ ক্ষ যখন শব্দের প্রথমে থাকে, তখন তার উচ্চারণ হয় খ এবং অন্যত্র থাকলে তার উচ্চারণ হয় ক্খ-এর মত। যেমন - ক্ষমতা>খমতা, ক্ষমা>খমা, অক্ষত>অক্খত, দীক্ষা>দীক্খা।

॥ দুই ॥ সংযুক্ত বর্ণের সঙ্গে ব, য, ম থাকলে এই ধ্বনিগুলির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন—পক্ব>পক্ক, নিক্বণ>নিক্কণ, আধিক্য>আধিক্ক, বাৎসল্য>বাৎসল্ল, খাদ্য>খাদ্দ, সাম্য>সাম্ম ইত্যাদি।

॥ তিন ॥ সংযুক্ত বর্ণের সঙ্গে 'ম' যুক্ত থাকলে একটি অনুনাসিক বর্ণ যুক্ত হয় যেমন— পদ্ম>পদ্দঁ, গ্রীষ্ম>গ্রীষ্ষ।

॥ চার ॥ হ্ব-এর উচ্চারণ বিভিন্ন রকম।
যেমন—বিহ্বল>বিউহল, জিহ্বা>জিউভা, আহ্বান>আওভান।

॥ পাঁচ ॥ হ্য-এর উচ্চারণ 'জ্ঝ'-এর মত। যেমন লেহ্য>লেজ্ঝ।

॥ ছয় ॥ যুক্তবর্ণ প্রথমে থাকলে এবং ঐ যুক্তবর্ণের একটি 'ব' বা 'ম' হ'লে তার উচ্চারণ হয় না। যেমন,—দ্বার>দার, ত্বরা>তরা, জ্বর>জর, শ্মশান>শশান, শ্মশ্রু>শশ্রু।

॥ **সাত** ॥ ঙ্গ-এর উচ্চারণ—ং-এর মত হয়;
যেমন,—গঙ্গা>গংগা, জঙ্গল>জংগল।

॥ **আট** ॥ জ্ঞ-এর উচ্চারণ গ্যঁ-এর মত। যেমন, জ্ঞান>গ্যাঁন, অজ্ঞ>অগ্‌গ্যঁ।

॥ **নয়** ॥ হ্ল-এর উচ্চারণ ল্‌হ-এর মত। যেমন, আহ্লাদ>আল্‌হাদ।

॥ **দশ** ॥ হ্ম-এর উচ্চারণ ম্‌হ-এর মত হয়। ব্রহ্ম>ব্রম্‌হ, ব্রাহ্মণ>ব্রাম্‌হণ।

॥ **এগারো** ॥ সংযুক্ত বর্ণের সঙ্গে 'ঞ' থাকলে তার উচ্চারণ 'ন'-এর মত হয়। যেমন, অঞ্চল>অন্‌চল, বাঞ্ছা>বান্‌ছা।

এইভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাংলা বর্ণের উচ্চারণ বিভিন্ন। এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যই ভাষার প্রাণসম্পদ্। শব্দমধ্যে-ব্যবহৃত বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণ-বৈষম্য ও ধ্বনি-বৈচিত্র্য ভাষার প্রধান সম্পদ্। উচ্চারণের ক্ষেত্রে এই বিধিগুলি মেনে চলতে হয়। অঞ্চল বিশেষে উচ্চারণ-বৈষম্য থাকে। তবে ভাষার উচ্চারণ-গত একটি সর্বজনীন রূপ রক্ষা করা দরকার। তা না হ'লে ভাষা ভাঙ্গনের মুখে চলে যায়। উচ্চারণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাই বিশেষ ধারণা থাকা প্রয়োজন। ধ্বনি পরিবর্তিত হয়। শব্দমধ্যে বর্ণের ধ্বনি-বৈচিত্র্য তো আছেই। ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন ধ্বনি পরিবর্তিত হ'তে হ'তে একটি নির্দিষ্ট রূপে পৌছলে তাকে ব্যাকরণও গ্রহণ করে। তখন রচিত হয় ধ্বনি-পরিবর্তনের বিভিন্ন নিয়মাবলী। এগুলি ব্যাকরণ-শুদ্ধ। ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মগুলিও তাই উচ্চারণতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্গত। শব্দের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণ থাকে; সেই বর্ণগুলি একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে ধ্বনি পরিবর্তিত হয়, ধ্বনি-পরিবর্তনের বিচিত্র স্রোতে ধ্বনিতত্ত্ব প্রবাহিত। সেগুলি সম্বন্ধে তাই বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। এখানে তাই ধ্বনি-পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল।

উচ্চারণতত্ত্ব ও ধ্বনি পরিবর্তন

॥ ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মাবলী ॥

ধ্বনি-পরিবর্তনের বিভিন্ন নিয়মগুলি হ'ল;—

॥ এক ॥ **শ্রুতিধ্বনি (glide)**: 'অনেক সময় দ্রুত উচ্চারণে এক ধ্বনির স্থান থেকে অন্য ধ্বনির উচ্চারণ-স্থানে যাবার সময় জিহ্বা অসতর্কভাবে মধ্যবর্তী কোন ধ্বনি উচ্চারণ ক'রে ফেলে। শব্দ-মধ্যস্থিত এইরূপ ভুঁইফোড় ধ্বনিকে শ্রুতিধ্বনি বলে।' শ্রুতিধ্বনি তিন প্রকার;—

(ক) **য়-শ্রুতি**—মা+এর>মায়ের

(খ) **ব-শ্রুতি**—য+আ>যাওয়া, খা+আ>খাওয়া, অম্ল>অম্বল

(গ) **দ-শ্রুতি**—বৈদিক স্থূণর>সংস্কৃতে স্থূন্দর, সংস্কৃতে বানর>বাংলায় বান্দর>বাঁদর।

॥ দুই ॥ **সমীভবন বা সমীকরণ (Assimilation) :** 'উচ্চারণ-কালে অনেক সময় সন্নিকৃষ্ট দু'টি বিভিন্ন ধ্বনি পরস্পর অথবা একে অপরের প্রভাবে পড়ে অল্পবিস্তর ধ্বনিসাম্য লাভ করে। ধ্বনি-পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াকে সমীভবন বা সমীকরণ বলে। সমীভবন তিন প্রকার ; –

(ক) **প্রগত সমীভবন ঃ** পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনিকে নিজ রূপে পরিবর্তিত করে। যেমন পক্ব>পক্ক, পদ্ম>পদ্দ।

(খ) **পরাগত সমীভবন ঃ** পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে নিজরূপে পরিবর্তিত করে। যেমন—তৎ + জন্য = তজ্জন্য, কর্ম>কম্ম, ধর্ম>ধম্ম, দুর্গা>দুগ্‌গা।

(গ) **অন্যোন্য বা পারস্পরিক সমীভবন ঃ** এখানে পরস্পরের প্রভাবে দু'টি ধ্বনিই পরিবর্তিত হ'য়ে ধ্বনি-সাম্য লাভ করে। যেমন– উৎ+শ্বাস = উচ্ছ্বাস।

॥ তিন ॥ **বিসমীভবন বা অসমীকরণ (Dissimilation) :** সমীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া হ'ল বিসমীভবন বা অসমীকরণ। এক্ষেত্রে পদমধ্যস্থিত দু'টি সমধ্বনির মধ্যে একটি পরিবর্তিত হ'য়ে যায়। বিসমীভবনের উদাহরণ খুব বেশী নয়। যেমন লাল>নাল, পর্তুগীস আর্মারিও (*Armario*)>আলমারী।

॥ চার ॥ **বর্ণ বিপর্যয় বা বিপর্যাস (Mitathesis) :** পদমধ্যস্থিত দু'টি ধ্বনির পরস্পর স্থান-পরিবর্তনকে বর্ণ-বিপর্যয় বা বিপর্যাস বলে। যেমন—বাক্স>বাস্ক, রিক্‌সা>রিস্‌কা, পিশাচ>পিচাশ।

॥ পাঁচ ॥ **স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Anaptyxis or vowel Insertion) :** উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে পৃথক ক'রে তার মধ্যে স্বরধ্বনি আনয়ন করাকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে। যেমন—কর্ম>করম, ধর্ম>ধরম, মুক্তা>মুকুতা, মূর্তি>মূরতি।

॥ ছয় ॥ **আগম (Prothesis) :** 'যাহা প্রকৃতি বা প্রত্যয় নহে, এবং যাহা প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের লোপসাধনও করে না ; শব্দের মধ্যে এইরূপ কোন স্বরধ্বনির আগমনকে আগম বলে।' আগম তিন প্রকারের ;—

(ক **পূর্বাগম**—শব্দের আদিতে যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে উচ্চারণে অসুবিধা হয়। অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য শব্দের আদিতে একটি স্বরধ্বনির আগম ঘটে। ধ্বনি-পরি- বর্তনের এই প্রক্রিয়াকে পূর্বাগম বলে। যেমন, স্কুল>ইস্কুল, স্টেশন>ইস্টেশন।

(খ) **মধ্যাগম** - শব্দের মধ্যে যে অসম হয়, তাকে মধ্যাগম বলে। স্বরভক্তি, শ্রুতিধ্বনি এই জাতীয় আগম। যেমন,– মুক্তা>মুকুতা, অম্ল>অম্বল, বর্ণ>বরণ।

(গ) **অন্ত্যাগম** শব্দের অন্তে যে আগম হয়, তাকে অন্ত্যাগম বলে। যেমন— ইঞ্চ>ইঞ্চি, বেঞ্চ>বেঞ্চি, সূর্য>সূর্যি।

॥ সাত ॥ **অপিনিহিতি (Eponthesis) :** পদ-মধ্যস্থিত ই-কার বা উ-কার স্বস্থানে থেকেও অধিকন্তু অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে উচ্চারিত হ'লে অপিনিহিতি বলে। যেমন, - কাঁচি>কাঁইচি, গাঁতি>গাঁইতি, করিয়া>কইর‍্যা, সাধু>সাউধ।

॥ **আট** ॥ **অভিশ্রুতি (Umlaut)** :—'অপিনিহিতি স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে গেলে এবং সেই অনুযায়ী স্বরধ্বনির বিকৃতি হ'লে অভিশ্রুতি বলে'। যেমন করিয়া>কইরিয়া>ক'রে, শুনিয়া>শুইনিয়া>শুনে।

॥ **নয়** ॥ **স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony)** : অপিনিহিতি ব্যতিরেকে অভিশ্রুতির মত ধ্বনি-পরিবর্তনকে স্বরসঙ্গতি বলে। অনেক সময় পূর্বের বা পরের স্বরধ্বনির প্রভাবে পদস্থিত আর একটি স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে ; এইভাবে স্বরের সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য ঘটে ; যেমন, দেশী>দিশি, বিলাতি>বিলিতি, তুলা>তুলো, মিছা>মিছে।

॥ **দশ** ॥ **নাসিক্যীভবন (Nasalisation)** : নাসিকা ব্যঞ্জন-ধ্বনি লুপ্ত হ'য়ে যদি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক ক'রে দেয়, তাহ'লে তাকে নাসিক্যীভবন বলে। যেমন—চন্দ্র>চাঁদ, সন্ধ্যা>সাঁঝ।

॥ **এগারো** ॥ **স্বতোনাসিক্যীভবন (Spontaneous Nasalisation)** :—নাসিকা ব্যঞ্জনের সংস্রব ছাড়াও যখন স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়, তখন তাকে স্বতোনাসিক্যীভবন বলে। যেমন,—পুথি>পুঁথি, টেকসই>টেঁকসই, খোকা>খোঁকা, উচ্চ>উঁচু।

বাংলা ধ্বনি-পরিবর্তনের আরও বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে। এই প্রক্রিয়াগুলি ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত। ধ্বনি-পরিবর্তনের এই ধারাগুলি বাংলা শব্দের উচ্চারণকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ক'রেছে। ফলে, বহু বাংলা বর্ণ ও শব্দ তার যথাযথ উচ্চারণের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লাভ ক'রেছে। ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মগুলি খুবই মূল্যবান। ধ্বনি-পরিবর্তনের উপর নির্ভর ক'রেই ভাষার উচ্চারণতত্ত্ব গড়ে ওঠে। কাজেই ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মগুলি শিক্ষকের জানতে হবে এবং শিক্ষার্থীদেরও জানতে হবে।

ধ্বনি-পরিবর্তন ও উচ্চারণ-তত্ত্ব

ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞানের আবশ্যকতা

(The importance of the study of phonetics for language teachers)

ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান অপরিহার্য। ধ্বনিতত্ত্ব বাংলা ব্যাকরণের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ধ্বনিতত্ত্বের মধ্যে উচ্চারণ-প্রক্রিয়া, ধ্বনি-পরিবর্তন, ছন্দ, যতি, স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণ, শিষ্ট সমাজে প্রচলিত উচ্চারণ-বিধি ইত্যাদি আলোচিত হয়। বিষয়গুলি ভাষা-শিক্ষার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসে শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে। বিভিন্ন পরিবেশ থেকে বিভিন্ন শিক্ষার্থী আসে। তাদের উচ্চারণে আঞ্চলিকতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব ও অশুদ্ধতা থাকে। শিক্ষক তাদের এই সব ভুল সংশোধন ক'রে দিয়ে শুদ্ধ উচ্চারণ-রীতি শিক্ষা দেবেন। শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে শুদ্ধ উচ্চারণ-রীতি সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে, ভাষার স্থায়ী রূপ রক্ষা পাবে। ভাষা-শিক্ষক নিজে যদি ধ্বনিতত্ত্ব যথাযথভাবে না জানেন, তবে তিনি শিক্ষার্থীদের তা শিক্ষা দেবেন কিভাবে ?

শিক্ষক নিজে ধ্বনিতত্ত্ব না জানলে তিনি তা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে পারবেন না

উচ্চারণতত্ত্ব একটি কঠিন, জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়। **প্রতিটি ভাষারই একটি নিজস্ব উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আছে।** বাংলা ভাষারও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা ক'রে উচ্চারণ ক'রতে হয়। নতুবা ভাষার শক্তি ও মাধুর্য বিনষ্ট হয়। বাংলাভাষার একটি নিজস্ব উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য আছে ; তা হ'ল **শব্দের আদিতে ঝোঁক, ফলে শব্দের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে ও দ্বিমাত্রিকতা প্রাপ্ত হয়। শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত ও দ্বিমাত্রিকতা থাকায় শব্দের অন্তে নিঃশ্বাস বায়ুর স্বল্পতা দেখা দেয়। শব্দের অন্ত্যে তখন মাত্রাহীনতা দেখা দেয় এবং শব্দের অন্ত্যস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণ ব্যতিরেকে উচ্চারিত হয়।** যেমন, —রাম—রাম্‌, চাঁদ—চাঁদ্‌, চল—চল্‌। বাংলা ভাষার উচ্চারণের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রতে হয়। নতুবা ভাষার শক্তি, গতি ও মাধুর্য বিনষ্ট হয়। ভাষা-শিক্ষক উচ্চারণের এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবগত থাকবেন ও ভাষা শিক্ষা-দানের সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য সচেতনভাবে শিক্ষা দেবেন।

বাংলা ভাষার নিজস্ব উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য

ভাষার ব্যাকরণ একটি বিজ্ঞান। ব্যাকরণের তাই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আছে। ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্ব শিক্ষাদানও এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কাজেই শিক্ষক যদি বিজ্ঞানগত দিক্‌ ও ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে সতর্ক না থাকেন, তবে তিনি তা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে পারবেন না। **স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও যুক্তবর্ণের উচ্চারণ-রীতি কি, কোথায় কোথায় এই উচ্চারণ-রীতি পরিবর্তিত হয়, ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মগুলি কি কি, শব্দের মধ্যে ধ্বনিগুলির বিন্যাস কি রকম হয়, কোন্‌ ধ্বনির কি উচ্চারণ, বিভিন্ন ধ্বনির প্রয়োগ-স্থল, প্রচলিত শুদ্ধ উচ্চারণ-রীতি প্রভৃতি ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।** এই বিষয়গুলি যদি ভাষা-শিক্ষক যথাযথভাবে না জানেন, তবে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের এগুলি শিক্ষা দিতে পারবেন না। ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান থাকলে শিক্ষক আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের ভুল ও অশুদ্ধ উচ্চারণ তিনি সংশোধনমূলক অনুশীলনের (*Remedial Exercise*) মাধ্যমে সংশোধন ক'রে দিতে পারবেন। ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান তাই অপরিহার্য।

বৈজ্ঞানিক উচ্চারণ রীতি শিক্ষাদান

ভাষা-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সরব পাঠের বিশেষ একটি স্থান আছে। কাব্যের ক্ষেত্রে সরব আবৃত্তি ধ্বনি-মাধুর্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। "কবিতা বোঝবার জন্য নয়, কবিতা বাজবার জন্য।" ভাষার এই সরব উচ্চারণের জন্য ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান প্রয়োজন। "আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।" আবৃত্তি ও সরব পাঠ তাই ভাষা-শিক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। সরব পাঠ নির্ভুল, শ্রুতিমধুর ও স্পষ্ট উচ্চারণ ছাড়া সম্ভব নয়। উচ্চারণ-বিকৃতি অর্থবোধের ক্ষেত্রেও অন্তরায় সৃষ্টি করে। সাহিত্যের প্রাণ হচ্ছে ধ্বনি,— কোথাও রসধ্বনি, কোথাও শব্দধ্বনি। শব্দধ্বনি ধ্বনিতত্ত্ব ও সুষ্ঠু উচ্চারণের উপর নির্ভরশীল। **সরব পাঠের**

সরব পাঠ

জন্য ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান প্রয়োজন। ভাষা-শিক্ষক সরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ ও সুষ্ঠু উচ্চারণ শিক্ষাদান ক'রবেন।

কথা বলা একটা শিল্প (*Art*)। স্পষ্ট উচ্চারণের মাধ্যমে মধুরভাবে ভাষা-ব্যবহারের সাহায্যে ভাব-প্রকাশ শিল্প-সুষমা লাভ করে। অনেকে সুন্দরভাবে কথা ব'লতে পারেন। অনেকের কথা বলার মধ্যে অস্পষ্টতা ও আড়ষ্টতা দেখা দেয়। সুন্দর উচ্চারণের জন্য ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান প্রয়োজন। দৈনন্দিন জীবনে কর্মোদ্দেশ্যে আমাদের অনেকের সঙ্গে মেলামেশা ক'রতে হয়। সামাজিক সম্পর্ক ও মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে, রক্ষা ক'রতে ও মধুর ক'রতে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের প্রয়োজন হয়। এই অন্তরঙ্গতা আসে মনের ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে। ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম হল ভাষা। কাজেই **স্পষ্ট, নির্ভুল, সুষ্ঠু ও শুদ্ধ উচ্চারণ সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে ; এবং এর জন্যে প্রয়োজন ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান।**

কথা বলা একটা শিল্প

ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান অপরিহার্য। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষাদান করেন। ভাষা-শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'ল,—

(১) কথ্য ভাষা শুনে তা অনুধাবন করা ;
(২) কথা বলে মনের ভাব যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা ;
(৩) লেখা পড়ে তার মর্ম গ্রহণ করা ;
(৪) লিখে মনের ভাব যথাযথভাবে প্রকাশ করা।

ভাষা-শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌছানোর জন্য ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান প্রয়োজন। অপরের কথা শুনে ও লেখা পড়ে মর্ম গ্রহণ করা, কথার মাধ্যমে ও লেখার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান ছাড়া অসম্ভব। ভাষা-শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কার্যকর ক'রবার জন্য শিক্ষকের ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান প্রয়োজন।

যতিচ্ছেদ ও ছন্দোবিধির জ্ঞানও শিক্ষকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ভাষা-ব্যবহার (লেখা ও পড়া) ক'রতে হ'লে যতিচিহ্ন-বিন্যাসের জ্ঞান প্রয়োজন। যতিচিহ্নগুলি উচ্চারণকে নিয়ন্ত্রিত করে,—উচ্চারণকে মধুর ও সুন্দর করে। ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে তাই যতিচ্ছেদের নিয়মগুলি জানা প্রয়োজন। তিনি নিজে এই নিয়মগুলি জানবেন এবং শিক্ষার্থীদের তা জানাবেন। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছন্দ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বিশেষ ক'রে কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ অপরিহার্য। কাব্য কবিতা-পাঠ ও আলোচনা ক'রতে গেলে ছন্দোবিদ্যার জ্ঞান অত্যাবশ্যক। সমস্ত শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে (*curriculum*) কবিতাকে অন্তর্ভূক্ত করা হ'য়েছে। কবিতা শিক্ষাদানের জন্য ছন্দের জ্ঞান অত্যাবশ্যক। শিক্ষক তাই ছন্দ সম্বন্ধে জানবেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছন্দ-বোধ সঞ্চারিত ক'রবেন। যার ফলে শিক্ষার্থীরা কবিতা

যতিচ্ছেদ ও ছন্দোবিদ্যা

পাঠ ক'রে তার মাধুর্য ও রস আস্বাদন ক'রতে পারে। ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে তাই যতিচ্ছেদ ও ছন্দোবিদ্যার জ্ঞান অপরিহার্য।

শিক্ষক নিজে ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ জানবেন। তিনি যে অঞ্চলের লোকই হোন-না-কেন তাঁকে কোলকাতার কথ্য ভাষার উচ্চারণ-রীতি জানতে হবে ; এবং ভাষা ব্যবহারের সময় তা ব্যবহার ক'রতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন ধ্বনিতত্ত্বের সুস্পষ্ট জ্ঞান। বিদ্যালয়ে নানা জায়গা থেকে নানা ছাত্র-ছাত্রী আসে। বিভিন্ন পরিবার, দেশের নানা অঞ্চল, সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসে। তাদের উচ্চারণে অনেক ত্রুটি থাকে। অনেক সময় অভিভাবকদের ঔদাসীন্যে শিক্ষার্থীরা ভুল উচ্চারণ শেখে। ভুল ও অস্পষ্ট উচ্চারণ বানান-ভুলকে প্রভাবিত করে। ফলে, শিক্ষার্থীদের ভাষাশিক্ষা ত্রুটিযুক্ত হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে বহু উদ্বাস্তু এসেছেন। তাঁদের ভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। তার প্রভাব আমাদের প্রচলিত উচ্চারণরীতির উপর এসে পড়েছে। তাছাড়া আছে নানা উপভাষার দৌরাত্ম্য। ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাবও আমাদের উচ্চারণ-রীতির উপর পড়ে। **আমাদের ভাষার স্বীকৃত উচ্চারণ-রীতির উপর এই যে আক্রমণ, তা থেকে আমাদের উচ্চারণ ও ভাষাকে রক্ষা ক'রতে হ'লে ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান অত্যাবশ্যক।** ধ্বনিতত্ত্ব তাই ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "*The Bengali Phonetic Reader*" তাই প্রত্যেক ভাষা শিক্ষকের অবশ্য পাঠ্যপুস্তক।

ভাষার উচ্চারণরীতির উপর আক্রমণ প্রতিহত করতে ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান আবশ্যক

অঞ্চল বিশেষে এবং ব্যক্তি-বিশেষে উচ্চারণ-বৈষম্য দেখা যায়। **ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞানই সকলের উচ্চারণ-রীতিকে একটি সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারে।** আমরা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহার করি, কিন্তু ভাষা-ব্যবহারকে সুন্দর করতে পারলে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব। স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণ যতিচ্ছেদ ও ছন্দোবিদ্যা ভাষাকে যথার্থ ও সৌন্দর্যময় করে তোলে। সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে আমাদের বর্ণমালা নেওয়া হ'য়েছে। আমাদের উচ্চারণ-রীতি তাই অনেকটা সংস্কৃতের মত। কিন্তু দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফলে সেই উচ্চারণ-রীতির পার্থক্য ঘটেছে, ধ্বনি পরিবর্তিত হ'য়েছে, শব্দের মধ্যে ধ্বনিগুলি পরস্পর প্রভাব বিস্তার ক'রেছে। ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক প্রভাব ভাষার উচ্চারণ-রীতির উপর পড়েছে। ভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর উচ্চারণরীতিও আমাদের উচ্চারণ-রীতিকে প্রভাবিত ক'রেছে। পাশ্চাত্ত্য উচ্চারণ-রীতির প্রভাব আমাদের উচ্চারণ-রীতির উপর পড়েছে। বিশেষ ক'রে ইংরেজী বহু বর্ণ আমাদের উচ্চারণ-রীতিতে প্রবেশ ক'রেছে। তার উপর আছে উচ্চারণে ব্যক্তির আড়ষ্টতা ও ঔদাসীন্য। এই সব অতিক্রম ক'রে ভাষাকে শুদ্ধ ও সুষ্ঠু উচ্চারণ-রীতিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে গেলে ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান অত্যাবশ্যক। ভাষা-শিক্ষক নিজে উচ্চারণ-বিকৃতির কারণগুলি জানবেন, ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মগুলি জানবেন। তিনি

ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান অত্যাবশ্যক নয়—অপরিহার্য

নিজের উচ্চারণ সম্বন্ধে সচেতন ও সতর্ক থাকবেন। তারপর তিনি শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ-রীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন। **ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান তাই অত্যাবশ্যক নয়,– অপরিহার্য।**

॥ অনুশীলনী ॥

১। বিদ্যালয়ে ভাষা ভাল করিয়া শিখাইতে গেলে ধ্বনিবিজ্ঞানের (Phonetics) সঙ্গে সামান্য পরিচয় দরকার কি? হইলে কেন হয় তাই লিখুন। (কলিঃ বিশ্বঃ বি. টি. ১৯৫৬)

২। বাংলা ভাষার শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান অনেকে অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করেন। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি যুক্তি সহকারে বিবৃত করুন। (কলিঃ বিশ্বঃ বি. টি. ১৯৬১)

৩। ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের (Phonetics) জ্ঞান একান্ত আবশ্যক—এ মন্তব্যের যাথার্থ্য ব্যক্ত করুন। (কলিঃ বিশ্বঃ বি, টি. ১৯৬৬)

৪। ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে ধ্বনিবিদ্যা ও ছন্দোবিদ্যার জ্ঞান অত্যাবশ্যক।—'যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক এই মন্তব্যের সার্থকতা বিচার করুন। (কলিঃ বিশ্বঃ বি. টি. ১৯৬৮)

৫। ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক।—এই মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ করুন। (কলিঃ বিশ্বঃ বি. টি. ১৯৭১)

৬। বাংলা উচ্চারণের ও ধ্বনি-পরিবর্তনের কতকগুলি বিশিষ্ট রীতি দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৬২)

৭। "ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের (Phonetics) জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক।"—এই মন্তব্যের যাথার্থ্য ব্যক্ত করুন। (উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৭০)

৮। ধ্বনিতত্ত্বের দিক্ হইতে স্বরবর্ণ 'অ' এবং 'এ'-র বিভিন্ন উচ্চারণ ও বাংলার বিভিন্ন সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণের উদাহরণ দিয়া প্রতিপন্ন কর যে, ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান বাংলা ভাষার শিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৮)

৯। উচ্চারণের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের অশুদ্ধতা কি কি কারণে পরিলক্ষিত হয়? বিভিন্ন ধরনের অশুদ্ধ উচ্চারণের উদাহরণ দাও। এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে লিখ। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬২)

১০। "ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনি-বিজ্ঞানের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক।"—এই মন্তব্যের সমর্থনে বাংলার আদর্শ উচ্চারণ-রীতির দৃষ্টান্ত উল্লেখপূর্বক একটি প্রবন্ধ রচনা করুন। (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৭৩)

১১। "ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান অপরিহার্য"—মন্তব্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন। (কলিঃ বিশ্বঃ বি. এড. ১৯৭৬)

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাভাষা শিক্ষাক্ষেত্রে স্তর-বিভাগ

[Stages in the Learning of Bengali]

মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষণ থেকেই শিশুর ভাষাশিক্ষা শুরু হয়। সমগ্র বাল্য ও কৈশোর ধ'রে সে ভাষা-ব্যবহারের কৌশলগুলি আয়ত্ত করে। আমরা বাল্যকালে কিভাবে ভাষা শিক্ষা করেছি, সে কথা ভাল করে মনে পড়ে না ;— সে সময় ভাষা-শিক্ষার সাফল্য কোথায় ছিল, ব্যর্থতা কোথায় ছিল, ত্রুটি কোথায় ছিল— তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বড় হয়ে আর সম্ভবপর নয়। অথচ ব্যক্তির জীবনে ভাষা-শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। ভাষা-শিক্ষার বিভিন্ন দিক্ ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। শিক্ষা ও শিক্ষার্থী যেন ডুটি পরস্পর সমান্তরাল রেখা,— দিগন্ত পেরিয়ে যতদূর চ'লে যাওয়া যায়, এই দুই রেখার মিলনের সম্ভাবনা নেই। অথচ শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে শিক্ষা যদি মিশে না যায়, তবে তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের উন্নয়ন সম্ভবপর নয়,— সম্ভবপর নয় তার মানসিক ও আত্মিক বিকাশ। তাই প্রয়োজন হয় শিক্ষাদান-পদ্ধতির। এই শিক্ষাদান-পদ্ধতিগুলি হবে মনস্তত্ত্ব-নির্ভর, শিশুকেন্দ্রিক ও বৈজ্ঞানিক। শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষার সময় বহুবিস্তৃত। বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীর রুচি, চাহিদা, সামর্থ্য, গ্রহণক্ষমতাও সমান নয়। সব শিশুর মানসিক বয়সও (*Mental Age*) সমান নয়। তাই শিক্ষা-জীবনকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত ক'রে ভাষা-শিক্ষাদান করা উচিত। ভাষা-শিক্ষাকে শিশুর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে ;— শিশু-মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি ক'রে ভাষা-শিক্ষা দিতে হবে। ভাষা-শিক্ষাক্ষেত্রে স্তরবিভাগের প্রয়োজনীয়তা তাই স্বীকার করতে হবে। শিশুর ভাষা-শিক্ষাক্ষেত্রকে নিম্নলিখিত স্তরগুলিতে বিভক্ত করা যায় ;—

ভাষা-শিক্ষা ক্ষেত্রে স্তর-বিভাগের প্রয়োজনীয়তা

॥ এক ॥ প্রাক্-প্রাথমিক স্তর (Pre-Primary stage)
॥ দুই ॥ প্রাথমিক স্তর (Primary stage)
॥ তিন ॥ নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর (Lower Secondary stage)
॥ চার ॥ মাধ্যমিক স্তর (Secondary stage)

এই সকল পর্যায়গুলিতে শিক্ষার্থীর মানসিকতা বিভিন্ন, গ্রহণ-ক্ষমতাও সমান নয়। তাই শিক্ষাদানের পদ্ধতিও হবে বিভিন্ন। এই সমস্ত স্তরগুলিতে শিক্ষার্থীর মানসিকতা, প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ এক ॥ প্রাক্-প্রাথমিক স্তর
(Pre-Primary Stage)

মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ ক'রে শিশু তার কান্নার মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করে।

কান্নাই তখন তার ভাবপ্রকাশের একমাত্র অবলম্বন। ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা তখনও সে অর্জন করে নি, তাই কান্নার মাধ্যমেই শিশু তখন তার অভাব-অভিযোগের কথা যতদূর সম্ভব ব্যক্ত করে। তারপর শিশু ধীরে ধীরে আধো-আধো বোলে কথা ব'লতে শুরু করে। এই বয়সকে বলা হয় **'বুলি-ফোটার বয়স'**। এই স্তরে শিশুর উচ্চারণে জড়তা থাকে—বক্তব্যও পরিষ্কার নয়। পারিপার্শ্বিকের সাহচর্যে শিশু দু'একটি কথা আধো-আধোভাবে প্রকাশ করে। এই স্তরে শিশু নিজের ইচ্ছায় ভাব প্রকাশ করে। বুলিতে সুর থাকে, ধ্বনিও থাকে ; কিন্তু অর্থবোধ ও প্রতীকদ্যোতকতা থাকে না। শিশুর উচ্চারণও এসময় সযত্ন-লালিত নয়, বিচার ক'রেও নয়। শিশুর বাগ্‌যন্ত্র এই সময় খুবই নমনীয় থাকে। কাজেই খুব সহজেই ভাষা-ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া যায়। এই স্তরে শিক্ষাদানের সঠিক পদ্ধতির কথা যথাযথভাবে উল্লেখ করা মুস্কিল। এই সময় শিশুর উপর মায়ের প্রভাব সর্বাধিক। কাজেই মায়ের সযত্ন প্রচেষ্টা ও সস্নেহ ভালোবাসায় শিশুর ভাষা-ব্যবহার যথাযথ ও সার্থক পথে অগ্রসর হ'তে পারে। তিনমাস থেকে প্রায় দু'বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর এই 'বুলি-ফোটা'র স্তর। তার পর থেকেই প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষা শুরু হয়।

কান্না ও বুলি-ফোটার বয়স

দুই (২ +) বৎসর থেকে পাঁচ (৫ +) বৎসর পর্যন্ত শিশুর জীবনে ভাষা শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়। এই পর্যায় লেখাপড়ার কাল নয়, **প্রস্তুতির পর্যায়**। আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রকাশ, সামাজিকতা, ভাষা-ব্যবহার ও লেখাপড়া সবকিছুরই ভিত্তি এই সময় স্থাপিত হয়। এই স্তরে শিশুর উপর মায়ের স্নেহপ্রভাব সর্বাধিক - ভাষা-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ কথাটি মনে রাখতে হবে। শিশু মাতাপিতা বা আত্মীয় প্রতিবেশীর নিকট ভাষা-ব্যবহার শিক্ষা করে। শিশুর মন অনুকরণপ্রিয়। অনুকরণের এক অদ্ভুত ক্ষমতা শিশুদের থাকে। ভাষা-ব্যবহারের কৌশলও শিশু এই অনুকরণ-ক্ষমতা থেকে সংগ্রহ করে। ক্রমশঃ শিশুর জীবনে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আসে। সামনে নতুন জগৎ—ধীরে ধীরে অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে (*Adjustment*) নিতে শিশু চেষ্টা করে। এই স্তরে শিশু খেলাধুলা ভালবাসে। খেলাধুলা ও জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রে সঙ্গীসাথীর সংখ্যা প্রথমে কম থাকে,—ক্রমশঃ এই সংখ্যা বাড়তে থাকে। তখন ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষা-ব্যবহারের প্রয়োজন তীব্র হয় এবং সেই থেকেই শিশু ভাষা শিক্ষা করে। এই সময় শিশুদের মধ্যে বেশী কথা বলার একটা প্রবণতা বা **'কথার স্রোত'** লক্ষ্য করা যায়। শিশুরা সাধারণত খেতে ব'সে বেশী কথা বলে। তবে এই সময় শিশুদের মধ্যে যে ভাষা-ব্যবহার হয়, তা স্থির নয় ; এখুনি যে কথা বলছে বা যে শব্দ ব্যবহার করছে, পরক্ষণেই তা ভুলে যাচ্ছে। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিশুর এই মানসিকতা লক্ষ্য করেই ভাষা-শিক্ষাদান করতে হবে।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিশুর মানসিকতা

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের খেলা ও কাজে উৎসাহ দিতে হবে। এই পর্যায়ে ভাষাশিক্ষাদান খেলাধুলার মাধ্যমে হবে। শিশু ছবি ও ছড়া খুব ভালবাসে। ছবির রং ও ছড়ার ছন্দ শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করে। ছবির বিষয়বস্তুও শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয়। গান ও আবৃত্তিও শিশু-চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভাষা-শিক্ষাদানের সময় তাই ছবি, ছড়া, গান ও আবৃত্তির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকবে, তার জন্য রঙিন চক, রঙের বাক্স ও তুলি ইত্যাদি তাদের দিতে হবে। এগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আত্মপ্রকাশ ক'রতে উৎসাহী হবে।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে ভাষা শিক্ষাদানের কয়েকটি দিক্

দৈনন্দিন জীবনের কাজের অনুকরণে রান্নাবান্না, অসুখ-সেবা, চিকিৎসা প্রভৃতি খেলা ; সাহিত্যের কথাকাহিনীর অবলম্বনে যুদ্ধ, অভিযান প্রভৃতির অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা-ব্যবহারের কৌশলগুলি আয়ত্ত ক'রবে। শিশুদের রূপকথা ও যাদুধর্মী গল্প শোনাতে হবে ; কারণ শিশু গল্প শুনতে ভালবাসে,—এই গল্পের মাধ্যমেও সে ভাষা শিক্ষা ক'রবে। এই পর্যায়ে শিশু স্বেচ্ছায় যে কাজ ক'রবে, তার মাধ্যমে জীবনের সঞ্চয়ে শিশুকে সাহায্য ক'রতে হবে। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও শব্দের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। সে যখন কথা বলবে, তখন ধৈর্য ধ'রে তার কথা (এলোমেলো ও বিশৃংখল হ'লেও) শুনতে হবে ; বিরক্তি প্রকাশ ক'রলে চলবে না। শিশুর কথার স্রোতে বাধা দিলে তার শিক্ষার গতিতে ছেদ পড়ে। শিক্ষার্থীর জীবনের অভিজ্ঞতা আনন্দময় হবে, দুঃখ ও বেদনার অভিজ্ঞতা শিশুচিত্তে প্রভাব বিস্তার করে এবং তার জীবনের স্বাভাবিক বিকাশে বাধাস্বরূপ হয়। প্রথম অবস্থায় পড়াশুনার মধ্যে শিশু যেন ভয় না পায় ;—এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন ক'রতে হবে। এই পর্যায়ে বিদ্যালয় হবে **'দ্বিতীয় গৃহ'**। বিদ্যালয়ে গৃহপরিবেশ সৃষ্টি ক'রে স্নেহ-ভালোবাসা, খেলাধুলা ও আনন্দ-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষা দিতে হবে।

॥ প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে ভাষা-শিক্ষাদানের পদ্ধতি ॥

(১) **ভাষা-শিক্ষাদানের সার্থক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হ'ল আগে ভাষা, পরে বর্ণমালা শিক্ষাদান করা।** কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা আগে বর্ণমালা শিক্ষাগ্রহণ করে। এটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ব-বিরোধী। শিশুমন বর্ণের কতকগুলি অর্থহীন রেখা-বিন্যাসের মাধ্যমে যে শিক্ষা পায়, তার সঙ্গে

আগে ভাষা, পরে বর্ণমালা

জীবন ও আনন্দের কিছুমাত্র যোগ নেই। কৃত্রিম ও যান্ত্রিক এই পদ্ধতি শিক্ষাবিজ্ঞানের পরিপন্থী। শিশুদের আগে ভাষা শিক্ষাদান ক'রতে হবে। তার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে সহজ সহজ কিছু শব্দকে সংগ্রহ ক'রে শিশুকে তারই লেখা শেখাতে হবে। এই লেখা বর্ণানুক্রমিক হবে না। 'মা' শব্দটির সঙ্গে শিক্ষার্থীর জীবনের সর্বাধিক যোগ। তাই সেখান থেকেই লেখা শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। তারপর ক্রমশঃ মামা, দাদা, বাবা, কাকা প্রভৃতি শব্দ শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণ ক'রবে।

তারপর সহজ ও ছোট ছোট বাক্য শিক্ষা দিতে হবে ; যেমন,— ভাত খাই, আমি ভাত খাই ইত্যাদি।

(২) **শিক্ষার্থীদের Sense training, Ear training প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রতে হবে।** ইন্দ্রিয়গুলি যেন শিক্ষা-সচেতন হয়। বাগ্‌যন্ত্র, চোখ, কান, নাক প্রভৃতির যথাযথ *training* ভাষা-শিক্ষাদানের সহায়ক হয়। শিক্ষার্থীদের *speech habit* গড়ে তুলতেও যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক হ'তে হবে।

ইন্দ্রিয় সচেতনতা

(৩) শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে **শব্দের প্রতীকতার সার্থক উপলব্ধি** হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে ভাষা শিক্ষাদান ক'রতে হবে। ভাষার অন্যতম গুণ হল প্রতীকতা। কাজেই এই প্রতীকতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কোন একটি শব্দের অর্থ কি, বা তার সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু কি— সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর ধারণা পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন। শব্দের প্রতীকতার সার্থক উপলব্ধি শিশুর ভাষা-শিক্ষাকে অনেকাংশে সার্থক করে। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে ভাষাশিক্ষার মধ্যে শিক্ষার্থীরা যাতে অধিক সংখ্যায় বিশেষ্যপদ শিক্ষা গ্রহণ করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এর জন্য শিক্ষার্থীদের চিড়িয়াখানা নিয়ে যেতে হবে, তাদের নিয়মিত *children park*-এ নিয়ে যেতে হবে। সেখানে বিভিন্ন বস্তু ও বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় শিক্ষার্থীদের শব্দের প্রতীকতা সম্বন্ধে সার্থক ধারণা দেবে। মনে রাখতে হবে যে, **শিশুর মানসিক বয়স দু'বৎসর হওয়ার পূর্বে সে সর্বনাম পদ সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে না, তিন বৎসর হওয়ার পূর্বে সে কাল ও বচন সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে না, আর চার বৎসরের পূর্বে উপসর্গ-বিভক্তি-কারকের বোধ হয় না।**

শব্দের প্রতীকতা

(৪) এই স্তরে শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষাদানের সময় কতকগুলি দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সেগুলি হ'ল—

(ক) **দ্রুত কথা বলা**—অতি দ্রুত কথা বললে কথা জড়িয়ে যায়, প্রত্যেকটি শব্দের সঠিক উচ্চারণ হয় না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে অতি দ্রুত কথা বলার প্রবণতা আছে, তা রোধ ক'রতে হবে।

(খ) **তোত্‌লানো**—শারীরিক দুর্বলতা ও বাগ্‌যন্ত্রের অসুবিধার জন্য অনেক শিশু তোত্‌লা হয়। ডাক্তার দেখিয়ে অথবা মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে তার এই দোষ সারাতে হবে।

(গ) **নাকি স্বর**— অনেকে উচ্চারণের সময় কৃত্রিমভাবে নাকি স্বর ব্যবহার করে। সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

(ঘ) **বিড়্ বিড়্ করে কথা বলা**— অনেকে আস্তে আস্তে বিড়্ বিড়্ করে কথা বলে। তাতে মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। শব্দের স্পষ্ট উচ্চারণ হয় না। সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

(ঙ) **ভুল উচ্চারণ**—শিশুরা অনেক শব্দের ভুল উচ্চারণ করে। সহৃদয় ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের সে ভুল উচ্চারণ সংশোধন ক'রতে হবে।

ভাষাশিক্ষা-ক্ষেত্রে এই ত্রুটিগুলি যদি সংশোধন না করা যায়, তবে পরবর্তী কালে শিশুর ভাষা-ব্যবহারের মধ্যেও অসুবিধা থেকে যাবে। শিশুর জীবনে মানসিক ভাবমোক্ষণ (*sublimation*) যথাযথভাবে না হ'লে পরবর্তী কালে সে একজন *problem child* হিসেবে দেখা দিতে পারে।

(৫) অনেকে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরকে **'পুস্তকবিহীন'** স্তর বলে বর্ণনা ক'রেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে পুস্তক-প্রাধান্য খর্ব করা হ'ল বর্তমান শিক্ষাতত্ত্বের লক্ষ্য। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে পুস্তক অপরিহার্য। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে আগে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে, পরে শিক্ষার্থীরা বর্ণমালা শিক্ষা গ্রহণ করবে। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে তাই বই-এর উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়। ছবি, ছড়া, গান, গল্প এই সমস্তের মাধ্যমে এই স্তরে ভাষা শিক্ষাদান ক'রতে হবে। তবে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে কিছু কিছু বই-এর প্রয়োজন। এইসব বইগুলি হ'ল –

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের পুস্তক

(ক) যে সব সহজ সহজ গল্প তাদের আনন্দ দেয়, এমন গল্পের বই,

(খ) পরিবেশ-সংক্রান্ত খবর সংবলিত বই,

(গ) দৈনন্দিন জীবন-সংক্রান্ত বই,

(ঘ) সহজ ছড়া ও ছবির বই,

(ঙ) সাধারণ অভিযানমূলক বই।

প্রাক প্রাথমিক স্তরের পুস্তকগুলি খুব সতর্কভাবে রচনা ও প্রকাশনা ক'রতে হবে। বই-এর ছাপা স্পষ্ট হবে, কাগজ দামী হবে, হরফগুলি বড় বড় হবে। বই-এ ছড়া থাকবে, রং-বেরং এর ছবি থাকবে। বইগুলি যেন শিক্ষার্থীদের কাছে লোভনীয় হয়।

প্রাক্ প্রাথমিক স্তরে ভাষা-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আমাদের দেশে খুব বেশী নেই। প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের সংখ্যাও আমাদের দেশে খুব কম। অধিকাংশ শিশুই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা-শিক্ষার সুযোগ পায় না। সামান্য সংখ্যায় যে সব বিদ্যালয় আছে, তাও অর্থ, আসবাব-পত্র, শিক্ষক ও সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে ছন্নছাড়া অবস্থায় পড়ে আছে। ভাষা-শিক্ষার প্রথম অবস্থায় শিক্ষার্থীদের বর্ণমালা লিখতে দেওয়া হয়। এটাই প্রচলিত রীতি। ফলে, শিক্ষার্থীর সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনটাই পঙ্গু হ'য়ে যায়। শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের এই অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ে চরম অব্যবস্থার পরিচয়। কিছু কিছু কবি-সাহিতিক-লেখক ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু কিছু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু প্রভৃতি প্রখ্যাত লেখকদের রচনায় শিশুসাহিত্য সমৃদ্ধ হ'য়েছে। মাঝে *Art Union* নামে ব্যবসায়ী সংস্থা শিশুদের জন্য কিছু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বই প্রকাশনা ক'রেছিলেন। তাঁদের প্রকাশিত বই 'পুষির

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে ভাষা-শিক্ষাদানের প্রকৃত অবস্থা

আস্তানা' সর্বভারতীয় মুদ্রণ-পুরস্কারও পেয়েছিল। তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হ'লেও বর্তমানে তাঁদের নীরবতা পীড়াদায়ক। সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রকাশিত কিছু কিছু ছবি ও ছড়ার বইও উল্লেখের দাবি রাখে। ছোটদের জন্য চলচ্চিত্রও (কাহিনী ও তথ্য) যথাযথভাবে রচিত হয় নি। যথেষ্ট পরিমাণে ছড়া ও ছবি বই-এর অভাবও আছে। প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা-শিক্ষাদানের জন্য একটা সামগ্রিক অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

॥ দুই ॥ প্রাথমিক স্তর
[Primary Stage]

ভাষা-শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরের (প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণী) গুরুত্ব খুব বেশী। এই সময় শিক্ষার্থীদের গড় বয়স ছয় থেকে দশ বৎসর। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা মনের ভাষা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ ক'রতে পারে। তাদের সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যা বেড়েছে, কাজেই ভাষা-ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই স্তরে দায়িত্বজ্ঞানও দেখা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতি কতকগুলি স্তর অতিক্রম ক'রতে হয়। তাই তাদের মধ্যে পরীক্ষা 'পাশের' (*Pass*) উৎসাহ ও 'ফেলের' (*Fail*) ভীতি দেখা যায়। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের লেখায় দক্ষতা (*Skill*) আসে, ধীরে ধীরে দ্রুততাও (*Speed*) আসে। শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত শব্দের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা সৃষ্টিমূলক কাজে প্রেরণা পায়, কারণ সাহিত্যরসের উপলব্ধি অল্পবয়সেই সম্ভব। প্রাথমিক স্তরের ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে মেয়েরা এগিয়ে যায়, ছেলেরা পিছিয়ে পড়ে ; পরে অবশ্য এর পরিবর্তন হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রাক্-বয়ঃসন্ধি-কালের বয়স, বাল্যের আশা, উৎসাহ, আগ্রহ, চাঞ্চল্য, চপলতা, উদ্দাম-ভঙ্গী, প্রাণ-স্পন্দন প্রভৃতি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ভাষা-শিক্ষাক্ষেত্রে এগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। প্রাথমিক স্তরের বালক-বালিকাদের মধ্যে অত্যধিক কথা-বলার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে শিশুমনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অত্যধিক কথা-বলার এই প্রবণতাকে মিনির চরিত্রে অপূর্বভাবে সন্নিবেশিত ক'রেছেন। ছোটদের কথা-বলার এই প্রবণতাকে ধৈর্য ধ'রে উৎসাহ দিতে হবে। অফুরন্ত জীবনীশক্তির উপর ভিত্তি ক'রে আশা-উৎসাহ-ঘেরা শিশুদের প্রাণচঞ্চল বাল্যকালকে মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার্থীদের পক্ষে **ভাষা-শিক্ষার প্রস্তুতি-পর্ব**। পরিবেশ ভাল হ'লে বিদ্যালয়ে অল্প আয়াসেই শিক্ষার্থীরা ভাষা শিক্ষা ক'রতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের লেখার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। নিজের অভিজ্ঞতা, দু'-এক

লাইন কবিতা, অপরের কাছ থেকে শোনা গল্প, ভ্রমণ-কাহিনী ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা সহজ ও সরল ভাষায় সাবলীল ভঙ্গীতে লিখবে। এ বিষয়ে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের ভাষা-শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নীরব পাঠ থাকবে, তবে সরব পাঠের ভাগই বেশী। ছোট অবস্থা থেকেই তারা নীরব পাঠের শিক্ষা পাবে। শিক্ষার্থীরা এই পর্যায়ে পাঠাগার থেকে বই-পত্র নিয়ে পাঠ্যক্রমের বাইরের কিছু কিছু বইও পড়বে। শিশুদের জন্য প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িক পত্রও পড়তে দিতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির বিকাশ ও জিজ্ঞাসা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। নির্ভুল শব্দ ও তার বানান, সুষ্ঠু উচ্চারণ, শব্দের প্রতীক রূপ, ছন্দোবোধ, ভাষা-ব্যবহারের কৌশল, লেখা ও পড়া, সৃজনশীল কাজ-কর্ম ইত্যাদিকে প্রাথমিক পর্যায়ের ভাষা-শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে ; ব্যাকরণ ও বানানের প্রতি নজর রাখলেও ভাষা-শিক্ষা ক্ষেত্রে এগুলিকে প্রাধান্য না দিলেও চলবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা-শিক্ষাদানকালে শিক্ষার্থীদের চঞ্চলতা, উচ্ছলতা ও আগ্রহকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা শিক্ষাদান প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা-শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ঃ

ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই পর্যায়ে ভাষা-শিক্ষাদানের সময় কতকগুলি শিক্ষাদান-পদ্ধতিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে সব সময় মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষাদান-পদ্ধতিগুলি হবে বৈজ্ঞানিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শিশুকেন্দ্রিক। শিক্ষাদর্শনকে অবলম্বন ক'রে, শিশু মনস্তত্ত্বকে ভিত্তি করে, শিশুর জীবন ও অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে এই শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ ক'রতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা-শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি হ'ল,—

১। **বর্ণ-ক্রম পদ্ধতি (Alphabetic Method)** ঃ ভাষা-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি হ'ল প্রাচীন পদ্ধতি। তবে এই পদ্ধতির প্রচলন সর্বাধিক। বর্ণ-ক্রম পদ্ধতিতে শিশুকে একের পর এক বর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রথমে স্বরবর্ণ পরে ব্যঞ্জনবর্ণ। তারপর মাত্রা চিহ্নগুলি শিক্ষা দেওয়া হয়, যেমন,— া, ি, ী, ু, ূ ইত্যাদি। এইসব বর্ণের রেখা-বিন্যাস শিশুরা একের পর এক শেখে। তার সঙ্গে সঙ্গে তারা এই বর্ণগুলির উচ্চারণও আয়ত্ত করে। বর্ণের আকৃতি ও উচ্চারণের জ্ঞান এই পদ্ধতিতে ভাষা-শিক্ষাদানের ভিত্তি। এই পদ্ধতিকে তাই অনেকে **স্বর-বিধি (Phonic Method)** বলে থাকেন। শিশুর বয়স লেখাপড়া শেখার উপযোগী হ'লেই তার 'হাতেখড়ি' হয়। তারপর থেকেই সে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন বর্ণ ও তার উচ্চারণ আয়ত্ত করে। ফলে, শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বর্ণের রেখা-বিন্যাস ও উচ্চারণ সঠিকভাবে আয়ত্ত করে। বর্ণগুলি শেখা হ'য়ে গেলে শব্দ বা বাক্য আয়ত্ত করতে তার বিশেষ অসুবিধা হয় না। তবে আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের বিচারে এই পদ্ধতি

বর্ণক্রম পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক

কৃত্রিম, যান্ত্রিক ও অবৈজ্ঞানিক। শিশুকালে তাদের উপর এমন কতকগুলি বর্ণের অনুশীলন চাপিয়ে দেওয়া হয় যার সঙ্গে শিশুর মন, প্রাণ ও জীবনের কিছুমাত্র মিল নেই ;—শিশুর চাঞ্চল্য, আগ্রহ ও আনন্দ ইত্যাদির সঙ্গে যার কোন যোগ নেই। বর্ণানুক্রমিক এই পদ্ধতি তাই অবৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ব-বিরোধী। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রচলন এখনও সর্বাধিক।

২। **শব্দ-ক্রম পদ্ধতি (Word Method) :**—এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও পরিচিতি থেকে কতকগুলি সহজ ও মধুর ধ্বনির শব্দকে নির্বাচিত ক'রে সেগুলির উচ্চারণ, প্রতীকতা ও বানান শিক্ষা দেওয়া হয়। ভাষা-শিক্ষা বর্ণানুক্রমিক হয় না, শব্দানুক্রমিক হয়। শিক্ষার্থী তার জানা শব্দ থেকেই নতুন নতুন বর্ণের লেখ্য রূপ শিক্ষা করে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে যথাযথ প্রতীকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন *Teaching Aids* ব্যবহার করতে পারলে ভাল হয়। শব্দ-ক্রম পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শব্দের সুষ্ঠু উচ্চারণ, নির্ভুল প্রতীকতা ও যথাযথ বানান শিক্ষা গ্রহণ করে। শিশুর জীবনের পরিবেশই তার চার-পাশে শব্দ-পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করে। দৈনন্দিন জীবনের শিশুর সমস্ত-কিছু কার্যকলাপই শব্দ দিয়ে ঘেরা। তাই শব্দকে কেন্দ্র ক'রে ভাষা শিক্ষাদান শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শিশু-মনস্তত্ত্বের অনুযায়ী।

শব্দ-ক্রম পদ্ধতি হল ভাষা-শিক্ষাদানের সঠিক পদ্ধতি

৩। **বাক্য-ক্রম পদ্ধতি (Sentence Method) :** - ভাষা-ব্যবহারের সব থেকে সার্থক অবলম্বন হ'ল—'বাক্য'। আমরা বাক্যের মধ্য থেকেই অপরের বক্তব্য গ্রহণ করি, আবার বাক্যের মাধ্যমেই নিজের মনের ভাব প্রকাশ করি। ছোট শিশুও অপরের কাছ থেকে বিভিন্ন বাক্য-সমন্বিত কথা শুনে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ; এবং নিজেও বাক্য বা খণ্ডবাক্যের মাধ্যমে নিজের চাওয়া-পাওয়ার কথা বলে। তাই বাক্যকে কেন্দ্র ক'রে ভাষা শিক্ষা-দান ক'রলে তার কার্যকারিতা সর্বাধিক হয়। এই পদ্ধতি শিশুর অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে ছোট ছোট সহজ কতকগুলি বাক্যকে বড় বড় হরফে লিখে দেওয়া হয়। তার পাশেই থাকে বাক্যটির চিত্ররূপ, ছবি ও সংশ্লিষ্ট বাক্যগুলি শিশু-চিত্তকে আকৃষ্ট করে। এই বাক্যগুলিকে বার বার উচ্চারণ করিয়ে শিশুকে বাক্য শিক্ষা দেওয়া হয়। বার বার উচ্চারণের ফলে ঐ বাক্যের অন্তর্গত সমূহ শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ শিশু গ্রহণ করে। সঙ্গে ছবি থাকায় শব্দগুলির প্রতীকতার সার্থক উপলব্ধি ক'রতে তার অসুবিধা হয় না। বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির লিখিত রূপ বার বার দেখে বর্ণ ও তার রেখা-বিন্যাস সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা শিক্ষার্থীদের হয়। এই পদ্ধতি বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত। আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের সঙ্গে এই পদ্ধতি সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু এই পদ্ধতিতে শিশুর সংগৃহীত শব্দের সংখ্যা দ্রুতহারে বাড়ে না। অথচ শিশুর মধ্যে অত্যধিক কথা বলার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কথার

বাক্য-ক্রম পদ্ধতিতে শব্দের উচ্চারণ ও প্রতীকতা সঠিক হয়

স্রোতে শিশু যে-সব শব্দ ব্যবহার করে, তার মধ্যে সামান্য কয়েকটি শব্দকেই এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যায়।

৪। **ধ্বনিসাম্য পদ্ধতি (Phonetic Method) ঃ**—প্রত্যেকটি বর্ণের উচ্চারণ-স্থান নির্দিষ্ট। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে উচ্চারণের সামঞ্জস্য আছে। তাই বিভিন্ন শব্দের মধ্যেও ধ্বনি-সাম্য লক্ষ্য করা যায়। এই সব ধ্বনিসাম্য-যুক্ত শব্দগুলিকে কেন্দ্র ক'রে ভাষা শিক্ষাদান ক'রতে হবে। এই শব্দগুলিকে শিশুর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকেই গ্রহণ ক'রতে হবে ; শব্দগুলি যেন শিক্ষার্থীদের অপরিচিত না হয়। যেমন—

জল, ফল, মল, চল, নল, বল, খল, ছল, তল, দল ইত্যাদি।

নাম, ধাম, দাম, জাম, খাম, ঘাম, বাম, রাম ইত্যাদি।

মামা, বাবা, কাকা, দাদা, জামা, হাতা, কাদা ইত্যাদি।

এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছন্দ ও লয়ের বোধ জন্মে। শিক্ষার্থীদের জানা শব্দগুলিকে নিয়ে এই পদ্ধতি রচিত হয় বলে এর মধ্যে শিক্ষার্থীরা মনের যোগ খুঁজে পায়। শব্দগুলির সঙ্গে সঙ্গে *Teaching Aids* ব্যবহার ক'রে শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীরা শব্দের প্রতীকতার সার্থক উপলব্ধি ক'রতে পারে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁর বহু-পরিচিত 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থে এই পদ্ধতি ও অক্ষরভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োগ ক'রেছেন। তবে শব্দগুলি ঐ গ্রন্থে সহজ থেকে ক্রমশঃ কঠিন - এই পদ্ধতিতে সজ্জিত হয় নি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর অর্থবোধ যাতে গৌণ হয়ে না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণে ধ্বনিগত সাম্য আছে

৫। **গল্প-বলা পদ্ধতি (Story telling Method) :**—গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। সব মানুষই গল্প ভালবাসে। ভাষা-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মানুষের এই গল্পপ্রীতিকে কাজে লাগাতে হবে। গল্প বলা ও তার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা একটি শিক্ষাদান-পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত হ'য়েছে। ভাষা-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গল্প বলা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। শিশু গল্প শুনতে ভালবাসে ; মা-ঠাকুমার কোলে বসে সব শিশুই গল্প শুনে দিন কাটিয়েছে। গল্পের মধ্যে যে যাদুধর্মিতা আছে তা শিশুচিত্তকে আকৃষ্ট করে। রূপকথা, ভয়ভীতি, কৌতুক, চিত্রধর্মিতা প্রভৃতি হল গল্পের প্রাণ। এগুলি শিশুদের কাছে সহজেই আদরণীয়। ভাষা-শিক্ষাদানের সময় সচেতনভাবে এই গল্প বলার পদ্ধতিকে ব্যবহার ক'রতে হবে। গল্পগুলি হবে শিক্ষামূলক গল্পের বিষয়বস্তু ও আয়তন শিশুর মানসিক বয়সের উপযোগী হবে। গল্পের মধ্যে সহজ সহজ শব্দের সন্নিবেশ থাকবে। শিক্ষার্থীদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা নিয়ে গল্প বলতে হবে। গল্পের মধ্য দিয়ে শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ ও শব্দের প্রতীকতা যেন প্রকাশ পায়। শিশুদের পুস্তকবিহীন ও প্রস্তুতির স্তরে গল্পের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষাদান খুবই কার্যকর।

গল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কার্যকারিতা

৬। **"দেখ এবং বল" পদ্ধতি ('Look and Say' Method) :** এই পদ্ধতিতে শিশুকে একটি বস্তু বা প্রাণীর ছবি দেখানো হয়। এই ছবিগুলির বস্তু বা প্রাণী প্রথম অবস্থাতে শিশুর জানা থাকে। ছবি দেখে শিশুকে বস্তু বা প্রাণীর নাম বলতে বলা হয়। কঠিন শব্দ হ'লে শিক্ষক নাম বলে দেন। শিক্ষককে বার বার স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে ছবিটির ধ্বনিরূপ শিক্ষার্থীর অন্তরে গেঁথে দিতে হবে। ফলে, শিশু ঐ শব্দটির স্পষ্ট উচ্চারণ ও প্রতীকতা জানবে। তারপর শব্দটিকে বড় বড় হরফে লিখে শিক্ষার্থীর সামনে ধরতে হবে। শিক্ষার্থী ঐ শব্দটির বর্ণগুলির উপর হাতের আঙুল চাপিয়ে তার বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ ক'রবে। শব্দগুলির সংকলন সহজ থেকে ক্রমশঃ কঠিন হবে। পরবর্তী কালে পাঠের বিভিন্ন বর্ণ দিয়ে শিক্ষার্থীকে ঐ শব্দ রচনা ক'রতে বলা হবে। এইভাবে শিশু ধীরে ধীরে বাক্য গঠন করতেও শিখবে। এই পদ্ধতিতে শিশু শুদ্ধ উচ্চারণ, শব্দের প্রতীকতা, বানান, বর্ণ প্রভৃতি সঠিকভাবে শিক্ষা করে। তবে এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি শিশুর উপর শিক্ষককে সুতীব্র নজর রাখতে হবে।

এই পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শিশু মনস্তত্ত্বের অনুযায়ী

৭। **আবৃত্তি (Recitation) :**— শিশুর কাছে কবিতা ও ছড়ার আকর্ষণ কম নয়। তাই ছড়া ও কবিতার সার্থক আবৃত্তির সাহায্যে ভাষা-শিক্ষাদান খুবই কার্যকর। আবৃত্তি শিশুচিত্তকে সহজেই আকর্ষণ করে। আবৃত্তি একটি শিল্প-বিশেষ। সুষ্ঠু উচ্চারণ, ছন্দ, যতিচিহ্ন, ভাব প্রভৃতি মেনে নিয়ে যথাযথভাবে আবৃত্তি ক'রতে হবে। ছড়ায় শ্বাসঘাতের প্রাধান্য,— আবৃত্তিতে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরাও আবৃত্তি করতে শিখবে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরব পাঠ (*Loud reading*) খুবই উপযোগী। বিদ্যালয়ে সমবেত পাঠেরও (*Group reading*) প্রয়োজন আছে। এতে অনেক ছেলের ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ থাকলেও অনগ্রসর শিক্ষার্থীরা ভাষা-শিক্ষার সুযোগ পায়। ভাষা-শিক্ষাক্ষেত্রে আবৃত্তিকে উৎসাহিত ক'রতে হবে। বাংলা বর্ণমালার উচ্চারণ বিজ্ঞান-ভিত্তিক। প্রতিটি বর্ণের সুনির্দিষ্ট উচ্চারণ-স্থান আছে। শিক্ষক প্রতিটি বর্ণ, শব্দ, বাক্য, কবিতা ও ছড়ার যথাযথ আবৃত্তি করবেন। শিশুরা অনুকরণ (*Imitation*) প্রিয়। তারা শিক্ষক মহাশয়ের যথাযথ উচ্চারণের অনুকরণ করে ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হবে।

ভাষা-শিক্ষাদানের সময় আবৃত্তিকে উৎসাহিত কর'তে হবে

৮। **লিঙ্গাফোন পদ্ধতি (Linguaphone Method) :**— আধুনিক যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে নানারকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। ভাষা-শিক্ষাদানের জন্যও কিছু কিছু পাঠ পরিকল্পনা (*Lesson Plan*) রেকর্ড করা থাকে। এই পাঠে বিভিন্ন শব্দ ও বর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণ থাকে। শিশুদের ঐ রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হয়। রেকর্ড থেকে শুনে অনুকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা ভাষা শিক্ষাগ্রহণ করে। তবে এই পদ্ধতি প্রথমে নতুন নতুন লাগলেও পরবর্তী কালে শিক্ষার্থীদের কাছে কৃত্রিম ও যান্ত্রিক হিসেবে

ভাষা-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্র বিজ্ঞানের অবদান

প্রতিভাত হয়। আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, শিক্ষকের পরিপূরক কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।

উল্লিখিত শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলিকে প্রাথমিক স্তরের ভাষা শিক্ষাদানের সময় প্রয়োগ ক'রতে হবে। **শিক্ষাদানের সময় শিশু মনস্তত্ত্বকে গুরুত্ব দিতে হবে**। আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলিকে সার্থকভাবে প্রয়োগ ক'রে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষাদানের সময় *Teaching Aids* ব্যবহার ক'রতে হবে। শুদ্ধ বানান, স্থষ্ঠু উচ্চারণ, প্রতীকতা, ভাষা-ব্যবহারের কৌশল প্রভৃতিকে শিক্ষাদানের সময় গুরুত্ব দিতে হবে। পাঠদান সব সময় সরল ও আকর্ষণীয় হবে। শিশু ভাষা-শিক্ষালাভ করবে তার মনের স্বাভাবিকতা অনুযায়ী। এর জন্য তাদের ছবি ও ছড়াই বই, গল্পের বই, গান, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রতে হবে। বিদ্যালয়কে শিক্ষা-গ্রহণের একটি আদর্শ পরিবেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

প্রাথমিক স্তরে ভাষা শিক্ষাদানের সময় শিশুমনস্তত্ত্বের উপর গুরুত্ব দিতে হবে

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থা অতীব শোচনীয়। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই পড়াশুনার মত পরিবেশ নেই,—ঘরবাড়ী ও আসবাবপত্র নিতান্তই সামান্য। প্রাথমিক শিক্ষকদের অধিকাংশই ট্রেনিং-প্রাপ্ত নন। শিক্ষাদান-প্রণালীও প্রাচীন। স্বাধীনতা-লাভের বত্রিশ বছর পরেও আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র বিস্ময় ও হাতাশা সৃষ্টি করে। আধুনিক শিক্ষা-জগতের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কোন সম্পর্ক নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা-সহায়ক উপাদানের (*Teaching Aids*) একান্ত অভাব। এ ব্যাপারে সরকার, শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক ইত্যাদি সকলেই উদাসীন। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বই-এর অভাবও লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের ছবি, ছড়া ও গল্পের বই আমাদের ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে নেই। তাই প্রাথমিক স্তরে যথাযথভাবে ভাষা-শিক্ষাদান শিক্ষা-ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামোয় সম্ভবপর নয়। এ ব্যাপারে সকলকেই গুরুত্ব দিতে হবে, সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষা-সংস্কারে এগিয়ে আসতে হবে। নতুবা মাতৃভাষা-চর্চার দৈন্য কোনদিন ঘুচবে না।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা

॥ তিন ॥ নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর

[Lower Secondary Stage]

বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম শ্রেণী হ'ল নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর। এই সময় শিক্ষার্থীদের গড় বয়স এগারো-বারো-তেরো বৎসর। বাল্যকাল থেকে কৈশোরের গণ্ডী পেরিয়ে

শিক্ষার্থীরা বয়ঃসন্ধিকালের সঙ্গম-তীর্থে উপনীত হয়। দেহ-মনের পরিবর্তনশীলতার মানসিকতায় এই স্তর পূর্ণ। শিশুর দেহ ও মন পূর্ণতার অভিমুখে পরিণতির সম্মুখীন। বয়ঃসন্ধিকালের যন্ত্রণা-কাতর মানসিকতা অনন্ত জিজ্ঞাসা, অদম্য উৎসাহ ও উদ্যমী আগ্রহে ব্যাকুল। এই স্তরে শিক্ষার্থীরা সব কিছু জানতে চায়, কর্মে উৎসাহ পায়, নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে চায়। শিশু-মনের এই বিচিত্র-মানসিকতাকে কেন্দ্র ক'রেই নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। তাদের মনে প্রবৃত্তি-(*Instinct*) ও প্রক্ষোভ (*Emotion*)-ঘটিত জটিলতা আসে। বয়ঃসন্ধিকালের যে সব সমস্যা আছে, তাকে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে উদ্গতি-সাধন (*Sublimation*) ক'রে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। তাতে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষিত হবে, যথাযথভাবে ভাষা-শিক্ষাও হবে।

নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের ভাষা-শিক্ষায় শিশুর মানসিকতা

প্রাক্-প্রাথমিক স্তর ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা ভাষা শিক্ষা ক'রেছে। নিম্নমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকাংশে পারদর্শী। লেখা ও পড়ার ক্ষেত্রে শিশু অনেকটাই অগ্রসর হ'য়েছে। তাই নিম্নমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত ক'রতে হবে। সাহিত্যের নন্দন-কাননে সে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে পারে। ছোট ছোট কবিতা, গল্প, রচনা প্রভৃতির মধ্যে শিশু তার সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাকে প্রকাশ করবে। ভাষা-শিক্ষক এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করবেন। মনের সূক্ষ্ম-অনুভূতির সার্থক প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বয়ঃসন্ধিকালের যন্ত্রণা-কাতর মন সৌন্দর্যলোকের চেতনা পাবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে তাই সাহিত্য-সৃষ্টিকে সুযোগ দিতে হবে। বিদ্যালয়ে দেওয়ালপত্রিকা (*Wall Magazine*) ও মুদ্রিত পত্রিকা (*Printed Magazine*) থাকবে। তাতে ছেলেমেয়েদের কাঁচা হাতের লেখাগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হবে। এর মধ্যে উৎকৃষ্ট রচনাগুলিকে অন্যান্য সাময়িক পত্রে প্রকাশের জন্য পাঠাতে হবে। এর জন্য ভাষা-শিক্ষককে সহানুভূতিশীল মন নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ

নিম্নমাধ্যমিক স্তরে শিশুর ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে '**ছবি আঁকার**' বিশেষ সম্পর্ক আছে। চিত্রাঙ্কন ভাষা-শিক্ষাকে প্রভাবান্বিত করে। তাই নিম্নমাধ্যমিক স্তরে ভাষা-শিক্ষাদানের সহযোগী হিসাবে চিত্রাঙ্কনকে উৎসাহ দান করতে হবে। ***Herbert Reed*** তাঁর ***'Education through Art'*** গ্রন্থে শিল্পকে শিক্ষার ভিত্তিভূমি হিসেবে বিশ্লেষণ ক'রেছেন। প্রতি মানুষের মধ্যেই সৌন্দর্যপিপাসা আছে। সেজন্য আর্টের প্রতি আকর্ষণ মানুষের কাছে চিরন্তন। মানুষের সৌন্দর্য-অনুশীলন ও সৃজনী শক্তির বিকাশে চিত্রাঙ্কন-প্রচেষ্টা খুবই উল্লেখযোগ্য। চিত্রাঙ্কন হ'ল ভাব-প্রকাশের প্রকৃষ্ট মাধ্যম ;—আবেগ, অনুভূতি, প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলির স্বাভাবিক বিকাশের মাধ্যম। চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে আনন্দ ও সৌন্দর্যের অনুভূতি অর্জন করা যায়। শিক্ষার্থীদের তাই ছবি আঁকতে দিতে হবে। নিম্নমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের 'হিজিবিজি' আঁকার বয়স অতিক্রান্ত হয়েছে। তাই সুষ্ঠু ও

চিত্রাঙ্কন

বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষার্থীদের ছবি-আঁকার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। এই চিত্রাঙ্কন শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষায় সাহায্য করবে। রং-বেরঙের ছবি আঁকতে আঁকতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছন্দের প্রতীকতা-বোধ সার্থক হবে। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ ক'রে শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকবে—সৌন্দর্য ও আনন্দের অনুভূতি লাভ ক'রবে। নিম্নমাধ্যমিক স্তরে তাই ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি ক'রে নিম্নমাধ্যমিক স্তরের ভাষা-শিক্ষার **পাঠ্যক্রম রচনা** ক'রতে হবে। ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রাধান্য অপসারণ ক'রতে হবে। পাঠ্যক্রমে সাহিত্য-রসচর্চা, সৃজনশীল সাহিত্য-সৃষ্টি, বিভিন্ন লেখকের লেখার সঙ্গে পরিচয় প্রভৃতি করবার সুযোগ দিতে হবে। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুতপঠনকে (*Rapid Reading*) গুরুত্ব দিতে হবে। ব্যাকরণ থাকবে, তবে তা হবে সাধারণ পর্যায়ের; তার মধ্যে 'নিপাতনে সিদ্ধ' থাকবে না। পাঠ্যক্রম এমন ভাবে রচনা করতে হবে, যাতে শিশুমন তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে ভাষা-শিক্ষা গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়।

পাঠ্যক্রম রচনা

নিম্নমাধ্যমিক স্তরে ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে **সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী**কে (*Co-currricular Activities*) প্রাধান্য দিতে হবে। সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীই শিক্ষার্থী-দের ভাষা-শিক্ষাকে সার্থক করে তুলবে। আবৃত্তি, অভিনয়, গান, গল্প-কবিতা, রচনা, সাহিত্য-পাঠ, সাহিত্য আলোচনা, দেওয়াল পত্রিকা, বিদ্যালয়ের মুদ্রিত পত্রিকা প্রভৃতির ব্যবস্থা, আলোচনা ও অনুশীলন প্রভৃতির মাধ্যমে ভাষা-শিক্ষা সফল ও সার্থক হ'য়ে ওঠে। বিদ্যালয়ে সাহিত্য-সহায়ক বিভিন্ন সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী অনুশীলনের সুযোগ ক'রে দিতে হ'বে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল সাহিত্য-রচনার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত ক'রতে হবে।

সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী

নিম্নমাধ্যমিক স্তরে **সরব পাঠের সঙ্গে সঙ্গে নীরব পাঠেরও অভ্যাস** ক'রতে হবে। ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে নীরব পাঠের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নীরব পাঠ নীচু শ্রেণীতে বা প্রাথমিক স্তরে সম্ভব নয়। কিন্তু বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নীরব পাঠের অভ্যাস ক'রতে হবে, সরব পাঠও প্রয়োজন। পাঠে দ্রুততা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ের মধ্যে ও বাইরে সরব পাঠ ও নীরব পাঠের মাধ্যমে ভাষা-শিক্ষা গ্রহণে অগ্রসর হয়।

সরব পাঠ
ও নীরব পাঠ

ভাষাশিক্ষা-ক্ষেত্রে **পাঠাগারের (Library)** একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীরা পাঠাগার ব্যবহার ক'রবে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যক্রমের বাইরের বই পড়তে উৎসাহিত হবে। ফলে; সাহিত্য-রাজ্যে প্রবেশ ক'রতে তাদের সুবিধা হবে। শিক্ষাজীবনে পাঠাগার অপরিহার্য। কম বয়স থেকে তার যথাযথ ব্যবহার ও অভ্যাস-গঠন প্রয়োজন। পাঠাগারের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা পাঠের দক্ষতা (*Study Skill*) অর্জন ক'রবে,

পাঠাগার ব্যবহার

পাঠাভ্যাস (*Study Habit*) গ'ড়ে তুলবে। বিভিন্ন বিশিষ্ট পুস্তকের সাহায্যে তারা অনন্ত জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করবে।

নিম্নমাধ্যমিক স্তরে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর এক একটি **Collection Book** থাকবে। এতে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রিয় কবিতা, গল্প-নাটকের নির্বাচিত অংশ, বাগ্‌ধারা, কঠিন কঠিন শব্দের বানান, বিভিন্ন লেখকের লেখা বই-এর নাম লেখা থাকবে। এই *Collection Book*-এর মধ্যে শিক্ষার্থীর মানসিকতা, সাহিত্য-চেতনা, শিল্প-প্রবণতা প্রভৃতি প্রতিফলিত হয়। ফলে, শিক্ষার্থীর উৎসাহ ও আগ্রহ বেড়ে যায় ; শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

Collection Book

নিম্নমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। **শিক্ষকের দায়িত্ব** পালনের উপর নির্ভর করছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণ। শিক্ষককে সম্পূর্ণ দায়িত্ব-সহকারে ভাষা-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ব্রত গ্রহণ ক'রতে হবে। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শনের উপর দাঁড়িয়ে শিশু-মনস্তত্ত্বকে অবলম্বন ক'রে শিক্ষক ভাষা-শিক্ষাদান ক'রবেন। ভাষা-শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক যথাযথভাবে শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলি (*Teaching Aids*) ব্যবহার ক'রবেন। ভাষা-শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও উৎসাহ সঞ্চারের চেষ্টা ক'রবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠাগার ব্যবহার ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীতে উদ্বুদ্ধ ক'রবেন। সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল হৃদয় নিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষার ত্রুটিগুলিকে অপসারিত ক'রবেন। ব্যাকরণ, বানান-ভুল, শুদ্ধ উচ্চারণ, লেখা, পাঠের দক্ষতা ইত্যাদি শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক সতর্কতার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলি ব্যবহার ক'রবেন। শিক্ষকের দায়িত্ব-পালন ও দক্ষতার উপর নিম্নমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ভাষাশিক্ষা-গ্রহণ নির্ভর ক'রছে। শিক্ষককে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

শিক্ষকের দায়িত্ব

॥ চার ॥ মাধ্যমিক স্তর
[Secondary Stage]

নবম ও দশম শ্রেণী হ'ল মাধ্যমিক স্তরের অন্তর্গত ;—বয়ঃসীমা—১৪-১৫ বৎসর। বিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষাগ্রহণের এটাই হ'ল সর্বশেষ পর্যায়। শিক্ষার্থীরা এই পর্যায়ে বাল্য ও কৈশোরের সীমা অতিক্রম ক'রে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। বয়ঃসন্ধিকালের মানসিকতা, জীবনের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা মাধ্যমিক স্তরের ভাষা-শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক পরিণত ; এই স্তরে তারা ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা ও আত্মপ্রত্যয় সংগ্রহ ক'রেছে। পরিণত মানসিকতা, ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা ইত্যাদির কথা স্মরণ রেখে এই পর্যায়ে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এই স্তরের শেষে শিক্ষার্থীদের সামনে আছে

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মানসিকতা

মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক পর্যায়ের ভাষা-শিক্ষাকে প্রভাবিত করে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণ শিক্ষাদানকে গুরুত্ব দিতে হবে। **ব্যাকরণ শিক্ষাদান** ক'রতে হবে আরোহী পদ্ধতিতে (*Inductive Method*); অর্থাৎ আগে উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূত্র খুঁজে বার ক'রতে হবে। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা **অনুবাদ-চর্চা (Translation)** ক'রবে। অনুবাদ-চর্চার মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন এই পর্যায়েই সম্ভব। এই স্তরে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি ক'রবে। গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত ক'রতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের **নীরব পাঠের** উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এই পর্যায়ে সরব পাঠের ব্যবহার কমিয়ে নীরব পাঠকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে। শিক্ষার্থীর ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে **আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক, সাহিত্য-আলোচনা** প্রভৃতি ক'রবে; বিদ্যালয়ে তার জন্য সুযোগ-সুবিধা রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্য-আলোচনার জন্য হাতে-লেখা দেওয়াল-পত্রিকা ও মুদ্রিত বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা থাকবে। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূ'ত **গদ্য-পদ্য পাঠ গ্রহণে** সাহিত্য-তত্ত্ব, রসচেতনা ও শিল্প-সুষমার কথা স্মরণ রাখতে হবে। ভাষা-শিক্ষাদানের সময় **শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলিকে (Teaching Aids)** ব্যবহার ক'রতে হবে। এই পর্যায়ে **দ্রুত-পঠনের (Rapid Reading)** জন্য অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত থাকবে। **পাঠাগার (Library)** ব্যবহার ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূ'ত বই পড়া হ'ল মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষাদানের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের পাঠাগার থেকে বিভিন্ন বই সংগ্রহ ক'রে অবসর সময়ে পড়াশুনা ক'রবে। বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের (যেমন,—রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির) লেখা এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা পড়ে ফেলবে। আধুনিক লেখকদের কিছু কিছু লেখাও তাদের পড়তে হবে। এই সঙ্গে বিভিন্ন লেখকের সাহিত্য-তত্ত্ব ও সাহিত্যের ইতিহাসের বিভিন্ন বই প'ড়ে তারা বিভিন্ন লেখকের সাহিত্য-কীর্তির সমালোচনা ক'রবে। এর জন্য শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন **সাময়িক পত্র (Periodicals)** ও সাহিত্য-পত্রের নিয়মিত পড়াশুনা ক'রবে। ফলে, ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সাহিত্য ও সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে *clear conception* ক'রতে পারবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের শেষ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা লাভ ক'রবে;—সাহিত্য-সমালোচনায় পারদর্শিতা লাভ ক'রবে;—এবং সৃজনশীল সাহিত্য-রচনায় দক্ষতা প্রদর্শন ক'রবে—এই হবে ভাষা-শিক্ষাদানের মূল কথা।

মাধ্যমিক পর্যায়ে ভাষাশিক্ষাদান পদ্ধতি

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মনন ও চিন্তনের (*Thinking*) উৎকর্ষ-সাধনের কথা ভাষা-শিক্ষককে স্মরণ রাখতে হবে। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আত্মসচেতনতা

ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষার্থীদের সুকুমার ভাবগুলি (*Fine Sentiments*) এই পর্যায়ে অনুভূতির অন্তর্মুখীনতায় পরিণত হয়। শিক্ষার্থীদের ঐ অনুভূতি, আবেগ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব ধর্ম, সামাজিকতা ও যুগচেতনার কথাও ভাষাশিক্ষাদানের সময় মনে রাখতে হবে। জীবনের অভিজ্ঞতা, যুগধর্ম ও সমাজ-চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ঐতিহ্য, জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারার কথাও শিক্ষার্থীদের ভাষাশিক্ষাদানের সময় মনে রাখতে হবে। ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যথার্থ অনুরাগ গ'ড়ে তোলাই হবে মাধ্যমিক পর্যায়ে ভাষা-শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ভাষা-শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা' যেন স্বনির্ভরতা ও আত্মপ্রত্যয় লাভ ক'রতে পারে। সৃজনশীল সাহিত্য রচনার মাধ্যমে আপন মানসিক অনুভূতিগুলির যথাযথ প্রকাশ শিক্ষার্থীদের ভাষাশিক্ষার সাফল্য প্রমাণ ক'রবে। ভাষা একদিকে যেমন ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে, অন্যদিকে তেমনি নন্দন-চেতনার আলোকে সৌন্দর্য ও শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাধ্যমিক স্তরে ভাষা-শিক্ষাদানের সময় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরে ভাষা-শিক্ষাদান প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়গুলিতে একাদশ শ্রেণীর বিলোপ সাধন করা হ'য়েছে। ১৯৭৪ থেকে শুরু হয়েছে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ের নতুন পাঠ্যক্রম। তাতে ভাষা-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে মাতৃভাষার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং পাঠ্যক্রমেরও বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের নতুন শিক্ষানীতির মধ্যে শিক্ষায় মাতৃভাষা যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্য-রস, নন্দন-চেতনা ও শিল্পমণ্ডন-কলা সঞ্চারিত করাই হবে নতুন পাঠ্যক্রমে মাধ্যমিক শ্রেণীতে বাংলাভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষাদানের মূল কথা। এই পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের কাছে যে সব বিষয় ও ক্ষেত্র নতুন ক'রে তুলে ধ'রেছে, তা বিচার ক'রবে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

নতুন পাঠক্রম

॥ অনুশীলনী ॥

১। প্রাথমিক স্তরের ছাত্রকে বাংলা (মাতৃভাষা হিসাবে) শিখাইতে হইলে কি প্রণালী অবলম্বন করা সংগত, তাহা যুক্তি-সহকারে বিস্তৃত করুন। (কলি বিশ্ব. বি. টি. ১৯৬২)

২। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় ছাত্রদের সম্যক আত্মবিকাশের জন্য শিক্ষার বাহনরূপে ও কর্মজীবনের প্রস্তুতির জন্য ছাত্রদের মাতৃভাষার কিরূপ শিক্ষা দিবেন? (কলি. বিশ্ব. বি. টি. ১৯৬৩)

৩। নিম্নমাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাকে কিভাবে সরস, আকর্ষণীয় ও প্রকৃত-পক্ষে ভাষা-শিক্ষার সহায়ক করা যায় তাহা বিবৃত কর। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৮)

৪। বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীদের প্রথম স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও পাঠদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা কর। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৭০)

পঞ্চম অধ্যায়

সরব পাঠ ও নীরব পাঠ

[Loud Reading and Silent Reading]

শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশাল জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের জন্য পাঠের প্রয়োজন হয়ই। শুনে, দেখে, পড়ে ও লিখে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করি। বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন লেখকের নানারকম পুস্তক আছে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে সেগুলি অধ্যয়ন ক'রতে হয়। সেক্ষেত্রে পাঠের প্রয়োজন হয়। ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রেও পঠের প্রয়োজন আছে। কাব্যসাহিত্য ইত্যাদি অনুশীলনের জন্য পাঠের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন স্তরে পাঠের প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষা-শিক্ষাদানের সময় তাই পাঠের উপর গুরুত্ব দিতে হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠের গুরুত্ব

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ভাষা-শিক্ষাগ্রহণ নির্ভর করে। **পাঠের জন্য চোখের প্রয়োজন হয় সর্বাধিক**। বিভিন্ন বই বা খাতার লেখা দেখে দেখে পড়তে হয়। পড়ার সঙ্গে চোখের একটা বিরাট সম্পর্ক আছে। দীর্ঘদিন ধ'রে পাঠের অভ্যাসের ফলে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের সঙ্গে চোখের এমন একটা সম্পর্ক স্থাপিত হ'য়ে যায় যে, তখন আর বর্ণ ইত্যাদি অনুসারে পাঠ করতে হয় না ; চোখ একবার মাত্র তাকিয়েই পাঠ্যগ্রহণ ক'রতে সক্ষম হয়। **পাঠের জন্য (বিশেষ ক'রে সরব পাঠের জন্য বাগ্‌যন্ত্র বিশেষ প্রয়োজন।** নিঃশ্বাস বায়ুকে মুখের মধ্যে গ্রহণ ক'রে তাকে জিহ্বার সাহায্যে তালু, ওষ্ঠ, দন্ত, কণ্ঠ্য, মূর্ধা প্রভৃতির উপর বিভিন্নভাবে চাপ দিলে যে কম্পন অনুভূত হয়, তা কণ্ঠনালীস্থিত ঝিল্লীর তন্ত্রীতে অনুরণন সৃষ্টি করে এবং তারই ফলে ভাষা উচ্চারিত হয়। উচ্চারণ ও ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাগ্‌যন্ত্রের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ খুবই প্রয়োজন। এমন কি, নীরব পাঠের জন্যও চোখ ও বাগ্‌যন্ত্র খুবই প্রয়োজন। ভাষাকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য তার লিপিরূপ সুনির্দিষ্ট করা হ'য়েছে। সেই লিপিরূপ থেকে ভাষা-শিক্ষার জন্য পাঠের প্রয়োজন হয়।

পাঠের ক্ষেত্রে চোখ ও বাগযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের মধ্যে **পাঠের দক্ষতা** (Study Skill) ও **পাঠের অভ্যাস** (Study Habit) গ'ড়ে তোলা। 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি'। শিক্ষা হ'ল তাই জীবনব্যাপী এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পাঠের অভ্যাস, তাই জীবনে বিশেষ প্রয়োজন। তাই পাঠের অভ্যাস গ'ড়ে তুলতে হয়। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত পাঠের মাধ্যমে এই অভ্যাস গ'ড়ে তোলে। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের পাঠ্যপুস্তকগুলি ছাড়াও অন্যান্য বই পড়ে। সেই পড়ার মধ্য থেকেই অভ্যাস গ'ড়ে উঠে। মানুষের অবসর-জীবনে পাঠের এই অভ্যাস বিশেষ কাজে লাগে।

Study Habit ও Study Skil

পাঠের অভ্যেস থেকেই পাঠের দক্ষতা গড়ে উঠে। মনোযোগের সংস্থাপন, অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও অনুশীলন প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠের দক্ষতা অর্জন করে। তখন তারা বিভিন্ন পুস্তক প'ড়ে তার ভাব ও বিষয়বস্তু সহজেই আয়ত্ত ক'রতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই পাঠের অভ্যাস ও দক্ষতা একান্ত প্রয়োজন।

পাঠ প্রধানতঃ দু'রকমের—সরব পাঠ ও নীরব পাঠ।

॥ সরব পাঠ ॥

(Loud Reading)

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরব পাঠ বিশেষ প্রয়োজন। কাব্য, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সরব পাঠ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ ক'রে নীচু শ্রেণীগুলিতে অথবা ভাষাশিক্ষার নিম্নতম স্তরগুলিতে সরব পাঠ বিশেষ কার্যকর। তখন সরব আবৃত্তির মাধ্যমেই শব্দ, বাক্য ও ভাষা শিক্ষা হয়। সরব পাঠই তখন ভাষা-শিক্ষার সবচেয়ে বড় অবলম্বন। ভাষার লিপিরূপ উদ্ধার ক'রে সরব পাঠ করতে গিয়ে চোখ ও বাগ্-যন্ত্রের সার্থক সমন্বয়ের একান্ত প্রয়োজন হয়। ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা একটু অগ্রসর হ'লেই সরব পাঠের অভ্যাস ক'রতে হবে। প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়েও শিক্ষার্থীরা অপরের কাছ থেকে ছড়া, কবিতা ইত্যাদি শুনেই সেগুলিকে গ্রহণ করে এবং সরব আবৃত্তির মাধ্যমে সেগুলিকে প্রতিফলিত করে। শুদ্ধ উচ্চারণ ও যথাযথভাবে ভাষা-ব্যবহারের শিক্ষা সরব পাঠ থেকে গ্রহণ করা যায়। মনের ভাবকে অপরের কাছে পৌছানোর জৈব প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্য ভাষার প্রয়োজন। মুখের কথা ব'লে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন হয় জীবনের সর্বস্তরেই। তার শিক্ষা সরব পাঠ থেকেই হতে পারে। সার্থক সরব পাঠ বা আবৃত্তি আজ শিল্প হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে সরব পাঠ তাই একান্ত আবশ্যক।

সরব পাঠের প্রয়োজনীয়তা

আদর্শ সরব পাঠের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ;—

॥ **এক** ॥ শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ। বিভিন্ন শব্দ ও বর্ণের সুস্পষ্ট উচ্চারণ করতে হবে।

॥ **দুই** ॥ ছন্দ ও যতি-চিহ্নের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরব পাঠ করতে হবে।

॥ **তিন** ॥ সরব পাঠের সময় শ্বাসাঘাত ও বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ-রীতির বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখতে হবে।

॥ **চার** ॥ সরব পাঠ নীচু শ্রেণীগুলিতে খুব বেশী প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা যত বাড়বে, সরব পাঠ তত কমিয়ে আনতে হবে।

॥ **পাঁচ** ॥ কবিতা-পাঠের ক্ষেত্রে সরব পাঠ অপরিহার্য।

॥ **ছয়** ॥ সরব পাঠের সময় মনঃ-সংযোগ একান্ত প্রয়োজন।

॥ **সাত** ॥ সরব পাঠের মধ্য দিয়ে লেখকের অনুভূতি ও বিষয়বস্তু আবেগকম্পিত স্বরে প্রকাশিত হবে।

॥ **আট** ॥ সরব পাঠকে 'আবৃত্তি'র মাধ্যমে শিল্প-পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।

॥ **নয়** ॥ শিক্ষককে ভাল আবৃত্তি করতে জানতে হবে। ভাষা-শিক্ষাদানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি আদর্শ সরব পাঠ দেবেন ;—শিক্ষার্থীদের সরব পাঠ করাবেন, শিক্ষার্থীদের ভুল-ত্রুটি হলে সহানুভূতির সঙ্গে তার সংশোধন ক'রবেন।

॥ **দশ** ॥ ভাল ভাল আবৃত্তি শিক্ষার্থীদের শোনাতে হবে। তার জন্য আবৃত্তির বিভিন্ন শিল্পী বিদ্যালয়ে আনতে হবে ; গ্রামোফোনের মাধ্যমে রেকর্ড বাজিয়েও শিক্ষার্থীদের ভাল আবৃত্তি শোনানো যেতে পারে।

কবিতা-শিক্ষাদানের সময় 'নিছক' পাঠের উপর জোর দিতে বলা হয়েছে। কবিতা বোঝবার জন্য নয়, বাজবার জন্য। কবিতার ছন্দ, ভাষা ও শব্দ ইত্যাদি সার্থক আবৃত্তির মাধ্যমেই ধরা পড়ে। কবিতার বিষয়বস্তু শিক্ষা না দিয়ে তার রসানুভূতি শিক্ষা দেওয়া উচিত। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সব পর্যায়েই কবিতার ক্ষেত্রে সরব পাঠ থাকবেই। G. *Thompson* বলেছেন, "*The language of poetry……preserves in a higher degree the qualities of rhythm, melody, fantasy, inherent in speech as such.*" **কবিতার প্রকৃত রস আস্বাদন ক'রতে হ'লে সরব পাঠ চাই-ই।** শিক্ষার্থীরাও স্বাভাবিকভাবে কবিতার সরব পাঠের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

কবিতা ও সরব পাঠ

ভাষা-শিক্ষাক্ষেত্রে সরব পাঠের কতকগুলি **সুবিধা** আছে। সরব পাঠ শিক্ষকের কাছে আনন্দদায়ক ; সরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আকৃষ্ট হয়। সরব পাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণ, শব্দ ইত্যাদির সুষ্ঠু ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা হয় ; শিক্ষার্থীরা ছন্দ ও যতি-চিহ্নগুলির নিয়ম যথাযথ মেনে পাঠ গ্রহণ ক'রতে শেখে। এইভাবে সরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষার ভিত্তি পাকা হয়। সরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের বাগ্‌যন্ত্রকে ভাষা-উচ্চারণের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ক'রতে শেখে। সরব পাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধের ভাব, ছন্দ, অনুভূতি, চিত্রধর্মিতা, সংগীতধর্মিতা, রসচেতনা, শিল্প-বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সরব পাঠ ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে ভাষাকে দ্রুত অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে, উচ্চারণ-বিকৃতি থেকে মুক্ত করে, উচ্চারণে আঞ্চলিকতার প্রভাব দূর ক'রে ভাষার স্থায়ী রূপ রক্ষা করে। কাব্য-কবিতা পাঠে সরব পাঠ অপরিহার্য। সরব পাঠের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের শিল্প-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে, সুকুমার ভাবগুলিকে যথাযথভাবে বিকশিত করে। সরব পাঠের মাধ্যমে রসাস্বাদনে শিক্ষার্থীদের প্রবৃত্তি (*Instinct*) ও প্রক্ষোভগুলির (*Emotion*) উদ্‌গতি-সাধন (*Sublimation*) হয়।

সরব পাঠের সুবিধা

সরব পাঠের কতকগুলি **অসুবিধাও** আছে। সরব পাঠে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে। নীরব পাঠের তুলনায় সরব পাঠে বেশী সময় ও শ্রম লাগে। সরব পাঠে

শিক্ষার্থীদের মনঃ-সংযোগ নাও থাকতে পারে। সরব পাঠ ক'রতে ক'রতে এমন একটি অবস্থা আসে, যখন চোখ ও বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে এমন সংযোগ স্থাপিত হয় যে, সরব পাঠের সময় মানসিক একাগ্রতার বেশী প্রয়োজন হয় না। সে অবস্থা শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। একজনের সরব পাঠ ও চীৎকার অন্যান্যদের পড়াশুনা, চিন্তা-ভাবনা ও কাজ-কর্মে অসুবিধার সৃষ্টি করে। একসঙ্গে ৩।৪টি ছেলেমেয়ে যদি সরব পাঠ করে, তবে তা এক অস্বস্তিকর পরিবেশে পরিণত হয়। সরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যদি কোন বর্ণ বা শব্দের ভুল উচ্চারণে অভ্যস্থ হয়, তবে সে অভ্যাস পরবর্তী কালে অপসারণ করা কষ্টকর। ছন্দ মেনে সরব পাঠ করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে অসুবিধাজনক; কারণ ছন্দ সম্বন্ধে তাদের ধারণা খুব বেশী নয়। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে পদ্ধতি অনুযায়ী সতর্কভাবে সরব পাঠ শিক্ষা দিলে, এবং বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সরব পাঠের হার কমিয়ে নীরব পাঠ শিক্ষা দিলে এইসব অসুবিধা দূর করা যায়। বিভিন্ন অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভাষা-শিক্ষাক্ষেত্রে সরব পাঠ একান্ত আবশ্যক।

সরব পাঠের অসুবিধা

॥ সমবেত পাঠ ॥ **(Collective Reading)**

এককভাবে সরব পাঠ ছাড়াও সমবেতভাবেও সরব পাঠ হয়। শিক্ষাক্ষেত্রের প্রাথমিক পর্যায়ে **সমবেত পাঠ (collective reading)** বিশেষ কার্যকর। সমস্বরে পাঠের সুবিধা আছে। শ্রেণীকক্ষের কিছু কিছু ছেলেমেয়ে ছন্দ, ভাব ও শুদ্ধ উচ্চারণ অনুযায়ী ভালভাবে সরব পাঠ ক'রতে পারে। তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ ক'রে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা খুব সহজে কম সময়ে পাঠ আয়ত্ত করতে পারে, শুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে পারে। সমবেত পাঠ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা-গ্রহণের এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তাতে শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সমবেত পাঠে কিছু ছেলেমেয়ে পাঠে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সমবেত পাঠে ছন্দ ও উচ্চারণ যাতে যথাযথভাবে রক্ষিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সমবেত পাঠ

॥ নীরব পাঠ ॥

(Silent Reading)

ভাষা-শিক্ষাক্ষেত্রে নীরব পাঠ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৃহত্তর জীবনের বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে, জ্ঞানার্জনের বিশাল ক্ষেত্রে নীরব পাঠ খুবই কার্যকর। নীরব পাঠে পাঠের দ্রুততা অনেক বেশী। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধীশক্তি কিছুটা অগ্রসর হ'লে নীরব পাঠ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, পাঠে দ্রুততাও আসে। নীরব পাঠ বিভিন্ন পরিবেশে শিক্ষা-গ্রহণের এক অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি করে। *Library*-র *reading hall*-এ একসঙ্গে অনেক শিক্ষার্থী নীরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে পারে; পরস্পরের মধ্যে শিক্ষা-গ্রহণে বাধার সৃষ্টি হয় না। গৃহ-পরিবেশেও নীরব পাঠের মাধ্যমে একসঙ্গে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে যথাযথভাবে পাঠ গ্রহণ করতে পারে। নীরব পাঠে মনঃসংযোগ

ও একাগ্রতার খুব বেশী প্রয়োজন। মনঃ-সংযোগ ও একাগ্রতা না থাকলে নীরব পাঠ ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। নীরব পাঠে শিক্ষার্থীদের সময় কম লাগে, শক্তিও কম ব্যয়িত হয়। তাই শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনেকক্ষণ ধরে নীরব পাঠ করা সম্ভব। যে সমস্ত গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদির ভাববস্তু খুব গভীর ও সূক্ষ্ম, সে সব ক্ষেত্রে নীরব পাঠ খুবই কার্যকর। শিক্ষাক্ষেত্রে নীরব পাঠের ব্যবহারই সর্বাধিক। বিদ্যালয়ের উঁচু শ্রেণী-গুলিতে নীরব পাঠের ব্যবহার বেশী করতে হবে। ভাষা-শিক্ষার স্তরে নীরব পাঠের গুরুত্ব তাই অস্বীকার করা যায় না। নীরব পাঠে শিক্ষার্থীরা ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ বেশী পায়। কোন শিক্ষার্থী যদি বই-এর দিকে তাকিয়ে নীরব পাঠের ভাণ ক'রে, তবে সে ফাঁকি দিচ্ছে কি না, তা বোঝা খুব কষ্টকর। নীরব পাঠে তাই ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ বেশী। নীরব পাঠের সময় শিক্ষার্থীদের চোখের তারার গতি-বিধি দেখে বোঝা যায় যে, তারা ফাঁকি দিচ্ছে কি না। নীরব পাঠের সময় চোখের তারার গতি বাম দিক্ থেকে ডান দিকে আবর্তিত হয়; একটি ছত্র পড়া শেষ হ'লে চোখের তারা আবার পরবর্তী ছত্রের প্রথমে নিবদ্ধ হয়। পাঠ-গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে নীরব পাঠের ব্যবহার করতে হবে, কারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে নীরব পাঠ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নীরব পাঠের প্রয়োজনীয়তা, সুবিধা ও অসুবিধা

সরব পাঠ ও নীরব পাঠ পরস্পর অভিন্ন নয়। সরব পাঠে কণ্ঠস্বরের শব্দ-ঝংকার থাকে, নীরব পাঠে থাকে বাগ্‌যন্ত্রের অস্পষ্ট কণ্ডূয়ন। ভাষা-শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে সরব পাঠ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শিক্ষার্থীর বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সরব পাঠ কমিয়ে নীরব পাঠ বাড়াতে হবে। সরব পাঠ ও নীরব পাঠের সার্থক ব্যবহার অনুশীলন-সাপেক্ষ। ছন্দ, যতি, ভাব, অনুভূতি, উচ্চারণ ইত্যাদির সাহায্যে আদর্শ সরব পাঠ সম্ভব। ভাল সরব পাঠ শিল্প-পর্যায়ে উন্নীত হয়। নীরব পাঠে মনঃসংযোগ ও একাগ্রতার খুবই প্রয়োজন। কবিতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সরব পাঠ প্রয়োজন; প্রবন্ধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নীরব পাঠ খুবই কার্যকর। **সরব পাঠ ও নীরব পাঠ পরস্পরের পরিপূরক। সরব পাঠের কলরবমুখরতা নীরব পাঠের ধ্যান-গভীরতার মধ্যে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়।** অনেকগুলি বিষয় অনেক সময় ধ'রে পড়াশুনা করতে গেলে নীরব পাঠই সবচেয়ে বড় অবলম্বন।

ভাষা-শিক্ষাক্ষেত্রে সরব ও নীরব পাঠ

প্রকৃতি অনুযায়ী পাঠকে সরব পাঠ ও নীরব পাঠ,—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু পাঠের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। আমরা বিভিন্ন গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ পড়ি বা পড়াই একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, রসানুভূতি-সমৃদ্ধ কাব্য-কবিতা, হাল্‌কা সাধারণ গল্প, প্রবন্ধ, সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র পড়বার বা পড়ানোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন। পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ—

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠের বিভিন্নতা

॥ এক ॥ চর্বনা পাঠ (Critical Study)
॥ দুই ॥ স্বাদনা পাঠ (Appreciation Study)
॥ তিন ॥ ধারণা পাঠ (Comperhensive Study)

এই তিন ধরনের পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন, পদ্ধতিও তাই ভিন্ন। পাঠের এই তিনটি পদ্ধতি নিয়ে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ এক ॥ চর্বনা-পাঠ (Critical Study) :

অনেক লেখকের রচনায় গভীরতা থাকে, যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কঠিন ও জটিল বিষয়ের আলোচনা থাকে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে অনেক প্রবন্ধ সংকলিত থাকে। যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধি, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে ঐ জাতীয় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হয়। এই জাতীয় পাঠকে চর্বনা পাঠ বা *Critical Study* বলা হয়। শক্ত বা কঠিন খাদ্যদ্রব্যকে যেমন চর্বন ক'রে খেতে হয়, এই জাতীয় প্রবন্ধ-রচনাকে তেমনি যুক্তি-তর্ক-বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক'রতে হয়। যে সমস্ত রচনায় বিষয়বস্তুর প্রাধান্য থাকে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে চর্বনা-পাঠ প্রয়োজন। সাধারণতঃ নীরব চর্বনা-পাঠেই যুক্তি-বুদ্ধির মাধ্যমে প্রবন্ধ-রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য গ্রহণ ক'রতে হয়।

চর্বনা-পাঠ

॥ দুই ॥ স্বাদনা-পাঠ (Appreciation Study) :

কাব্য-কবিতায় রসানুভূতিই সবচেয়ে বড় কথা। কবিতায় বিষয়বস্তুর প্রাধান্য নেই,—কবির অনুভূতির উচ্ছ্বাস কবিতায় ধরা পড়ে। কবিতায় ব্যঙ্গার্থ বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যায়। রসধ্বনিই কবিতার প্রাণ-সম্পদ। কবিতার পাঠ তাই রসানুভূতি-মূলক,—রসাস্বাদমূলক। কবিতাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেও রসাস্বাদনই বড় কথা। কবিতার পাঠকে তাই স্বাদনা-পাঠ বা *Appreciation Study* বলা হয়। কবির যে অনুভূতি কবিতায় প্রকাশিত হ'য়েছে, শিক্ষার্থীরা যাতে তা গ্রহণ ক'রতে পারে, তার প্রচেষ্টা হয় স্বাদনা-পাঠের মাধ্যমে। কবিতা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'ল কাব্যগত রসাস্বাদন ক'রতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা। স্বাদনা-পাঠ কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।

স্বাদনা-পাঠ

॥ তিন ॥ ধারণা-পাঠ (Comprehensive Study) :

কতকগুলি বিষয় থাকে, যেগুলিকে পাঠ করা হয় একটা সাধারণ ধারণা সৃষ্টির জন্য। নিখুঁত বিচার-বিশ্লেষণ, রসের আস্বাদন এই জাতীয় পাঠের উদ্দেশ্য নয়। সাধারণভাবে দ্রুতপাঠের মাধ্যমে লেখকের বক্তব্য সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা সৃষ্টির জন্য যে পাঠের ব্যবহার করা হয়, তাকে ধারণা-পাঠ বা *Comprehensive Study* বলে। সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, দ্রুত পঠনের বিভিন্ন পুস্তক এই ধারণা-পাঠের মাধ্যমে অনুশীলন করা হয়। অনেকে আবার একে **আয়ত্তীকরণ পাঠ** বলে থাকেন।

ধারণা-পাঠ

আদর্শ পাঠের বিশেষত্ব
(Qualities of good Reading)

আদর্শ পাঠ কাকে বলবো ? আদর্শ পাঠের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বগুলি কি কি ? সে সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। কারণ ভাষা-শিক্ষাক্ষেত্রে সরব পাঠ ও নীরব পাঠ,— দুই-ই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা ও সাহিত্যের ব্যবহার ও উপলব্ধি অনেকাংশে নির্ভর করে পাঠের উপর। কাজেই সরব পাঠ ও নীরব পাঠের আলোচনা প্রসঙ্গে আদর্শ পাঠের বিশেষত্বগুলি আলোচনা করা দরকার। কারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সরবপাঠ ও নীরব পাঠ শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ পাঠের বিশেষত্বগুলি যাতে তারা যথাযথভাবে অর্জন করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বগুলিতে দক্ষতা অর্জন ক'রতে পারলে তবেই তাদের ভাষা-শিক্ষাগ্রহণ সফল ও সার্থক হবে। তাই আদর্শ পাঠের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। এগুলি হ'ল ;—

আদর্শ পাঠের বিশেষত্বগুলির গুরুত্ব

॥ এক ॥ নির্ভুলতা (Accuracy) ঃ

নির্ভুল ও সঠিকভাবে পাঠ করাই হল আদর্শ পাঠের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। মূল যে রচনা বা লেখা থেকে পাঠ হ'চ্ছে, তা সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে পড়তে হবে। সরব পাঠে উচ্চারণ নির্ভুল হবে, মূল রচনার কোন শব্দ বাদ যাবে না, মূল রচনার কোন বিকৃতি হবে না, শব্দের আদিতে ঝোঁক পড়বে। শান্ত, ছন্দোময়, স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে ভাবের নিবিড় অনুভূতি সরব পাঠের মাধ্যমে চমৎকার ও নির্ভুলভাবে প্রকাশিত হবে। এক্ষেত্রে যতিচিহ্ন ও ছন্দের উপর গুরুত্ব দিতে হবে,—অর্থাৎ নির্ভুল পাঠ হবে যতিচিহ্ন ও ছন্দ অনুযায়ী। নীরব পাঠেও সতর্কভাবে মূল রচনাকে অনুসরণ ক'রে সঠিকভাবে নীরবে পড়তে হবে। এক্ষেত্রে কোন শব্দ ছেড়ে গেলে বা দৃষ্টিতে বিভ্রম ঘটলে অর্থের উপলব্ধি নীরব পাঠে ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রতে পারে। সরব পাঠে বা নীরব পাঠে নির্ভুলভাবে পাঠ করা তাই আদর্শ পাঠের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে রক্ষা না ক'রলে অর্থের উপলব্ধিতে ভুল হবে ;—যে উদ্দেশ্যে ভাষা ও সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক পাঠের ব্যবস্থা, সেই লক্ষ্য ব্যাহত হবে।

(১) নির্ভুলতা

॥ দুই ॥ গতি (Speed) ঃ

পাঠের গতি হ'ল আদর্শ পাঠের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভাষা, কাব্য ও সাহিত্যের বিষয়-পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা কত কম সময়ে কত দ্রুত কোন একটি বিষয় পাঠ ক'রে তার বিষয়বস্তু যথাযথভাবে গ্রহণ ক'রতে পারে, তা লক্ষ্য রাখতে হবে। পাঠের গতি শিক্ষার্থীদের বয়স, শ্রেণী ও মানসিকতা অনুযায়ী দ্রুত থেকে দ্রুততম হবে। কম বয়সে শিক্ষাগ্রহণের প্রাথমিক স্তরে এই গতি থাকে খুবই শ্লথ, কিন্তু বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই গতিকেও ক্রমশঃ দ্রুত ক'রতে হবে। কম সময়ে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত একটি বিষয়ে অধ্যয়নই হ'ল এর আসল কথা। এর জন্য চাই পাঠের অভ্যাস (*study habit*), পাঠের দক্ষতা

(২) গতি

(*study skill*), মানসিক একাগ্রতা ও ইন্দ্রিয়গুলির দ্রুত সঞ্চালন-ক্ষমতা। তবে কেবলমাত্র গতির কথা চিন্তা ক'রে পাঠের আয়ত্তীকরণ ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে চলবে না।

॥ তিন ॥ উপলব্ধি (Comprehension) :

পড়ে আয়ত্তীকরণ ও উপলব্ধি করা আদর্শ পাঠের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভাষা ও সাহিত্যের কোন একটি বিষয় পাঠ ক'রে তার বিষয়বস্তু, সাহিত্য-গুণ, শিল্পমণ্ডন-কলা, ধ্বনি ও রস, সৌন্দর্যচেতনা, শব্দ ও বাক্য বিন্যাস, রূপনির্মিতি প্রভৃতি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি ক'রতে হবে। কাব্য ও সাহিত্যের আধার হ'চ্ছে সহৃদয় পাঠকের মন। মনের অনুভূতির তন্ত্রে তন্ত্রে কাব্য-সাহিত্যের অনুরণন এক তীব্র আনন্দময় উপলব্ধি সৃষ্টি ক'রবে, তবেই কাব্য-সাহিত্যপাঠ সার্থক হবে।

(৩) উপলব্ধি

॥ চার ॥ অভিব্যক্তি (Expression) :

কাব্য-সাহিত্যপাঠের মধ্য দিয়ে যে অনুভূতি ও উপলব্ধি ঘটে, বিশেষ ক'রে সরব পাঠের মধ্য দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ বা অভিব্যক্তি হয়। সরব পাঠে পাঠকের কণ্ঠস্বরের শিল্পচাতুর্য ও মাধুর্যের মধ্য দিয়ে কাব্য-সাহিত্যের বিষয়বস্তু, ছন্দ, ধ্বনি ও রসের অভিব্যক্তি সম্ভবপর হয়। ফলে, অনেক সময় ব্যক্তির প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ (*Instinct and Emotion*)-জনিত অনেক মানসিক জটিলতা সুষ্ঠু ও সামাজিক খাতে প্রবাহিত হ'য়ে ব্যক্তির চিত্তবৃত্তির উদ্‌গতি সাধন করে। সাহিত্য-পাঠের সূক্ষ্ম ও তীব্র অনুভূতি নীরব পাঠেও অনেক সময় ব্যক্তির মুখমণ্ডলের শান্তশ্রী ভাবের মধ্য দিয়ে প্রতিমূর্ত হ'য়ে উঠে।

(৪) অভিব্যক্তি

সুসংহত পাঠ ও বিস্তৃত পাঠ
(Intensive and Extensive Reading)

কাব্য-সাহিত্যের এমন কতকগুলি অংশ থাকে, সেগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিবিড় ও সুসংহত পাঠ ক'রতে হয়। এই সব ক্ষেত্রে পাঠের গতি (*speed*) বেশী হবে না। ধীরে ধীরে সমগ্র মানসিক একাগ্রতা নিয়ে নিবিড় অনুভূতিময় কাব্য-সাহিত্যচর্চার প্রয়োজন আছে। সেক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়ের বিষয়বস্তু, ধ্বনি-রস, ছন্দ-অলংকার, কাব্য-সুষমা প্রভৃতিকে সম্পূর্ণভাবে আস্বাদন করার প্রচেষ্টা করা হয়,—ব্যক্তিসত্ত্বা ঐ পাঠের মধ্যে ডুবে যায়। একে **সুসংহত পাঠ (Intensive Reading)** বলে। বিদ্যালয়ে *Text Book*-এর বিভিন্ন অংশ শিক্ষার্থীরা যাতে সুসংহতভাবে পাঠ করে, তার জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে। কিন্তু কাব্য-সাহিত্যের এমন কতকগুলি অংশ আছে, যেগুলির আয়তন ব্যাপক, খুব একাগ্রভাবে সমস্ত ব্যক্তিসত্ত্বা নিয়োজিত ক'রে পড়বার প্রয়োজন নেই ;—প্রয়োজন সাধারণ ও হাল্‌কাভাবে বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করা ও সাহিত্য-সৌন্দর্যের আস্বাদন করা,—সেক্ষেত্রে পাঠের দ্রুততার দিকে বেশী লক্ষ্য দিতে হয়। উপন্যাস

সুসংহত পাঠ ও বিস্তৃত পাঠ

প্রভৃতি বিষয়কে এইভাবে পাঠ করা হয়, দ্রুত পঠনের (*Rapid Reading*) বিষয়-গুলিও এর মধ্যে পড়ে। একে **বিস্তৃত পাঠ (Extensive Reading)** বলে। কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই উভয়বিধ পাঠেরই প্রয়োজন ও গুরুত্ব আছে।

।। অনুশীলনী ।।

১। "পাঠ ত্রিবিধ—চর্বনা (critical-appreciation), স্বাদনা (Appreciation), আয়ত্তীকরণ (Comprehension)।"
এই তিন জাতীয় পাঠকে কিভাবে পৃথক করিবেন তাহা দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যাখ্যা করিয়া দিন। (কলি. বিশ্ব, বি টি ১৯৫৯)

২। 'ভাষা-শিক্ষার জন্য যেমন নীরব পাঠের তেমনি সরব আবৃত্তিরও আবশ্যকতা আছে।'—এই উক্তি সম্পর্কে-সংক্ষেপে আপনার মন্তব্য প্রমাণ করুন এবং শিক্ষাদানের কিরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব, তাহাও নির্দেশ করুন। (কলি. বিশ্ব, বি. টি ১৯৬৫)

৩। ভাষা-শিক্ষায় সরব পাঠ ও নীরব পাঠের যথাযথ স্থান নির্দেশ করুন। (কলি. বিশ্ব, বি. টি. ১৯৬৭) ; উত্তর বঙ্গ বিশ্ব, বি., টি, ১৯৭০)

৪। পঠনের প্রয়োজনীয়তা কি ? ভাষা-শিক্ষার সরব ও নীরব পঠনের যথাযথ স্থান নির্দেশ করুন এবং পঠন শিক্ষাদানের কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, তাহাও বিবৃত করুন। (কলি. বিশ্ব., বি এড. ১৯৭১)

৫। সরব-পঠন ও নীরব-পঠনের তুলনামূলক আলোচনা করুন। কাব্য-পাঠে কোন্‌টি বেশী উপযোগী ? যুক্তিসহ নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করুন। (উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৮)

৬। ছাত্রদের পঠনশক্তি-বিকাশের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন ? এই প্রসঙ্গে বাংলা গদ্য পাঠদানের পদ্ধতি বিবৃত করুন। (উত্তর বঙ্গ বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৯)

৭। সরব-পাঠ ও নীরব-পাঠের মধ্যে পার্থক্য কোন্‌খানে ? পাঠদানকালে কোন্‌টি কখন কিভাবে ব্যবহার করিবে, দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা কর। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড, ১৯৭০)

৮। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সরব পাঠ ও নীরব পাঠের স্থান কতখানি ? উভয় ব্যাপারের জন্য আমরা কি ধরনের শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করিব ? (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৭২)

৯। সাহিত্য-পাঠনে সরব পাঠ ও নীরব পাঠের উপযোগিতা নির্দেশ করুন। (কলি. বিশ্ব., এড. ১৯৭৩)

১০। পঠন কয় প্রকার সে সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত সহ একটি প্রবন্ধ রচনা করুন, এবং ভাষা-শিক্ষায় সরব পাঠ ও নীরব পাঠের যথাযথ স্থান নির্দেশ করুন। (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৭২)

১১। সাহিত্য-পাঠনে স্বাদনা (appreciation) ও বিচার-বিশ্লেষণ (critical appreciation) এর প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব, বি. এড. ১৯৭৪)

১২। ভাষা-শিক্ষায় পঠনের গুরুত্ব কতখানি এবং এই প্রসঙ্গে সরব পঠন ও নীরব পঠনের উপযোগিতা-ই বা কতদূর একজন ভাষা-শিক্ষকরূপে আপনি প্রশ্নটির উপর আলোকপাত করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৫)

১৩। সরব পাঠ ও নীরব পাঠের উপযোগিতা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৭)

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা গদ্যের শ্রেণী-বিভাগ
ও
গদ্য-শিক্ষাদানের পদ্ধতি

(Types of Bengali Prose ; Methods of Teaching)

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই বাংলা-গদ্যের যাত্রা শুরু। বিদেশীদের প্রচেষ্টাতেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূচনা। খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে ও ব্রিটিশ প্রশাসনযন্ত্রকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আমলা ও কেরানী সৃষ্টির জন্য বিদেশীদের দেশীয় ভাষার উন্নয়নের প্রচেষ্টা ; এবং সেই সুযোগেই বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূচনা। বাংলা কাব্যসাহিত্য দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য-মণ্ডিত হলেও বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস বেশী দিনের নয়। কিন্তু তা হলেও বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ সার্থক গদ্যশিল্পীদের প্রতিভার আলোকে বাংলা গদ্য-সাহিত্য আজ রীতিমত সমৃদ্ধ। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ-রচনা, ভ্রমণকাহিনী, আত্মজীবনী, পত্রসাহিত্য প্রভৃতি শাখা নিয়েই বাংলা গদ্য-সাহিত্য। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে এগুলির পৃথক পৃথক আলোচনা প্রয়োজন।

বাংলা গদ্যসাহিত্য

উপন্যাস
(Novel)

উপন্যাসের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ। দেশী ও বিদেশী সাহিত্যে এত বিবিধ ধরনের উপন্যাস আছে যে, এককথায় উপন্যাসের সংজ্ঞা দেওয়া কষ্টকর। লেখকের বলিষ্ঠ জীবনদর্শন (*Philosophy of life*) ও জীবন-জিজ্ঞাসা (*Criticism of life*) হ'ল উপন্যাসের ভিত্তিভূমি। লেখকের জীবনদর্শন ও অনুভূতির বিশ্লেষণই (*Analysis*) হল সার্থক উপন্যাস। উপন্যাসের একটি গল্পরস থাকে, তাকে বলে আখ্যান (*Plot*)। এই আখ্যানভাগ খুব সুসংবদ্ধ হবে ; এই কাহিনীর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক (*cause and effect relationship*) থাকবে। ঘটনা থেকে চরিত্র সৃষ্টি হবে। চরিত্রগুলি যথাযথভাবে বিশ্লেষিত হবে, চরিত্রগুলির কথোপকথন উপন্যাসের মধ্যে থাকতে বাধা নেই। আখ্যানভাগের বিস্তার, চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতি সমস্ত কিছুর মধ্যে লেখকের বক্তব্য, উপস্থাপন-কৌশল, বাণীভঙ্গী ও *Style* উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করে। উপন্যাসের মধ্যে সমাজ-চেতনা ও বাস্তবতা থাকা চাই। কোন কোন উপন্যাসের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বর্তমান থাকে। যুগচেতনা ও যুগমানস উপন্যাসের মধ্যে প্রতিফলন হয়। লেখকের জীবনদর্শনের উপরই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক লেখক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "গল্প বলিবার বিশেষ একটি ভঙ্গীকে—গল্পের মধ্য দিয়া মানুষের প্রকৃত ছবি আঁকিবার চেষ্টা, ঘটনা-সংঘাতে তাহার

উপন্যাসের সংজ্ঞা

চরিত্র-স্ফুরণের উদ্‌যোগ, সামাজিক মানুষের মধ্যে যে অহরহ একটা আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তাহারই সূক্ষ্ম আলোচনা ও এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়া মনুষ্য-জীবন সম্বন্ধে একটা বৃহত্তর ব্যাপকতর সত্যকে ফুটাইয়া তোলা—ইহাকেই উপন্যাস বলা যাইতে পারে।”

॥ উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ ॥

বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস ও তার শ্রেণী-বিভাগ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে,—

॥ এক ॥ ঐতিহাসিক উপন্যাস :– অতীত ইতিহাসের কাহিনীকে অবলম্বন করে লেখক যখন উপন্যাস রচনা করেন, তখন তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কাল্পনিক ঘটনার সংমিশ্রণ করবার অধিকার লেখকের থাকে। 'রাজসিংহ' (বঙ্কিমচন্দ্র), 'বঙ্গবিজেতা' (রমেশচন্দ্র), 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' (রবীন্দ্রনাথ), 'কেরী সাহেবের মুন্সী' (প্রমথনাথ বিশী) প্রভৃতি হ'ল ঐতিহাসিক উপন্যাস।

॥ দুই ॥ সামাজিক উপন্যাস :– সমাজকে অবলম্বন ক'রে তার জটিলতা নিয়ে যে উপন্যাস, তাকে সামাজিক উপন্যাস বলে। রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়বস্তু অবলম্বন ক'রেই সামাজিক উপন্যাস। সামাজিক উপন্যাসের সুযোগ সুবিশাল। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (বঙ্কিমচন্দ্র), 'চোখের বালি' (রবীন্দ্রনাথ), 'ঘরে বাইরে' (রবীন্দ্রনাথ), 'গৃহদাহ' (শরৎচন্দ্র), 'চরিত্রহীন' (শরৎচন্দ্র), গণদেবতা' (তারাশংকর), 'কলকাতার কাছেই' (গজেন্দ্রনাথ মিত্র) প্রভৃতি বাংলা সামাজিক উপন্যাসের উদাহরণ।

॥ তিন ॥ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস (Psychological Novel) :— এই জাতীয় উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি-বিন্যাস উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই জাতীয় উপন্যাসের লেখক।

॥ চার ॥ কাব্যোপন্যাস :—লেখকের কাব্যদৃষ্টি যখন জীবনদর্শনকে স্নিগ্ধ, সুন্দর ও মধুর ক'রে তোলে তখন কাব্যোপন্যাস সৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' একটি সার্থক কাব্যধর্মী উপন্যাস।

॥ পাঁচ ॥ গোয়েন্দা-উপন্যাস :– এই জাতীয় উপন্যাসের সাহিত্যগুণ কম ; কিন্তু এর পাঠক-সংখ্যা সুবিপুল। খুন, জখম, আত্মহত্যা, খানাতল্লাস, অপরাধ, পুলিশ প্রভৃতি নিয়ে এই জাতীয় উপন্যাস বেশ লোমহর্ষক। শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত কয়েকটি সার্থক গোয়েন্দা-উপন্যাস রচনা করেছেন।

॥ ছয় ॥ হাস্যরসাত্মক উপন্যাস :– জীবনের বা ভাবকল্পনার অসংগতির দিককে কেন্দ্র ক'রে লেখক হাস্যরসাত্মক উপন্যাস সৃষ্টি করেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় উপন্যাসের সার্থক লেখক।

॥ সাত ॥ আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস :– এই জাতীয় উপন্যাসে পাত্রপাত্রীগণ নিজের কথা নিজেই বলে যায় এবং তার মাধ্যমেই চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনা-বিন্যাস রচিত

হয়। 'রজনী' (বঙ্কিমচন্দ্র), 'ঘরে বাইরে' (রবীন্দ্রনাথ), 'চতুরঙ্গ' (রবীন্দ্রনাথ) এই জাতীয় উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'ও আত্মজীবনীর স্পর্শ আছে।

॥ **আট** ॥ **খণ্ডোপন্যাস** ঃ—আয়তন ছোট হয়েও যে রচনাগুলি সুসংবদ্ধভাবে উপন্যাসের গুণাবলী সমৃদ্ধ হয়, তাকে খণ্ডোপন্যাস বলা হয়। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়,' 'চতুরঙ্গ', 'মালঞ্চ' প্রভৃতি এই জাতীয় উপন্যাস।

॥ **নয়** ॥ **অন্যান্য উপন্যাস** ঃ—আরও অন্যান্য অনেক ধরনের উপন্যাস আছে। বিপ্লবী আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে **বৈপ্লবিক উপন্যাস** (শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', বনফুলের 'অগ্নি') ; পত্রের মাধ্যমে আখ্যান-বিস্তারের মধ্য দিয়ে **পত্রোপন্যাস** (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ক্রৌঞ্চমিথুন') ; কোন মতবাদ-প্রচারমুখী **উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস** (বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী') ; বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী অবলম্বনে রচিত **বীরত্ব-ব্যঞ্জক উপন্যাস** (মণীন্দ্রলাল বসুর 'অজয়কুমার') ; প্রচলিত কোন গাথা বা জনশ্রুতির উপর নির্ভর ক'রে লেখা **কাহিনী-উপন্যাস** (দীনেশ সেনের 'শ্যামল ও কজ্জল') ; কোন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের উপর লেখা **আঞ্চলিক উপন্যাস** (তারাশংকরের 'ধাত্রীদেবতা' ও 'কালিন্দী') ইত্যাদি উপন্যাস বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী ক'রেছে।

ছোটগল্প
(Short stories)

গল্প শুনবার বাসনা মানুষের চিরন্তন। গল্পের প্রতি তাই সকলেরই একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। ছোটগল্পই সাহিত্যের সর্বাধিক সজীব শাখা। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ছোটগল্প আধুনিক সংযোজন। আকারে ছোট গল্পই ছোট-গল্প নয়। ছোটগল্পের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। *Hudson*-এর ভাষায়, "*A short story must contain one and only one informing idea and that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method.*" রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—

"ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ ;
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে না হইল শেষ।"

('বর্ষাযাপন'—সোনার তরী)

B. Matthews-এর মতে, "*The short story by its effect a certain unity of impression which set it apart from other kinds of fiction.*" নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, "ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতিজাত (*impression*) একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য-কাহিনী যার একতম বক্তব্য কোন ঘটনা বা কোন পরিবেশ বা কোনও মানসিকতাকে অবলম্বন ক'রে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।" ছোটগল্পে ঘটনা, মনস্তত্ত্ব বা চরিত্রগত কোন একটি সমস্যারই সংকটরূপ দেখানো হবে। ছোটগল্পে লেখকের একটি বিশেষ ভাব-কল্পনা বা *idea* মূর্ত হয়ে ওঠে। ঘটনার নাটকীয়তা, দ্রুতগতি ও সুসংবদ্ধতা ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছোটগল্পের মধ্যে লেখকের সংবেদনশীল মানসিকতা প্রতিফলিত হয়। একটি উৎকণ্ঠা (*Suspense*) ও চরম মুহূর্ত (*climax*) ছোটগল্পে অনিবার্যভাবে উপস্থিত থাকবে। গল্পের শেষে একটা '*jerk*' বা 'আঘাত' পাঠক-মনে প্রভাব বিস্তার ক'রবে। তবে প্রতীতির সমগ্রতা (*unity of impression*) ছোটগল্পের প্রধান পালনীয় শর্ত। সমাজ, জীবন, দর্শন, চরিত্র, ঘটনা ইত্যাদি সম্পর্কিত যে প্রতীতি লেখক তাঁর অনুভূতি-প্রবণ মন দিয়ে গ্রহণ করেন, তারই ব্যঞ্জনাধর্মী প্রকাশ ছোটগল্পে লক্ষ্য করা যায়।

ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

বিষয় ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ছোটগল্পকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হ'য়ে থাকে। সেগুলি হ'ল,—

॥ এক ॥ **সামাজিক ছোটগল্প** রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার'; শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ'; শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি', 'বধূবরণ' ইত্যাদি।

॥ দুই। **প্রেম-বিষয়ক ছোটগল্প** - রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়', 'একরাত্রি', 'শেষ রাত্রি'; মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সর্পিল', 'বৃহত্তর', 'মহত্তর' ইত্যাদি।

॥ তিন ॥ **অতিপ্রাকৃতমূলক ছোটগল্প**—রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে'; বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাসি', 'অভিশপ্ত'; শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মর্কট' ইত্যাদি।

॥ চার ॥ **ঐতিহাসিক ছোটগল্প**—রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া'; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রত্নতত্ত্ব', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৃৎ প্রদীপ', 'চন্দন মূর্তি' ইত্যাদি।

॥ পাঁচ ॥ **সাংকেতিক ছোটগল্প** - রবীন্দ্রনাথের 'একটি আষাঢ়ে গল্প', 'তোতা কাহিনী'; শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মরু ও সংঘ' ইত্যাদি।

॥ ছয় ॥ **মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প**—রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' ইত্যাদি।

॥ সাত ॥ **হাস্যরসাত্মক ছোটগল্প**—রবীন্দ্রনাথের 'অধ্যাপক', 'রাজটিকা'; প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'বলবান জামাতা', 'রসময়ীর রসিকতা'; রাজশেখর বসুর 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'কচিসংসদ' ইত্যাদি।

॥ আট ॥ **গার্হস্থ্যমূলক ছোটগল্প**—রবীন্দ্রনাথের 'ব্যবধান', 'মধ্যবর্ত্তিনী'; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'খেলা', 'ঠেলাগাড়া'; বনফুলের 'তিলোত্তমা' ইত্যাদি।

॥ নয় ॥ **মানুষ ও প্রকৃতির প্রেমমূলক ছোটগল্প**—রবীন্দ্রনাথের 'তারাপদ', 'অতিথি', 'শুভা'; শরৎচন্দ্রের 'মহেশ'; মনোজ বসুর 'বন-মর্মর' ইত্যাদি।

॥ দশ ॥ **বাস্তবনিষ্ঠ ছোটগল্প**—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক', 'নমুনা'; শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'নারীমেধ', 'বধূবরণ'; প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গারঙ্গ' ইত্যাদি।

॥ এগারো ॥ **অন্যান্য ছোটগল্প**—এ ছাড়াও উদ্ভট ছোটগল্প (বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'নারায়ণী যোগ'), বৈজ্ঞানিক ছোটগল্প (প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শয়তানের দ্বীপ', সুবোধ ঘোষের 'সুতরাং'), ভৌতিক গল্প, ডিটেকটিভ গল্প, রাজনৈতিক গল্প প্রভৃতি ছোট ছোট শাখায় ছোটগল্পকে বিভক্ত করা যায়।

নাটক
(Drama)

নাটক হ'ল দৃশ্যকাব্য। *M. Boulton*-এর ভাষায় ***"It is a literature that walks and talks before our eyes."*** নাটকের কুশীলবগণ অভিনয়ের মাধ্যমে শিল্প-সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন; নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমেই জীবনের কথা প্রতিফলিত হয়। *F. Drew*-র মতে ***"Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre."*** সনাতনপন্থী নাট্য-সমালোচকগণ **নাটকের তিনটি ঐক্যের** (*Unity*) উপর জোর দিয়েছেন; (১) সময়ের ঐক্য (*Unity of Time*), (২) স্থানের ঐক্য (*Unity of Place*), (৩) ঘটনার ঐক্য (*Unity af Action*)। নাটকের মধ্যে ঘটনার ঐক্যের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। নাটকীয়তা (*Dramatic Action*) হ'ল নাটকের প্রাণ। নাটকীয় দ্বন্দ্ব (*conflict*) নাটককে দুর্বার গতি দান করে। ঘটনার দ্বন্দ্ব বা অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটককে সমৃদ্ধ করে। নাটকে একটি আখ্যানভাগ (*plot*) থাকে। তার উপর ভিত্তি ক'রে নাটকীয়তা (*Drcmatic Action*) সৃষ্টি করা হয় বিভিন্ন কুশীলবদের পরস্পর সংলাপ (*Dialogue*) ও বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সংলাপ হ'ল নাটকের প্রাণ। নাটকের মধ্যে নাট্যকারের বলিষ্ঠ জীবনবোধ, জীবনদর্শন ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়। নাটকে মূল কাহিনীর সঙ্গে উপ-কাহিনীও (*Parallel Plot*) থাকে। কোথাও কোথাও পরিবেশ-সৃষ্টি ও অভিনয়ের নির্দেশও থাকে। প্রাচীন নাটকে স্বগতোক্তি থাকতো। নাটককে প্রধানতঃ পাঁচটি অঙ্কে ভাগ করা হয়। এই ভাগ হয় নাটকীয়তা অনুযায়ী;—

নাটকের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

(১) প্রারম্ভ (*Exposition*)
(২) প্রবাহ (*Growth of Action*)
(৩) উৎকর্ষ (*The climax*)

(৪) গ্রন্থিমোচন (*Falling Action*)
(৫) উপসংহার (*Catastrophe*)

বর্তমানে নাটকে পঞ্চাঙ্কের এই রীতি সকলে মেনে চলেন না। তবে দ্বন্দ্ব (*conflict*) বা নাটকীয়তা (*Dramatic Action*) যে নাটকের প্রাণ, সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক নেই। দীর্ঘকাল ধ'রে নাটক নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হ'য়েছে। নাটক আজ তাই এক বলিষ্ঠ শিল্পকলা। *Worsfold*-এর ভাষায়, ***"The drama is a composite art in which the author, the actor and the stage-manager all combine to produce the total effect."*** নাট্যরচনা, অভিনয়, মঞ্চ-পরিকল্পনা, নেপথ্য-সংগীত, আলোকসম্পাত, সুপরিচালনা প্রভৃতির সাহায্যে নাটক সুসংবদ্ধ হয়। কোন কোন নাটকে সংগীত একটি প্রধান স্থান অধিকার ক'রে থাকে। বর্তমানে *reading drama*-র গুরুত্বও কম নয়। নাটক প্রধানতঃ তিন প্রকার,—

(১) ট্র্যাজিডি (***Tragedy***)
(২) কমেডি (***Comedy***)
(৩) প্রহসন (***Farce***)

॥ এক ॥ ট্র্যাজিডি (Tragedy) :

ট্র্যাজিডিকে বিষাদাত্মক বা বিয়োগাত্মক নাটক বলে আখ্যায়িত করা ঠিক হবে না। তবে ট্র্যাজিডি অবশ্যই বিষাদাত্মক হবে। ট্র্যাজিডি হবে নায়ক-প্রধান। এই নায়ক কোন বিশিষ্ট বা খ্যাতিমান ব্যক্তি। ব্যক্তিগত দুর্বলতা, ভুলভ্রান্তি বা অদৃষ্টের পরিহাসে নায়ক যখন অন্তর্দ্বন্দ্ব-বহির্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে ক্রমশঃ বিষাদাত্মক পরিণতির দিকে যায়, তখন তাকে *Tragedy* বলে। নায়কের গুণাবলী, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঘটনাবিন্যাস ও বিয়োগাত্মক পরিণতি দর্শক-চিত্তকে আকৃষ্ট করে। *Tragedy* তাই নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। *Aristotle*-এর ভাষায়, *"Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action not of narrative, through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions."* শ্রীশচন্দ্র দাশের ভাষায়, "রঙ্গমঞ্চে নায়ক বা নায়িকার গতিমান জীবনকাহিনী, দৃশ্য-পরম্পরা উপস্থাপিত করতঃ যে নাটক দর্শকের হৃদয়ে উদ্রিক্ত ভীতি ও করুণা প্রশমন করিয়া তাহার মনে করুণ রসের আনন্দ সৃষ্টি করে, তাহাই ট্র্যাজিডি।" 'কৃষ্ণকুমারী' (মধুসূদন দত্ত), 'নীলদর্পণ' (দীনবন্ধু মিত্র), 'প্রফুল্ল' (গিরিশচন্দ্র ঘোষ), 'নূরজাহান' (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) প্রভৃতি বাংলাসাহিত্যের বিখ্যাত ট্র্যাজিডি।

ট্র্যাজিডির সংজ্ঞা ও স্বরূপ

॥ দুই ॥ কমেডি (Comedy) :

কমেডি হ'ল মিলনাত্মক নাটক। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন দিক্ যখন আনন্দোজ্জলভাবে নাটকের নায়ক-নায়িকার মিলন-মাধুর্যে পরিসমাপ্তি লাভ করে, তখন তাকে বলে কমেডি। কমেডি অপেক্ষাকৃত লঘু রচনা। *Aristotle*-এর ভাষায়, *'A comedy is an imitation of men worse than the average; worse, however, not as regards any and every sort of fault, but only as regards particular kind, the Ridiculous, which is a species of ugly. The ridiculous may be defined as a mistake or deformity not productive of pain or harm to others"* কমেডিতে থাকে হাস্যরসের প্রাধান্য। কমেডির নায়ক সামান্য বাধা অতিক্রম ক'রে সাফল্য অর্জন করে এবং নায়িকার সঙ্গে মধুর মিলনের মধ্যে কমেডির পরিসমাপ্তি লাভ করে। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী,' 'বিয়ে পাগলা বুড়ো,' রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন', চিরকুমার সভা', অমৃতলাল বসুর 'কৃপণের ধন', প্রমথনাথ বিশীর 'ঘৃতং পিবেৎ' ইত্যাদি বাংলা নাটকের বিখ্যাত কমেডি।

কমেডিক সংজ্ঞা ও স্বরূপ

॥ তিন ॥ প্রহসন (Farce) :

প্রহসন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কৌতুকপ্রধান নাটক। প্রহসন হ'ল সমাজের কুকীর্তি শোধনার্থে রহস্যজনক ঘটনা সংবলিত হাস্যরস-প্রধান ছোট নাটক। প্রহসনের ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-সৃষ্টিতে অনেকটা অতিরঞ্জন লক্ষ্য করা যায়। লেখকের কোন বলিষ্ঠ জীবনদর্শন প্রহসনের মধ্যে প্রতিফলিত হয় না। মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু', 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পুনর্জন্ম', 'কল্কি অবতার', অমৃতলাল বসুর 'তাজ্জব ব্যাপার', রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট প্রহসন।

প্রহসন কাকে বলে ?

॥ নাটকের শ্রেণীবিভাগ ॥

ট্র্যাজিডি, কমেডি ও প্রহসন প্রভৃতি নাটককে **অন্যভাবেও** শ্রেণীবিভাগ করা যায়। সেগুলি হ'ল—

॥ এক ॥ ঐতিহাসিক নাটক (Historical Drama) : ঐতিহাসিক কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে যখন নাট্যসৃষ্টি করা হয় এবং নাটকের *Plot* যখন ইতিহাস থেকে গ্রহণ করা হয়, তখন তাকে ঐতিহাসিক নাটক বলে। মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণ-কুমারী', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান', 'নূরজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবার-পতন' প্রভৃতি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক।

॥ দুই ॥ পৌরাণিক নাটক (Mythical Drama) : রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ থেকে *Plot* সংগ্রহ ক'রে ধর্ম, অতিপ্রাকৃত (***Supernatural***

elements), ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যখন নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হয়, তখন তাকে পৌরাণিক নাটক বলে। পৌরাণিক নাটকে ধর্মগত সিদ্ধরসকে অবলম্বন করা হয়। গিরিশচন্দ্রের 'জনা', 'বিল্বমঙ্গল'; দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'; ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম', 'নরনারায়ণ'; মন্মথ রায়ের 'কারাগার' প্রভৃতি হ'ল প্রখ্যাত বাংলা পৌরাণিক নাটক।

॥ তিন ॥ **নৃত্যনাট্য (Dance Drama)**: নৃত্য-অভিনয়-গান-সংলাপ ইত্যাদি যে নাটকে লক্ষ্য করা যায়, তাকে নৃত্যনাট্য বলে। নৃত্যনাট্যে কুশীলবগণ নৃত্যের মাধ্যমে অভিনয় ক'রে ভাব প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' একটি উৎকৃষ্ট নৃত্যনাট্য।

॥ চার ॥ **সাংকেতিক নাটক (Symbolic Drama)**: আধুনিক কালের জীবন-সমস্যা, যুগজীবন যখন রূপক ও সাংকেতিকতার সাহায্যে নাট্যরূপ লাভ করে, তখন তাকে সাংকেতিক নাটক বলে। মানব মনের সূক্ষ্মতম অংশ, অনুভূতি ও দ্বন্দ্ব-গুলি সাংকেতিক নাটকে চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর,' 'রাজা' এই জাতীয় নাটক।

॥ পাঁচ ॥ **অতিনাটক (Melodrama)**: অতিনাটকে কাল্পনিক বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে অস্বাভাবিক ঘটনা-বিন্যাস, অলৌকিক পরিবেশ-সৃষ্টি, আকস্মিক ও লোমহর্ষক পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। অতিনাটকে আছে বিস্ময়কর ঘটনার প্রাচুর্য;—সমাপ্তিও সেই ধরনের। গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল', 'জনা'; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান'; রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' প্রভৃতি এই জাতীয় অতিনাটক। অধিকাংশ বাংলা নাটকে অতিনাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

॥ ছয় ॥ **গীতিনাট্য (Lyrical Drama)**: যে নাটকে সংগীতই প্রাণ, তাকে 'গীতিনাট্য' বলা হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা'; রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা', 'বাল্মীকি প্রতিভা'; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ধ্যানভঙ্গ' প্রভৃতি এই জাতীয় নাটক।

॥ সাত ॥ **চরিত-নাটক (Biographical Drama)**: ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত চরিত্রকে অবলম্বন ক'রে ঘটনাবিন্যাস ও নাট্যসৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন', 'বিদ্যাসাগর'; মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল', 'মহারাজ নন্দকুমার' প্রভৃতি হ'ল চরিত-নাটক। চরিত-নাটকে বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবনী অবলম্বন ক'রে নাট্য সৃষ্টি করা হয়।

॥ আট ॥ **সমস্যা-প্রধান নাটক (Thesis Drama)**: সমাজ-জীবনের সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে লেখক যখন তাঁর বক্তব্য, মতবাদ ও মানসিকতা পরিব্যক্ত করেন, তখন তাকে সমস্যা-প্রধান নাটক বলে। সমস্যা-প্রধান নাটকে উদ্দেশ্যপ্রবণতা এসে যায়। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'; রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'মুক্তধারা'; গিরিশ ঘোষের 'বলিদান' ইত্যাদি এই জাতীয় নাটক।

॥ নয় ॥ **একাঙ্ক নাটক (One-act Play)**:—বিংশ শতাব্দীতে বাংলা কথা-সাহিত্যে যেমন ছোটগল্পের জোয়ার এসেছে, তেমনি নাটকের ক্ষেত্রেও পূর্ণাঙ্গ পঞ্চাঙ্ক

নাটকের পরিবর্তে একাংক নাটকের ঢেউ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে একাংক নাটকের অভিনয়-গোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক ; এ নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে। বনফুল, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য. রতনকুমার ঘোষ, শ্যামলতনু দাশগুপ্ত, স্বরূপ ব্রহ্ম প্রভৃতি হ'লেন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। একাংক নাটকের বাঁধন বেশ আঁটসাঁট ; নাট্যরস প্রথম থেকেই ঘনীভূত,—উপকাহিনীর স্থান নেই। একাংক নাটকে একটি বিশেষ পরিবেশকে গ্রহণ ক'রে একটি বিশেষ ভাবানুভূতিকে (Impression) নাট্যরূপ দান করা হয়। সাম্প্রতিক রাজনীতি, আধুনিক ঘটনা, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদিকে একাংক নাটকে সফলভাবে উপস্থাপিত ক'রবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রূপক ও সাংকেতিক একাংক নাটকও অনেক সংখ্যায় লক্ষ্য করা যায়।

॥ দশ ॥ বিমূর্ত নাটক (Abstract Drama) : কতকগুলি নাটক বিমূর্ত-ভাবকে অবলম্বন করে সুপরিকল্পিতভাবে রচিত হয়। এই জাতীয় নাটক আধুনিক যুগের সৃষ্টি। আধুনিক যুগের বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতা বিমূর্ত ভাবের মাধ্যমে নাটকে বিধৃত হয়। যুগধর্মের জীবন-জিজ্ঞাসা তীব্র প্রখরতায় নাটকের পরিমণ্ডলে এক বিমূর্ত লোক রচনা করে। বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ইত্যাদি বিমূর্ত নাটকের পর্যায়ে পড়ে।

॥ এগারো ॥ যাত্রা : 'যাত্রা' আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম। দেশে যাত্রাপাগল বহু মানুষ আছেন, যাত্রা-গোষ্ঠীও অনেক আছে। যাত্রার প্রাচীনত্ব অনস্বীকার্য। যাত্রায় অভিনয় অনেকটা স্থূল, নাটকের রচনাও সেই অনুযায়ী। অনেক অলৌকিক কাহিনী ও অবাস্তব কথা যাত্রার মধ্যে দেখা যায়। অতিনাটকীয়তা ও Over-acting যাত্রার অন্যতম সম্পদ্। তা হ'লেও যাত্রা আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয়। সাম্প্রতিক কালে যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। ব্রজেন দে, ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ, ভৈরব গাঙ্গুলী, শম্ভু বাগ, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, অমর ঘোষ, উৎপল দত্ত; শৈলেশ গুহ নিয়োগী প্রভৃতিরা হ'লেন যাত্রার পালাগান-রচনার সার্থক শিল্পী।

॥ বারো ॥ উপন্যাস-নাটক :—কতকগুলি সার্থক বাংলা উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেওয়া হ'য়েছে। শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' থেকে 'যোড়শী', 'দত্তা' থেকে 'বিজয়া', 'পল্লী-সমাজ' থেকে 'রমা' ; রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' থেকে 'বিসর্জন' ; তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' থেকে 'সরলা' (অমৃতলাল বসু) প্রভৃতি এই জাতীয় নাটকের উদাহরণ।

॥ তেরো ॥ গণ-আন্দোলনের নাটক :—বাংলা দেশে নবনাট্য-আন্দোলন ক্রমশঃ গণনাট্য-আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে। এই জাতীয় নাটকগুলি প্রচারমূলক, মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল সামাজিক অন্যায়, দারিদ্র্য ও শোষণের হাত থেকে মুক্তির পথ হিসেবে জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। পূর্ণাঙ্গ ও একাংক—এই দুই জাতীয় নাটকের মধ্যেই এখন গণ-আন্দোলনের বিষয়বস্তু লক্ষ্য করা যায়।

প্রবন্ধ ও রচনা
(Essays)

প্রবন্ধ ও রচনা সাধারণতঃ সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাহিত্য-তত্ত্বের বিচারে প্রবন্ধ ও রচনার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রবন্ধ ও রচনা বাংলা গদ্য-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান দু'টি শাখা।

॥ **এক** ॥ **প্রবন্ধ :**—'প্রবন্ধ' শব্দটির অর্থ হল 'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন'। বিষয়বস্তুর গৌরবই প্রবন্ধের প্রাণ। কোন তত্ত্ব বা তথ্যকে প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ধর্ম-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, মতবাদ প্রভৃতি হ'ল প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রবন্ধের মধ্যে বর্ণনার উচ্ছ্বাস নেই, আবেগ নেই। সাবলীল গতিতে তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে প্রবন্ধ রচিত হয়। **নির্লিপ্ত তন্ময়তাই (Objectivity) প্রবন্ধের প্রধান গুণ।**

প্রবন্ধ কাকে বলে ?

প্রবন্ধ পুরোপুরি বুদ্ধিধর্মী। বাংলা সাহিত্যে অনেক বিখ্যাত প্রবন্ধকার আবির্ভূত হ'য়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের সার্থক শিল্পী।

বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্যক্রমে (Curriculum) যে গদ্যাংশ (Prose piece) থাকে, তার মধ্যে অধিকাংশই প্রবন্ধজাতীয় রচনা।

॥ **দুই** ॥ **রচনা :** 'রচনা' হ'ল রসোত্তীর্ণ বাংলা গদ্য। সাহিত্যতত্ত্বের বিচারে রচনা প্রবন্ধের তুলনায় উৎকৃষ্ট। রচনাকে অনেকে 'রম্য রচনা' বা 'ব্যক্তিগত রচনা' (Personal Essay) ব'লে থাকেন। রচনায় বিষয়বস্তুর প্রাধান্য বেশী থাকে না। রচনার রস সম্ভোগ-ই বড় কথা। রচনায় বর্ণনার গুণ ও কৌশল প্রধান কথা। কি

রচনা কি ?

বলা হ'ল, তার থেকে কেমন ক'রে বলা হল, তাই রচনার প্রধান গৌরব। রচনা সর্বপ্রকারের বন্ধনমুক্ত। রচনায় হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল-করা চিত্তের প্রকাশ ; **নিবিড় মন্ময়তাই (Subjectivity) রচনার প্রাণ।** বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ', রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ও 'পঞ্চভূত', প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবলের হালখাতা', যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত', সৈয়দ মুজতবা আলির 'পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতি হল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রম্য রচনা। রচনার মধ্যে সাহিত্য-গুণই প্রধান। মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি যখন নির্লিপ্ত ও সাবলীলভাবে গদ্য-রচনার মাধ্যমে ধরা পড়ে, তখন তা হয় রচনা।

জীবনচরিত ও আত্মজীবনী
(Biography & Autobiography)

জীবনচরিত ও আত্মজীবনী বাংলা গদ্য-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ। ঐতিহাসিক তথ্য 'নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী', প্রকাশভঙ্গী জীবনচরিত ও আত্মজীবনীকে সমৃদ্ধ করে। যুগমানব ও মহাপুরুষের জীবনচরিত গদ্যরচনা হিসেবে স্বীকৃত হ'য়েছে। এ

জাতীয় রচনা বিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হ'লে শিক্ষার্থীরা নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র-গঠনের শিক্ষা পায়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিপুলকায় 'রবীন্দ্র-জীবনী'; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' 'পরমাপ্রকৃতি সারদামণি', 'ক্রুশবিদ্ধ যীশু'; ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধক 'চরিতমালা', ইন্দ্র মিত্রের 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি হ'ল প্রখ্যাত জীবনচরিত গ্রন্থ। আত্মজীবনীতে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ও আত্ম-অনুভূতির কথা থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়', জীবনস্মৃতি', ছেলেবেলা', বিদ্যাসাগরের 'আত্মচরিত', নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন', তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার সাহিত্যজীবন' প্রভৃতি হ'ল উৎকৃষ্ট আত্মজীবনী-গ্রন্থ। অনেক গদ্য-রচনায় স্মৃতিচারণ বা দিনপঞ্জী (Diary) প্রভৃতির ধরনও লক্ষ্য করা যায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জোড়াসাঁকোর ধারে' এই জাতের স্মৃতিচারণ।

জীবনচরিত ও আত্মজীবনী

ভ্রমণ-কাহিনী

ভ্রমণকাহিনী একদিকে শিক্ষামূলক, অন্যদিকে সাহিত্য-গুণমণ্ডিত। বিভিন্ন দুর্গম স্থানে ভ্রমণ ও লেখকের অভিযান, সৌন্দর্যদর্শন, অনুভূতি ইত্যাদির সার্থক সাহিত্যায়ন ভ্রমণ-কাহিনীকে সমৃদ্ধ করে। ভ্রমণ-কাহিনী প'ড়ে অনেক স্থানের তথ্য ও সামাজিক-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা যায়। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ', প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ও 'দেবতাত্মা হিমালয়'; রবীন্দ্রনাথের 'জাপান-পারস্যে', 'যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি'; অন্নদাশংকর রায়ের 'পথে প্রবাসে'; বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'তৃণাঙ্কুর' প্রভৃতি হ'ল প্রখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনী।

বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনী

পত্র-সাহিত্য

কাজের প্রয়োজনে ও ব্যবহারিক স্বার্থে মানুষ চিঠিপত্র লেখে। কিন্তু তার গণ্ডী অতিক্রম ক'রে পত্র যখন মনের অনুভূতির উচ্ছ্বাসকে বহন ক'রে নিয়ে যায়, তখন তা সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। শ্রেষ্ঠ পত্রলেখক জীবনের প্রয়োজন সিদ্ধ ক'রে পত্রকে সংবাদ-পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যেমন আমার ছবি আঁকা চিঠি লেখাও তেমনি, ঘটনার ডাক পিওন-গিরি করে না সে, নিজেরই সংবাদ সে নিজে।" পত্র-সাহিত্য তাই ভাব ও অনুভূতি-প্রধান। পত্র-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন, "যারা ভাল চিঠি লেখে তারা মনের জানালার ধারে বসে আলাপ করে যায়—তার কোন ভার নেই, বেগও নেই, স্রোত আছে। ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস।" ('পথে ও পথের প্রান্তে')। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র', 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'চিঠিপত্র' (বিভিন্ন খণ্ড) উৎকৃষ্ট পত্র-সাহিত্যের নিদর্শন।

পত্র সাহিত্য কি

॥ **প্রচলিত পাঠ্যক্রমে বাংলা গদ্য** ॥

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য যে পাঠ্যক্রম প্রচলিত আছে, তার মধ্যে প্রতিশ্রেণীর জন্যই গদ্য সাহিত্যের আসন পাকা। পঞ্চম শ্রেণীতে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা আধিকারিক 'কিশলয়' গ্রন্থ সংকলন ক'রেছেন। নবম ও দশম শ্রেণীর জন্যও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষে বিশ্বভারতী 'পাঠসংকলন' গ্রন্থ প্রকাশ ক'রেছেন। কিন্তু ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ নেই; বিভিন্ন বিদ্যালয় তাঁদের পছন্দ অনুসারে যে কোন একটি পুস্তককে পাঠ্যহিসেবে মনোনীত করেন। প্রতিটি শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তকেই (Text Book) বাংলা গদ্যের একটি সুনির্দিষ্ট স্থান আছে। তাছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট দ্রুত পঠনের (Rapid Reading) পুস্তকের মধ্যেও বাংলা গদ্য-সাহিত্য পাঠ্য থাকে; যেমন – রামায়ণী কথা, রাজর্ষি, জীবনস্মৃতি, কমলাকান্তের দপ্তর ইত্যাদি। বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বাংলা গদ্যের যে সব অংশ আছে, সেগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণী-বিভাগ করা যায়,—

বাংলা গদ্যের প্রচলিত পাঠক্রমের পর্যালোচনা

॥ **এক** ॥ **ছোটগল্প** –বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের কতক-গুলি সার্থক ছোটগল্প সংকলিত আছে। যেমন—'ছুটি', 'বলাই', 'রূপোকাকা" 'তোতাকাহিনী', 'আদরিণী', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' ইত্যাদি।

॥ **দুই** ॥ **উপন্যাসের অংশ** বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিকদের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের কিছু কিছু অংশ পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস থেকে 'বহুরূপী', 'নতুনদা' ও 'ইন্দ্রনাথ' অংশ বহু পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত আছে। তাছাড়াও 'দেবীচৌধুরাণী' 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি উপন্যাস থেকেও বহু অংশ সংকলিত হ'য়ে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে।

॥ **তিন** ॥ **নাটকের অংশ**—প্রখ্যাত উপন্যাসের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন পাঠ্য-পুস্তকে সংকলিত হ'য়েছে। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের গদ্যাংশগুলির মধ্যে সাধারণতঃ একটি নাটকের অংশ থাকে। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের প্রথম অংশ, 'মেবার পতন' ইত্যাদি নাটক থেকে বিভিন্ন অংশ সংকলিত হ'য়ে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে।

॥ **চার** ॥ **পৌরাণিক কাহিনী**—বেদ-পুরাণ-উপনিষদ ইত্যাদির পুরাতন কাহিনী অনেক পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত হয়।

॥ **পাঁচ** ॥ **ঐতিহাসিক কাহিনী**—ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, দেশাত্মবোধক অংশ পাঠ্যপুস্তকে নির্বাচিত হ'য়ে স্থান পায়।

॥ **ছয়** ॥ **প্রবন্ধ**—বিভিন্নশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে যে সব গদ্যাংশগুলি সংকলিত থাকে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রবন্ধ-শ্রেণীর রচনা। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, সামাজিক

প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ, নৈতিক শিক্ষামূলক প্রবন্ধ, সমস্যামূলক প্রবন্ধ, দেশাত্ম-বোধক প্রবন্ধ, বিতর্কমূলক ও যুক্তিনির্ভর প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রতিশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকেই একাধিক সংখ্যায় সংকলিত থাকে। সাহিত্যের বিচারে এই প্রবন্ধগুলি যথাযথ গুণান্বিত না হ'লেও এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে।

॥ **সাত** ॥ **জীবনী** – বহু মহাপুরুষের জীবনী বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে। শিক্ষার্থী'রা যাতে ঐসব মহাপুরুষের জীবনী প'ড়ে চরিত্র গঠন ক'রতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই জীবনীগুলি নির্বাচিত হয়। আত্মজীবনী ও স্মৃতিচারণও বিভিন্ন-শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে লক্ষ্য করা যায়।

॥ **আট** ॥ **রূপকথা** -নীচু শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকগুলিতে রূপকথাধর্মী রচনাও কিছু কিছু সংকলিত থাকে।

বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা কর'লে দেখা যায় যে, গদ্যাংশগুলির মধ্যে অধিকাংশই প্রবন্ধজাতীয় রচনা। শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে তাকিয়েই এই প্রবন্ধগুলি সংকলন করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রুতপঠনের পুস্তকের মধ্যেও বাংলা গদ্যের স্থান সুনির্দিষ্ট। নবম-দশম শ্রেণীর দ্রুতপঠনের তালিকায় 'জীবনস্মৃতি'-র অন্তর্ভূক্তিতে অনেক সাহিত্যপ্রেমিক খুশী হবেন। তবে অন্যান্য দ্রুতপঠনগুলির নির্বাচন সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দশম শ্রেণীর ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের যে পরিবর্তন হয়েছে, তাতে বাংলা গদ্যসাহিত্যের পঠন-পাঠনে সাহিত্যগুণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

॥ গদ্য শিক্ষাদান ॥

গদ্য-শিক্ষাদানের মূল **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** হ'ল শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করা। গদ্যপাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা শিক্ষালাভ করবে। গদ্য-শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের পঠন-শক্তির উন্মেষ সাধন করা ; বাংলা গদ্যপাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সরব পাঠ, নীরব পাঠ অভ্যাস করবে। ফলে, তাদের পাঠের অভ্যাস (*Study Habit*) ও পাঠের দক্ষতা (*Study Skill*) বাড়বে। গদ্য পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি পাবে। গদ্য পাঠ শিক্ষার্থীদের শব্দজ্ঞান, শব্দচেতনা, বাক্যের মধ্যে বিন্যস্ত পদগুলির পরিচয় সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি ক'রবে। গদ্য-শিক্ষাদানের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের সাহিত্যতত্ত্ব, নন্দনচেতনা, রসমাধুর্য, শিল্পমণ্ডন-কলা প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা। অবশ্য বিষয়বস্তুর উদ্ধারও গদ্য-শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে ; কারণ বর্তমান শিক্ষা ও পরীক্ষা-ব্যবস্থা সে উদ্দেশ্যেই পরিচালিত।

গদ্য-শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিদ্যালয়ে গদ্য-শিক্ষাদানের অনেক **অসুবিধা** আছে। বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষা ও পরীক্ষা-ব্যবস্থা গদ্যাংশগুলির বিষয়বস্তুকে যতখানি প্রাধান্য দেয়, সাহিত্যগুণকে

ততখানি গুরুত্ব দেয় না। গদ্য-শিক্ষাদানের সময় সাহিত্যতত্ত্ব, রসধ্বনি, শিল্পকলা ইত্যাদির কথা প্রায়ই ভুলে যেতে হয়। শিক্ষার্থীদের অপরিচিত অনেক শব্দ গদ্যরচনার মধ্যে থাকে। তাতে তাদের পক্ষে পাঠগ্রহণের অসুবিধা হয়। গদ্য-রচনার মধ্যে প্রাচীন লেখকের যে রচনারীতি থাকে, তার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় নেই; ফলে শিক্ষা-গ্রহণকালে শিক্ষার্থীদের অসুবিধা হয়। ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, উচ্চারণতত্ত্ব, যতিচিহ্ন-বিন্যাস সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের যথাযথ জ্ঞান না থাকার ফলে গদ্য-শিক্ষাদানের সময় অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়। শিক্ষার্থীদের সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি ক'রবার সুযোগ বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে নেই। তাই গদ্য-শিক্ষাদানের সময় অসুবিধা হয়। পাঠ্যক্রমের অধিকাংশ গদ্য-রচনাই সাহিত্যের বিচারে উৎকৃষ্ট নয়। অধিকাংশ গদ্য-রচনাই প্রবন্ধজাতীয়, যে গুলির উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দান করা। তাই গদ্য-শিক্ষাদান সাহিত্যানুশীলন ও সৌন্দর্যানুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা গদ্য শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের প্রধান প্রতিবন্ধক। গদ্য-শিক্ষাদানের সময় আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হয় না, শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলি (*Teaching Aids*) ব্যবহৃত হয় না;—শিক্ষাদান সম্পূর্ণ কৃত্রিম, যান্ত্রিক ও গতানুগতিক। গদ্য-শিক্ষাদানের সময় স্বাভাবিকভাবেই এই সব অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়।

গদ্য-শিক্ষাদানের অসুবিধা

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে গদ্য-শিক্ষাদানকে সফল ও সার্থক ক'রতে হলে নিম্ন-লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন;—

(১) পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সাহিত্যগুণ-সমন্বিত গদ্য-রচনার সংস্থান করতে হবে।

(২) আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন ক'রতে হবে।

(৩) শিক্ষাকে পরীক্ষা-কেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত ক'রতে হবে।

(৪) শিক্ষাদানের সময় বিভিন্ন শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ও বোর্ডের ব্যবহার যথাযথভাবে ক'রতে হবে।

(৫) শিক্ষাদানের সময় সাহিত্য-দর্শনের কথা মনে রাখতে হবে।

(৬) সরব পাঠ ও নীরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি অনুরাগ, পাঠের অভ্যাস ও পাঠের দক্ষতা বাড়াতে হবে।

(৭) বিদ্যালয়ে সাহিত্যানুশীলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ক'রতে হবে।

(৮) পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভূ'ত বিভিন্ন কার্যাবলীর (যেমন,—অভিনয়, সাহিত্য-আলোচনা, গল্পের বই পড়া, গল্প-প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখা, পত্রিকার প্রকাশনা ইত্যাদি) ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

(৯) সরল ও বৈচিত্র্যময়তার মাধ্যমে গদ্য শিক্ষাদান ক'রতে হবে, যাতে শিক্ষাগ্রহণ শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়।

(১০) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সাহিত্যিকদের গদ্য-রচনা পড়বার সুযোগ দিতে হবে।

এই সব পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য শিক্ষকের জ্ঞান, ধৈর্য, সহৃদয়তা, পরিশ্রম ও দক্ষতা একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন ক'রতে হবে। নিয়মিত পাঠটীকা (*Lesson Plan*) রচনা ক'রে সেই অনুযায়ী শিক্ষাদান করতে হবে। শিক্ষকের দক্ষতা ও বিদ্যালয়ের পরিচালন-ব্যবস্থার উপর শিক্ষার্থীদের গদ্যশিক্ষা-গ্রহণ অনেকাংশে নির্ভরশীল, এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। আধুনিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গদ্য-শিক্ষাদান ক'রবেন।

গদ্য-শিক্ষাদানে শিক্ষকের ভূমিকা

॥ অনুশীলনী ॥

১। সাহিত্য-পুস্তকে গদ্যাংশ পড়াইবার সময় কি জাতীয় অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় এবং সেই সব অসুবিধা অতিক্রম করিয়া কিরূপে বিভিন্ন জাতীয় রচনাকে সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলা যায়, সে বিষয়ে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। (কলি বিশ্ব., বি টি. ১৯৬৫)

২। কবিতা এবং গদ্য পড়াইবার পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করুন। (কলি বিশ্ব., বি. টি ১৯৬০)

৩। ছাত্রদের পঠন-শক্তি বিকাশের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন? এই প্রসঙ্গে বাংলা গদ্য পাঠদানের পদ্ধতি বিবৃত করুন। (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৯)

৪। 'কিশলয়' হইতে 'পাঠ সংকলন' পর্যন্ত পাঠ্য-পুস্তকে গদ্যাংশে কি ধরনের গল্প বা কথা-কাহিনী সাধারণতঃ পাওয়া যায়? বিভিন্ন নামে ইহাদের অভিহিত করিবার কারণ কি? কোন্ ধরনের গল্প কোন্ বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী বলিয়া মনে করেন? (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি এড. ১৯৬৫)

৫। গদ্য ও পদ্যের পড়ানোর রীতির তুলনামূলক আলোচনা করুন। (সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত সহ)।

(P. G., B. T.—১৯৭৬)

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা-কাব্যের শ্রেণীবিভাগ ও কবিতা শিক্ষাদান-পদ্ধতি

[Types of Poetry ; Methods of Teaching]

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের স্থচনা হয়েছিল প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীতে। চর্যাপদ থেকে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের যাত্রা শুরু। তারপর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, লোক-সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ-সাহিত্য (রামায়ণ ও মহাভারত) বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য শাক্তগীতি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলাকাব্যের আদি ও মধ্যযুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্ত থেকে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের আধুনিকতার যাত্রা শুরু। রঙ্গলাল, মধুস্থদন, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতির মহাকাব্য ;—বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেনের গীতি-কবিতা ;—মধুস্থদন, রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, প্রমথ চৌধুরীর সনেট ;—রবীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, স্থভাষ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বস্থ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির আধুনিক গদ্য-কবিতা প্রভৃতি কাব্য ও কবিতা বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রেছে। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস তাই বহু-বিস্তৃত। বহু পরীক্ষা, নিরীক্ষা, রীতি ও ছন্দ-বৈচিত্র্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বহু লেখকের লেখনীর যাদুস্পর্শে সমৃদ্ধ বাংলা কাব্যধারার শাখা বহুধা-বিভক্ত। সে নিয়ে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে।

বাংলা কাব্য সাহিত্য

কবিতা কি ? কবিতা কাকে বলে ? 'ছন্দোবদ্ধ পদ'কে-ই কবিতা বলা হয়। সেই অর্থে ছন্দই কবিতার প্রাণ। ছন্দই কবিতাকে তার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যে উন্নীত হ'তে সাহায্য করে। কিন্তু কেবলমাত্র ছন্দই কবিতার সব কথা ও শেষ কথা নয়। অলংকার কবিতাকে সমৃদ্ধ করে, স্থন্দর করে, অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করে। অলংকার তাই কবিতার অঙ্গ। 'অপরিহার্য শব্দের অবশ্যম্ভাবী বাণী-বিন্যাস'কে (*Best words in the best order'—Coleridge*) কবিতা বলা হ'য়েছে। শব্দচেতনা তাই কবির অন্যতম অস্ত্র—অবলম্বন। *Wordsworth* ব'লেছেন, "**Poetry is the spotaneous overflow of powerful feelings.**" কবিতার মধ্যে থাকে কবির কল্পনাশক্তির প্রকাশ ; অনুভূতির উচ্ছ্বাস কবিতার মধ্যে বাণী-মূর্তিতে ধরা পড়ে। *W. Deenton* বলেছেন, "*Absolute poetry is the concrete and artistic expression of the human mind in the emotional and rhythmic language.*" কাব্যের প্রাণ তাই রসধ্বনি ; মানুষের অন্তরস্থিত স্থায়ী ভাবগুলি কাব্য-পাঠের মাধ্যমে রসপরিণতি লাভ করে। মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলি কাব্য-রসাস্বাদনের মাধ্যমে আনন্দধ্বনিতে অনুরণিত হয়। মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায়,—"কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে আত্মার রতি-স্থখ সম্ভোগকালে রসমূর্ছিত মানবের ভাববিধুর গদগদ ভাবই কবিতা।" 'কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ।' অনেক কবিতার মধ্যে সংগীতধর্মিতা ও চিত্রধর্মিতা থাকে। কাব্য ও কবিতার মধ্য দিয়ে কবির বলিষ্ঠ জীবনদর্শন ফুটে ওঠে ; *Mathew Arnold* বলেছেন, "*Poetry is at bottom a*

কবিতা কি ?

criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty." বাস্তব জগতের সত্য ও কাব্যের সত্য এক নয়। অপরূপকে রূপের মধ্যে, অনির্বাচনীয়কে বচনের মধ্যে প্রকাশ করাই কাব্যের কাজ। বঙ্কিমচন্দ্র ব'লেছেন,—"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নয়"। কবিতা তাই প্রচারধর্মী ও উদ্দেশ্যমুখী নয়। কবির অনুভূতির উচ্ছ্বাস কবিতায় রসস্নিগ্ধ বাণীমূর্তি লাভ করে ও ছন্দের বন্ধনে ধরা পড়ে। সৌন্দর্য-সৃষ্টিই কাব্যের উদ্দেশ্য। কবিতাকে প্রধান দুইভাগে ভাগ করা যায় ;—

(১) মন্ময় কবিতা (*Subjective poetry*),

(২) তন্ময় কবিতা (*Objective poetry*)।

বিষয়বস্তু, রূপনির্মিতি, গঠন-বৈশিষ্ট্য ; ভাববিস্তার ইত্যাদি অনুযায়ী মন্ময় ও তন্ময় কবিতা আবার কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত। একে একে সেগুলির আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ এক ॥ মন্ময় কবিতা
[Subjective poetry]

মন্ময় কবিতা ব্যক্তিনিষ্ঠ। কবির অন্তর-অনুভূতির সূক্ষ্ম দিক্‌গুলি মন্ময় কবিতায় ধরা পড়ে। "কবি যখন নিজের আন্তর অনুভূতি; ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ভাবনা-চিন্তা এবং বহির্গত অনুভূতি তাঁহার কাব্যের সামগ্রীমাত্র রূপে গ্রহণ করিয়া আত্ম-প্রকাশ করেন, তখন আমরা তাঁহার সৃষ্টিকে মন্ময় বা ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতা বলি" (শ্রীশচন্দ্র দাস)। মন্ময় কবিতায় কবির অনুভূতির নিবিড়তা ও কল্পনা-বিলাসই প্রধান উপজীব্য। কাব্যতত্ত্ব, সাহিত্যদর্শন, শিল্পমণ্ডন কলা ও রসসৌন্দর্যের বিচারে মন্ময় কবিতাই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কবিতা। বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণ সার্থক মন্ময় কবিতা সৃষ্টি ক'রে বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রেছেন।

মন্ময় কবিতা

॥ গীতি-কবিতা (Lyric) ॥

সংগীতধর্মী '**গীতি-কবিতা**'কে ইংরাজী সাহিত্যে Lyric বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র গান ও কবিতার সংমিশ্রণকে গীতি-কবিতা বলে না। গীতি-কবিতা একটি স্বতন্ত্র সারির কবিতা। রূপ-নির্মিতি, বিষয়-বৈচিত্র্য ও অন্তর্লীন মন্ময়তা গীতি-কবিতাকে সমৃদ্ধ ক'রেছে। গীতি-কবিতায় কোন কাহিনী থাকে না। বিশ্ব-প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যলীলা কবি-মনে যে অনুভূতির ঝংকার তোলে, তাই গীতি-কবিতার ছত্রে ছত্রে অনুরণিত হয়। অনুভূতি, আবেগ, উচ্ছ্বাস গীতি-কবিতায় সংগীতমুখর ছন্দে প্রকাশিত হয়। গীতি-কবিতার অবয়ব ও আয়তন তাই দীর্ঘ নয়। গীতি-কবিতায় তত্ত্ব থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য"। *Henley*-র ভাষায়, *"A Lyric is a single emotion temperamentally expressed in terms of poetry.* গীতি-কবিতার মধ্যে কবির

অন্তরের গভীরতা ও নিবিড়তার স্পর্শ পাই আনন্দ-বেদনার মাধ্যমে। শ্রীশচন্দ্র দাস বলেছেন, "যে কবিতায় কবির আত্মানুভূতি বা একান্ত ব্যক্তিগত বাসনা-কামনা ও আনন্দ-বেদনা তাঁহার প্রাণের অন্তস্তল হইতে আবেগ কম্পিত সুরে অখণ্ড ভাবমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাকেই গীতি-কবিতা বলে।" গীতি-কবিতায় সংগীতধর্মিতা বিদ্যমান। ধর্মীয় কবিতাও গীতি-কবিতা হয় যখন ধর্মের আবেদনকে পিছনে ফেলে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগ, উচ্ছ্বাস ও আকুলতা কাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। আদি ও মধ্যযুগের কাব্য-সাহিত্যে গীতি-কবিতার লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। চর্যাপদও তাই গীতি-কবিতার পর্যায়ে পড়ে। আমাদের কাব্য-সাহিত্যে অজস্র গীতি-কবিতা আছে। গীতিকবিতার প্রাচুর্যে আমাদের কাব্যভাণ্ডার পূর্ণ, কাব্যলক্ষ্মী অপূর্ব শ্রীমণ্ডিতা। বৈষ্ণবপদাবলী বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার নিদর্শন। বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার স্পর্শে বাংলা গীতি-কবিতার ভাণ্ডার অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হ'য়েছে।

গীতি-কবিতা

বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা অনুযায়ী গীতি-কবিতাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

নিসর্গ চেতনা ও প্রকৃতিবিষয়ক অনুভূতি বহু গীতি-কবিতায় প্রকাশিত হ'য়েছে। বাহ্য প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ যখন কবির অন্তর-লোকে নিবিড়অনুভূতির সৃষ্টি করে এবং তার উচ্ছ্বাস যখন শান্ত, স্নিগ্ধ ও মধুরভাবে কবিতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তখন তাকে প্রকৃতিবিষয়ক গীতি-কবিতা বলা হয়। মোহিতলালের 'কালবৈশাখী', রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল', অক্ষয়কুমার বড়ালের 'শ্রাবণে' ও 'মধ্যাহ্নে' এই জাতীয় গীতি-কবিতার নিদর্শন।

প্রকৃতি-বিষয়ক গীতি-কবিতা

নারী-পুরুষের প্রেম-মিলন, বিরহ-বেদনা, হাসি-অশ্রু, নিবিড় রোমান্টিক অনুভূতি যখন গীতি-কবিতায় কবির আত্মগত ভাবকল্পনার মাধ্যমে ধরা পড়ে, তখন তাকে প্রেমমূলক গীতি-কবিতা বলে। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সার্থক ভাবে বিভিন্ন পদাবলীতে প্রকাশিত হ'য়েছে। জীবনানন্দ দাসের 'বনলতা সেন', রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষার দিনে' প্রভৃতি সার্থক প্রেমবিষয়ক গীতি-কবিতার নিদর্শন।

প্রেম-বিষয়ক গীতি-কবিতা

দেশপ্রেম, স্বদেশপ্রেম বহু গীতিকবিতার বিষয়বস্তু। অতীতের বীরত্ব-কাহিনীর প্রতি অনুরাগ, স্বদেশানুরাগ ইত্যাদি অবলম্বনে কবি যখন তাঁর অন্তর-অনুভূতির উচ্ছ্বাস কবিতার মধ্যে প্রকাশ করেন, তখন তা গীতি-কবিতার পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই জাতীয় কবিতাকে দেশাত্মবোধক গীতি-কবিতা বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্', রবীন্দ্রনাথের 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ভারতলক্ষ্মী', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বঙ্গভূমি' ইত্যাদি এই জাতীয় গীতি-কবিতা।

দেশাত্মবোধক গীতি-কবিতা

সমাজ, জীবন, সৌন্দর্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কবির জীবনদর্শন ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

যখন কবিতায় অনুভূতির আবেদনসহ প্রকাশিত হয়, তখন তাকে চিন্তামূলক গীতি-কবিতা বলে। কবি-মানসের ভাব-কল্পনা রূপ থেকে অপরূপের মধ্যে, বচন থেকে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যলোকের মধ্যে উধাও হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবনসঙ্গীত', মোহিতলাল মজুমদারের 'পাপ', যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 'নবপন্থা' এই জাতীয় চিন্তা-মূলক গীতি-কবিতা।

চিন্তামূলক গীতি-কবিতা

কবির ধর্মীয় চেতনা ও ভক্তিভাব অনেক কবিতার মধ্যে ধরা পড়েছে। আমাদের দেশ ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ। ধর্মীয় ভাব ও চেতনা এদেশের সমাজ-ব্যবস্থার সর্বপ্রধান অঙ্গ। তাই যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মীয় চেতনা কাব্য-কবিতায় বহু ভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে। এই জাতীয় কবিতা যখন ধর্মীয় তত্ত্ব ও চেতনা থেকে মুক্ত হ'য়ে কবির অন্তর-অনুভূতির আলোকে উদ্ভাসিত হয়, তখন গীতি-কবিতার পর্যায়ে উন্নীত হয়। এগুলিকে ভক্তিমূলক গীতি-কবিতা বলা হয়। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত গীতি, রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া-নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র কবিতাগুলি, গোবিন্দদাসের 'বন্দনাগীতি', রজনীকান্ত সেনের 'নির্ভর' প্রভৃতি এই শ্রেণীর গীতি-কবিতা। বন্দনামূলক কবিতা যখন শ্রদ্ধা-ভক্তিতে আপ্লুত হ'য়ে কবির আবেগ-অনুভূতি-স্নিগ্ধ হয়, তখন তা গীতি-কবিতার পর্যায়ে উন্নীত হয়।

ভক্তিমূলক গীতি-কবিতা

॥ সনেট (Sonet) ॥

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালীর কবি পেত্রার্ক (*Petrach*) সনেটের জন্মদাতা। ইতালীর 'সনেটে' (মৃদুধ্বনি) শব্দ থেকে **'সনেট'** শব্দটির উৎপত্তি। বাংলাতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সনেটের প্রবর্তন করেন ; তিনিই সনেটের প্রতিশব্দ হিসেবে **'চতুর্দশপদী কবিতাবলী**-র ব্যবহার করেন। সনেট এক ধরনের মন্ময় কবিতা *Prof. Bain*-এর ভাষায়, "*The sonet is a short lyrical poem complete in one stanza, containing fourteen lines of five measured verse.*" সনেট কবির এক অখণ্ড ভাবকল্পনা থেকে ১৪ অক্ষরের ১৪টি ছত্রে পয়ার বা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করে। ১৪টি ছত্রের মধ্যে সনেটের ভাব-কল্পনা সুসংবদ্ধ। এই ১৪টি ছত্রকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে, প্রথম ৮ ছত্র **অষ্টক (Octave)**, শেষ ৬ ছত্র **ষট্‌ক** (Sestet)। অষ্টকের মধ্যে কবির ভাব-কল্পনা রূপ ধারণ করে। ষট্‌কে সেই ভাব-কল্পনার বিস্তৃতি, ব্যাখ্যা ও পরিণতি। অষ্টককে দু'ভাগ করে অনেকে সনেট লিখেছেন ; প্রতি ভাগকে চতুষ্ক (*Quatrain*) বলা হয়। ষট্‌ককে দু'ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে ; প্রতি ভাগকে ত্রি-পদিকা (*Tercet*) বলে। তবে সমগ্র সনেটের মধ্যে একটি অখণ্ড ভাবকল্পনার দ্যোতনা থাকা চাই। ইতালীয় সনেট রীতিতে মিলের নিয়ম হল,—

সনেট

(ক খ খ ক+ক খ খ ক)+(গ ঘ ঙ+গ ঘ ঙ), বা (গ ঘ+গ ঘ+গ ঘ)। *Shakespeare* সনেটের অষ্টক-ষট্‌ক নিয়ম মানেন নাই, তাঁর

মিলের নিয়মও ভিন্ন রূপ;—ক খ, ক খ, গ ঘ, গ ঘ, ঙ চ, ঙ চ, ছ ছ। শেষ দুই ছত্রের এই মিলকে **couplet** বলা হয়। ইতালী, ইংরেজী ও ফরাসী—এই তিনটি রীতি বর্তমানে সনেটের রূপ-নির্মিতিকে প্রভাবান্বিত করে। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত (চতুর্দশপদী কবিতাবলী), রবীন্দ্রনাথ (বিভিন্ন কাব্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত), প্রমথ চৌধুরী (সনেট পঞ্চাশৎ), মোহিতলাল মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন (অশোক গুচ্ছ), অক্ষয়কুমার বড়াল, প্রথম বিশী, অজিত দত্ত, মণীন্দ্র রায় প্রভৃতির নাম সনেট-শিল্পী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

॥ মন্ময় কবিতার অন্যান্য রূপ ॥

শোকগীতিও এক শ্রেণীর মন্ময় কবিতা। ইংরেজীতে এই জাতীয় কবিতাকে **Elegy** বলা হয়। শোকগীতিতে কবির বেদনা-বোধ শোকানুভূতি যখন ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার সীমা অতিক্রম ক'রে মানব-কেন্দ্রিক হয়, তখন তা গীতি-কবিতাতে পরিণত হয়। কবির বেদনা-বোধ ও শোকানুভূতির নিবিড়তা ও আন্তরিকতা শোকগীতিকে শিল্পশ্রী মণ্ডিত করে। সাধারণীকরণের ফলে কবির ব্যক্তিগত বেদনা সর্বমানবের বেদনাতে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', নজরুল ইসলামের 'ইন্দ্রপতন' (চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুতে), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর', নবীনচন্দ্র সেনের 'মাইকেল মধুসূদন' বিখ্যাত শোককবিতা। বিহারীলালের 'বন্ধু-বিয়োগ', অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা', রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ', নজরুলের 'চিত্তনামা', করুণানিধানের 'উদ্দেশে' বিখ্যাত শোকগীতির উদাহরণ। কবি যখন তাঁর শোকানুভূতিকে রাখালের মুখ দিয়ে প্রকাশ করেন এবং কাব্যে রাখালিয়া পরিবেশ (*Pastoral surrounding*) রচনা করেন, তখন তাকে **রাখালিয়া শোকগীতি (Pastoral Elegy)** বলে। কালিদাস রায়ের 'কৃষাণীর ব্যথা' ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 'চাষার ঘরে' এই শ্রেণীর শোকগীতি।

শোকগীতি

গ্রীক নাটকের *chorus* পরবর্তী কালে ইংরেজীতে **ode** জাতীয় কবিতায় রূপান্তরিত হয়। ইহাই বাংলায় স্তোত্র বা প্রশস্তিমূলক কবিতা। স্তোত্রের বিষয়বস্তু হল কোন 'সুমহান গাম্ভীর্যব্যঞ্জক বিষয়বস্তু'। এই বিষয়বস্তু যখন ওজস্বী ছন্দে কবির আত্মগত অনুভূতির উচ্ছ্বাসরূপে কাব্য-কবিতায় প্রকাশিত হয়, তখন তাকে স্তোত্র-জাতীয় কবিতা বলে। অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মানব-বন্দনা', 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'নমস্কার,' রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' ও 'পৃথিবী', মোহিতলালের 'নারীস্তোত্র' ও 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' ইত্যাদি স্তোত্র বা প্রশস্তি-জাতীয় কবিতা।

স্তোত্র বা প্রশস্তিমূলক কবিতা

জীবনের হাল্কা ও লঘু আনন্দের দিক্ ও সমাজ জীবনের লঘু-চপল চিত্র যখন গীতি-কবিতায় কবির অন্তর-অনুভূতির স্পর্শে সজীবতা লাভ ক'রে বাণীমূর্তি পরিগ্রহ করে, তখন তাকে লঘু বৈঠকী কবিতা (*Verse de Societe*) বলে। অপরাজিতা দেবীর 'বুকের বীণা' এই জাতীয় কাব্য।

লঘু বৈঠকী কবিতা

॥ দুই ॥ তন্ময় কবিতা
(Objective Poetry)

তন্ময় কবিতা বস্তুনিষ্ঠ। কবির কাব্যে যখন বস্তুজগৎ যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে তন্ময় কবিতা বলা হয়। তবে বস্তুধর্মী কবিতায় ভাবের বিস্তার ঘটবার কোন বাধা নেই। বস্তুনিষ্ঠ তন্ময় কবিতাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সেগুলি হ'ল ;—

তন্ময় কবিতা

॥ মহাকাব্য (Epic) ॥

'মহাকাব্যে'র আয়তন দীর্ঘ। মহাকাব্য বস্তুনিষ্ঠ হ'লেও এর মধ্যে উদাত্ততার (*Sublimity*) অভাব নেই। বীরত্বব্যঞ্জক, মহিমোজ্জ্বল, গম্ভীর, সমুন্নত ইত্যাদি গুণ মহাকাব্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। **সংস্কৃত আলংকারিকগণ** মহাকাব্যের গঠন সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ ক'রেছেন। মহাকাব্যের সর্গ সংখ্যা হবে কমপক্ষে ৮টি। শৃংগার, বীর ও শান্ত—এই তিনটি রসের যে-কোন একটি প্রধান রস হবে এবং অন্যান্য রস তারই অঙ্গ হবে। মহাকাব্যের আখ্যানভাগ পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক হবে। মহাকাব্যের নায়ক হবে সর্বপ্রকার সদ্‌গুণে অলংকৃত (ধীরোদাত্ত)। মহাকাব্যের পরিণামে সত্য ও ন্যায়ের জয় প্রতিষ্ঠিত হবে, দুর্বৃত্তেরা পরাজিত হবে। মহাকাব্যের পটভূমি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পরিব্যাপী হবে ; ভাষা হবে ওজস্বী ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। **Aristotle**-এর মতে, *An epic should be based on a single action, one that is a complete whole in itself, with a begining middle and end, so as to enable the work to produce its own proper pleasure with all the organic unity of a living creature……As for its metre the heroic has been assigned it from experiencc."* অর্থাৎ "মহাকাব্য আদি, মধ্য ও অন্ত্য সমন্বিত বর্ণনাত্মক কাব্য ইহাতে বিশিষ্ট কোন নায়কের জীবন-কাহিনী অখণ্ডরূপে একই বীরোচিত ছন্দের সাহায্যে কীর্তিত হয়।" মহাকাব্যের আয়তন ও অবয়ব সুদীর্ঘ, কাব্যও আলাদা স্বাদের। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতে মহাকাব্যের যুগ অতিক্রান্ত হ'য়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালেও মহাকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মহাকাব্য দুই শ্রেণীর ;—

মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

(ক) **Authentic Epic** :—এই জাতীয় মহাকাব্যগুলি প্রাচীন যুগে রচিত হ'য়েছে। তাই এগুলিকে *Primitive Epic* বা *Epic of growth*-ও বলা হয়। হোমারের 'ওডিসি' ও 'ইলিয়াড', বাল্মীকির 'রামায়ণ' ও বেদব্যাসের 'মহাভারত'—এই চারিটি এই শ্রেণীর মহাকাব্য। সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত বাংলায় অনূদিত হ'য়েছে।

Authentic Epic

(খ) **Literary Epic** :—এই জাতীয় মহাকাব্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের সৃষ্টি ;

অবয়ব ও আয়তনে পূর্বতন মহাকাব্য অপেক্ষা ছোট। এগুলিকে '*Imitative Epic*' বা '*Epic of Art*' বলেও গণ্য করা হয়। এগুলির ঘটনাবস্তু সুসংবত, চরিত্র-চিত্রণ মহিমাময়, কল্পনাপ্রাচুর্যও আছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ-কাব্য', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্র-সংহার', নবীনচন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র', 'রৈবতক', 'প্রভাস'—এই শ্রেণীর মহাকাব্য।

Literary Epic

॥ গদ্য কবিতা ॥

বস্তুনিষ্ঠ তন্ময় কবিতার অন্যতম সমৃদ্ধ শাখা হ'ল গদ্য-কবিতা। শ্রেষ্ঠ গদ্য সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে একটা ছন্দের মাধুর্য লক্ষ্য করা যায়। কোন কবি যখন সচেতনভাবে গদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দ-সুষমাকে কাব্যের মধ্যে মুক্ত গতি দান করেন, তখন তা গদ্য-কবিতায় পর্যবসিত হয়। গদ্যের নীরবতার মধ্যেই তখন রসধ্বনির স্পন্দন শোনা যায়, কবির বস্তুগত অনুভূতির উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্য-কবিতার প্রতিষ্ঠাতা ও সার্থক শিল্পী। তাঁর 'পুনশ্চ', 'শ্যামলী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ উৎকৃষ্ট গদ্য-কবিতার নিদর্শন। আধুনিক কবিদের অধিকাংশই গদ্য-কবিতার সার্থক শিল্পী। বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি আধুনিক কবিগণ গদ্য-কবিতা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রেছেন।

গদ্য-কবিতা

॥ তন্ময় কবিতার অন্যান্য রূপ ॥

পূর্বে নৃত্যের সঙ্গে গীত কবিতাকে **গাথা কবিতা** (**Ballad**) বলা হ'ত। *Ballad* (ফরাসী শব্দ) এর সঙ্গে ব্যালের (***Ballet***) সাদৃশ্য আছে। পল্লীগান ও লোকগীতিকে বর্তমানে গাথা বলা হয়। এই জাতীয় কবিতাগুলি সহজ, সাবলীল ও লঘুগতি। 'ময়মনসিংহ গীতিকা', 'গোপীচাঁদের গীত' হ'ল গাথা-কাব্য। পরবর্তী কালে গাথা-কবিতার সৃষ্টি হয়। কোন কাহিনী বা ঘটনাকে যখন কাব্যরূপ দেওয়া হয় অর্থাৎ কবিতার মধ্যে যখন আখ্যান-ভাগ থাকে, তখন তাকে 'গাথা-কবিতা' বলা হয়। এগুলি **সাহিত্যিক গাথা** (**Literary Ballad**) বলে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের 'পরশমণি', 'পণরক্ষা', 'প্রতিনিধি'; কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'শ্রীধর'; সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর 'ইন্‌সাফ' গাথা-শ্রেণীর কবিতা। গাথা-শ্রেণীর কবিতার অন্য এক শ্রেণী হ'ল **কাহিনী কাব্য** (**Narrative Story Poems**)। এগুলি দীর্ঘ আয়তনবিশিষ্ট—সমগ্র কাব্য জুড়ে একটি কাহিনী বিস্তৃত হয়। মংগলকাব্য (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল), অন্নদামঙ্গল, চৈতন্যজীবনী-কাব্য, রঙ্গলালের 'কাঞ্চী কাবেরী', কামিনী রায়ের 'মহাশ্বেতা' এই ধরনের কাহিনী-কাব্যের নিদর্শন। কোন আখ্যান অবলম্বনে রচিত কাব্যকে **খণ্ড-কাব্য** বলে। 'পলাশীর যুদ্ধ' (নবীনচন্দ্র), 'দশমহাবিদ্যা' (হেমচন্দ্র), 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (রঙ্গলাল) এই জাতীয় রচনা।

গাথা-কাব্য

কাব্য-নাট্য (Lyrical Drama) ও নাট্য-কাব্য (Dramatic Lyric)—এই দু'টি শ্রেণীর বস্তুনিষ্ঠ তন্ময় কবিতা আপাতদৃষ্টিতে এক হ'লেও সাহিত্যগত বিচারে এদের পৃথক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কাব্য নাট্যে কাব্যাংশ প্রকট, এই জাতীয় রচনা কাব্যের আধারে নাটক। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'বিদায় অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন' এই জাতীয় রচনা। নাট্য-কাব্য নাটকের আধারে কাব্য, নাটকের অংশই এখানে অধিকতর শক্তিশালী। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন , 'মালিনী' প্রভৃতি এই জাতীয় রচনা। আধুনিক কালে বুদ্ধদেব বসু এ ধরনের কতকগুলি নাট্য-কাব্য রচনা ক'রেছেন।

কাব্য নাট্য ও নাট্য কাব্য

বস্তুনিষ্ঠ তন্ময় কবিতার অন্যতম শাখা হ'ল 'নীতি-কবিতা'। নীতি-কবিতা উদ্দেশ্য মূলক ;—নীতি ও তত্ত্বকথা প্রচার করা এই জাতীয় কবিতার উদ্দেশ্য। এর জন্য কবি গল্প, কাহিনী ও নিছক কলা-শিল্পের আশ্রয় নিয়ে থাকেন ; সাহিত্য-গুণের বিচারে এগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর রচনা। তবে কবি-কল্পনার স্পর্শে এই কবিতাগুলি কাব্য-সুষমা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা', রঙ্গলালের 'নীতিকুসুমাঞ্জলি', রজনীকান্ত সেনের 'অমৃত', কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'শতদল', 'যদি'—এই জাতীয় নীতি-কবিতার নিদর্শন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে (বিশেষ ক'রে নীচু শ্রেণীগুলিতে) এই শ্রেণীর কবিতা-সংকলনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

নীতি-কবিতা

জীবনের বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি ও অসংগতির কথা ব্যঙ্গকবিতার মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় কবিতাগুলি প্রখর জীবনরস সমৃদ্ধ হ'য়ে হাস্যরসের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। *Wit, Humour* ও *Satire* অবলম্বনে এই জাতীয় লঘু-চপল কবিতাগুলি রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট্', 'দুরন্ত আশা' ; ঈশ্বর গুপ্তের 'বিধবা বিবাহ'; মোহিতলালের 'দ্রোণগুরু', 'সরস-সতী' ;যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 'পাঁকাল বন্দনা'—এই জাতীয় ব্যঙ্গ-কবিতার নিদর্শন। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, আক্রমণ ও অতিরঞ্জনের মাধ্যমে যে সব ব্যঙ্গ কবিতা সৃষ্ট হয় সেগুলি **Parody** নামে খ্যাত। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 'বঙ্গে শরৎ', সজীনকান্ত দাসের 'হে বিরাট গদী', মোহিতলালের 'আমি যদি জন্ম নিতেম ক্যাবলা কালুর কালে', কালিদাস রায়ের 'কেন বঞ্চিত হব ভোজনে' এই জাতীয় *Parody* কবিতা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হাসির গান' ব্যঙ্গ কবিতার নিদর্শন। কবিতার ব্যঙ্গ ও 'ব্যঙ্গ অলংকার' এক নয়।

ব্যঙ্গ কবিতা

লোকসাহিত্যের একটি শাখা হ'ল **'ছড়া' (Nursery Rhymes)**। শিশু মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি ক'রে এই জাতীয় বস্তুনিষ্ঠ কবিতাগুলি শিশুদের মনোরঞ্জন করে। ভাবের অসংবদ্ধতা, অযৌক্তিকতা, অলৌকিকতা, রূপকথা, যাদুধর্মিতা, উদ্ভট শব্দবিন্যাস ছড়ার প্রাণ-সম্পদ। ছড়ার ছন্দ সুস্পষ্ট। প্রতি পর্বে চার মাত্রার স্বরবৃত্ত ছন্দে ছড়া রচিত, প্রতি পর্বের প্রথমে শ্বাসাঘাত সুস্পষ্ট। গ্রাম্য প্রকৃতি, সমাজ-জীবন, মেয়েদের গার্হস্থ্য জীবন ছড়ার মধ্যে দেখা যায়। ছড়ায় মায়ের স্নেহ-কোমল স্পর্শানুভূতিও বিদ্যমান। যোগীন্দ্রনাথ বসু,

ছড়া

সুকুমার রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, সুনির্মল বসু, স্বপন বুড়ো, অন্নদাশংকর রায় বাংলা ছড়ার সার্থক শিল্পী ; রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে বাংলা ছড়া-সাহিত্যও অগ্রগতি লাভ করেছে। ভাষা-শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে ছড়ার প্রভাব অনস্বীকার্য। ভাবের অসংলগ্নতা ও যুক্তিহীনতা **আবোল তাবোল (Nonsense)** জাতীয় কবিতার লক্ষণ। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' এই জাতীয় রচনা।

ইংরেজী **'Allegory'** শ্রেণীর অনুকরণে বাংলা রূপক কাব্য সৃষ্ট হয়েছে। এই জাতীয় কবিতায় একটি প্রবহমান অর্থ থাকে ; কিন্তু তার সঙ্গে আরও একটি অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্ন প্রয়াণ', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশোক কানন' এই জাতীয় কাব্য। কাব্য-কবিতায় রূপক যখন সূক্ষ্ম হয়ে সাংকেতিকতায় পরিণত হয় ;—গল্পাংশ যখন ভাব কল্পনাকে ব্যঞ্জিত করে, তখন তাকে **সাংকেতিক বা প্রতীকী (Symbolic)** কাব্য বলে। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী,' 'দুই পাখী,' 'বালিকা বধূ' ইত্যাদি এই জাতীয় সাংকেতিক কবিতা।

রূপক কাব্য

পত্রের আকারে লেখা কাব্যকে **পত্রকাব্য** বা লিপি-কবিতা বলা হয়। এই জাতীয় বস্তুনিষ্ঠ কবিতায় নায়ক-নায়িকা পরস্পরের জন্য কবিতার মাধ্যমে পত্র রচনা করে। রোমান কবি ওভিদ (*Ovid*) এই শ্রেণীর কাব্যের জনক। মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' এই শ্রেণীর পত্র-কাব্য। বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে আখ্যান-ভাগ; চরিত্র-চিত্রণ, ভাব-ব্যঞ্জনা ইত্যাদি চমৎকারভাবে কাব্যের আকারে বিধৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'পত্র,' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পুরীর চিঠি', রাধারাণী দেবীর 'পরিণীতার পত্র' এই জাতীয় কবিতার নিদর্শন।

পত্রকাব্য

॥ কবিতা শিক্ষাদান ॥

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকে কবিতার স্বতন্ত্র স্থান থাকে। দ্রুত পঠনের মধ্যেও কবিতা স্থান পেয়েছে। পরীক্ষার মধ্যেও কবিতার স্থান গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীরাও কবিতার ক্লাস ভালোবাসে।

'রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ।' **কবিতা শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** হবে শিক্ষার্থীদের সেই 'অলৌকিক মায়ার জগতে' নিয়ে যাওয়া। **Coleridge** ব'লেছেন, "*Poetry is the blossom and the fragrance of all human knowledge, human thoughts, human passions, emotions, language.*" **Wodrsworth** বলেছেন, "*Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings ; **it takes its origin from** emotion recollected in tranquillity.*" কবিতার এইসব সংজ্ঞা ও স্বরূপের কথা মনে রাখতে হবে। কবিতার বিষয়বস্তু, দু'একটি ছত্রের ব্যাখ্যা, কয়েকটি শব্দের অলোচনা, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষা দিলেই কবিতার পাঠদান যথার্থ হয় না। কবিতা শিক্ষাদানের সময় রসানুভূতি, কবির মানসিকতা, কবিতার ছন্দ ও

কবিতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য

রূপনির্মিতি ইত্যাদির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। কবিতা বুদ্ধি দিয়ে বোঝাবার বিষয় নয়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার শিল্প। কবিতার পাঠগ্রহণ ক'রে কবি-হৃদয়ের আকুতি ও আর্তি যদি না অনুভব করা গেল, তবে তা ব্যর্থ। *Rhyburn* যথার্থই ব'লেছেন—"*Our task is to try to enable our pupils to catch something of what the poet felt and of what he was trying to express.*"

ছন্দ ও অলংকার কবিতার প্রাণসম্পদ। ছন্দ কবিতার অপরিহার্য অঙ্গ। সাম্প্রতিক কালে যদিও অমিত্রাক্ষর ছন্দ, গৈরিশ ছন্দ, মুক্তক ছন্দ ও গদ্য-ছন্দের কবিতা লেখা হ'চ্ছে, তবুও কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দের বাঁধনকে অস্বীকার করা যায় না। তান-প্রধান, ধ্বনি-প্রধান ও স্বর-প্রধান—এই তিন রীতির বাংলা ছন্দকে স্বীকার করা হ'য়েছে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিক বিভিন্ন ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রেছেন। ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কাব্য কবিতার রসাস্বাদনের সময় তাই ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন কবিতার সাহিত্যগুণ ও কাব্যোৎকর্ষ আলোচনার সময় ছন্দের আলোচনা প্রয়োজন। কবিতা পড়ানোর সময়ও ছন্দের প্রয়োজন হয়। কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ তাই অপরিহার্য, কারণ ছন্দোবদ্ধ পদকেই কাব্য বলা হয়। কবিদের অলংকার ব্যবহার থেকেই কাব্যে 'অলংকারবাদ' জন্ম নিয়েছে। "কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ", অলংকারযুক্ত বাক্যই কাব্য। এই মতবাদ একদিন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। পরে অবশ্য দেখা গিয়েছে যে, অলংকার কাব্যের সব কথা নয়। অলংকার যেমন নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে মাত্র, সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষমতা তার নাই এবং নির্দোষ অবয়বে অলংকার সংস্থান না ক'রলে যেমন সৌন্দর্যসৃষ্টি হয় না, সাহিত্যেও তেমনি। অলংকার কাব্য-কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, কাব্যের বক্তব্যকে সমৃদ্ধ করে কাব্যের আলোচনায় তাই অলংকারের স্থান স্থায়ী। কাব্যরসের আস্বাদনের সময়ও অলংকার অপরিহার্য। কাব্য-কবিতায় তাই ছন্দ ও অলংকারের গুরুত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না।

কাব্য কবিতায় ছন্দ ও অলংকার

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন **পাঠক্রম পর্যালোচনা** ক'রে সেই পাঠ্যক্রমে কবিতার স্থান সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম শ্রেণী ছাড়া অন্য সব শ্রেণীতেই সরকারী কর্তৃপক্ষ অথবা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রকাশিত বা অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক আছে। কিন্তু কোন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকেই বাংলা কবিতাগুলির বৈজ্ঞানিক সংকলন নেই। কোন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকেই কবিতা-সংকলনের জন্য তার কাব্যগুণের উপর জোর দেওয়া হয়নি; শিক্ষাদর্শন ও শিশু-মনস্তত্ত্বের কথাও গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়নি। অধিকাংশ কবিতাই নীতিজ্ঞান-শিক্ষামূলক, পৌরাণিক ও লঘু রচনা; এবং কাব্য-সাহিত্যের বিচারে সেগুলি নিকৃষ্ট। 'ছড়া' শিশু-চিত্তকে আকর্ষণ করে। অথচ সার্থক ছড়ার সংকলনগ্রন্থ বংলাভাষায় কমই আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে 'ছড়া' যথোপযুক্ত স্থান পায় নি। নিম্নমাধ্যমিক শ্রেণীর কবিতাগুলির অধিকাংশই হয়

নীতিজ্ঞান প্রচারমূলক নয়, পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণীতে 'হাটে,' কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', 'কালবৈশাখী', 'ভারততীর্থ' প্রভৃতি কতকগুলি সার্থক কবিতা স্থান পেয়েছে। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে, তাতে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিকে লুপ্ত ক'রে আবার দশম শ্রেণীর নতুন পাঠ্যক্রম প্রচলন করা হয়েছে।

প্রচলিত পাঠ্যক্রমে বাংলা কবিতার স্থান

সেক্ষেত্রেও বাংলা কবিতার সংকলন ও পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে কাব্যগুণ ও রসসৌন্দর্য গুরুত্ব পাবে বলে ঘোষণা করা হলেও কার্যত তা হয় নি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে দ্রুতপঠনের (*Rapid Reading*) পুস্তক নির্দিষ্ট থাকে। প্রতি শ্রেণীতেই একখানি কবিতার বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। দ্রুতপঠনের কবিতাগুলিও সুনির্বাচিত ও সুসংকলিত নয়। মাধ্যমিক শ্রেণীগুলির পাঠ্যপুস্তকে যে সব কবিতা পাওয়া যায়, তাদের নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে ;—

(১) **মহাকাব্যের অংশ** —'কবিগুরু বন্দনা', 'দধীচির তনুত্যাগ'।

(২) **দেশাত্মবোধক কবিতা** -'ভারতলক্ষ্মী', 'ভারততীর্থ', 'মা আমার', 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'।

(৩) **প্রকৃতিমূলক কবিতা** –'কালবৈশাখী', 'মধ্যাহ্নে'।

(৪) **গাথা শ্রেণীর কবিতা** —'প্রতিনিধি', 'দুই বিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য'।

(৫) **সনেট** —'কাশীরাম দাস', 'বঙ্গভূমি', 'প্রার্থনা'।

(৬) **শোক কবিতা** —'জীবন-ভিক্ষা'।

(৭) **পৌরাণিক কবিতা** - রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন অংশ পাঠ্যপুস্তকে প্রায়ই সংকলিত থাকে।

(৮) **নীতিজ্ঞানমূলক কবিতা** - 'স্বাধীনতা', প্রার্থনা', 'দেবতামন্দির মাঝে ভকত প্রবীণ……', ইত্যাদি।

(৯) **গদ্য কবিতা** -পাঠ্য নেই, তবে আধুনিক কবিদের রচনা অন্ততঃ উঁচু শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে থাকতে পারতো।

(১০) **রূপকধর্মী কবিতা**—'হাটে', 'রানার'।

(১১) **বর্ণনামূলক কবিতা**—'আমরা'।

(১২) **সংগীতধর্মী কবিতা**—'ভারতলক্ষ্মী', বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পদ, ব্রত-চারীর গান ইত্যাদি।

কবিতা শিক্ষাদানের সময় নিছক পাঠের উপর গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কবিতা বোঝবার জন্য 'নয়, অনুভব করবার জন্য। কবির অনুভূতি কাব্য-পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। কাব্যরসের আধার হচ্ছে পাঠকের মন। বার বার কাব্যপাঠের ফলে সেই 'মন' তৈরি হয়। তাই কবিতা শিক্ষাদানের সময় নিছক পাঠের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। কবিতার মধ্যে ছন্দের বন্ধন আছে। তাই কবিতা-পাঠের সময় ছন্দোজ্ঞান প্রয়োজন, কিন্তু

বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ছন্দ পাঠ্য নেই। অথচ প্রতি শ্রেণীতেই অনেকগুলি করে কবিতা পাঠ্য আছে। সেক্ষেত্রে ছন্দের প্রয়োজন আসে। কবিতা-পাঠের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছন্দ-বোধের সৃষ্টি ক'রতে পারেন, এবং সেটাই হল একমাত্র পথ। পাঠের মাধ্যমেই কবিতার রসানুভূতির স্পর্শ পাওয়া সম্ভব। তাই কবিতার ক্ষেত্রে সরব পাঠ খুবই কার্যকর। ছন্দ, যতি, ভাব ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে কবিতার আবৃত্তি যথোপযুক্ত শিল্প-পর্যায়ে পরিণত হয়। শিল্প হিসাবে আবৃত্তি সর্বত্রই স্বীকৃত। 'হাটে' (যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত), 'ভারততীর্থ' (রবীন্দ্রনাথ), 'ঝর্ণা' (সত্যেন্দ্রনাথ), 'কালবৈশাখী' (মোহিতলাল), 'আষাঢ়' (রবীন্দ্রনাথ), 'রানার' (সুকান্ত), 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' (নজরুল) প্রভৃতি কবিতাগুলি আবৃত্তির জন্য খুবই কার্যকরী। কবিতার পাঠ তার ভাব বিষয়বস্তু ও অর্থ গ্রহণেও সাহায্য করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কর্তৃক কবিতার সঠিক আবৃত্তি ও সরবপাঠ কবিতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য অনেকখানি সার্থক করে। কবিতা শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঠিক সরবপাঠ খুবই কার্যকর। ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকের আবৃত্তির ক্ষমতা থাকা খুবই প্রয়োজনীয়। সাহিত্যের শিক্ষক যদি আবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করতে না পারেন, তবে তিনি সফল হবেন কোথায়? শিক্ষার্থীরাও বিভিন্ন কবিতা মুখস্থ রাখবে ও ভাল আবৃত্তি ক'রতে জানবে। পরীক্ষায় আবৃত্তিকে স্থান দিতে হবে।

কবিতা শিক্ষাদানের সময় নিছক পাঠের উপর গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে **কবিতা শিক্ষাদানের বিভিন্ন অসুবিধা** লক্ষ্য করা যায়। পাঠ্যপুস্তকের কবিতাগুলি সুনির্বাচিত নয়—সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ নয়। তাই রসোত্তীর্ণ সার্থক কবিতা শিক্ষাদানের অসুবিধা প্রচলিত পাঠ্যক্রমের মধ্যেই নিহিত আছে। প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থা বিষয়ধর্মী, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন কবিতার বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন দেওয়া থাকে। শিক্ষাদানের সময় তাই কবিতার কাব্যগুণ উপেক্ষিত হয়। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাও কবিতা-শিক্ষাদানের সার্থক পরিবেশ সৃষ্টি করে না। কবিতা শিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলিও কৃত্রিম, গতানুগতিক ও পরীক্ষা-কেন্দ্রিক। স্বাধীন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, শিক্ষাদানের সময় বিভিন্ন শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ (*Teaching Aids*) ব্যবহৃত হয় না। কবিতা শিক্ষাদানের সময় ছন্দ, অলংকার উপেক্ষিত হয়;—রসানুভূতি ও সরবপাঠও যথাযথ গুরুত্ব পায় না। কাব্য কবিতার চর্চা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাই আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ে আছি।

কবিতা-শিক্ষাদানের অসুবিধা

কবিতা শিক্ষাদানকে যথাযথ ক'রতে হ'লে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ ক'রতে হবে ;—

(১) কাব্যগুণের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্য পুস্তকের কবিতাগুলির সংকলন ক'রতে হবে। পাঠ্য পুস্তকের বাইরের কবিতা পড়ানোর স্বাধীনতা শিক্ষককে দিতে হবে।

(২) প্রচলিত শিক্ষা ও পরীক্ষা-ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত ক'রতে হবে।

(৩) কবিতা শিক্ষাদানের সময় আবৃত্তির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

(৪) বিভিন্ন শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ (*Teaching Aids*) ব্যবহার ক'রতে হবে।

(৫) কবিতা শিক্ষাদানের সময় ছন্দ ও অলংকারের উপর নজর রাখতে হবে। কবিতার কাব্যগুণ সম্বন্ধে অবহিত করাই কবিতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

(৬) শিক্ষাদর্শন ও শিশু মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভর ক'রে আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলি ব্যবহার ক'রতে হবে।

(৭) পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অন্যান্য কাব্য-পাঠে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত ক'রতে হবে।

(৮) শিক্ষকের শিক্ষাদানের দক্ষতার উপর শিক্ষার্থীদের কাব্য-কবিতার শিক্ষা গ্রহণ অনেকখানি নির্ভর করে।

(৯) পাঠ-টীকা (*Lesson Plan*) রচনা ক'রে পরিকল্পনা সহকারে কবিতার শিক্ষাদান ক'রতে হবে।

সাহিত্যিক উপলব্ধি
(Literary Appreciation)

কাব্য ও সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে সাহিত্যিক উপলব্ধি প্রয়োজন। শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর জ্ঞানই নয়,—কাব্য-কবিতার সাহিত্যোৎকর্ষ, ধ্বনি-মাধুর্য, সৌন্দর্যানুভূতি, রসচেতনা ও নন্দনতত্ত্বের সার্থক উপলব্ধি চাই। কাব্যের আধার হ'চ্ছে সহৃদয় পাঠকের মন। তাই মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুভূতির অনুরণন হবে কাব্য-পাঠের মধ্য দিয়ে। পাঠক এই বাস্তব পৃথিবীর সীমারেখা অতিক্রম ক'রে রস ও কাব্যের অলৌকিক মায়ার জগতে অনুপ্রবেশ ক'রবে। এই অনুভূতিই কাব্য-সাহিত্যের সাহিত্যিক উপলব্ধি। **কোন কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গ্রহণ ও আস্বাদন করা হয়ঃ—**

(১) কাব্যের বিষয়বস্তুর ভাবগ্রহণ

(২) বিষয়বস্তু অনুযায়ী কাব্যের রূপনির্মিতির পরিচয়

(৩) কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দ ও অলঙ্কার—এবং তার শিল্পগত সৌৎকর্ষ

(৪) কাব্যের ধ্বনি ও রসের সার্থক উপলব্ধি

(৫) কাব্যের শব্দপ্রয়োগ-কৌশল, কবির *Style* ইত্যাদির পরিচয়

(৬) কাব্যের সৌন্দর্য ও নন্দনতত্ত্বের আস্বাদন

উল্লিখিত বিষয়গুলি কোন কাব্য-কবিতাকে সাহিত্য ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ করে। কাজেই এগুলির সার্থক পরিচয় ছাড়া কোন কাব্য-কবিতার সাহিত্যিক উপলব্ধি সম্ভব নয়। আর এই সাহিত্যিক উপলব্ধিই কাব্য-সাহিত্যের পাঠ ও শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ও সার্থক ক'রে তোলে। কাব্য-কবিতা শিক্ষাদানের সময় তাই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তার সার্থক সাহিত্যিক উপলব্ধি সম্ভব ক'রে তুলতে পারে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। শিশু-সাহিত্যে কবিতার স্থান কতখানি? প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত বালক-বালিকাদের কি ধরনের কবিতা পড়াইবে, তাহার নমুনা দাও। (কলি, বিশ্ব., বি. টি. ১৯৪৭)

২। কবিতা পড়াইবার সময় নিছক পাঠের উপর জোর দেওয়ার বিশেষ কোন আবশ্যকতা আছে কি না, তাহা আলোচনা কর। (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৫১)

৩। কবিতা এবং গদ্য পড়াইবার পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি ১৯৬০)

৪। কবিতা পড়াইবার সাফল্য সুষ্ঠু পাঠের উপর কতটা নির্ভর করে? আদর্শ পাঠের লক্ষণ কি কি? (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৬১)

৫। কবিতা পড়ানোয় ছাত্রদের মনে অলঙ্কার-বোধ কি ভাবে জাগানো যায়, তাহা বিস্তৃত আলোচনা করুন। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৬৩)

৬। পাঠ্যপুস্তকে গান ও গীতি কবিতাংশ অনেক সময়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে; ইহাদের স্বাতন্ত্র্য কোথায়, তাহার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিয়া আলোচনা করুন। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৬৫)

৭। কবিতা-পাঠে কোন্ লক্ষ্য সঙ্গত? উপস্থাপন সোপানে তাহার অনুকূল পদ্ধতি কি? অভিযোজনে কোন্ ধরনের প্রশ্ন হইবে। বাড়ির কাজ কি দেওয়া যাইতে পারে? স্বনির্বাচিত একটি কবিতা উল্লেখ করিয়া মন্তব্যগুলি লিখ। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি ১৯৬৬)

৮। কবিতা পড়াতে হলে কোন্ কোন্ দিকে নজর রাখা দরকার? উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে এ বিষয়ে আমাদের কোন্ দিকে সবচেয়ে বেশী করে নজর দিতে হবে? (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৯)

৯। কবিতা-পাঠের উদ্দেশ্য কি? বাংলা কবিতা কিভাবে পড়ানো উচিত? (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৭০)

১০। পঞ্চ-সোপান পদ্ধতিতে বাংলা কবিতা কি সার্থকভাবে পড়ানো সম্ভব? আরও কার্যকরী পন্থা কিরূপ হইতে পারে, উদ্দেশ্য-সাধনের দিক্ দিয়া বিচার করিয়া লিখুন। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৭২)

১১। কবিতা-পঠনের উদ্দেশ্য ও উপযুক্ত রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (কলিঃ বিশ্ব, বি. এড. ১৯৭২)

১২। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে কবিতার অন্তর্ভুক্তি শিক্ষাতত্ত্বের বিচারে যুক্তিযুক্ত কি না, আলোচনা করুন। কবিতা পড়াইবার জন্য শিক্ষকের কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের প্রয়োজন আছে কি? (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৪)

১২। বাংলা কবিতা পড়াইতে হইলে কোন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন এবং লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইলে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে? (কল্যাণী বিশ্ব, বি. এড. ১৯৭৩)

১৪। কবিতা পাঠের উদ্দেশ্য কি? কবিতা পাঠকে হৃদয়গ্রাহী ও সার্থক করিতে হইলে কোন্ পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ বলিয়া আপনি মনে করেন, তাহা যুক্তি-সহকারে আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৮)

অষ্টম অধ্যায়

ছড়া

[Nursery Rhymes]

লোকসাহিত্যের এক সমৃদ্ধিশালী শাখা হ'ল ছড়া। সুপ্রাচীন কাল থেকে বহু ছড়া রচিত হ'য়ে বাংলার জনজীবনকে সমৃদ্ধ ক'রেছে। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এই ছড়ার জন্ম,—এই ছড়ার ব্যবহার। এই অসংখ্য ছড়ার রচয়িতাদের সঠিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা অসম্ভব। ঈশ্বর গুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথ সে চেষ্টা করেছিলেন। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এই ছড়া রচিত হ'য়েছে, ব্যবহৃত হ'য়েছে। বাংলার সমাজ-জীবনের অনেক পরিচয় এই ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়। ছড়া তাই লোকসাহিত্যের এক প্রধান সম্পদ। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যে অসংখ্য ছড়া রচিত হ'য়েছে, ব্যবহৃত হ'য়েছে ও বিস্মৃত হ'য়েছে, তার সঠিক পরিচয় দেওয়া কষ্টকর। কিন্তু জনজীবনের রসমাধুর্য ও আনন্দলোক সৃষ্টি করতে এই ছড়াগুলি একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল; বাংলাদেশের গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহকোমল অংশের অনেকখানি জুড়ে এই 'ছড়া'। বিশেষ ক'রে শিশুদের কাছে ছড়ার আকর্ষণ অনিবার্য, আবেদন অবিসংবাদিত।

লোকসাহিত্য ও ছড়া

ছড়ার প্রধান সম্পদ হল এর **ছন্দ**। ডঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের মতে 'ছড়ার সঙ্গে ঢাক ও ঢোলের বাজনার মিল আছে'। ব্রতকথার সঙ্গে ছড়ার সুরের মিল আছে; - কবিয়ালদের গানে ছড়ার সুর-স্পন্দন শোনা যায়। ছড়ার ছন্দ খুবই সুস্পষ্ট। ছড়ার ছন্দ হ'ল শ্বাসাঘাত প্রধান, বলপ্রধান বা স্বরবৃত্ত। শ্বাসাঘাতের প্রাধান্য হ'ল ছড়ার ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য। ছড়ার ছন্দ দ্রুত লয়ের। এই ছন্দে প্রতিপর্বে চার মাত্রা;—প্রতিপর্বের প্রথমে প্রবল শ্বাসাঘাত, শ্বাসাঘাতের পরবর্তী অক্ষরটি হয় লঘু। তাই একই পর্বাঙ্গে পর পর দু'টি অক্ষরে বা পর্বাঙ্গের মধ্যস্থিত একাধিক অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে না। দ্রুত লয় ও শ্বাসাঘাতের প্রাধান্য হ'ল ছড়ার ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য।

ছড়ার ছন্দ

ছড়ার বিষয়বস্তু হল বহু বিচিত্র। বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে বিচার ক'রলে দেখা যায় যে, ছেলে-ভোলানো ছড়ার সংখ্যাই সর্বাধিক। ছোট ছেলেকে নিয়ে খেলা করা, আদর করা, ঘুম পাড়ানো, কান্না থামানো ইত্যাদির সময়ে ছড়ার ব্যবহার করা হয়। মা, মাসী, দিদিমা, ঠাকুরমা প্রভৃতি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এই সব ছড়া শুনিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁদের স্নেহ ও ভালবাসা। স্নেহ-ভালবাসার সূক্ষ্ম তন্ত্রীর উপর ছড়ার সুর-মূর্ছনা ব'লে ছড়া ক্ষণস্থায়ী; কারণ কোন সূক্ষ্ম ভাব দীর্ঘস্থায়ী হ'তে পারে না। অনেক সময় ছড়ার বিষয়বস্তুর মধ্যে অসংগতি দেখা যায়, অবাস্তব শব্দের ধ্বনিঝংকার শোনা যায়। ছড়ার বিষয়বস্তুর মধ্যে চিত্রধর্মিতা থাকে, ছড়া শোনবার সঙ্গে সঙ্গে তার বিষয়বস্তুর চিত্র শিশুমনে ভেসে উঠে। মেয়েদের বিয়ের ঘটনা অনেক ছড়ার বিষয়বস্তু। আমাদের দেশে বাল্য বিবাহ মেয়েদের জীবনের এক দুর্বিষহ

যন্ত্রণা ; বিয়ের ঘটনা তাই মেয়েদের সমাজ-জীবনে বেদনাদায়ক। এই বিয়ের ঘটনা তাই বহু ছড়ার বিষয়বস্তু। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বর-কনে ভালবাসে। প্রবহমান জীবনে বর-বধূর বিচিত্র সাজের মধ্যে শিশু অসংগতি লক্ষ্য করে। বিয়ের মধ্যে শিশু ভবিষ্যৎ জীবনের সুখশান্তির আলো দেখতে পায়। বিয়ের কথা বা ঘটনা তাই তাদের কাছে আকর্ষণীয়। ছড়ার বিষয়বস্তুর মধ্যে তাই বিয়ে, বর-কনে ইত্যাদি ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে। নারীজীবনের দুঃখ-জ্বালা-বেদনাকে অতিক্রম ক'রবার জন্য মেয়েরা বার-ব্রত করে। তাকে অবলম্বন ক'রেই 'মেয়েলি ছড়া' ও 'ব্রতের ছড়া'। রূপকথার যাদুধর্মিতাকে কেন্দ্র ক'রে পরী, রাজপুত্র ইত্যাদি বিষয়ের উপরও বহু ছড়ার বিষয়বস্তু। ভয় মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। ভূত, দৈত্য, রাক্ষস, যুদ্ধ প্রভৃতি ভীতিদায়ক ঘটনা অনেক ছড়ার বিষয়বস্তু। কৃষি-প্রধান এই দেশের কৃষিকাজকে অবলম্বন ক'রে অনেক ছড়া রচিত হ'য়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনা, কিংবদন্তী ইত্যাদি অবলম্বনেও অনেক ছড়া ('বর্গী') রচিত হ'য়েছে। বাংলা-দেশের সমাজ-জীবনের দুঃখ-বেদনা, হাসি-অশ্রু, অভাব-অনটন, জ্বালা-যন্ত্রণা, সুখ-শান্তি, স্নেহ-মমতা ইত্যাদি বিষয়বস্তু অসংখ্য ছড়ার মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

ছড়ার বিষয়বস্তু

ছড়া লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা। **ছড়ার ভাষা** তাই সমাজ-জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কথ্য ভাষার চমৎকার প্রয়োগ ছড়ার মধ্যে দেখা যায়। কথ্য ভাষা ছড়াকে একটি বিশিষ্ট গতি ও বলিষ্ঠ রূপ দান করে। ছড়ার মধ্যে অনেক অর্থহীন শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ছন্দ, ভাব, ধ্বনিবৈচিত্র্য ইত্যাদি সৃষ্টির জন্য ছড়ার মধ্যে এই সব অর্থহীন শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তদ্ভব, দেশী ও গ্রাম্য বহু শব্দ ছড়ায় স্থান পেয়েছে। ছড়ার নামপদ (বিশেষ্যপদ) ও ক্রিয়াপদের সংখ্যাই সর্বাধিক। কথ্য ভাষা, গ্রাম্য শব্দ ও সমাজ-জীবনের কথা ছড়াকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ক'রে তোলে। ছড়ার ভাষা ভাবপ্রকাশের উপযোগী সার্থক মাধ্যম। ছড়ার ভাষা খুব স্পষ্ট, সহজ ও সরল। ভাবকে সহজবোধ্য ক'রে তোলবার জন্যই ছড়ার ভাষা এত সহজ ও সরল। ছড়ার মধ্যে অনেক উপভাষাও (*Dialect*) লক্ষ্য করা যায়।

ছড়ার ভাষা

ছড়ার অন্যতম প্রধান সম্পদ হল এর **যাদুধর্মিতা**। রূপকথার মত স্বপ্নময়তা ছড়ার মধ্যে সৃষ্টি করা হয়। ছড়ার অর্থহীন শব্দগুলি এই যাদুধর্মিতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে ;—ছড়ার বিষয়বস্তু এই স্বপ্নময়তা সৃষ্টির অবলম্বন। অর্থহীন শব্দগুলির ধ্বনিঝংকার শিশু-চিত্তকে আকৃষ্ট করে। আবার পরী, রাজপুত্র, বিয়ে প্রভৃতি বিষয় যাদুধর্মী স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। শব্দ, ভাব, ভাষা ইত্যাদির অবাস্তবতা ও অসংগতিও ছড়ার যাদুধর্মিতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ছড়ার এই যাদুধর্মিতা শিশুচিত্তকে আকৃষ্ট করে ; এবং এই **স্বপ্নময় যাদুধর্মিতাই হ'ল ছড়ার অন্যতম প্রাণসম্পদ**।

ছড়ায় যাদুধর্মিতা

ছড়ার ছত্রে ছত্রে মায়ের স্নেহকোমল মনের স্পর্শানুভূতির সংবেদন ছড়িয়ে আছে। ছড়া মায়েদের গার্হস্থ্য জীবনের সাহিত্য। গার্হস্থ্য জীবনের যেটুকু অংশকে মায়েরা এবং মেয়েরা তাদের স্নেহকোমল স্পর্শে সঞ্জীবিত ক'রতে পেরেছে, ছড়ায় তার রসঘন অভিব্যক্তি। ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর দিতে দিতে, খেলা ক'রতে করতে এই ছড়ার সৃষ্টি। ছেলে রাগ ক'রেছে, আড়ি ক'রেছে, কাঁদছে—এই অবস্থায় মা তাকে কোলে নিয়ে ছড়া বলছেন শিশুর মন ভোলানোর জন্য। ছড়ার মধ্যে তাই মায়ের অপত্যস্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ও বাৎসল্য সহস্রধারায় উৎসারিত হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—"এই ছড়াগুলির সঙ্গে চিরকাল যে স্নেহার্দ্র সরল মধুর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে, আমার মতো মর্যাদাভীরু গম্ভীরস্বভাব বয়স্ক পুরুষের লেখনী হইতে সে ধ্বনি কেমন করিয়া ক্ষরিত হইবে? পাঠকগণ আপন গৃহ হইতে আপন বাল্য স্মৃতি হইতে, সেই সুধাস্নিগ্ধ স্বরটুকু মনে মনে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। ইহার সহিত যে স্নেহটি, যে সংগীতটি, যে সন্ধ্যাপ্রদীপালোকিত সৌন্দর্য ছবিটি চিরদিন একাত্মভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে, সে আমি কোন্ মোহমন্ত্রে পাঠকদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিব!" (ছেলে-ভুলানো ছড়া) শিশুর জীবনকে কেন্দ্র ক'রেই মায়ের স্নেহপ্রবণ জীবনের যাত্রাপথ। স্নেহ, আদর, ভালোবাসা দিয়েই মা শিশুর জীবনকে ভরে দিতে চান। ছড়ার মধ্যে সেই স্নেহ-ভালোবাসার স্পর্শ আছে। শিশুকে আদর ক'রতে, খাওয়াতে, ঘুম পাড়াতে মা ছড়া বলেছেন;—শিশু-কন্যাকে পতিগৃহে পাঠানোর কল্পনাতে বেদনাবিধুর ছড়া আবৃত্তি ক'রেছেন; চাঁদ দেখে সোনার চাঁদ ছেলেকে আদর ক'রতে ক'রতে ছড়া বলেছেন। ছড়া তাই মায়ের অপত্যস্নেহের প্রীতিস্নিগ্ধ রূপ মায়ের অন্তর-বেদনার প্রতিচ্ছবি, স্নেহ-ভালোবাসার সাহিত্যরূপ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠানো।......সেই সকরুণ কাতর স্নেহ, বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের ঘরের এই স্নেহ, ঘরের দুঃখ, বাঙালির গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,......আমাদের ছড়ার মধ্যেও বঙ্গজনীর এই মর্মব্যথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে'—

ছড়ায় মায়ের মনোভাব

> "আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
> দুর্গা যাবেন শ্বশুর বাড়ি, সংসার কাঁদিয়ে॥
> মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধুলায় লুটায়ে।
> সেই-যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে॥" (ছেলে-ভুলানো ছড়া)

ছড়ার মধ্যে কন্যাবিরহ-জনিত মাতৃহৃদয়ের এই হাহাকার ধরা পড়েছে। ছড়ার মধ্যে তাই মায়ের স্নেহকোমল মনের স্পর্শ পাওয়া যায়।

শব্দসম্ভার ও শব্দ-বৈচিত্র্য হ'ল ছড়ার অন্যতম সম্পদ। বিভিন্ন ছড়ার মধ্যে যে সব শব্দ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে সংখ্যায় সর্বাধিক হল নামপদ বা বিশেষ্যপদ। ছড়া

শিশুর কাছে আকর্ষণীয় ব'লে ভাষা-শিক্ষায় ছড়ার প্রয়োজন হয়। ছড়ায় বিশেষ্যপদের সংখ্যা সর্বাধিক হওয়ায় তা শিশুর ভাষা-শিক্ষার পক্ষে খুবই কার্যকরী হয়। এই সব বিশেষ্যপদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তরুণ বয়সে শব্দের প্রতীকদ্যোতকতা সম্বন্ধে সুশিক্ষিত হয়। নামপদের পর ক্রিয়াপদের সংখ্যা ছড়ায় বেশী। নামপদ ও ক্রিয়াপদের যথার্থ শিক্ষা শিশুকে ভাষা-শিক্ষায় সফল করে। ছড়ার শব্দগুলির মধ্যে অধিকাংশই দেশী ও গ্রাম্য শব্দ, তদ্ভব শব্দের সংখ্যাও কম নয়। এইসব শব্দের মধ্যে বিভিন্ন উপভাষার (**Dialect**) বিশিষ্ট শব্দও লক্ষ্য করা যায়। ছড়ার মধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলি হ'ল অর্থহীন। এই অর্থহীন শব্দগুলির যাদুধর্মিতা শিশুচিত্তকে আকৃষ্ট করে। ধ্বনিঝংকারই ছড়ার শব্দের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। ছন্দোময় এক অপূর্ব ধ্বনিঝংকার ছড়ার শব্দগুলিকে শিশুচিত্তের কাছে আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছে।

ছড়ার শব্দসম্ভার

মনস্তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট শাখা। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যেই মানব-মনকে বিশ্লেষণ ক'রবার প্রচেষ্টা হ'য়েছে। শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি সব কিছুর সঙ্গেই মানুষের মনের সম্পর্ক ; এবং তাকে ঘিরেই মনোবিজ্ঞান। শিশু-মনস্তত্ত্বের মাধ্যমে ছোটছোট ছেলেমেয়েদের মনকে বিশ্লেষণ করবার প্রচেষ্টা হ'য়েছে। ছড়া শিশুর সাহিত্য; শিশু ছড়া ভালবাসে। ছড়া শিশুকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। ছড়ার মধ্যে তাই **শিশু-মনস্তত্ত্ব** অনিবার্যভাবেই বিদ্যমান। শিশু-মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিকগুলি ছড়ার মধ্যে অপূর্বভাবে বাণীমূর্তি লাভ ক'রেছে। ছড়ার মধ্যে শিশুমনস্তত্ত্ব থাকলেও ছড়ার রচয়িতাদের মধ্যে সকলেরই শিশুমনস্তত্ত্বের পরিপূর্ণ জ্ঞান ছিল না। গার্হস্থ্য জীবনের কথা অত্যন্ত সহজ, সরল ও ছন্দোবদ্ধভাবে ছড়ার মধ্যে বিধৃত হ'য়েছে। সেক্ষেত্রে শিশুমনস্তত্ত্বের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন-ভাবে কাজ ক'রেছে। সমস্ত ছড়া-রচয়িতা মনস্তাত্ত্বিক ছিলেন না; মনস্তত্ত্বের জ্ঞান অর্জন করেও ছড়া রচনা করা হয় নি, ছেলে-ভোলানো ছড়ার অধিকাংশই মা-দিদিমা-পিসীমা ইত্যাদির মুখে মুখে রচিত। তবুও ছড়া শিশুকে আকর্ষণ করে। শব্দ, বিষয়, ধ্বনি, চিত্রধর্মিতা, যাদুধর্মিতা, ছন্দ, শ্বাসাঘাত, অবাস্তবতা ইত্যাদি এমন কতকগুলি দিক্ আছে, যা শিশুদের কাছে পরম লোভনীয়। ছড়ার মধ্যে শিশু-মনস্তত্ত্ব থাকলেও মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলি ধ'রে ছড়া রচিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলে-ভোলানো ছড়া' প্রবন্ধে বলেছেন, – "**ছড়াগুলি ভারহীনতা অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্যবশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশু মনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।**"

ছড়া ও শিশু মনস্তত্ত্ব

ছড়া শিশুকে আকর্ষণ করে। প্রায় সমস্ত শিশুই ছড়া ভালবাসে। কিন্তু কেন? বিভিন্ন কারণে ছড়া শিশুকে আকর্ষণ করে। সেগুলি হ'ল ;—

॥ **এক** ॥ ছড়ার ছন্দ শিশুকে আকর্ষণ করে। চার মাত্রার ছোট ছোট পর্ব, দ্রুত

লয় ও প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত, সংযুক্ত স্বরবৃত্ত বলপ্রধান লৌকিক ছন্দ ছড়ার মধ্যে এমন মনোহারিত্ব সৃষ্টি করে, যার আবেদন শিশুচিত্তে অনিবার্য।

॥ **দুই** ॥ ছড়ার শব্দরাজি শিশুচিত্তে আকর্ষণ সৃষ্টি করে। ছড়ার শব্দগুলির অবাস্তবতা ও অর্থহীনতা শিশুদের কাছে লোভনীয়। ছড়ার শব্দগুলির অপূর্ব ধ্বনিঝংকারও শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়।

॥ **তিন** ॥ ছড়ার বিষয়বস্তু শিশুচিত্তকে আকৃষ্ট করে। লঘু, চপল, রূপকথাধর্মী বিষয়বস্তু শিশুদের কাছে পরম লোভনীয়। সামাজিক রীতিনীতি, ঐতিহাসিক ঘটনা, বিবাহ-অনুষ্ঠান, নব পরিণীতা বধূর শ্বশুরালয়ে গমন শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় হয়। অনেক সময় ছড়ার বিষয়বস্তুর অসংগতি ও অবাস্তবতাও শিশুচিত্তকে আকৃষ্ট করে।

॥ **চার** ॥ ছড়ার যাদুধর্মিতা শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়। বিষয়বস্তুর অবাস্তবতা, অর্থহীন শব্দের সংস্থান, রূপকথাধর্মী বিষয়বস্তু, বিষয়বস্তুর অবাস্তবতা ছড়ার মধ্যে এক স্বপ্নমন্দির পরিবেশ সৃষ্টি করে ; এবং তা শিশুচিত্তকে আকৃষ্ট করে।

॥ **পাঁচ** ॥ কথ্য ভাষা, গ্রাম্য শব্দ ও তদ্ভব শব্দ শিশুদের কাছে ছড়ার আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।

॥ ছয় ॥ **অপত্য স্নেহের সহস্রধারার অকৃপণ বর্ষণ ছড়ার ছত্রে ছত্রে এক শান্ত স্নিগ্ধ রূপ এনে দিয়েছে।** মা, দিদিমা, পিসীমা, কাকীমা, মাসীমা-রা যুগে যুগে ছেলেমেয়েদের কোলে নিয়ে খাওয়ানো, ঘুম-পাড়ানো, কান্না-থামানোর জন্যে আদর ক'রে খেলাচ্ছলে ছড়া বলেছেন ; তাই ছড়ার মধ্যে শিশুচিত্ত মাতৃস্নেহের অপূর্ব মাধুরি দেখতে পায়, এবং তা শিশুমনকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করে।

॥ **সাত** ॥ ছড়ার চিত্রধর্মিতা ও সংগীতময়তাও শিশুদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। শিশু ছড়া ভালোবাসে ; শিশুদের কাছে ছড়া আকর্ষণীয়। ছড়া শিশুর সাহিত্য। শিশুসাহিত্যের পরিধি বিশাল, ছড়া তার একটি বিশিষ্ট শাখা মাত্র। ছড়ার বিভিন্ন দিক্ শিশুচিত্তকে আকর্ষণ করে, শিশু ছড়া ভালোবাসে। কিন্তু সাহিত্যগত বিচারে ছড়ার কাব্যগুণ ও রসমাধুর্যের অনুভূতি সবসময় শিশুর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

ছড়া কি শিশুসাহিত্য ?

ছড়া তাই শিশুর প্রয়োজন সিদ্ধ করে, ভাষা-শিক্ষায় সহায়তা করে, শিশুচিত্তকে আকৃষ্ট করে। রচয়িতাদের অনুভূতির নিবিড়তায় ছড়াগুলি সার্থক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচিত হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ছড়াগুলি শিশু-সাহিত্য ; তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে।" ছড়ায় শিশু-মনস্তত্ত্ব উপেক্ষিত নয়। চিরন্তন ও সর্বজনীন আবেদন নিয়ে ছড়াগুলি সৃষ্ট হ'য়েছে। **ছড়া তাই শিশুসাহিত্য।**

বাংলা ভাষায় অজস্র ছড়া রচিত হ'য়েছে। সেই সব ছড়াগুলি আজও যথাযথভাবে সংকলিত হয় নি। অনেক ছড়া তার জন্মলগ্নেই স্থায়িত্বের মর্যাদা হারিয়েছে ;—অনেক ছড়া লোক-মুখে বিস্মৃত, অর্ধবিস্মৃত ও পরিবর্তিত। তা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শাখা হল 'ছড়া'। এই শাখাটি রীতিমত

সমৃদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথ বহু প্রাচীন ছড়া সংকলিত ক'রবার চেষ্টা ক'রেছেন। ফলে, অনেকগুলি ছড়া বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেয়েছে। আধুনিক নগর-সভ্যতার যুগেও বহু কবি ও লেখক বহু সার্থক ছড়া রচনা ক'রেছেন। এযুগে ছড়ার মুখ্য সাহিত্যিকেরা হ'লেন রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, অন্নদাশংকর রায়, সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু, সুখলতা রাও ও স্বপনবুড়ো প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকগণ। **বাংলা সাহিত্যের** ঐতিহাসিক লেখক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা ছড়া সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা ক'রে বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটির যাত্রাপথকে আরও সুগম করেছেন। বাংলা-দেশের ঘরে ঘরে এই ছড়ার প্রচলন ; বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে এই ছড়ার অপূর্ব ধ্বনিঝংকার। ছড়া আজ তাই বাংলা সাহিত্যের এক সমৃদ্ধিশালী শাখা।

বাংলা সাহিত্য ও ছড়া

শিশু ছড়া ভালবাসে, ছড়া শিশুকে আকর্ষণ করে। ছড়াকে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে তার কার্যকারিতাও হয় অবশ্যম্ভাবী। শিশুর ভাষা-শিক্ষায় ছড়ার স্থান স্থায়ী অপরিহার্য। বিশেষ ক'রে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে (*Pre Primary Stage*) ও প্রাথমিক স্তরে (*Primary Stage*) ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে ছড়াকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে যখন ভাষা-শিক্ষায় অনেকটা শৃঙ্খলাহীন অবস্থা, তখন ছড়ার-মাধ্যমে শিক্ষাদান খুবই কার্যকর। ছড়ার মধ্যে অধিকাংশই নামপদ বা বিশেষ্যপদ। ছড়ার মাধ্যমে এই নামপদের শিক্ষা শিশুদের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীকদ্যোতকতার শিক্ষা দেয়। ভাষা-শিক্ষার প্রথম স্তরে এই প্রতীকদ্যোতকতার জ্ঞান খুবই প্রয়োজন। ছড়ার ছন্দ, শব্দ, ধ্বনি, বাক্যবিন্যাস, ভাষা, বিষয়বস্তু ও ভাব ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করে। শিশু ছড়া ভালবাসে এবং বাল্যাবস্থায় তারা ছড়ার সরব পাঠ ও আবৃত্তি করে। এই সরব পাঠ ভাষা-শিক্ষায় ও ভাষাবোধ বিকশিত ক'রবার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর। গৃহ-পরিবেশ, আত্মীয়স্বজন ও বিদ্যালয় পরিবেশে শিশু আত্মপ্রতিষ্ঠা ক'রতে চায়, এই প্রবৃত্তিকে বলা হয় "আত্মসাযুজ্যবোধ" (*Instinct of Self-assertion*)। ছড়ার সরব আবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার এই প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি হয়। শিশুর প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলির (*Instincts and emotions*) উদ্‌গতি-সাধনের (*Sublimation*) জন্য ছড়ার প্রয়োজন আছে। ছড়ার চিত্রধর্মিতাও ভাষাশিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। ৭।৮ বৎসর পর্যন্ত শিশুর জীবন প্রধানত ইন্দ্রিয়নিয়ন্ত্রিত। ছড়ার ধ্বনিঝংকার, যাদুধর্মিতা, বিষয়-বৈচিত্র্য, সংগীতময়তা ও ছন্দ শিশুর ইন্দ্রিয়-চেতনাকে আকৃষ্ট করে। শিশুর ভাষা-শিক্ষায় ছড়ার স্থান তাই অনিবার্য। অনেক সময় শিশু স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন ছড়া আয়ত্ত করে। বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বসম্মত উপায়ে ছড়া-গুলিকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারলে শিশুর ভাষাশিক্ষা সহজ ও সার্থক হবে।

ভাষা-শিক্ষায় ছড়ার স্থান

॥ অনুশীলনী ॥

ভাষা, বিষয়বস্তু, খোকা-খুকুর ছড়ায় মায়ের মনোভাব ও ছন্দের প্রতি শিশুদের আকর্ষণ—মাত্র এই কয়টি শীর্ষে বাংলার প্রাচীন ছড়ার উপর একটি প্রবন্ধ রচনা করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৭০)

নবম অধ্যায়

দ্রুতপঠন

[Rapid Reading]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দ্রুতপঠনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। বিদ্যালয়ে ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্যক্রমে প্রতি শ্রেণীতেই এক-একটি পাঠ্যপুস্তক (*Text Book*) থাকে। এই পাঠ্যপুস্তকে গদ্য ও পদ্য—এই উভয়বিধ রচনাকেই সংকলিত করা হয়। শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষা ও সাহিত্যানুশীলনের দিকে লক্ষ্য ক'রে পাঠ্যপুস্তক সংকলিত করা হয়। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের গদ্য ও পদ্য রচনা শিক্ষার্থীদের ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্য-চর্চার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত ও অবিশেষিত পাঠ্য (*Non-detailed study*) হিসাবে দ্রুতপঠন পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীতেই দ্রুতপঠন পাঠ্যক্রমের (*curriculum*) অন্তর্ভূর্ত হ'য়েছে। শ্রেণী, শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কোন শ্রেণীতে একটি, কোন শ্রেণীতে একাধিক পুস্তক বিদ্যালয়ে দ্রুতপঠনের জন্য নির্দিষ্ট হয়। গদ্য ও পদ্য—এই উভয়বিধ রচনাই দ্রুতপঠন হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কবিতায় সংকলন-গ্রন্থ (যেমন, 'কাব্য-মালঞ্চ'), কাব্যগ্রন্থ (যেমন, 'গাথাঞ্জলি'), উপন্যাস (যেমন, 'রাজর্ষি'), প্রবন্ধ-গ্রন্থ (যেমন, 'চরিতকথা', 'রামায়ণী কথা'), রম্যরচনা (যেমন, 'কমলাকান্তের দপ্তর') ইত্যাদি পুস্তক দ্রুতপঠনের জন্য গ্রহণ করা হয়। **দ্রুতপঠন হ'ল পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক; শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষা, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদির অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টিতে অনিবার্য**। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাই দ্রুতপঠনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

দ্রুতপঠন ও পাঠ্যপুস্তক

ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে **দ্রুতপঠনের প্রয়োজনীয়তা** অনস্বীকার্য। দ্রুতপঠন হল পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক। পাঠ্যপুস্তকে যে কয়টি রচনা সংকলিত থাকে, তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাহিত্যচেতনা তৃপ্ত হয় না, কৌতূহল শান্ত হয় না, সাহিত্যানুরাগ যথেষ্টভাবে সৃষ্ট হয় না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্যবোধ জাগ্রত ক'রতে দ্রুতপঠন হ'ল এক অপরিহার্য মাধ্যম। দ্রুতপঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষাশিক্ষাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত বিভিন্ন গদ্য ও পদ্য রচনা অনেক সময় সংক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন; লেখকের মূল রচনাকে সংক্ষিপ্ত ক'রে বা মূল রচনার অংশবিশেষ গ্রহণ ক'রে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সংকলন করা হয়। তাতে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল যথাযথভাবে চরিতার্থ হয় না,—সাহিত্য-নন্দন-চেতনা, শিল্প-সৌন্দর্য-মণ্ডনকলা, রস-সম্ভোগ ও লেখকের সংবেদনশীল অনুভূতি-প্রবণ মনের সর্বাংশ

দ্রুতপঠনের প্রয়োজনীয়তা

ধরা পড়ে না। বাংলা সাহিত্যের **পরিণত ফসল ও উন্নত সাহিত্যসৃষ্টি শিক্ষার্থীদের সামনে দ্রুতপঠনের মাধ্যমে উপস্থিত করা যায়।** তাতে শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা ও তার উন্নত সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়। বিদ্যালয়ে তাই দ্রুতপঠনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এর প্রয়োজনীয়তার কথাও অস্বীকার করা যায় না। এই প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার ক'রে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির বিভিন্ন শ্রেণীতে দ্রুতপঠনকে পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করা হ'য়েছে।

দ্রুতপঠন শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি হ'ল ;—

(১) শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করা।

(২) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ সৃষ্টি করা।

(৩) দ্রুতপঠনের জন্য নির্বাচিত পুস্তকের সাহিত্য-রসগ্রহণ, শিল্পসৌন্দর্য উপভোগ ও নন্দন-চেতনার আলোকে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।

(৪) পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত পুস্তক পড়তে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।

(৫) শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভর করা, যাতে তারা বিভিন্ন পুস্তক-পাঠে স্বয়ংসাধনায় প্রবৃত্ত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করা ও শিক্ষাকে আনন্দময় করা হ'ল দ্রুতপঠন শিক্ষাদানের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ফলে, শিক্ষার্থীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে বিভিন্ন বই পড়তে অগ্রসর হয়।

(৬) শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল চরিতার্থ করা।

(৭) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যভ্যাস (*study habit*) তৈরি করা ও তাদের পাঠ-দক্ষতা (*study skill*) বৃদ্ধি করা।

শিক্ষার্থীরা ক্রমশঃ নীরব পাঠে দক্ষ হবে ; তাদের পাঠে দ্রুততা আসবে ; পাঠ গ্রহণ ক'রে তারা বিষয়বস্তু, রসধ্বনি, শিল্পসৌন্দর্য সম্বন্ধে উপলব্ধি ক'রতে পারবে ; এই হবে দ্রুতপঠন-শিক্ষাদানের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বিদ্যালয়ে **দ্রুতঠনের পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচনের** সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। দ্রুতপঠনের পুস্তক নির্বাচনের সময় পুস্তকব্যবসায়ীদের অনুরোধ ও বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ রক্ষা করা হয় এবং তা ক'রতে গিয়ে পুস্তক নির্বাচনও যথাযথ হয় না। দ্রুতপঠনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে যেমন-তেমন ১।২টি পুস্তক নির্বাচিত হয়। প্রকাশকগণও দ্রুতপঠন গ্রন্থের সংকলন ও প্রকাশনের উপর বেশী গুরুত্ব দেন না। দ্রুতপঠনের পুস্তক নির্বাচনের সময় যথেষ্ট সতর্ক হ'তে হবে। শিক্ষার্থীদের শ্রেণী, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বুদ্ধিবৃত্তি, গ্রহণক্ষমতা ইত্যাদি বিচার ক'রে দ্রুতপঠনের পুস্তক নির্বাচন ক'রতে হবে। দ্রুতপঠনের পুস্তকগুলির ছাপা, কাগজ, *cover*, চিত্র ইত্যাদি যথাযথ ও নির্ভুল হবে। দ্রুতপঠনের জন্য নির্বাচিত পুস্তকের মধ্যে সাহিত্যগুণ থাকবে; শিক্ষার্থীরা যেন পুস্তকের সাহিত্যগুণে আকৃষ্ট হ'য়ে স্বয়ং-সাধনার মাধ্যমে স্বতঃপ্রণোদিত

হ'য়ে দ্রুতপঠনের পুস্তক পড়তে আগ্রহী হয়। দ্রুতপঠনের পুস্তক যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্যচেতনা সৃষ্টি করে, সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি করে। দ্রুতপঠনের পুস্তক প'ড়ে শিক্ষার্থীরা যেন পাঠ্য পুস্তকের অতিরিক্ত আরও পুস্তক পড়তে উৎসাহিত হয়। নীতিজ্ঞান শিক্ষামূলক ও উদ্দেশ্যমূলক রচনা অপেক্ষা নিছক সাহিত্যধর্মী রচনাকে দ্রুতপঠনের পুস্তক নির্বাচনের সময় অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। পৌরাণিক কাহিনীমূলক কতকগুলি মামুলি গ্রন্থকে দ্রুতপঠনের জন্য নির্বাচিত ক'রলে চলবে না। দ্রুতপঠনের পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেন বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাধর সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন পুস্তককে বিষয়বস্তু অনুযায়ী নির্বাচিত করা যেতে পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে দ্রুতপঠনের পুস্তকগুলি সুনির্বাচিত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর', মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যসংকলন 'কাব্যমালঞ্চ' দ্রুতপঠনের জন্য সুনির্বাচিত গ্রন্থ। কিন্তু 'সংকল্প ও স্বদেশ' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ কি রবীন্দ্রনাথের ছিল না? 'রাজর্ষি'র পরিবর্তে শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি' নির্বাচিত হ'লে গ্রন্থের সাহিত্যগুণ বেশী মর্যাদা পেত। 'রামায়ণী কথা', 'চরিত-কথা' উৎকৃষ্ট রচনা হ'লেও শিক্ষার্থীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে এই দ্রুতপঠনের পুস্তকগুলিকে স্বয়ংসাধনার জন্য গ্রহণ করে না। শিক্ষার্থীদের রুচি, সামর্থ্য ও চাহিদা, পুস্তকের সাহিত্যগুণ ইত্যাদি বিচার ক'রে দ্রুতপঠনের পুস্তক নির্বাচন করা উচিত।

দ্রুতপঠনের পুস্তক নির্বাচন

পাঠ দু'রকমের, সরব পাঠ ও নীরব পাঠ। দ্রুতপঠনের জন্য নীরব পাঠই (*Silent reading*) বেশী উপযোগী। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সরব পাঠের (*Loud reading*) প্রয়োজনও হয়। দ্রুতপঠনের কবিতা অংশে যেখানে স্বাদনা-পাঠের (*Appreciation study*) প্রয়োজন হয়, সেখানে সরব পাঠ খুবই কার্যকর। দ্রুত-পঠনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নীরব পাঠই বেশী উপযোগী। নীরব পাঠের মাধ্যমে পাঠে দ্রুততা (*speed*) আসে। দ্রুতপঠনকে সত্যই দ্রুত পঠন ক'রতে হবে। অল্প সময়ে কোন বিষয় সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা ক'রতে হ'লে দ্রুতপঠনকে দ্রুত পাঠ ক'রতে হয়; এবং তার মাধ্যমে নিশ্চয়ই নীরব পাঠ। বিষয়বস্তুর মর্মগ্রহণই দ্রুতপঠন শিক্ষা-দানের উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে ধারণা-পাঠ (*comprehensive study*) প্রয়োজন। নীরব পাঠের অভ্যাস দ্রুতপঠনের মাধ্যমেই হ'তে পারে। সার্থক ধারণা-পাঠের জন্যও নীরব পাঠ প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের পরিণত পাঠে পৌঁছে দেওয়াই হ'ল দ্রুতপঠন শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। পরিণত পাঠ বলতে সাধারণত নীরব পাঠই বোঝায়। ভাষা-শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে সরব পাঠ প্রয়োজন হ'লেও ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের নীরব পাঠে অভ্যস্ত ক'রতে হবে; এবং দ্রুতপঠন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রবে। নীরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দ্রুতপঠনের বিষয়বস্তুর মর্ম গ্রহণ ক'রবে, বিষয়বস্তুকে ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ ক'রবে। এইভাবে ধীরে ধীরে তারা স্বয়ং-সাধনার মাধ্যমে পাঠে মনোযোগী হবে। তখনই শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে দ্রুতপঠনের বিষয়বস্তু ও মর্ম ধারাবাহিকভাবে

সরব পাঠ, নীরব পাঠ ও দ্রুতপঠন

নীরব পাঠের মাধ্যমে গ্রহণ ক'রবে। এইভাবে দ্রুতপঠনকে নীরব পাঠের মাধ্যমে গ্রহণ ক'রবার ফলে শিক্ষার্থীরা নীরব পাঠে অভ্যস্ত হবে। বিষয়বস্তুকে ধারাবাহিক-ভাবে গ্রহণ ক'রবে, শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে পাঠ-গ্রহণে আগ্রহী হবে। পাঠে দক্ষতা (*skill*) ও দ্রুততা (*speed*) অর্জন ক'রবে, পাঠ্য পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠে আগ্রহী হবে। তবে দ্রুতপঠনের জন্য সাহিত্যগুণ-সমৃদ্ধ কোন কোন অংশকে, বিশেষ ক'রে কবিতার ক্ষেত্রে, সরব পাঠকেও গ্রহণ ক'রতে হবে। তবে নীরব পাঠই দ্রুতপঠনের পক্ষে সবচেয়ে বেশী উপযোগী।

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় **দ্রুতপঠন শিক্ষাদান** উপেক্ষিত। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য দ্রুতপঠনের পুস্তক নির্দিষ্ট থাকে। সময়-তালিকায় (*Time table*) দ্রুতপঠন শিক্ষাদান সুনির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন শিক্ষক দ্রুতপঠন পড়াতে গিয়ে কোন রকমে দায়সারা কাজ ক'রে আসেন। দ্রুতপঠন শিক্ষাদান আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বসম্মত ক'রতে হবে। দ্রুতপঠনের যে সমস্ত অংশ সরব পাঠের উপযোগী সেগুলিকে সার্থক আবৃত্তি সহকারে পাঠদান ক'রতে হবে। তবে দ্রুতপঠন শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীদের নীরব পাঠের প্রতি সবচেয়ে বেশী নজর রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে নীরব পাঠের অভ্যাস ক'রবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা নীরব পাঠ দিতে গিয়ে পাঠে অমনোযোগী না হয়, ফাঁকি না দেয়। দ্রুতপঠনের পাঠে শিক্ষার্থীদের দ্রুততা আনতে হবে। পাঠদানের সময় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠটীকা (*Lesson plan*) প্রণয়ন ক'রে তাকে ভিত্তি ক'রেই পাঠদান করতে হবে। শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীদের রুচি, চাহিদা, সামর্থ্য, বুদ্ধি ও শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা স্মরণ রাখতে হবে। দ্রুতপঠন শিক্ষাদানের সময় উপযুক্ত স্থানে বিভিন্ন শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ (*Teaching aids*) ব্যবহার ক'রতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে দ্রুতপঠনের বিষয়বস্তুর মর্মগ্রহণ ও ভাব সম্পর্কে ধারণা শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভবপর হয়। এর জন্য পাঠদানের সময় বিভিন্ন *points* বোর্ডে লিখে দিতে হবে। সেই *point*গুলিকে কেন্দ্র ক'রেই শিক্ষার্থীরা দ্রুতপঠনের পাঠ গ্রহণ ক'রবে। দ্রুতপঠনের ভাবগম্ভীর কঠিন ও জটিল অংশগুলি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। দ্রুতপঠন শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করা হ'ল বিশেষ কার্যকরী একটি পদ্ধতি। সুকৌশলে বিভিন্ন প্রশ্ন ক'রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে অনুরাগী করতে পারেন। তারা বিষয়বস্তু কতখানি অর্জন করেছে, তার পরিমাপ করতে পারেন। দ্রুতপঠন শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ সৃষ্টি ক'রতে হবে। শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই শিক্ষার্থীরা যাতে দ্রুতপঠন-পাঠে অভ্যস্ত ও মনোযোগী হয়, তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ক'রতে হবে। স্বয়ং-সাধনার মাধ্যমে স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীরা দ্রুতপঠন-পাঠে অগ্রসর হবে। ফলে, তাদের মধ্যে সাহিত্যা-নুরাগ সৃষ্ট হবে এবং পাঠ্য পুস্তকের অতিরিক্ত বিভিন্ন পুস্তক-পাঠে তাদের আগ্রহ দেখা দেবে। তখনই তাদের ভাষা-শিক্ষাদান সার্থক হবে।

দ্রুতপঠন শিক্ষাদান

দ্রুতপঠনের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গতানুগতিক ; আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থায় দ্রতপঠনের মূল্যায়ন দু'ভাবে করা হয় ; অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীতে দ্রুতপঠনের বিষয়-বস্তুর উপর রচনাধর্মী (*Essoy type*) প্রশ্ন করা হয় ; আর নবম-দশম শ্রেণীতে দ্রুত পঠনের বিভিন্ন অংশ প্রশ্নপত্রে তুলে দিয়ে তার ভাবসম্প্রসারণ, ভাবার্থ, মর্মার্থ, তাৎপর্য, সারাংশ ইত্যাদি করতে দেওয়া হয়। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের *composition* অংশের ভাব-সম্প্রসারণ, ভাবার্থ-মর্মার্থ-তাৎপর্যলিখন, সারাংশ-সারসংক্ষেপকরণ তার স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে দ্রতপঠনের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরীক্ষাকেন্দ্রিক, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধাঁচ অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষাদান-পদ্ধতি আবর্তিত হয়। দ্রত-পঠনের বিভিন্ন অংশের উপর ভাবসংক্ষেপ, ভাবার্থ-মর্মার্থ লিখন, ভাবসম্প্রসারণ ইত্যাদি প্রশ্ন থাকে বলে তার শিক্ষাদানও সেই অনুযায়ী হয়। ফলে, দ্রতপঠন শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-গুলি ব্যর্থ হয়। ভাষা-শিক্ষা দুর্বল হয়, শিক্ষার্থীদের সাহিত্যানুরাগ সৃষ্ট হয় না। দ্রুতপঠন শিক্ষা গ্রহণের মূল্যায়ন যথাযথভাবে করতে হলে বিষয়টির শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি বিস্মৃত হলে চলবে না। শিক্ষকের সাহায্য ছড়াও স্বয়ং-সাধনার মাধ্যমে পাঠ্যগ্রহণ, নীরব পাঠের মাধ্যমে বিয়বস্তু উদ্ধার, সাহিত্যানুরাগ-সৃষ্টি, পাঠ্য-পুস্তকের অতিরিক্ত পুস্তক পাঠে আগ্রহ-সৃষ্টি ইত্যাদি হ'ল দ্রুতপঠন শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দ্রুতপঠনের পরীক্ষা ও মূল্যায়নের সময় এ বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে এবং ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে। তবে সুখের কথা এই যে, ১৯৭৪ সাল থেকে প্রচলিত নতুন মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের **মৌখিক-পরীক্ষায় (oral)** দ্রতপঠনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থা ও দ্রুতপঠনের মূল্যায়ন

॥ অনুশীলনী ॥

১। বাংলা দ্রুতপাঠ্য (অবিশেষিত) পড়াইবার সময়ে শিক্ষক ছাত্রের সাহিত্যবোধ জাগ্রত করিবার জন্য কি কি প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবেন? দ্রুতপাঠ্যকে বাস্তবিক দ্রুত করিবার জন্য ছাত্রদের স্বয়ং-সাধনার উপর কতটা নির্ভর করা যাইবে এবং কিভাবে তাহার ব্যবস্থা করিবেন?
(কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৪)

২। দ্রুতপঠনের উপযোগিতা কি? দ্রুতপঠন পুস্তক পড়াইবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি কি? বাংলা সাহিত্যের 'অবশ্যপাঠ্য পুস্তক' (Text Book) রচনা পড়ানোর 'নীরব পাঠে'র সুরটি অনেকে অনাবশ্যক মনে করেন কেন, তাহার মনোবিজ্ঞানসম্মত কারণ উল্লেখ করিয়া আপনার মন্তব্য লিখুন।
(বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি., (১৯৬৩)

৩। (ক) রাজর্ষি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) মেজদিদি—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (গ) রামায়ণী কথা—দীনেশচন্দ্র সেন।

—নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী দ্রুতপঠনের একখানি মাত্র পুস্তক নির্বাচন করিতে হইলে উপরের গ্রন্থ তিনটির মধ্যে কোন্‌খানি অনুমোদন করিবেন? নিম্নরূপ ধারায় নির্বাচনের কারণগুলি আলোচনা করুন:

(ক) ঐ শ্রেণীর ছাত্রদের মনোবৃত্তি, ভাষা ও চিন্তা-সামর্থ্য;

(খ) কিরূপ ধরনের গল্প বা আলোচনা তাহাদের মনোজ্ঞ হয়;

(গ) দ্রুতপঠনের সাধারণ উদ্দেশ্য আপনার অনুমোদিত পুস্তকে সাধিত হইবার সম্ভাবনা কতখানি? (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি, ১৯৬৪)

৪। দ্রুতপঠন পাঠের উদ্দেশ্য বা প্রধান লক্ষ্য কি কি? এই লক্ষ্যসিদ্ধির অনুকূল পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত? কোন্ কোন্ কারণে এই পাঠ ব্যর্থ হয়? (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৬)

৫। বাঙলা দ্রুতপাঠ্য পড়াইবার সার্থকতা কি? এই পাঠে ছাত্রের সাহিত্যবোধ জাগ্রত করবার জন্য কি কি প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবেন? (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৮)

৬। বিদ্যালয়ে দ্রুতপঠনের প্রয়োজনীয়তা কি? কি কি বিশেষ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হয়? ইহার সাফল্য কিরূপে বিচার করিবেন? (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৭)

৭। বিদ্যালয়ে দ্রুতপঠনের প্রয়োজনীয়তা কি? কি কি বিশেষ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হয়? দ্রুতপঠন পুস্তক পড়াইবার প্রকৃত পদ্ধতি কি? (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৭৩)

৮। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাতৃভাষার পাঠ্যক্রমে দ্রুতপাঠ্যপুস্তকের ও পাঠ্যপুস্তকের পাঠদানের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির পার্থক্যগুলির বিস্তারিত অলোচনা করুন। (P. G., B. T.—১৯৭৬)

দশম অধ্যায়

ব্যাকরণ শিক্ষাদান

[Methods of Teaching Grammar]

ভাষার বিজ্ঞান বা শাস্ত্র হ'ল ব্যাকরণ। 'ব্যাকরণ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ক'রলে দাঁড়ায় বি+আ+কৃ+ল্যুট্ ; যা নিষ্পাদন করে, তাই ব্যাকরণ। ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগই ব্যাকরণের লক্ষ্য ও কাজ। *D. H. Sweet* বলেছেন, "*Grammar is the practical analysis of a language, its anatomy*". ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—"যে বিদ্যার দ্বারা কোন ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার পঠনে, লিখনে ও কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে ভাষার ব্যাকরণ বলে।" **যে শাস্ত্র বা বিজ্ঞান প'ড়ে ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ শিক্ষালাভ করা যায়, তাই ব্যাকরণ।** ব্যাকরণ ভাষাকে শুদ্ধরূপে বিশ্লেষণ করে। ব্যাকরণের মধ্য দিয়ে ভাষার উদ্ভব, বিকাশ, স্বরূপ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব, প্রয়োগরীতি ও লক্ষণগুলি যথাযথভাবে জানা যায়।

ব্যাকরণ কাকে বলে?

বাংলাভাষারও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ, অর্থাৎ ব্যাকরণ আছে, কিন্তু বিদেশীরাই প্রথমে বাংলা ব্যাকরণের প্রয়োজন বোধ করেছিল। এদেশে এসে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করবার জন্য তারা নিজেদের জন্যই বাংলা ব্যাকরণকে প্রয়োজনীয় ভেবেছিল। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ পাদ্রী ম্যানুএল-দ্য-আস্সুম্পসাও সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। কিন্তু তা বিদেশী ভাষায় রচিত। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালহেড বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ইংরেজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। পরে তা বাংলায় অনূদিত হয়। এই সময়কার রচিত ব্যাকরণগুলির উদ্দেশ্য ছিল অবাঙালী ও বিদেশীকে বাংলা শেখানোয় সহায়তা করা। পরবর্তী কালে বিভিন্ন বৈয়াকরণ ও ভাষা-বিজ্ঞানী তাঁদের মূল্যবান ও মৌলিক চিন্তাধারায় বাংলা ব্যাকরণকে সমৃদ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাপদ চক্রবর্তী, সুকুমার সেন প্রভৃতি পণ্ডিত ও ভাষা-বিজ্ঞানী বাংলা ব্যাকরণকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমানে বাংলা ব্যাকরণ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা-বিজ্ঞান।

বাংলা ব্যাকরণের উদ্ভব ও বিকাশ

অনেকে মনে করেন যে, মাতৃভাষা শেখবার জন্য ব্যাকরণ অপরিহার্য নয়। জীবনের স্বাভাবিক পথেই মানুষ মাতৃভাষা শিক্ষালাভ করে। ছেলেবেলা থেকে মায়ের মুখ ও পরিচিত পরিবেশ থেকে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে মাতৃভাষা আয়ত্ত করে। অপরের কাছ থেকে শুনে ভাষা আয়ত্ত হ'য়ে যায়। তখন ব্যাকরণের সাহায্য ছাড়াই মানুষ ভাষা ব্যবহার

মাতৃভাষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ অপরিহার্য নয়

ক'রতে পারে। আগে ভাষা সৃষ্টি হয়, তারপর ব্যাকরণ তাকে বিশ্লেষণ করে। মানুষও আগে ভাষা শেখে, পরে ব্যাকরণের সাহায্যে তাকে বিশ্লেষণ ক'রে শুদ্ধ ও স্থায়ী করবার প্রচেষ্টা করা হয়। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও আগে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে, পরে ব্যাকরণ। অনেকে মনে করেন, মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ অপরিহার্য নয়। বিদেশীর ক্ষেত্রে ভাষাশিক্ষার সময় ব্যাকরণ প্রয়োজন। বাংলা ব্যাকরণ প্রাথমিক পর্যায়ে রচিত হ'য়েছিল বিদেশীদেরই বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

কিন্তু মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ খুবই প্রয়োজন। ভাষাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ ক'রে তাকে বিজ্ঞানে পরিণত করতে ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন প্রয়োজন। বিদেশীদের ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যাকরণ প্রয়োজন,—একথা ঠিক ; কিন্তু বাংলা যাদের মাতৃভাষা তাদের পক্ষেও ব্যাকরণ-পাঠ অপরিহার্য ; - কারণ ভাষা-শিক্ষার পক্ষে ব্যাকরণ সহায়কের ভূমিকা পালন করে। ব্যাকরণ-শিক্ষার প্রয়োজন আছে। **বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ শিক্ষাদানের প্রয়োজন নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য অনুভূত হয় ;—**

॥ এক ॥ **ব্যাকরণের জ্ঞান ভাষাকে শুদ্ধভাবে গ্রহণ করতে ও প্রয়োগ করতে সাহায্য করে।** শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের মাধ্যমে ভাষা-বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুনগুলি শিক্ষা ক'রে ভাষাকে নির্ভুলভাবে প্রয়োগ ক'রতে শেখে।

॥ দুই ॥ **ব্যাকরণের জ্ঞান ভাষাপ্রয়োগে দক্ষতা বৃদ্ধি করে।** ব্যাকরণের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিকে আয়ত্ত করে। বিভিন্ন নিয়ম ইত্যাদি জানবার ফলেও ভাষা-ব্যবহারে দক্ষতা আসে।

॥ তিন ॥ **ব্যাকরণের জ্ঞান ভাষাকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা ক'রে তাকে স্থায়ী রূপ দেয়।** ভাষা সব সময় পরিবর্তনমুখী। এই পরিবর্তন ভাষাকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়। তাই নিয়মকানুনের বিধিনিষেধ আরোপ ক'রে ভাষাকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা ক'রে তাকে স্থায়ী করবার চেষ্টা করা হয়। সাহিত্য ও সমাজের পক্ষেও ভাষার স্থায়ী রূপ একান্তভাবেই প্রয়োজন।

॥ চার ॥ **বিভিন্ন বাগ্‌ধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দ জানলে সেগুলি প্রয়োগ ক'রে ভাষাকে শক্তিশালী করা যায়।**

॥ পাঁচ ॥ অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই আমরা মাতৃভাষা আয়ত্ত করি। তারপর যদি আমরা ব্যাকরণের দ্বারা সেগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রতে পারি, তবে **ভাষা-ব্যবহারের ভুল কম হয়, দক্ষতা বাড়ে ও আত্মপ্রত্যয়ও বাড়ে।** ব্যাকরণের জ্ঞান অর্জন করলে শিক্ষার্থীরা নির্ভুলভাবে ভাষা ব্যবহার করবার প্রত্যয় ও বিশ্বাস অর্জন ক'রতে পারে। তখন সহজে ও স্বচ্ছন্দে সে ভাষা ব্যবহার ক'রতে পারে।

॥ ছয় ॥ **মাতৃভাষায় ব্যাকরণের জ্ঞান শিক্ষার্থীদের অন্যান্য বিদেশী বা দেশী ভাষা শিখতে সাহায্য করে।**

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের মনস্তাত্ত্বিক দিক্‌ও আছে। অনেকে মনে করেন যে, মনস্তাত্ত্বিক কারণে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্রের কতকগুলি মানসিক বৈশিষ্ট্য

গড়ে তোলার জন্য ব্যাকরণ শিক্ষাদান প্রয়োজন, কাজেই ব্যাকরণ শিক্ষাদানকে মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার ক'রে দেখতে হবে। ব্যাকরণ-শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যুক্ত-বোধ ও বিচার-শক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন হয়। মনস্তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, মানুষের মন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির সমষ্টি; এই বৃত্তিগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অন্য-নিরপেক্ষ। ব্যাকরণ-শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যুক্তিবোধ ও বিচারশক্তি আয়ত্ত ক'রবে এবং পরে এই মানসিক বৃত্তি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত হবে। মনোবিজ্ঞানের এই পদ্ধতিকে শিক্ষায় সঞ্চালন (*Transfer of training*) বলা হয়। ব্যক্তির এই মানসিক বৃত্তির পরিপুষ্টির জন্যও ব্যাকরণ শিক্ষাদান প্রয়োজন। কিন্তু বৃত্তিমূলক এই মতবাদ মনোবিজ্ঞানে ভুল ব'লে প্রমাণিত হ'য়েছে। ব্যাকরণ অনুশীলন ক'রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে যুক্তিবোধ ও বিচারশক্তি গড়ে ওঠে, তা বিষয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন মূল্য নেই।

ব্যাকরণ পাঠের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ

ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ অপরিহার্য নয়, সহায়ক শক্তি মাত্র। ব্যাকরণ সৃষ্টির বহু আগে ভাষা সৃষ্টি হ'য়েছিল। **মানুষ আগে ভাষা শেখে, পরে ব্যাকরণ।** ব্যাকরণ মানুষের মানসিক বৃত্তির উদ্‌গমন ক'রতে পারে না। মনের ভাবপ্রকাশের জন্যও ব্যাকরণ প্রয়োজন হয় না। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মনের ভাব-প্রকাশের জন্য ভাষা-কৌশল আয়ত্ত করে। ব্যাকরণ সুসাহিত্যিক সৃষ্টি করে না, সুবক্তাও সৃষ্টি করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে। ব্যাকরণ ভাষা-ব্যবহারে শুদ্ধ-প্রয়োগ, সৌন্দর্য-সৃষ্টি ও দক্ষতাবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ব্যাকরণ ভাষাকে বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তি-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যাকরণ ভাষার শরীর-তত্ত্ব (*Anatomy*)। ভাষার শুদ্ধ রূপ রক্ষার জন্য ব্যাকরণ প্রয়োজন। ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচারিতা রোধের জন্য ব্যাকরণ প্রয়োজন। ব্যাকরণ ভাষাকে বিশ্লেষণ ক'রে তার স্বরূপকে উদ্‌ঘটিত করে, শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে শব্দকে যথাযথ প্রয়োগ ক'রতে সাহায্য ক'রে;—বাক্য-গঠনের রীতি ও কৌশলগুলি আয়ত্ত ক'রতে সাহায্য করে। তাই বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ পাঠ আবশ্যক। ব্যাকরণকে বাদ দিয়ে ভাষা-শিক্ষা সফল ও সার্থক হবে না। প্রত্যেক ভাষারই একটা নিজস্ব স্বরূপ ও প্রকৃতি আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ভাষার সেই প্রকৃতিগত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণকারের কাজ।"

বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ পড়ানোর আবশ্যিকতা

শুদ্ধভাবে ভাষা লিখতে পারা, পড়ে বুঝতে পারা, বলতে পারা ও শুনে বুঝতে পারাই হচ্ছে **ব্যাকরণ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য**। এই উদ্দেশ্যগুলির ব্যবহারিক (*Functional*) কারণ;—এগুলির মাধ্যমে ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। বাক্যের মধ্যবর্তী পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়, বাক্যের মধ্যে শব্দগুলির অবস্থান

ব্যাকরণ পড়ানোর উদ্দেশ্য

প্রভৃতি বিষয় যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধিতে আনাই হ'চ্ছে ব্যাকরণ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। ভাষাপ্রয়োগের ভুল কোথায় হয়, বিপদ কোথায় সে সব অবহিত করা ব্যাকরণ-শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। ফলে, শিক্ষার্থীরা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানতে পারে। কিন্তু ব্যাকরণ-শিক্ষাদানকে ভাষা ও সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা ঠিক নয়। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শিক্ষার্থীদের অনুরাগ সৃষ্টি করা। ব্যাকরণের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সাহিত্যের রসবোধ ও শুদ্ধ ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে উৎসাহিত ক'রবে—এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হবে। ফলে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনাত্মক রচনাধর্মী শক্তির বিকাশ হবে। ব্যাকরণ শিক্ষাদান শিক্ষার্থীদের যুক্তি-বোধ ও বিচারশক্তিকেও বিকশিত করবে। শিক্ষার্থীরা যাতে শুদ্ধভাবে ভাষা প্রয়োগ ক'রতে পারে, ভাষার অন্তর্নিহিত স্বরূপ-শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারে ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হয়, সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হবে।

বিদ্যালয়ে **ব্যাকরণ পড়ানোর বিভিন্ন সমস্যা আছে**। ব্যাকরণ একটি শুষ্ক, নীরস ও কঠিন বিষয়। স্বরূপগত বৈচিত্র্যেই ব্যাকরণ জটিল ও কঠিন। তাই ব্যাকরণ শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা আগ্রহ, আকর্ষণ ও আনন্দ অনুভব করে না। ব্যাকরণ-পাঠে তাদের একটা অনিচ্ছা ও অনীহা লক্ষ্য করা যায়। সমাজ-জীবনে ও জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না। তাই জীবন-বিমুখ এই শিক্ষা থেকে তারা দূরে থাকতে চায়। এমনকি, সাহিত্য-পাঠের ক্ষেত্রেও তারা ব্যাকরণের আবশ্যিকতা ঠিক বুঝতে পারে না। তাই সাহিত্যের আনন্দ-আরাধনায় তারা ব্যাকরণকে অনাবশ্যক বলে মনে করে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী ব্যাকরণের একটি সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্রম আজও রচনা করা সম্ভব হয় নি। প্রচলিত সমস্ত ব্যাকরণ বইই গতানুগতিক, যান্ত্রিক ও কৃত্রিম। একই বিষয় (যেমন—পদ-প্রকরণ, সমাস, সন্ধি, বাগ্‌ধারা) বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাকরণের পাঠ্যক্রমে ও পুস্তকে লক্ষ্য করা যায়।

ব্যাকরণ পড়ানোর সমস্যা

ব্যাকরণ-শিক্ষাদানের পদ্ধতিও পুরাতন। সমস্ত ব্যাপারটা একটা অদ্ভুত যান্ত্রিক উপায়ে গতানুগতিকতার পথ ধ'রে বিস্ময়করভাবে চ'লে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে একটা বিরাট ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রায় সকলেই গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। বিদ্যালয়গুলিতে ব্যাকরণ পড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকের অভাব আছে। একে-ই ব্যাকরণ একটি নীরস ও জটিল বিষয়, তার উপর খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের অভাব ও ব্যাকরণ পড়ানোর অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সমস্যাকে আরও জটিল ক'রে তুলেছে। সমস্ত সমস্যাকে নিবিড়ভাবে অনুধাবন ক'রে বিদ্যালয়ে যথাযথভাবে ব্যাকরণ পড়ানোর ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

॥ **ব্যাকরণ শিক্ষাদান** ॥

অনেক চিন্তা-ভাবনা ক'রে বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ শিক্ষাদান ক'রতে হবে। **বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ শিক্ষাদানকে সফল ও সার্থক করে তুলতে হলে, নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলিকে গ্রহণ করতে হবে, নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলিকে সচেতনভাবে ধৈর্যসহকারে প্রয়োগ করতে হবে ;—**

(১) পাঠ্যক্রম

॥ **এক** ॥ ভাষা-শিক্ষার স্তর অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা, বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ী বৈজ্ঞানিকভাবে বিদ্যালয়ে ব্যাকরণের **পাঠ্যক্রম (curriculum)** নির্ধারিত ক'রতে হবে। ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু দখল অর্জন করতে না পারলে ব্যাকরণ শিক্ষাদান শুরু করা যাবে না। কারণ আগে ভাষাজ্ঞান অর্জন ক'রতে হবে, তারপর ব্যাকরণের সাহায্যে তাকে বিশ্লেষণ ক'রতে হবে। *A. Jesperson* ব'লেছেন—"**Nobody should study the grammar until he knows the language.**" তাছাড়া, ব্যাকরণ-শিক্ষার জন্য চাই বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা। বয়স একটু না বাড়লে সেই ক্ষমতা শক্তিশালী হয় না। এ জন্য পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ব্যাকরণের কোন পাঠ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত করা ঠিক নয়। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ব্যাকরণ পাঠ চলবে। প্রতিটি শ্রেণীর জন্য ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম থাকবে। এই পাঠ্যক্রম মূর্ত থেকে বিমূর্ত হবে, সহজ থেকে জটিল হবে, শিক্ষার্থীদের জানা থেকে শুরু হয়ে ক্রমশঃ অজানার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়বে। এই পাঠ্যক্রম বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি, যোগ্যতা, মানসিক শক্তি, গ্রহণ-ক্ষমতা প্রভৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। শিক্ষার্থীদের উপর পাঠ্যক্রমের চাপ যেন খুব বেশী না পড়ে।

(২) শিক্ষক

॥ **দুই** ॥ বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ-শিক্ষাদানকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিদ্যালয়ে সময়-তালিকায় ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সুনির্দিষ্ট স্থান থাকবে। পরীক্ষাতেও ব্যাকরণকে তার যথাযথ স্থান দিতে হবে। বিদ্যালয়ে ব্যাকরণের **শিক্ষক মহাশয় (Teacher)** যথাযথ গুরুত্ব, ধৈর্য ও সহানুভূতি সহকারে ব্যাকরণ শিক্ষা দেবেন। এ ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব অসীম। তাঁরই শিক্ষাদানের ফলে ব্যাকরণের মত একটি কঠিন, জটিল ও নীরস বিষয় শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে গ্রহণ ক'রবে। কাজেই ব্যাকরণ পড়ানোর প্রতি তিনি গুরুত্ব দেবেন। ধৈর্য সহকারে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হবে। এই জাতীয় একটি কঠিন-জটিল বিষয়কে শিক্ষার্থীরা সহজে গ্রহণ ক'রতে চায় না। তাই বার বার চেষ্টা ক'রে, সহজ থেকে সহজতর ক'রে, ধৈর্য সহকারে তিনি ব্যাকরণ শিক্ষা দেবেন। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন। তাঁরই সহানুভূতি ও সহৃদয়তা ব্যাকরণের মত একটি কঠিন বিষয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় ক'রে তুলবে। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের জন্য অবশ্যকীয় জ্ঞানও শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন। বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ধারণা (*clear conception*) না থাকলে তাঁর পক্ষে ব্যাকরণ শিক্ষাদান সম্ভব নয়। তিনি শিক্ষাদানের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি জানবেন এবং

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সময় সেগুলি প্রয়োগ ক'রবেন। শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলির সাহায্যে তিনি ব্যাকরণ শিক্ষাদানকে সরস ও আকর্ষণীয় ক'রে তুলবেন।

॥ **তিন** ॥ ব্যাকরণের **পাঠ্য পুস্তক (Text Book)** সম্বন্ধেও সচেতন থাকতে হবে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে রচিত প্রচলিত ব্যাকরণবইগুলি শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণ শিক্ষার অন্তরায়। তাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী ভাষাকে ব্যাকরণের মধ্যে বিশ্লেষণ ক'রতে হবে। ব্যাকরণের পুস্তক প্রতিটি শ্রেণীর পাঠ্যক্রমকে নিখুঁতভাবে মেনে চলবে। অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তকে থাকবে না। ব্যাকরণের পাঠ্য-পুস্তক লেখকের পাণ্ডিত্য-প্রকাশের ক্ষেত্র নয়, একথা মনে রাখতে হবে। ব্যাকরণের সূত্রগুলিকে সহজ ভাষায় যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য ক'রে প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত ক'রতে হবে। বিভিন্ন উদাহরণগুলিকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা ক'রতে হবে। উদাহরণগুলি শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সম্ভাব্য ক্ষেত্র থেকে আহরিত হবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিদ্যালয়ের ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তক (*Text Book*) রচিত হবে। এই পুস্তকের কলেবর যতদূর সম্ভব ছোট হবে। কারণ, পুস্তকের কলেবর অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে।

(৩) ব্যাকরণের পাঠ্য পুস্তক

॥ **চার** ॥ ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সময় **বিভিন্ন শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ (Audio-visual Aids)** ব্যবহার ক'রতে হবে। বিশেষ ক'রে বিভিন্ন চার্ট (*chart*) ব্যাকরণ-শিক্ষাদানের পক্ষে বিশেষ সহযোগী। বিদ্যালয়ে এই ধরনের অনেকগুলি চার্ট থাকবে এবং ব্যাকরণের বিষয়-কক্ষে (*subject room*) সেগুলিকে প্রয়োজন ও সৌন্দর্য অনুসারে সাজিয়ে রাখতে হবে, এবং শিক্ষাদানের সময় সেগুলিকে যথাযথ স্থানে ব্যবহার ক'রতে হবে। ফলে, ব্যাকরণ শিক্ষাদান সরস ও আকর্ষণীয় হবে। শিক্ষার্থীরাও তাদের ব্যাকরণের জ্ঞানকে সম্পূর্ণ করতে পারবে এবং ধারণাকে (*conception*) পরিষ্কার করতে পারবে। **ব্যাকরণ শিক্ষাদানে ব্ল্যাক বোর্ডের (Black Board) ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।**

(৪) শিক্ষাসহায়ক উপকরণ

॥ **পাঁচ** ॥ **পাঠটীকা (Lesson notes)** প্রণয়ন ক'রে পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাকরণ শিক্ষাদান করতে হবে। হার্বার্টের শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী এই পাঠটীকা রচনা করতে হবে। পাঠটীকায় সুনির্দিষ্ট পূর্ব-পরিকল্পনা ক'রে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষাদান করতে হবে।

(৫) পাঠটীকা

॥ **ছয়** ॥ ব্যাকরণ কখনই ভাষা ও সাহিত্যের উপর প্রভুত্ব করবে না,—এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাকরণ শিক্ষাদান করতে হবে। ভাষার জন্যই ব্যাকরণ। ব্যাকরণের নিছক কচ্‌কচানি যেন ভাষা-সাহিত্যের সৌন্দর্য ও শিল্পসত্তাকে বিনষ্ট না করে। **ব্যাকরণকে diet হিসাবে ব্যবহার না ক'রে drug হিসাবে ব্যবহার ক'রতে হবে।** ব্যাকরণ সব সময় ভাষা ও সাহিত্যের অনুগামী হবে।

(৬) ব্যাকরণ diet নয়, drug

॥ ব্যাকরণ শিক্ষাদানে বিভিন্ন পদ্ধতি ॥

উল্লিখিত বিষয়, ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গীর কথা সামনে রেখে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে ব্যাকরণ শিক্ষাদান করতে হবে। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে ব্যাকরণ শিক্ষাদান করা হয়। এই পদ্ধতিগুলির স্বরূপ ও গুণাগুণ নিম্নে আলোচনা করা হল ;—

॥ এক ॥ সূত্র পদ্ধতি ঃ

ব্যাকরণ-শিক্ষাদানের এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের সূত্রকে বার বার আবৃত্তি ক'রে বা প'ড়ে তাকে মুখস্থ করে। পরে এই সূত্রকে উদাহরণের মাধ্যমে প্রয়োগ ক'রে দেখানো হয়। এই পদ্ধতি বহু পুরাতন পদ্ধতি,—বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতির প্রয়োগ আছে। আমাদের দেশের ব্যাকরণের প্রায় সমস্ত পাঠ্যপুস্তকই এই পদ্ধতিতে লিখিত, অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতিতেই ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যাকরণের কোন সূত্র, নিয়ম বা সিদ্ধান্ত মুখস্থের মধ্য দিয়ে ঐ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় ব'লে একে **সিদ্ধান্ত পদ্ধতি**ও বলা হয়। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সূত্র বা সিদ্ধান্ত প্রণালী বহুলপ্রচলিত হ'লেও তা দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। এই পদ্ধতিতে পাঠদান শুষ্ক ও নীরস হয়, শিক্ষার্থীরা পাঠ-গ্রহণে উৎসাহ ও আকর্ষণ অনুভব করে না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ না ক'রলে ব্যাকরণ-শিক্ষা সার্থক হয় না ; শিক্ষার্থীরাও অনেক সময় অনেক সূত্র না বুঝেই মুখস্থ ক'রে ফেলে। ফলে, তা তাদের মনে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এই পদ্ধতি তাই অবৈজ্ঞানিক, তা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগ অনেক বেশী।

সূত্র-প্রণালী

॥ দুই ॥ ভাষা-পদ্ধতি ঃ

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ভাষা-প্রণালীতে রচনা, অনুশীলন, অভ্যাস ও প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষার বিশুদ্ধতা শেখানো হয়,—ভাষা বিশ্লেষণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ পুস্তকের প্রয়োজন নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ব্যাকরণের জ্ঞান ছাড়াই অনেক ক্ষেত্রে শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করতে শেখে। সেই পদ্ধতি ও রীতির উপর ভিত্তি ক'রেই ব্যাকরণ শিক্ষাদানের এই ভাষা-প্রণালী গড়ে উঠেছে। শ্রেণীকক্ষের মধ্যে প্রশ্নোত্তর, আলাপ-আলোচনা, সংবাদ, পুস্তক ও রচনা প্রভৃতির সাহায্যে স্বাভাবিক-ভাবে শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষা গ্রহণ করে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণ শিক্ষাদানের এটিই সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। ব্যাকরণের পুস্তক ছাড়াও ভাষা-বিশ্লেষণের জন্য এই পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের কথা বলার মধ্যে ও লেখার মধ্যে বিশুদ্ধভাবে ভাষা ব্যবহার করে, এই পদ্ধতিতে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই পদ্ধতির প্রয়োগে ভাষা-শিক্ষায় অনেক সময় লাগে, এটি একটি সম্পূর্ণ পদ্ধতি নয়। এখনও এই পদ্ধতির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ আছে। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিতে শুদ্ধ ভাষা-প্রয়োগ শিখতে পারে না।

ভাষা-প্রণালী

॥ তিন ॥ পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি ঃ

প্রতিটি বিদ্যালয়েই প্রতি শ্রেণার জন্যই ব্যাকরণের পৃথক্ পৃথক্ পাঠ্যপুস্তক থাকে। সেই পাঠ্যপুস্তকে ব্যাকরণের পাঠ্যক্রম সুন্দরভাবে লিখিত থাকে,—বিভিন্ন সূত্র, নিয়ম ও বিবিধ উদাহরণ দিয়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা থাকে। শিক্ষক মহাশয় সেই বই থেকে ক্রমান্বয়ে অধ্যায়ের পর অধ্যায় ধ'রে পাঠ দান করেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অসীম। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে পাঠ্যপুস্তকগুলিও উন্নতমানের হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বাধীন শিক্ষাদান পদ্ধতি নয়। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রে অন্য পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা অতি মাত্রায় পুস্তককেন্দ্রিক ও মুখস্থনির্ভর হ'য়ে পড়ে।

পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি

॥ চার ॥ প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি ঃ

আলোচনা, সাহিত্যের আলোচনা, রচনা-লেখা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিকভাবেও ব্যাকরণের শিক্ষা দেওয়া যায়। একে 'প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি' বলে। প্রচলিত পাঠ্যক্রমে **Textual grammar** অনেকটা এই জাতীয়। এই পদ্ধতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। কারণ, সুন্দর সুন্দর প্রয়োগের মধ্য থেকেই শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের জ্ঞান আহরণ করে। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের লক্ষ্য নিয়ে সুনির্বাচিত অংশগুলিকে সুকৌশলে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করা হয় ফলে শিক্ষার্থীরাও পাঠগ্রহণে আনন্দ ও আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু **প্রসঙ্গের অবতারণা সুনিপুণ ও সুনির্বাচিত হওয়া চাই**। তবেই এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণের ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক রূপটি অব্যাহত থাকে। এই পদ্ধতির প্রয়োগ সময়-সাপেক্ষ ; এবং শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিতে দুরূহ অংশগুলিকে সহজে গ্রহণ ক'রতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি

॥ পাঁচ ॥ বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ঃ

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কোন সূত্র শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেই সূত্রের উপযোগী অনেকগুলি উদাহরণ তাদের সামনে তুলে ধরা হয়। শিক্ষার্থীরা সেই সব উদাহরণকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সূত্রে বা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তারপর আবার তারা অন্য উদাহণের মধ্যে ঐ সূত্র বা সিদ্ধান্তকে প্রয়োগ ক'রে দেখে। এক্ষেত্রে উপস্থাপিত **উদাহরণগুলি সুনির্বাচিত, প্রাসঙ্গিক ও ধারাবাহিক হবে**। এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। ফলে, ব্যাকরণ শিক্ষাদান সার্থক হয়।

বিশ্লেষণ-পদ্ধতি

॥ ছয় ॥ আরোহী-পদ্ধতি ঃ

তর্কবিজ্ঞানের (*Logic*) **আরোহ-পদ্ধতি (Inductive Method)** অনুসারে ব্যাকরণের এই পদ্ধতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকরী ও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা-বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব ব্যাকরণ শিক্ষাদানের এই পদ্ধতিকে সর্বোৎকৃষ্ট ব'লে বিবেচনা করে। এই পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের সার্থক অনুসারী। **এই**

পদ্ধতির মূল কথা হ'ল 'উদাহরণ থেকে সূত্র'। শিক্ষার্থীদের সামনে কতকগুলি উদাহরণ তুলে ধ'রতে হবে, তারা এই উদাহরণগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে নিজস্ব চিন্তা ও যুক্তি-বিন্যাস ক্ষমতার সাহায্যে স্বাভাবিক পথে সূত্রে বা সিদ্ধান্তে পৌঁছোবে। এই ক্ষেত্রে উদাহরণ ও দৃষ্টান্তগুলি সুনির্বাচিত হওয়া চাই। দৃষ্টান্তগুলিকে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকেই সংগ্রহ ক'রতে হবে। শিক্ষার্থীরা এই উদাহরণগুলিকে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, বিচার-বিবেচনা, চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তিতর্ক দিয়ে যাচাই ক'রে নিজেরাই সূত্র নির্মাণ ক'রবে। তারপর এই সূত্রগুলিকে আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে দেখবে। তর্কবিজ্ঞানে এই পদ্ধতি চমৎকারভাবে স্বীকৃত। যেমন,

আরোহী পদ্ধতি

রাম মরণশীল।
শ্যাম মরণশীল।
যদু মরণশীল।
তারা সকলেই মানুষ।
∴ সমস্ত মানুষই মরণশীল।

একজন, দু'জন, তিনজন মানুষকে মরণশীল দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, সমস্ত মানুষই মরণশীল। তারপর অন্যান্য মানুষের জীবন দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, মৃত্যু মানুষের জীবনে অপরিহার্য। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাগুলিকে পুনর্গঠিত ক'রে ও বিন্যস্ত ক'রে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মানব-সভ্যতার বিকাশে ও সমাজ-জীবনের অগ্রগতিতে আরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ বহু পুরাতন ঘটনা। যে সমস্ত ঘটনা বা তথ্যকে আজ আমরা সত্য বা স্বতঃসিদ্ধ বলে জানি, তা এই ভাবে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বা দৃষ্টান্তের ফলশ্রুতি। মানুষ তার জীবনে তার মনের অগোচরেই দৃষ্টান্ত ও তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এইভাবে কত সিদ্ধান্তই না গ্রহণ করেছে! জন ডিউই (*John Dewey*) তাই বলেছেন,- **"Continual reconstruction of experience is education"**. ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার ক'রতে হবে। যেমন,—

উদাহরণ ঃ— দেব (অ) + (আ) আলয় = দেবালয়—অ + আ = আ
বিদ্যা (আ + (আ) আলয় = বিদ্যালয়— আ + আ = আ
নব (অ) + (অ) অন্ন = নবান্ন অ + অ = আ

অতএব, **সূত্র** হ'ল,- "অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আ-কার হয়। আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।" (সন্ধি)

এই পদ্ধতি শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ফলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, উৎসাহ, কৌতূহল, অনুপ্রেরণা ও পর্যবেক্ষণ-স্পৃহা প্রভৃতি বাড়ে। শিক্ষা তখন শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়। বিভিন্ন উদাহরণ সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সূত্র-গঠনের কাজে শিক্ষার্থীদের মানসিক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবার ফলে শিক্ষা-গ্রহণে তারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। **ভাষা-ব্যবহারে**

শুদ্ধতা, ভাষা বিশ্লেষণ, ভাষাগতদক্ষতা যদি ব্যাকরণ শিক্ষাদানের লক্ষ্য হয়, তবে তা আরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বাধিক অর্জন করা যায়।

॥ সাত ॥ অবরোহ-পদ্ধতি :

অবরোহ-পদ্ধতি (Deductive Method) আরোহ-পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ক্ষেত্রে **"সূত্র থেকে উদাহরণে"** যাওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণের কোন সূত্রকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয়, শিক্ষার্থীরা এই সূত্রকে আয়ত্ত করে ; তারপর তাকে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রয়োগ ক'রে তার নির্ভুলতা নির্ণয় করে। তর্কবিজ্ঞানে এই পদ্ধতিকে বলা হয় অবরোহ-পদ্ধতি। যেমন,—

সমস্ত মানুষই মরণশীল।
রাম একজন মানুষ।
∴ রাম মরণশীল।

এ ক্ষেত্রে আগেই সূত্রটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। তারপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ ক'রে তার নির্ভুলতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে হয়। ব্যাকরণ-শিক্ষায় এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করা হ'য়েছে। যেমন, —

সূত্র—"অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকিলে উভয় মিলে আ-কার হয়। আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।" (সন্ধি)

উদাহরণ দেব (অ) + (আ) আলয় = (অ + আ) দেবা(আ)লয় ইত্যাদি।

সূত্রটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকগুলি উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ ক'রতে হবে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা কম ব'লে শিক্ষাগ্রহণে তারা আগ্রহ, কৌতূহল ও উৎসাহ গ্রহণ করে না। বিষয়টি তাদের কাছে জটিল ও নীরস বলে মনে হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীর মুখস্থ-বিদ্যার প্রতি প্রবণতা বা ঝোঁক দেখা যায়। এই শিক্ষা তাই মনোবিজ্ঞানের বিরোধী। জানা থেকে অজানায় যাওয়া, মূর্তথেকে বিমূর্তে যাওয়া শিক্ষাদানের কৌশল (*Maxims of teaching*)। কিন্তু এই পদ্ধতিতে তা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। এই পদ্ধতি তাই শিক্ষাতত্ত্বেরও পরিপন্থী। কিন্তু তা সত্ত্বেও **ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভাষা-ব্যবহার ও ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির দিক্ থেকে এই পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ ভাষার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ ছাড়া নিছক ব্যাকরণের জ্ঞান অনাবশ্যক।**

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আরোহ ও অবরোহ এই দুটি পদ্ধতিরই প্রয়োজন। সূত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আরোহ-পদ্ধতি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবরোহ-পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারলে ভাল হয়। উভয় পদ্ধতি তাই পরস্পরের পরিপূরক। **আরোহ-পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষা ও অবরোহ-পদ্ধতিতে তার প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। D. C. Wren বলেছেন,—'Teach grammar inductively and apply it deductively.'**

আরোহ-পদ্ধতি ও অবরোহ-পদ্ধতি

কিন্তু আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যখন ব্যাকরণের সূত্র নির্মাণের

উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তখন তার শিক্ষা আরোহ-পদ্ধতিতেই হওয়া উচিত।

গতানুগতিকতা পরিহার ক'রে ব্যাকরণ শিক্ষাদানকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতি অনুযায়ী ক'রতে হবে। ব্যাকরণ শিক্ষাদান যেন কৃত্রিম, যান্ত্রিক ও নীরস না হয়। এই শিক্ষাদান শিক্ষার্থীদের জানা থেকে অজানায়, মূর্ত থেকে বিমূর্তে, সহজ থেকে জটিলের দিকে নিয়ে যাবে। ব্যাকরণ শিক্ষা-গ্রহণে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী ও সক্রিয় ক'রে তুলতে হবে। শিক্ষাদান মুখস্থ-বিদ্যার উপর নির্ভরশীল হবে না। শিক্ষার্থীরা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূত্রে উপনীত হবে। মনে রাখতে হবে যে, ব্যাকরণ ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাকে সহজ করে, ভাষা-ব্যবহারকে শুদ্ধ করে। ভাষা ও সাহিত্যের বাইরে ব্যাকরণের কোন গুরুত্ব নেই। **ব্যাকরণকে 'প্রভু' হিসাবে ব্যাবহার না ক'রে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাকে 'ভৃত্য' হিসাবে দেখতে হবে।** সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ শিক্ষাদান করতে হবে। বহুদিন থেকে প্রচলিত আমাদের ব্যাকরণ শিক্ষাদান সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। তাই ব্যাকরণের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদান কৌশলের সর্বাত্মক পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এইভাবে ব্যাকরণ শিক্ষা ক'রে শিক্ষার্থীরা সার্থকভাবে ভাষা-ব্যাবহার শিখবে, সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হবে। তবেই ব্যকরণ-শিক্ষাদান সার্থক হবে।

উপসংহার

॥ অনুশীলনী ॥

১। ব্যাকরণ শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?
সাহিত্য-পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাকরণ সম্পর্কে যে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ হয়, ছাত্রদের পক্ষে তাহাই কি পর্যাপ্ত অথবা ব্যাকরণ বিষয়ে তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে নিয়মিত শিক্ষাদান আবশ্যক? যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক এ বিষয়ে আপনার মত ব্যক্ত করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬০)

২। আমরা যে বাংলা ব্যাকরণ পড়ি ও পড়াই, তাহার বেশির ভাগই সংস্কৃত ব্যাকরণের বাংলা সংস্করণ,—আপনার বিদ্যালয়ে যে বংলা ব্যাকরণ প্রবেশিকার পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বিচার করুন, এবং ভাষা শিখাইবার পক্ষে উক্ত গ্রন্থের উপযোগিতা সম্বন্ধে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬০)

৩। বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনার অভিমত যুক্তি সহযোগে ব্যক্ত করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি, ১৯৬৯)

৪। ব্যাকরণ পড়াইবার উদ্দেশ্য কি? বাংলা ব্যাকরণ পড়ানোর ব্যাপারে কি ধরনের সমস্যা আসিয়া থাকে? ব্যাকরণ পড়াইবার আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি., ১৯৭০)

৫। ব্যাকরণ-পাঠের আবশ্যকতা কি? বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষাদানে কি প্রণালী অবলম্বন করিবেন? (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৯)

৬। ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ পড়ানোর উদ্দেশ্য কি ; উভয়ের কোন্ কোন্ দিক্ বিদ্যালয়ের কোন্ কোন্ স্তরে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া লিখুন।

(বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৫)

৭। ব্যাকরণ শেখানো কোন্ শ্রেণী থেকে আরম্ভ করা উচিত ? এ পাঠদানকে সরস করতে হলে কি কি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে ? উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করুন।

(বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৯)

৮। বাংলা ব্যাকরণ পড়াইবার প্রচলিত পুরাতন পদ্ধতির সহিত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির আলোচনা করুন।

(কলি. বিশ্ব. বি. এড. ১৯৭২)

৯। বাংলা ব্যাকরণ পড়াইবার আধুনিক প্রণালী কি? উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা করুন।

(কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৬৫)

১০। মাতৃভাষা শিক্ষার পক্ষে ব্যাকরণ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক ব্যাকরণ শিক্ষার পদ্ধতি আলোচনা করুন।

(কল্যাণী বিশ্ব. বি. এড. ১৯৬৭)

১১। বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা ব্যাকরণ পৃথকভাবে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন আছে কি? কোন্ পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষা দিলে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হইতে পারে ? যুক্তিসহকারে তাহা লিখুন।

(বর্ধমান বিশ্ব. বি. এড. ১৯৭২)

১২। মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ-পাঠের আবশ্যকতা কি ? 'বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষাদানে কি প্রণালী অবলম্বন করিবেন, উদাহরণ-সহ বিস্তারিত আলোচনা করুন।

(কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৭৩)

১৩। বাংলা ভাষা শিক্ষায় ব্যাকরণ-পাঠের যথার্থ উপযোগিতা সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য উপস্থিত করুন এবং সাহিত্য-বিষয়ক পাঠদানে ব্যাকরণের স্থান নির্দেশ করুন।

(কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৫)

১৪। ব্যাকরণ পাঠকে কিরূপে সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলা যায়—সে বিষয়ে আপনার অভিমত দৃষ্টান্ত ও যুক্তিসহকারে ব্যক্ত করুন।

(কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৮)

একাদশ অধ্যায়

রচনা ও লেখা

[Essay Writing]

বিদ্যালয়-স্তরে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রবন্ধ ও রচনাকে সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সাহিত্যদর্শনের বিচারে প্রবন্ধ ও রচনা ভিন্নজাতীয় সৃষ্টি, – এদের সাহিত্যগুণও ভিন্ন, প্রকৃতিও ভিন্ন। "প্রবন্ধ" শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন'। **প্রবন্ধ তাই বস্তুনিষ্ঠ সৃষ্টি, – বিষয়বস্তু (Subject matter), তথ্য ও তত্ত্ব-ই প্রবন্ধের মুখ্য কথা**। একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে যখন নানাভাবে যুক্তি, তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ ও তথ্য-তত্ত্ব দিয়ে একান্তভাবেই বস্তুনিষ্ঠ ক'রে উপস্থাপিত করা হয়, তখন তাকে বলে 'প্রবন্ধ'। 'রচনা' হল ব্যক্তিনিষ্ঠ তন্ময় সৃষ্টি। 'অসাধারণ চমৎকারিণী রচনা হি নির্মিতঃ'—কর্ণপূর। *Montague* রচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন,— *"It is myself I paint."* তিনি আরও বলেছেন, *"Myself am the matter of my book."* রবীন্দ্রনাথ 'রচনার প্রসঙ্গে' ('বিচিত্র প্রবন্ধ') বলেছেন, "ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে, তাহা বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে।" 'রচনা' শব্দটির অর্থ হল—নির্মাণ, গ্রন্থন, বিন্যাস বা গঠন। **রচনার মধ্যে বিষয়বস্তু বড় কথা নয়; বর্ণনার সাহিত্যকীর্তির তন্ময় প্রতিষ্ঠাই রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য**। কী বলা হল,—তাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় ; কিন্তু কেমন ক'রে বলা হল, –তাই রচনার মূল কথা। বিষয়বস্তু সংগ্রহ ক'রে নানা যুক্তিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশন করাই হল প্রবন্ধের কাজ। কিন্তু রচনা সম্পূর্ণ সৃজনশীল আত্মগত সাহিত্যসৃষ্টি, ব্যক্তিমনের নিবিড় অনুভূতির সৌন্দর্য ও শিল্পময় অভিব্যক্তিই যার প্রাণ। প্রবন্ধ ও রচনার মধ্যে তাই গুণগত পার্থক্য আছে।

প্রবন্ধ ও রচনা

প্রবন্ধ ও রচনা সাহিত্যের দু'টি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শাখা হ'লেও বিদ্যালয়ে এই দু'টিকে সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। একই উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ ও রচনাকে ব্যবহার করা হয়। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রশ্নপত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে,—"নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।" এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত *topic* দেওয়া হয়, তা প্রধানতঃ প্রবন্ধেরই উপযোগী। দেশভ্রমণ, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, রেডিও, মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, দুর্গাপূজা, মনীষীদের জীবনী প্রভৃতি বস্তুনিষ্ঠ বিষয়গুলিকে বিদ্যালয়ে প্রবন্ধ-রচনার বিষয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া, কতকগুলি বিষয়কে গ্রহণ করা হয়, সেগুলির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রচনার সুযোগ রয়েছে। 'বনভোজন', 'একটি বর্ষণ-মুখরিত দিন', 'শীতের সকাল' প্রভৃতি বিষয়গুলিতে সাহিত্যধর্মী রচনা-সৃষ্টির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবে এই জাতীয় বিষয় সংখ্যায় খুব বেশী নয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে তাই বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের প্রাধান্যই বেশী। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণী থেকে পাঠ্যক্রমের মধ্যে প্রবন্ধ ও রচনা একটি বিশিষ্ট স্থান

প্রচলিত পাঠ্যক্রমে প্রবন্ধ ও রচনার স্থান

অধিকার ক'রে আছে। সপ্তম-অষ্টম-নবম-দশম শ্রেণীতে প্রবন্ধ শিক্ষা দেওয়া হয়; পরীক্ষাতেও প্রবন্ধ বা রচনার একটি বিশেষ স্থান আছে। আমাদের দেশের বিদ্যালয়-গুলিতে মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে (*curriculum*) প্রবন্ধ বা রচনার স্থান তাই নির্দিষ্ট। বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষা ও উত্তরদানের ক্ষেত্রেও রচনা-ধর্মী অভীক্ষার (*Essaytype Examination*) স্থান বিদ্যালয়ে সুনির্দিষ্টভাবে বর্তমান। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রবন্ধ বা রচনা শিক্ষাদান তাই অপরিহার্য।

ভাষা-শিক্ষার কতকগুলি স্তর আছে। রচনা বা শিক্ষাদানেরও কতকগুলি স্তর বা পর্যায় আছে। শিশুর রচনাশিক্ষায় গল্প (*story*) ও চিত্রের (*picture*) ব্যবহার বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক। মনস্তাত্ত্বিক কারণেই প্রতিটি শিশুই গল্প ভালোবাসে, ছবি পছন্দ করে। রচনা-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাই এ দু'টিকে সর্বাত্মকভাবে ব্যবহার ক'রতে হবে। গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কল্পনা-শক্তির বিকাশ সাধন ক'রতে হবে।

গল্প ও চিত্রের মাধ্যমে শিশুদের রচনা-শিক্ষা

গল্প শুনে শিশু তা আয়ত্ত ক'রতে চেষ্টা করে, পরে সেই গল্পকেই সে অপরের কাছে ব্যক্ত ক'রতে চায়। এইভাবে ভাষা-শিক্ষাক্ষেত্রে তার স্বকীয়তা ও আত্মপ্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠিত হয়। সে রচনা-কৌশল আয়ত্ত করে। এইভাবে তার মধ্যে রচনা-সৃষ্টির পটভূমি প্রস্তুত হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কল্পনা ও চিন্তাশক্তির বিকাশে, ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা-সৃষ্টিতে, কোন একটি বিষয় অবলম্বনে আপন কল্পনা ও চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ-রচনায় **ছবি** একটি উল্লেখযোগ্য বাহন। ছবি শিশুদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। বহু রঙের ছবি শিক্ষার্থীদের কাছে আরও আকর্ষণীয়। এই সব ছবিকে রচনা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ব্যবহার ক'রতে হবে। কোন কাহিনী বা গল্পের চিত্ররূপ বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করতে হবে। তা দেখে শিক্ষার্থীরা নিজেদের আপন কল্পনাশক্তির সাহায্যে তাকে ভাষাময় রূপ দেবে। এইভাবে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রবন্ধ বা রচনা লেখবার ক্ষমতা ও দক্ষতা জন্মাবে। **শিশুদের প্রবন্ধ রচনা শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে গল্প ও ছবি তাই গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য মাধ্যম।**

প্রবন্ধ ও রচনা শিক্ষায় প্রাথমিক পর্যায়ে **মৌখিক রচনা** প্রয়োজন। ভাষাশিক্ষা-ক্ষেত্রে মুখে ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা আগে জন্মায়,—লেখার দক্ষতা আসে পরে। শিশুদের মধ্যে অধিক কথা বলার একটা প্রবণতা আছে। এই সব দিক্ বিচার-

মৌখিক রচনা

বিবেচনা ক'রে মৌখিক রচনার আশ্রয়েই শিশুদের প্রবন্ধ ও রচনা শিক্ষার শক্ত বনিয়াদ গড়ে তুলতে হবে। শিশুরা প্রথমে শেখে শব্দ, তারপর শব্দ-পরম্পরায় বাক্য। বাক্যের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ ক'রতে পেরে শিশুচিত্ত এক অদ্ভুত মানসিক তৃপ্তি ও প্রশান্তি পায়,—কারণ আপনাকে প্রকাশ করাই মানব মনের মৌলিক প্রবণতা। **তাই রচনা-শিক্ষার গোড়ার দিকে মৌখিক রচনাকে প্রাধান্য দিতে হবে।** শিশুরা বিভিন্ন শব্দ দিয়ে ছোট ছোট বাক্য রচনা ক'রবে,—তার মধ্য দিয়ে তাদের মনের ভাব সম্পূর্ণ ও স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হবে।

এই রূপ কয়েকটি বাক্য নিয়ে রচনাকল্প একটি বিষয় গ'ড়ে উঠবে। নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা (*Experience*) বর্ণনার মধ্য দিয়েও শিক্ষার্থীরা তাদের রচনাশক্তি সার্থকভাবে বিকশিত হওয়ার পথ খুঁজে পাবে ; সহজ ও সরল ভাষায় তার জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবে, তার দৈনন্দিন জীবনের কথা বলবে, জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ আবেগময় ঘটনার বিবরণ দেবে। এই ভাবে মৌখিক রচনার মাধ্যমে তার কল্পনা ও চিন্তাশক্তি ধীরে ধীরে বিকশিত হবে, এবং আপন দক্ষতায় ও শৈলীতে ভাষা ব্যবহার ক'রে সুন্দর প্রবন্ধ ও রচনা লেখবার জন্য তার মানসিক প্রস্তুতিও গড়ে উঠবে।

রচনা লেখার প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে **অনুচ্ছেদ-রচনা** বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে নীচু শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা রচনার বিষয়টিকে যথাযথ আয়ত্ত ক'রে তার সঙ্গে নিজস্ব চিন্তার ফসল যুক্ত ক'রে ভাবের বিশ্লেষণ ও ভাষার বিন্যাসের মাধ্যমে সার্থক পূর্ণাঙ্গ রচনা লিখতে পারে না। অনুচ্ছেদ হ'ল পূর্ণাঙ্গ রচনার ক্ষুদ্র সংস্করণ। নীচু শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা তাই রচনার পরিবর্তে অনুচ্ছেদ লিখতে শিখবে। অনুচ্ছেদের ছোট্ট অবয়ব ও পরিসরের মাধ্যমে তারা তাদের মনের ছোট ছোট ভাবনাগুলিকে যথাযথভাবে প্রতিফলন করবে। অনুচ্ছেদগুলি যেন একটি পূর্ণাঙ্গ রচনার কতকগুলি *points*। যেমন,—'বর্ষাকাল' একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা ; কিন্তু বর্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থা, বর্ষায় মনের অবস্থা, বর্ষার সুবিধা-অসুবিধা —এগুলি অনুচ্ছেদ। এই অনুচ্ছেদগুলিকে একটির পর একটি ঠিকভাবে সাজিয়ে নিতে পারলে একটি পূর্ণাঙ্গ রচনাতে পরিণত হয়। নীচু শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের তাই সার্থকভাবে অনুচ্ছেদ রচনা ক'রতে শিক্ষা দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ তাঁদের নয়া পাঠ্যক্রমে ষষ্ঠ শ্রেণীতে 'রচনা'-র পরিবর্তে 'অনুচ্ছেদ-রচনা'কে স্থান দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ রচনা

বিদ্যালয়ে প্রবন্ধ-রচনা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ও গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সেগুলি হ'ল—

॥ **এক** ॥ প্রবন্ধ ও রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে ভাষা শিক্ষা করতে পারে। তাদের মধ্যে ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা ও কৌশল বৃদ্ধি পায়।

॥ **দুই** ॥ শিক্ষার্থীদের মধ্যে কল্পনা ও চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়।

॥ **তিন** ॥ প্রবন্ধ ও রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পচেতনা বৃদ্ধি পায়।

॥ **চার** ॥ প্রবন্ধ ও রচনার মধ্যে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিভাবনা আত্মপ্রকাশ করে। ফলে, তাদের প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভজনিত মানসিক জটিলতার উদ্গতি সাধন হয়।

॥ **পাঁচ** ॥ প্রবন্ধ ও রচনার অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ, বিচার-বিশ্লেষণ, যুক্তিতর্ক ও চিন্তাভাবনার ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

—এইসব কারণে বিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষার্থীদের রচনা-শিক্ষাদান আবশ্যক হ'য়ে পড়ে।

ভালো ও সার্থক প্রবন্ধ বা রচনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষাদানের সময় সেই বৈশিষ্ট্যগুলির কথা মনে রাখতে হবে। প্রবন্ধের মধ্যে **বিষয়বস্তুই** প্রধান, আর

বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে প্রবন্ধের স্থানই সর্বাধিক। তাই প্রবন্ধ-রচনার সময় বিষয়বস্তুর প্রাধান্য থাকবে। যে বিষয়বস্তুর উপর প্রবন্ধ রচনা হবে, তার উপর শিক্ষার্থীদের ভালো দখল থাকবে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকমহাশয়ের কাছ থেকে শুনে, বিভিন্ন বই ও পত্র-পত্রিকা প'ড়ে, চিন্তাভাবনা ক'রে ও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জন করবে। প্রবন্ধ ও রচনার **ভাষা** সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল হবে; ভাষা বিষয়বস্তুর অনুযায়ী হবে। **বর্ণনাভঙ্গী** রচনাকে সমৃদ্ধ ক'রবে। বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে এবং তা সাহিত্যগুণে আকর্ষণীয় হবে। প্রবন্ধের মধ্যে সুন্দর ক'রে গুছিয়ে, অনুচ্ছেদে ভাগ ক'রে বিষয়বস্তুকে চমৎকার ক'রে উপস্থাপন ক'রতে হবে। **উপস্থাপন-কৌশল** প্রবন্ধ ও রচনার অন্যতম গুণ। প্রবন্ধ ও রচনার মধ্যে লেখকের নিজস্ব রীতি ও **Style** পরিস্ফুট ও প্রতিফলিত হবে। **যুক্তিতর্কের** মাধ্যমে প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর **বিচার-বিশ্লেষণ** ক'রতে হবে, কল্পনা ও চিন্তাশক্তির সাহায্যে বিষয়বস্তুর **treatment** ক'রতে হবে। **রচনার মধ্যে লেখকের আত্মগত ভাবনা ব্যক্তিগত মন্ময় চেতনা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির অনুরণন প্রতিবিম্বিত** হবে। রচনার ছত্রে ছত্রে লেখকের ব্যক্তিমানসিকতা ও বিদগ্ধ চেতনার আলোক ও অনুভূতির উত্তাপ ছড়িয়ে পড়বে। **প্রবন্ধ ও রচনা সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ হবে,—শিল্পমণ্ডন-কলায় উন্নত হবে**। ভালো রচনার এই বৈশিষ্ট্যগুলির কথা স্মরণ রেখে বিদ্যালয়ে রচনা শিক্ষা দিতে হবে। তবেই রচনা শিক্ষাদান যথার্থ ও সার্থক হবে। ভালো রচনা সম্বন্ধে **বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,**—"রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা ও স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা, তাহার পর ভাষার সরলতা স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে।"

ভালো রচনার বৈশিষ্ট্য

রচনা-শিক্ষাদানের সময় যে বিষয়টির উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে, তা হ'ল শিক্ষার্থীদের **অনুশীলন**। প্রবন্ধ ও রচনা লেখায় শিক্ষার্থীদের চর্চা ও অনুশীলন থাকবে। এই অনুশীলন শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হ'লেই ভাল হয়। শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিয়েও রচনা লিখতে উৎসাহিত ক'রতে হবে। প্রবন্ধ ও রচনা শিক্ষাদানের সময় **বিষয়বস্তু নির্বাচনের** উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিষয়বস্তু সহজ থেকে ক্রমশঃ জটিল হবে, শিক্ষার্থীদের জানা পরিবেশ থেকে শুরু ক'রে ক্রমশঃ তা অজানার দিকে ছড়িয়ে পড়বে। প্রবন্ধ ও রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় নজর রাখতে হবে যাতে তা শিক্ষার্থীদের জীবনের মিল থাকে। প্রবন্ধ ও রচনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন রকমের হ'তে পারে। প্রকৃতিমূলক, জীবনীমূলক, চিন্তামূলক, বর্ণনামূলক, ভাবমূলক, সমাজচেতনামূলক প্রভৃতি বিভিন্ন রচনা শিক্ষার্থীদের লিখতে দেওয়া হয়। আত্মগত ব্যক্তিধর্মী বিভিন্ন বিষয়কেও এর অন্তর্ভুক্ত ক'রতে হবে।

রচনা-শিক্ষাদান

রচনা-শিক্ষাদানের পর পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা **বিষয়বস্তুর জ্ঞান আহরণ** ক'রবে ও তথ্য সংগ্রহ ক'রবে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকমহাশয়ের কাছ

থেকে শুনে, বিভিন্ন বই প'ড়ে, পত্র-পত্রিকা প'ড়ে বিষয়বস্তুর জ্ঞান সংগ্রহ ক'রতে পারে। বিষয়বস্তুর অস্পষ্টতা থাকলে চলবে না। তারপর শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা ক'রে সমগ্র রচনাটিকে কয়েকটি **points**-এ ভাগ করবে। এ সময় শিক্ষকমহাশয় তাদের সাহায্য করবেন। প্রবন্ধ-রচনার প্রারম্ভে থাকবে **'সূচনা'**;—এই পর্যায়ে প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা থাকবে। রচনার শেষ পর্যায়ে থাকবে **'উপসংহার'**, যার মধ্যে সমস্ত আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। মধ্যে থাকবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত মূল বিষয়বস্তু। **মূল বিষয়বস্তু কয়েকটি অনুচ্ছেদে লেখা হবে। যথাযথ স্থানে যতিচিহ্ন থাকবে। মাঝে মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি থাকবে। রচনার ভাষা হবে সরল, সাবলীল ও সুস্পষ্ট। শিক্ষার্থীরা যাতে নিজের ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করে, তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বর্ণনার ভঙ্গী, যুক্তিতর্কবিন্যাস, বিচার-বিশ্লেষণের বিস্তার প্রবন্ধ বা রচনাকে উন্নত ও শক্তিশালী করবে। রচনার ভাষা ভাবের অনুযায়ী হবে। রচনার শব্দ-ব্যবহারও ভাব, ভাষা ও ধ্বনি অনুযায়ী হবে। প্রতিটি বাক্যগঠন যথাযথ হবে। ভাষায় সাধু-চলিতের মিশ্রণ থাকবে না, গুরুচণ্ডালী দোষ থাকবে না, ব্যাকরণগত ভুল থাকবে না। সুষ্ঠু ও সুন্দর হাতের লেখায় প্রবন্ধ বা রচনা লিখতে হবে। কোথাও ভাবের অস্পষ্টতা থাকবে না। রচনা লেখায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে। শব্দ সংগ্রহ ও বাক্য-গঠনের প্রতি তাদের আকর্ষণ বাড়াতে হবে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সাহিত্যিকের লেখাগুলি পড়বে এবং ধীরে ধীরে প্রবন্ধ ও রচনার কৌশলগুলি তারা আয়ত্ত ক'রবে। শিক্ষার্থীদের লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ ও রচনা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে পাঠ ক'রতে দিতে হবে, বিদ্যালয়ের পত্র-পত্রিকায় (দেওয়াল ও মুদ্রিত) এগুলিকে প্রকাশ ক'রতে হবে। বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ ও রচনা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার-দানের ব্যবস্থা ক'রতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা উৎসাহী ও অনুপ্রাণিত হয়। শিক্ষকের যত্ন, নিষ্ঠা, সহানুভূতি ও সহযোগিতা এবিষয়ে বিশেষভাবে কার্যকরী।** ব্যাপকভাবে রচনার অনুশীলনী ও চর্চাকে সম্ভব ক'রে তুলতে হবে। তার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীদের সত্যিকারের প্রবন্ধ ও রচনা লেখবার ক্ষমতা বিকশিত হবে। এর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ভালো রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি জানিয়ে দিতে হবে। রচনা-শিক্ষাদানকালে শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে হবে।

রচনা-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পাঠাগার ও শ্রেণীকক্ষের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বিষয়বস্তুর জ্ঞান আহরণ করতে শিক্ষার্থীদের **পাঠাগার (library)** থেকে বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা নিয়ে পড়া-শুনা ক'রতে হয়। এই সব বই ও পত্র-পত্রিকা না পড়লে

শিক্ষার্থীরা প্রবন্ধ ও রচনার বিষয়বস্তুর জ্ঞান যথাযথভাবে সংগ্রহ ক'রতে পারবে না। ফলে, ভাবের মধ্যে একটা অস্পষ্টতা থেকে যাবে। রচনা-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পাঠাগার ব্যবহার তাই বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা পাঠাগার থেকে বিভিন্ন লেখকের বইপত্র ও সাহিত্যসৃষ্টি সংগ্রহ করে সেগুলিকে পাঠ ক'রবে। ফলে প্রবন্ধ ও রচনা লেখবার কৌশলগুলি তারা আয়ত্ত করতে পারবে। **শ্রেণীকক্ষের (class room)** বিশেষ সজ্জাও রচনা-শিক্ষাদানের সহায়ক। শ্রেণীকক্ষকে রচনা-শিক্ষাদানের উপযোগী ক'রে সজ্জিত ক'রতে হবে। শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন বই ও পত্রপত্রিকা দিয়ে যে বিষয় পাঠাগার (*Subject Library*) গঠিত হবে, তা শিক্ষার্থীদের রচনা লিখতে সাহায্য করবে। শ্রেণীকক্ষে ছবি ইত্যাদি দিয়ে এমন একটি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় যা শিক্ষার্থীদের রচনা-শিক্ষাদানের সহায়ক ; এবং সেদিকে তাকিয়ে শ্রেণী-কক্ষকে সজ্জিত ক'রতে হবে। অতিরিক্ত পড়াশুনা ও সুতীব্র মনন ছাড়া ভালো রচনা লেখা যায় না। তার জন্য বিদ্যালয়-পাঠাগার, *reading room* ও সুসজ্জিত শ্রেণীকক্ষ বিশেষ সহায়তা করবে।

রচনা-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পাঠাগার ও শ্রেণীকক্ষের ভূমিকা

একটি সুগ্রন্থিত **'সংকলন'** (**collection book**) শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধ ও রচনা লেখায় যথেষ্ট সহায়তা ক'রবে। এই 'সংকলন' ব্যক্তিজীবনের একটি মূল্যবান সম্পদ। এই-জাতীয় সংকলনে বিভিন্ন লেখক ও মনীষীদের সুচিন্তিত উক্তি, বিভিন্ন কাব্য কবিতার উদ্ধৃতি, বাগ্‌ধারা, নতুন নতুন শব্দ প্রভৃতি সংকলিত থাকবে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বই বা পত্র-পত্রিকা পড়ে ও বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ ক'রে এই সংকলন গড়ে তুলবে। এই সংকলন শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধ ও রচনা লেখায় প্রভূত পরিমাণে সাহায্য ক'রবে। প্রবন্ধ ও রচনার মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলবে। তবে দেখতে হবে যাতে শুধুমাত্র উদ্ধৃতির চাপে প্রবন্ধ বা রচনার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হ'য়ে না যায়। তথ্য তত্ত্ব, কবিতার ছত্র, বিভিন্ন উদ্ধৃতি, বাগ্‌ধারা ও নতুন শব্দের সংকলন শিক্ষার্থীদের চিন্তাধারা ও *Style*-কে পর্যন্ত প্রভাবিত ক'রতে পারে। প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে এরূপ এক-একটি সংকলন গড়ে তোলে, তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ব্যক্তিগত সংকলন-পুস্তিকা

শিক্ষার্থীদের কল্পনা-শক্তির বিকাশে ও চিন্তাশক্তির প্রসারে চিঠি-লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ব্যবহারিক পত্রগুলি অনেকটা কৃত্রিম ও যান্ত্রিক, কিন্তু যে সমস্ত পত্র সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি প্রিয়জনকে লেখা সেগুলির মধ্যে আত্মগত ভাবনা ও নিবিড় অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কল্পনা, চিন্তা ও অনুভূতি-শক্তির বিকাশ ও প্রসার হয়। এ কারণেই বিদ্যালয়-স্তরেও শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লিখতে উৎসাহিত ক'রতে হবে। শিক্ষার্থীরা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও *Pen-friend*-দের ব্যক্তিগত পত্র লিখবে। তার মধ্য দিয়ে সে তার আপন মনের ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ ক'রবে। জীবনের অভিজ্ঞতা, দৈনন্দিন জীবনের

পত্র-রচনা ও রচনা-শিক্ষা

কাহিনী, কোথাও বেড়াতে গিয়ে তার বর্ণনা, কোন আত্মগত চিন্তা ইত্যাদিকে অবলম্বন ক'রে শিক্ষার্থীরা চিঠিপত্র লিখবে, যত বেশী লিখবে তত ভাল। তাতে ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা বাড়বে, ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা বাড়বে এবং লেখার মধ্যে আপন অনুভূতির ছোঁয়া লাগবে। এর ফলে ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের যে মানসিকতা ও ভাষা-ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত হবে, তা প্রবন্ধ ও রচনা লিখতে তাদের সাহায্য ক'রবে। **রচনা-শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে তাই শিক্ষার্থীদের চিঠি লিখতে উৎসাহিত করা উচিত।**

প্রবন্ধ ও রচনা—এ দু'টি সাহিত্যের দু'টি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শাখা হ'লেও প্রবন্ধের তুলনায় রচনার সাহিত্যগুণ বেশী। তাই শিক্ষার্থীদের রচনা লেখায় অধিকতর উৎসাহিত করতে পারলে তাদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও সৌন্দর্য-চেতনা বিকশিত হবে। সেজন্য প্রয়োজন **সৃজনশীল রচনার (creative writing)**। শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বাভাবিক ভাবে আপন নিবিড় অনুভূতি দিয়ে এই সৃজনশীল সাহিত্যধর্মী রচনাকে সম্ভব ক'রে তুলবে। বহির্জগতের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ তার মনোরাজ্যে যে ছোঁয়া দেবে, তার-ই অনুভূতি-ঘন আত্মগত প্রকাশ ও অভিব্যক্তি ঘটবে এই জাতীয় রচনাগুলির মধ্যে। এই জাতীয় রচনা লেখবার উপর বিদ্যালয় থেকে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা থাকবে না। কিন্তু নেপথ্য-পরিচালনায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল রচনা-সৃষ্টিকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করতে হবে। এই জাতীয় সাহিত্য-রচনা বিদ্যালয় পত্রিকাতে প্রকাশ করতে হবে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা ক'রতে হবে। বিদ্যালয়ে প্রবন্ধ ও রচনা শিক্ষাদানের চরম পর্যায় হ'ল এই সৃজনশীল সাহিত্যধর্মী রচনাগুলি। কাজেই ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের সেদিকে নিয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে সাহিত্য-চেতনা, শিল্প-সৌন্দর্য ও নন্দনতত্ত্বের সার্থক উদ্বোধন ক'রতে হবে।

সৃজনশীল সাহিত্য-ধর্মী রচনা

রচনা-শিক্ষার সঙ্গে শিশু-মনস্তত্ত্বের অপূর্ব যোগ আছে। রচনার মধ্যে শিক্ষার্থীর কল্পনা, চিন্তা, অনুভূতি ও সুকুমার বৃত্তিগুলির (*Fine sentiments*) যথাযথ বিকাশ ঘটে। তার ফলে সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে একটা স্বাভাবিক মানসিক আকর্ষণ তারা অনুভব করে। রচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মন আত্মপ্রকাশ করে। প্রকাশ ও অভিব্যক্তিই মানব জীবনের অন্যতম প্রধান প্রবণতা। প্রকাশের যন্ত্রণায় সমস্ত বিশ্বজগৎ এক অদ্ভুত অস্থিরতার মধ্যে আছে। রচনার মধ্য দিয়ে শিশু তার মনের সার্থক অভিব্যক্তি ঘটিয়ে এই অস্থিরতা থেকে মুক্তি পায়। শিশু-মনে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভজনিত (*Instinct and emotion*) যে সব জটিলতা দেখা দেয়, বয়ঃসন্ধিকালের যে সব যন্ত্রণা তাদের মর্মে মর্মে তীব্র জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে, রচনার মাধ্যমে সার্থক অভিব্যক্তির ফলে সে সব জটিলতা ও যন্ত্রণার **উদ্‌গতিসাধন (Sublimation)** হয়। মানসিক যে সব জটিলতা শিশুর জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারতো সেগুলির যথাযথ উদগতি-সাধনের ফলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য

রচনা-শিক্ষাদান ও শিশু-মনস্তত্ত্ব

রক্ষা পায়। তাই মনস্তাত্ত্বিক কারণেও শিক্ষার্থীদের রচনা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এইভাবে দেখা যায় যে, রচনার সঙ্গে শিশু-মনস্তত্ত্বের সম্পর্ক ও সংযোগ আছে।

শিক্ষার্থীদের লেখা যে সব প্রবন্ধ ও রচনা দেখা যায়, তার মধ্যে প্রধানতঃ তিন ধরনের ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় –

॥ এক ॥ বিষয়বস্তু ঘটিত

॥ দুই ॥ ভাষাগত

॥ তিন ॥ রচনার শিল্পগত

শিক্ষার্থীদের লেখা প্রবন্ধ ও রচনার ত্রুটি

শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবন্ধ ও রচনার **বিষয়বস্তুঘটিত দুর্বলতা** থাকে। অনেক সময় তারা যে *topic*-এর উপর প্রবন্ধ বা রচনা লিখতে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান ও ধারণা পরিষ্কার নয়। সেক্ষেত্রে প্রবন্ধ বা রচনা ত্রুটিযুক্ত হতে বাধ্য। শিক্ষার্থীদের মধ্যে **ভাষা-ব্যবহারের দুর্বলতা** থাকে। প্রবন্ধ বা রচনা লিখতে গিয়ে তারা সাধু ভাষা ও চলতি ভাষায় মিশিয়ে ফেলে। অনেক সময় ভাষার ব্যকরণগত ভুলও দেখা যায়। ভাষার মধ্যে সরলতা, স্পষ্টতা ও সাবলীলতা থাকে না। অনেক সময় ভাষায় গুরুচণ্ডালী দোষ দেখা যায়। শিক্ষার্থীরা ভালো প্রবন্ধ বা ভালো রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি না জানার ফলে তারা **সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ রচনা সৃষ্টি** ক'রতে পারে না। উন্নত সাহিত্যিক প্রবন্ধ ও রচনার শিল্পগত রূপটি তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। শিক্ষার্থীরা রচনা লেখবার সময় অনুচ্ছেদ করতে ভুলে যায়। যথাযথ স্থানে যতিচিহ্ন স্থাপন ক'রতে ভুলে যায়। প্রবন্ধ বা রচনা লেখবার এই ত্রুটিগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে দূর ক'রতে পারলে রচনা-শিক্ষাদানকে যথাযথ ও সার্থক করে তোলা যায়।

শিক্ষার্থীদের খাতা দেখা

বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত প্রবন্ধ বা রচনা শিক্ষার্থীরা লিখবে এবং তা শিক্ষক মহাশয়কে দেখাবে। এমন কি, যে সমস্ত শিক্ষার্থী উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হবে ব্যক্তিগতভাবে প্রবন্ধ বা রচনার চর্চা বা অনুশীলন ক'রে, সেই লেখাগুলি শিক্ষক মহাশয়ের কাছে এলে সেগুলিও তাঁকে দেখতে হবে। ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষককে অনেক গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধ ও রচনার খাতাগুলি দেখে দিতে হবে। খাতা দেখায় যথেষ্ট যত্ন ও নিষ্ঠা থাকবে, শিক্ষার্থীরা খাতা নিয়ে এলে বিরক্তি প্রকাশ ক'রলে চলবে না; তাতে আনন্দ প্রকাশ ক'রতে হবে, প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ ক'রতে হবে। খাতা দেখবার সময় অত্যন্ত যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে শিক্ষার্থীদের বিষয়ঘটিত, ভাষাগত ও রচনা-শিল্পগত ভুল-ত্রুটিগুলি দেখিয়ে দিতে হবে। **সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সংশোধনাত্মক উপায়ে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার রচনা লেখবার ত্রুটিগুলি দূর করবেন। ভুল সংশোধন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর মানসিকতা ও আত্মাভিমানে যেন আঘাত না লাগে।** শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধ ও রচনার খাতা দেখবার সময় কিভাবে উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়, তার পরামর্শও শিক্ষক মহাশয় খাতার মধ্যে দেবেন। খাতা দেখা অত্যন্ত বিরক্তিকর কাজ। তাছাড়া, শিক্ষকদের

কাজের চাপও ভীষণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের জীবন ও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তিনি একাজ যদি ধৈর্য ও স্থৈর্য সহকারে করতে পারেন, তবে শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতি হয় ও শিক্ষার্থীর সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি পায়।

প্রচলিত পাঠ্যক্রমে প্রবন্ধ ও রচনার স্থান নিতান্তই গতানুগতিক। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তার কথা চিন্তা ক'রে বিদ্যালয়ে রচনা শিক্ষাদান করা হয় না। বিদ্যালয়ে রচনা শিক্ষাদান সম্পূর্ণ গতানুগতিক, কৃত্রিম ও যান্ত্রিক। পরীক্ষাতেও সাধারণভাবে শিক্ষার্থী-

উপসংহার

দের রচনা লিখতে দেওয়া হয়। সামগ্রিক ভাবে রচনা-শিক্ষাদান বিদ্যালয়ে অবহেলিত। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠে রচনাশিক্ষাদানকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। তবেই শিক্ষার্থীর ভাষা-ব্যবহারে দক্ষতা বাড়বে, সাহিত্যানুরাগ বাড়বে, শিল্প-চেতনা আসবে ও সামগ্রিকভাবে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদান সার্থক হবে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। সুষ্ঠুভাবে 'রচনা' শিখাইতে গেলে আদর্শ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে কিরূপ পরিবর্তন ঘটাইবেন? সমগ্র ছাত্রসংখ্যাকে গোষ্ঠীতে ভাগ করিয়া কিরূপভাবে 'রচনা' শিখাইতে পারা যায়, তাহা সংক্ষেপে আলেচনা করুন। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬২)

২। শ্রেণীকক্ষের কিরূপ পরিবর্তন করিয়া লইলে এবং গ্রন্থাগারের সাহায্য লইবার মতো কিরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ করিলে শিক্ষার্থীদের রচন'-শিক্ষা ফলপ্রসূ করা যায়? (বর্ধ. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৫)

৩। প্রবন্ধ-রচনার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবন্ধের বিশুদ্ধতা ও সৌন্দর্য-বিচারের জন্য কোন্ কোন্ দিক লক্ষ্য রাখিবে? রচনা লেখা শিখাইবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি কি বিশ্লেষণ কর। (বর্ধ বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৮)

৪। রচনা শেখাতে গিয়ে শিক্ষকের কোন্ কোন্ দিকে অবহিত থাকা উচিত? ছাত্রদের দিয়ে কোন একটি রচনা লিখিয়ে নেবার পর সেই লেখাগুলি শিক্ষক কোন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য রেখে দেখে দেবেন? (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৭১)

৫। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা রচনা-শিক্ষা সাধারণতঃ কিভাবে দেওয়া হয়? কিভাবে শিক্ষা দিলে রচনা-শিক্ষা সার্থক হতে পারে, বুঝাইয়া লিখুন। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৭১)

৬। রচনার দোষগুণ কি কি? আপনার মতে বাংলা রচনা শিখাইবার মূল নীতি ও পদ্ধতি কি হওয়া উচিত? (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৯)

৭। রচনা শিখাইবার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি কি, তাহা বিশদভাবে আলোচনা করুন। (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড ১৯৬৬)

৮। ভাষা-শিক্ষা ও রসবোধের পক্ষে রচনা-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতখানি? রচনা লিখন-শিক্ষা দেবার উৎকৃষ্ট প্রণালী কি? (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৮)

৯। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা রচনা-শিক্ষা সাধারণতঃ কিভাবে দেওয়া হয়? কি ভাবে শিক্ষা দিলে রচনা-শিক্ষা সার্থক হইতে পারে বুঝাইয়া লিখুন। (বর্ধমান বিশ্ব. বি. এড. ১৯৭২)

১০। বাংলা রচনার দোষগুণ ও রচনা-শিক্ষাদানের নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব. বি. এড. ১৯৭৩)

১১। প্রবন্ধ-রচনার দোষগুণ কি কি? রচনা শিখাইবার জন্য কি পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন? তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করুন। (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৭২)

১২। বাংলা রচনার দোষগুণ বিশ্লেষণ করুন। (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড, ১৯৭২)

১৩। বাংলা রচনা শিক্ষাদান প্রসঙ্গে একজন ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসাবে আপনি যে নীতি-পদ্ধতিকে সর্বাধিক ফলপ্রসূ বলিয়া মনে করেন, তৎসম্পর্কে আপনার বক্তব্য উপস্থাপিত করুন। (কলি. বিশ্ব., ১৯৭৬)

১৪। বাংলা রচনা শিক্ষাদানের নীতি ও পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৮)

দ্বাদশ অধ্যায়

রচনা-কল্প

[Composition]

মাধ্যমিক বিদ্যালয়-স্তরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্যক্রমে (*curriculum*) ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ, মর্মার্থ, সার-সংক্ষেপ প্রভৃতি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভূ ত আছে। এগুলি রচনা-কল্প (*composition*) নামে আখ্যাত হয়। ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে এগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এগুলির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন-ভাবে ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করে। বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন শব্দের অবস্থান সুসংহতভাবে যে একটি ভাবের পরিমণ্ডল গড়ে তোলে, বা কয়েকটি বাক্য মিলে যে বিষয়কে অর্থগত ও গঠনগতভাবে সম্পূর্ণ করে, তার পরিচয় ও অনুশীলন হয় এই ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ, সরলার্থ, সার-সংক্ষেপ প্রভৃতির মাধ্যমে। কোন একটি বিষয়ের ভাবকে শিক্ষার্থীরা কতখানি আয়ত্ত করতে পেরেছে, নিজের সঙ্গে কতখানি মিশিয়ে নিতে পেরেছে, তাও এই রচনা-কল্পের মধ্যে মূল্যায়ন করা যায়। ভাষায় বিশুদ্ধতা রক্ষা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ-কৌশল অর্জন করা যায় এই রচনা-কল্পের অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে। প্রতি শ্রেণীতেই তাই এই-জাতীয় বিষয়গুলিকে অন্তর্ভূ ত করা হয়েছে। এই বিষয়গুলির সঙ্গে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের কতকগুলি বিষয় সম্পর্কযুক্ত আছে। এ কথা বলা যায় যে, ইংরেজী শিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলির কাছ থেকে আমরা এগুলিকে গ্রহণ করেছি এবং তারপর সেগুলিকে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে একেবারে নিজস্ব ক'রে নিয়েছি। কাজেই রচনা-কল্প আলোচনা করবার সময় তার সঙ্গে ইংরেজী প্রতিশব্দগুলি এসে পড়বেই। এখানে সেগুলির একটি তালিকা তুলে ধরা হল,—

সূচনা

ভাবসম্প্রসারণ—Amplification
সারাংশ—Substance
সংক্ষিপ্তসার—Summary
সরলার্থ—Paraphrase
ভাবার্থ, মর্মার্থ – Central Idea
সারসংক্ষেপ/সারমর্ম – Pre´cis

এগুলির স্বরূপ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষাদান-কৌশল সম্বন্ধে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে।

ভাবসম্প্রসারণ (Amplification) পুরোপুরি প্রবন্ধ বা রচনা জাতীয়। অনেক সময় একটি ভাবসম্প্রসারণের বিষয়বস্তুকে প্রবন্ধ বা রচনা লিখতে বলা হয়।

প্রবন্ধ বা রচনা শিক্ষাদানের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভাবসম্প্রসারণেরও তাই। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাবসম্প্রসারণ পাঠ্য, পরীক্ষাতেও ভাবসম্প্রসারণের প্রায় স্থায়ী স্থান। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভাবসম্প্রসারণ শিক্ষার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। মাঝে মাঝে কোন কোন সপ্তাহে ভাষা-শিক্ষকের ইচ্ছাক্রমে ভাবসম্প্রসারণ শিক্ষা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও অধিকাংশ সময় রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' বা অনুরূপ কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে গূঢ়ার্থক ২।৪টি ছত্রকে ভাবসম্প্রসাররণের জন্য নির্দেশিত করা হয়। শিক্ষার্থীরা তার ভাবটিকে বুঝতেই পারে না, তার সম্প্রসারণ ক'রবে কি ভাবে? নবম-দশম প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীগুলিতে দ্রুতপঠনের পুস্তক থেকে (যেমন, সংকল্প-স্বদেশ, কাব্য-মালঞ্চ, কমলাকান্তের দপ্তর) বিভিন্ন অংশ তুলে দেওয়া হয় ভাবসম্প্রসারণের জন্য। কিন্তু কিসের উদ্দেশ্যে? দ্রুতপঠন, না ভাবসম্প্রসারণের জ্ঞান পরিমাপের উদ্দেশ্যে? এ চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ ক'রতে পারলে ভাল হয়। কারণ কি উদ্দেশ্যে আমরা ভাবসম্প্রসারণ করতে দিই, সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। কোন একটি ছোট অংশ থেকে ভাব সংগ্রহ ক'রে শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় তাকে বর্ণনা, যুক্তিতর্ক, ভাববিন্যাস, ব্যাখ্যা প্রভৃতির মাধ্যমে কতখানি সহজ ও সাবলীল ভাবে প্রকাশ করতে পারে, তাই ভাবসম্প্রসারণের উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান বাড়ানো, ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানো, এবং ভাষা-ব্যবহারকে সাহিত্যধর্মী করে তোলা ভাবসম্প্রসারণের মূল লক্ষ্য। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ভাবসম্প্রসারণ শিক্ষাদান করতে হবে। ভাবসম্প্রসারণের কৌশল বা রীতি শিক্ষার্থীদের বার বার বলতে হয় না। একবার ধারণা জন্মালে তারা পরবর্তী পর্যায়ে আর অসুবিধায় পড়ে না। অনুশীলনই হ'ল ভাবসম্প্রসারণের মূল কথা। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময় বার বার বিভিন্ন অংশের ভাবসম্প্রসারণ ক'রে নিজের ভাষা-জ্ঞান বৃদ্ধি করবে ও ভাষা-ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবে। শিক্ষক কোন একটি অংশকে ভাবসম্প্রসারণের জন্য নির্দিষ্ট করবেন। অংশটি সুনির্বাচিত হওয়া চাই—অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি, যোগ্যতা ও মানসিকতার উপযোগী হওয়া চাই। অংশটি তাদের কাছে আকর্ষণীয় হবে। শিক্ষক অংশটির মূল ভাব বা অর্থ শিক্ষার্থীদের একবার বলে দিতে পারেন। তারপর শিক্ষার্থীরা খাতায় অনুশীলনের মাধ্যমে ভাবসম্প্রসারণ করবে। ভাবসম্প্রসারণের আয়তন কতখানি হবে, কত সময় দেওয়া হবে, সব শিক্ষক নির্দেশ ক'রতে পারেন। তাতে শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও ভাবনা সুসংহত হয়, রচনাও নিবিড় ও দৃঢ়বদ্ধ হয়। শিক্ষার্থীরা কিছু সময় চিন্তা ক'রে নিয়ে অংশটির ভাবসম্প্রসারণ ক'রবে। মূল অংশটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের বিস্তৃততম আলোচনাই ভাবসম্প্রসারণ। শিক্ষার্থীরা মূল অংশটি পড়ে অনুসন্ধিৎসু ও জিজ্ঞাসু মন নিয়ে তার বক্তব্যের তাৎপর্যকে গ্রহণ করবে, উপলব্ধি করবে, অনুভব করবে। তারপর সেই বক্তব্যকে নিজস্ব প্রকাশরীতির মাধ্যমে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করবে, যার মধ্যে প্রতিফলিত হ'বে শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তা ও নিজস্ব অনুভূতি। বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ভাগ ক'রে যতিচিহ্নগুলি যথাস্থানে সংস্থাপিত ক'রে সরল, সাবলীল ও

ভাবসম্প্রসারণ শিক্ষাদানের রীতি ও পদ্ধতি

প্রাঞ্জল ভাষায় শিক্ষার্থীরা তার আপনমনের ভাবনা ও মাধুরি মিশিয়ে অংশটির ভাবসম্প্রসারণ ক'রবে। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা থাকবে। তারপর শিক্ষার্থীদের লেখাগুলো যত্ন, নিষ্ঠা ও সহানুভূতির সঙ্গে দেখে দিতে হবে। **ভাবসম্প্রসারণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞানও বাড়ে, ভাষা-কৌশল আয়ত্ত হয়, ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ে।** তাই বিদ্যালয়ে গুরুত্ব সহকারে ভাবসম্প্রসারণ শিক্ষা দেওয়া উচিত।

সারাংশ (**Substance**), **সংক্ষিপ্তসার** (**Summary**) প্রায় এক-জাতীয় রচনা-কল্প। বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত, নিটোল ও সুসংহত ক'রে প্রকাশ করাই সারাংশ ও সংক্ষিপ্তসার লিখনের মূল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান, ভাষাব্যবহারের দক্ষতা বাড়ে। যে অংশটি শিক্ষার্থীদের সারাংশ বা সংক্ষিপ্তসার লেখার জন্য দেওয়া হয় সেটি সুনির্বাচিত হবে, অর্থাৎ তা শিক্ষার্থীদের মান বা যোগ্যতা অনুযায়ী হবে।

সারাংশ ও সংক্ষিপ্তসার

শিক্ষার্থীরা মনোযোগ ও একাগ্রতা সহকারে অংশটি বার বার পড়বে, তার ভাব, অর্থ ও বক্তব্যকে আয়ত্ত করবে। তারপর বিষয়টিকে নিজের অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করবে। শেষে মূল বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত ক'রে সুসংহত ও নিটোল ক'রে প্রকাশ ক'রবে। সারাংশ বা সংক্ষিপ্তসারে বিষয়টির মূল ও প্রতিপাদ্য অংশটি সামগ্রিকভাবে প্রতিফলিত হবে। তাতে অনাবশ্যক অংশ যেমন থাকবে না, মূল বক্তব্যও তেমনি বাদ পড়বে না। **বিষয়বস্তু প্রকাশের সংক্ষেপিত রূপই হ'চ্ছে সারাংশ বা সংক্ষিপ্তসার।** এতে লেখকের ব্যবহৃত অলংকার, সমাস, ভাষারীতি, এমনকি শব্দসম্ভারও পরিত্যক্ত হ'য়ে মূল ভাবটি শিক্ষার্থীর নিজের ভাষায় নিজস্ব প্রকাশ-রীতিতে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হবে। মূল অংশটির সাধারণ বক্তব্য যখন সামগ্রিকভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ হয়, তখন তাকে সংক্ষিপ্তসার (*Summary*) বলে। কিন্তু সারাংশ (*Substance* মূল বক্তব্যের আরও সংক্ষেপিত, সুসংহত ও সুসংবদ্ধ রূপ। সংক্ষিপ্তসার ও সারাংশ রচনা আরও করতে হ'লে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক অনুশীলন প্রয়োজন ; বিদ্যালয়ে সে সুযোগ ক'রে দিতে হ'বে। সারাংশ বা সংক্ষিপ্তসার রচনায় শিক্ষার্থীরা যাতে সম্পূর্ণ নিজস্ব শব্দ, ভাষা ও প্রয়োগরীতি অবলম্বন করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

রচনা-কল্পের অন্যতম রূপ হ'চ্ছে **সরলার্থ** (**Paraphrase**) **লিখন**। ছোট কবিতা, কবিতাংশ, গদ্যাংশ প্রভৃতির সরলার্থ-লিখনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা ভাষাজ্ঞান, ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ত করে। কোন গদ্যাংশ বা পদ্যাংশকে নিজের ভাষায় সহজ, সরল ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করাই সরলার্থ-লিখন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা মূল অংশটি কয়েকবার প'ড়ে তার ভাব ও বিষয়বস্তু যথাযথভাবে আয়ত্ত ক'রে তাকে

সরলার্থ-লিখন

সরল ভাবে নিজের ভাষায় নিজস্ব প্রয়োগরীতির মাধ্যমে উপস্থাপিত ক'রবে। মূল অংশের তুলনায় সরলার্থ খুব ছোট নাও হতে পারে। একটি নির্দিষ্ট ও নির্বাচিত অংশকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করা ও নিজস্ব প্রয়োগ-রীতিতে অভিব্যক্ত করাই সরলার্থ-লিখন। বিদ্যালয়ে বিশেষ ক'রে কবিতার

ক্ষেত্রে সরলার্থ-লিখন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, কিন্তু বিষয়টি শিক্ষাদানের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। শিক্ষার্থীদের নানাভাবে নানাপথে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। তার মধ্য দিয়েই সে মনের ভাবকে যথাযথ ক'রে প্রকাশ ক'রতে ও ভাষার প্রয়োগ-রীতি আয়ত্ত ক'রতে পারবে ; এবং সে ক্ষেত্রে সরলার্থ-লিখন বিশেষ কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে।

মর্মার্থ (Central ide:)ও সারমর্ম (Pre´cis) রচনাও রচনাকল্পের অন্যতম রূপ। এই দুই ক্ষেত্রে মূল বিষয়কে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ক'রে প্রকাশ করা হয়। যে গদ্যাংশ বা পদ্যাংশের উপর মর্মার্থ বা সারমর্ম লিখতে দেওয়া হয়, শিক্ষার্থীরা তা বার বার পড়ে মূল ভাবটি গ্রহণ ক'রবে, তারপর তাকে সংক্ষিপ্ত করে ২।৪টি বাক্যে মূল ভাবটি ব্যক্ত ক'রবে। বিষয়বস্তুর মূল ভাবটি ধরতে না পারলে মর্মার্থ বা সারমর্ম লেখা সম্ভব নয়।

মর্মার্থ ও সারমর্ম

সারমর্ম বা সারাংশে কোন সুনির্দিষ্ট অংশের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রূপ, এক্ষেত্রে সংক্ষেপিত অংশটির মূল ভাবটি রক্ষা ক'রে একটি নামকরণ (*Titl*e) ক'রতে হয়। তাতে শিক্ষার্থীরা মূল ভাবটি গ্রহণ ক'রতে পারছে কি না, তা বোঝা যায়। মর্মার্থ বা সারমর্ম লেখবার ক্ষেত্রে মূল অংশের অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ পড়বে, অলংকার, বিশ্লেষণ, যুক্তি-বিন্যাস, ব্যাখ্যা প্রভৃতি বাদ পড়বে ;— থাকবে মাত্র খুব সংক্ষেপিতরূপে শুধু মাত্র মূল ভাবটি। এবং তা ১।২টি বাক্যে সহজ ও সরলভাবে মূল ভাবটিকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠবে। ভাষাজ্ঞান লাভ ক'রতে এবং ভাষার প্রয়োগ-কৌশল আয়ত্ত ক'রতে মর্মার্থ ও সারমর্ম বা সারসংক্ষেপ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ভাষার জ্ঞান ও বিশ্লেষণ, ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগকৌশল আয়ত্ত ক'রতে রচনা-কল্পের (*Composition*) বিভিন্ন শাখা প্রশাখার প্রয়োজন আছে। কোন একটি নির্বাচিত অংশ প'ড়ে শিক্ষার্থীরা তার বিষয়বস্তুটি গ্রহণ ক'রবে। একবার প'ড়ে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা না হ'লে বার বার পড়বে। বিষয়বস্তু যথাযথ ভাবে আয়ত্ত হ'লে তাকে বিভিন্ন ভাবে নিজের ভাষায় প্রয়োগ ক'রবে, নিজস্ব রীতিতে অভিব্যক্ত ক'রবে। নির্দিষ্ট গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ প'ড়ে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর জ্ঞান আহরণ ক'রবে ; ভাবসম্প্রসারণে তাকে নিজের ভাষায় সহজ ও সরল ক'রে বিস্তৃত ক'রবে। সারাংশ, সংক্ষিপ্তসার, সরলার্থ, মর্মার্থ, সারমর্ম প্রভৃতি অন্যান্য রীতিতেও একটি নির্দিষ্ট গদ্যাংশের বা পদ্যাংশের বিষরবস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা যায় ; সংক্ষেপের আয়তন ও পরিসর কিন্তু

উপসংহার ও মন্তব্য

সর্বত্র এক নয়। সরলার্থে মূল অংশটিকে ভাষান্তরিত করা হয় মাত্র, এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা মূল অংশটিকে নিজের ভাষায় ও নিজস্ব প্রয়োগরীতিতে পরিব্যক্ত করে। সারাংশ ও সংক্ষিপ্তসার সরলার্থের তুলনায়ও সংক্ষেপিত রূপ। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অংশটির মূল ভাব ও মূল ভাবের আশ্রিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভাব সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত করা হয়। অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ পড়ে। মর্মার্থ ও সারমর্ম মূল অংশের সংক্ষিপ্ততম রূপ। এক্ষেত্রে মূল অংশটিকে যতদূর সম্ভব ছোট করা হয়, সারমর্মে (*pre´cis*) একটি নামকরণও করা হয়। তাই

দেখা যায় যে, সারাংশ প্রভৃতিতে বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্তাকারে নিজস্ব ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। আলোচ্য অংশটির মূল ভাব শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত হয়। তার ফলে ভাষা-শিক্ষাও যথাযথ হয়। তবে বিদ্যালয়ে এই বিষয়গুলির পঠন-পাঠন নিতান্তই গতানুগতিক, কৃত্রিম ও যান্ত্রিক। সে অবস্থা থেকে আমাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতির সাহায্যে এই বিষয়গুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। সাহিত্যের প্রশ্নে এবং আলোচনায় এই ইংরেজী শব্দগুলি প্রায় ব্যাবহৃত হয়—
Summary, Substance, Central idea, Paraphrase, Amplification.
এই শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ দিন। যদি কোন প্রচলিত প্রতিশব্দ আপনি পছন্দ না করেন, তৎপরিবর্তে আপনার মনোমত প্রতিশব্দ প্রস্তাব করুন। রচনা-শিক্ষার পক্ষে উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে কোন্‌টির উপযোগিতা কিরূপ তাহা সংক্ষেপে বিচার করুন।
(কলি. বিশ্ব., বি. টি., ১৯৬২)

২। সাহিত্যের প্রশ্নে—Summary, Substance, Central idea, Paraphrase, Amplification—এই ইংরেজী শব্দগুলি প্রায় ব্যবহৃত হয়। এগুলির বাংলা প্রতিশব্দ দিয়া তুলনামূলক আলোচনা করুন। কোন প্রচলিত প্রতিশব্দকে অনুপযুক্ত মনে হইলে আপনার মতে যোগ্যতর শব্দের উল্লেখ করুন। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বি. টি. ১৯৬৭)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বানান

[Spelling]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা হল বানান-ভুলের সমস্যা। লিখতে গিয়ে বানান-ভুল হয়, ভুল হয় প্রায় সকলেরই। বাংলা বানান সম্পর্কে কেউই সচেতন নয়; তাই এই ভুল চলে আসে। ফলে, ভাষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বানান-ভুলের এই সর্বাত্মক গ্রাস থেকে বাংলা ভাষাকে মুক্তি দিতে হবে। সর্বত্র এরূপ অসংখ্য বানান-ভুল ভাষার বিশুদ্ধতাকে নষ্ট করে, ভাব প্রকাশে বাধা দেয় ও অর্থ-গ্রহণে অসুবিধা সৃষ্টি করে। ফলে সামগ্রিক ভাবে ভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদ্যালয়ে ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা-প্রসঙ্গে বানান-ভুলের সমস্যাটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে।

সূচনা

ভাষার দু'টি রূপ,—কথ্য ও লেখ্য। **লেখ্য ভাষাতেই বাংলা বানান-ভুলের সমস্যা।** তবে একথা ঠিক যে, কথ্য ভাষার উচ্চারণ-রীতি লেখ্য ভাষার বানানকে অনেকটা প্রভাবিত করে। তবু বানান-ভুল ধরা পড়ে লেখ্য ভাষাতেই। উপস্থিত ব্যক্তির কাছে মনের ভাব পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হল কথ্য ভাষা। কিন্তু লেখ্য ভাষা স্থায়ী ভাষা; লেখ্য ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের ভাবনা ও চিন্তার ফসল আগামী দিনের মানুষের জন্য রেখে যাই। ভাষাকে এই স্থায়ী রূপ দিতে কতকগুলি চিহ্ন প্রয়োজন হয়,—ভাষা-বিজ্ঞানে তাকে বলা হয় লিপি। প্রত্যেক ভাষারই লিপি বা বর্ণমালা আছে। এই বর্ণমালাকে কেন্দ্র ক'রেই ভাষার স্থায়ী লেখ্য রূপ। বর্ণমালাকে অবলম্বন ক'রে কতকগুলি শব্দ গড়ে ওঠে। প্রতিটি শব্দই কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতীকরূপে কাজ করে। এই প্রতীকদ্যোতকতাই ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। শব্দ ও ভাষার এই প্রতীকতাকে আমরা মেনে নিয়েছি। তাই ভাষার সর্বজনগ্রাহ্য একটি স্থায়ী রূপ সৃষ্ট হ'য়েছে। কিন্তু বানান ভুল করলে তাতে আঘাত আসে। বানান-ভুল শব্দের অর্থবোধে অসুবিধা ঘটায়, প্রতীকদ্যোতকতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। ফলে, ভাষার ভাবপ্রকাশ-ক্ষমতা জটিলতা সৃষ্টি করে। ফলে, ভাষার ভাব-প্রকাশক্ষমতা জটিলতা সৃষ্টি করে। এতে ভাষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়; বাংলা বানান-ভুলের সমস্যা তাই প্রধানতঃ লেখ্য ভাষার সমস্যা।

বানান-ভুলের সমস্যা হ'ল লেখ্য ভাষার সমস্যা

মাতৃভাষাতে বানান-ভুলের সমস্যা এতবড় হ'য়ে দেখা দেওয়ার কথা নয়। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তি মাতৃভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়। তারপর জীবনের সর্বস্তরেই মাতৃভাষার ব্যবহার হয়। শিক্ষা-গ্রহণও মাতৃভাষায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের ভাষার মধ্যে আমাদেরই ভুল থেকে যাচ্ছে। ভুল করে শিক্ষার্থীরা, ভুল করে শিক্ষিত লোকেরাও।

মাতৃভাষাতে বানান-ভুলের সমস্যা

বানান-ভুল প্রায় সকলেরই হয়। ব্যাপারটি বিস্ময়কর। মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা ও সচেতনতার অভাবই এই সমস্যার জন্য দায়ী।

বাংলা বানানের সমস্যা

বাংলা বানানের নানাবিধ সমস্যা আছে। এই সমস্যা মূলতঃ ত্রিবিধ ;—

॥ এক ॥ বর্ণমালার সমস্যা
॥ দুই ॥ ভাষার সমস্যা
॥ তিন ॥ উচ্চারণের সমস্যা

বাংলা বানানের এই সমস্যাগুলি একে একে আলোচনা করা যেতে পারে।

বর্ণমালার সমস্যা ঃ

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে **বর্ণমালার সমস্যা** একটি বড় সমস্যা। বাংলা বর্ণমালা নিজেই সমস্যা-জর্জরিত। এই সমস্যাগুলি হ'ল ;—

॥ এক ॥ বাংলা বর্ণমালা অন্তরঙ্গে দেবনাগরী, বহিরঙ্গে বাংলা।

বাংলা বর্ণমালার অন্তরঙ্গে দেবনাগরী, বহিরঙ্গে বাংলা

আমাদের বর্ণমালার উচ্চারণ দেবনাগরীর মত, কিন্তু তার লিখিত রূপ পৃথক্। ফলে নানা ক্ষেত্রে বিপত্তি ঘটে। দেবনাগরীতে ন-ণ, জ-য, ব-ব-এর পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ ও ব্যবহার আছে ; বাংলায় উচ্চারণ একই রকম, লেখায় পার্থক্য। ব-ব-এর লেখায় ও উচ্চারণেও কোন পার্থক্য নেই। বাংলা বর্ণমালায় দুটি 'ব' থাকবে কেন ? বাংলা বর্ণমালার এই সমস্যা বাংলা বানানকেও প্রভাবিত করে।

বাংলা বর্ণমালায় বর্ণের সংখ্যাধিক্য

॥ দুই ॥ ইংরেজীর মত একটি শক্তিশালী ও আন্তর্জাতিক ভাষার বর্ণমালায় বর্ণের সংখ্যা যেখানে ২৬, আমাদের সেখানে স্বরবর্ণ (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ, = ১১ ; ৠ ও ৯ অপ্রচলিত বলে বাদ দেওয়া হয়েছে) ও ব্যঞ্জনবর্ণ (৩৮ টি) মিলে প্রায় ৫০টি বর্ণ। এ ছাড়াও বিভিন্ন যুক্ত-বর্ণ আছে। **বাংলা বর্ণমালার** এই **সংখ্যাধিক্য** বাংলা বানানের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে।

যুক্তাক্ষরের সমস্যা

॥ তিন ॥ বাংলা বর্ণমালায় **যুক্তাক্ষরের সমস্যা** একটি প্রধান সমস্যা। অনেকগুলি বর্ণ থাকা সত্ত্বেও বাংলায় শব্দ-রচনা, বাক্য-গঠন ও ভাব প্রকাশ ক'রতে যুক্ত-বর্ণের প্রয়োজন হয়। তাই শিক্ষার্থীদের অনেকগুলি যুক্ত-বর্ণ শিখতে হয়। যুক্ত-বর্ণের রেখার টান জটিল, তারপর অনেকগুলি যুক্ত-বর্ণের পার্থক্য সামান্য একটু রেখা-বিন্যাসের পার্থক্যের জন্য হয়। শিক্ষার্থীরা এতে বিভ্রান্তি বোধ করে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও যুক্তাক্ষরের টানগুলি ঠিকমত জানেন না। যুক্তাক্ষর তাই বাংলা বানানকে সমস্যা ও জটিলতার মধ্যে ফেলে দেয়।

॥ চার ॥ বাংলা বর্ণমালায় অনেকগুলি বর্ণ আছে, যুক্তাক্ষরও আছে। কিন্তু বাংলা একটি মিশ্রভাষা ব'লে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী শব্দকে যথাযথভাবে উচ্চারণ

ক'রবার বর্ণ বাংলায় নেই। সংখ্যায় **এত বর্ণ থাকা সত্ত্বেও দেশী বিদেশী বিভিন্ন শব্দকে উচ্চারণ করবার জন্য অন্য বর্ণের প্রয়োজন হয়।** বাংলায় 'জ' ও 'য' দু'টি বর্ণ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজী 'z' এর উচ্চারণ যথাযথ ভাবে করা যায় না। রাজশেখর বসু এক জায়গায় সঠিক ভাবেই লিখেছেন,—'Zান্তি'।

দেশী-বিদেশী সমস্ত শব্দকে উচ্চারণ করবার বর্ণ বাংলায় নেই

॥ **পাঁচ** ॥ বাংলা বর্ণমালার অনেকগুলি বর্ণের উচ্চারণ প্রায় একই রকম। সমস্ত অনুনাসিক বর্ণের (ঙ, ঞ, ন, ণ, ম, ং, ঁ) উচ্চারণ প্রায় কাছাকাছি। সংস্কৃতে এদের মধ্যে উচ্চারণের পার্থক্য থাকলেও এই সূক্ষ্ম উচ্চারণ বাংলায় সম্ভব হয় না। ন-ণ, ঙ-ং উচ্চারণ একই। তাছাড়াও বাংলা বর্ণমালায় জ-য, ব-ব, শ-ষ-স, র-ড়-ঢ় বর্ণগুলি আছে, সেগুলির উচ্চারণ খুবই কাছাকাছি। প্রায় **সমোচ্চারিত** এই **বর্ণ**গুলি বাংলা বানানে বিপর্যয় ঘটায়।

সমোচ্চারিত বিভিন্ন বর্ণ

॥ **ছয়** ॥ বাংলা বর্ণমালা বৈজ্ঞানিক ভাবে সজ্জিত। উচ্চারণের সূক্ষ্ম পার্থক্য ও বিভিন্নতা বাংলা বর্ণমালায় প্রতিফলিত। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ বর্ণমালার বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ। স্বরবর্ণের হ্রস্বস্বর-দীর্ঘস্বর, ব্যঞ্জনবর্ণে অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ বর্ণ, ঘোষ-অঘোষ বর্ণ উচ্চারণ-তত্ত্বের সূক্ষ্ম তাৎপর্যের ভিত্তিতে বিন্যস্ত। কিন্তু উচ্চারণের এই সূক্ষ্ম পার্থক্য বাংলা শব্দে প্রতিফলিত হয় না। বাংলার অধিকাংশ স্বরই হ্রস্ব উচ্চারণ হয়। 'নদী'-'যদি' উচ্চারণে স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা রক্ষিত হয় না। তেমনি ব্যঞ্জনবর্ণেও অল্পপ্রাণতা মহাপ্রাণতা, ঘোষবত্তা ও অঘোষবত্তা উচ্চারণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এর প্রভাব বাংলা বানানের উপর পড়ে। সংস্কৃতে উচ্চারণের সূক্ষ্মতা বজায় থাকে বলে কোন সমস্যা দেখা দেয় না। কিন্তু বাংলায় এই হ্রস্ব-দীর্ঘ, মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ, ঘোষ-অঘোষ প্রভৃতি উচ্চারণ-বিভ্রান্তি ঘটায়। বাংলা বানান তখন শ্রুতি-নির্ভর না হ'য়ে স্মৃতি-নির্ভর হ'য়ে পড়ে।

বাংলা বর্ণমালা বৈজ্ঞানিক হলেও তা উচ্চারণে প্রতিফলিত হয় না

বাংলা বর্ণমালার এইসব স্বরূপগত ও উচ্চারণগত সমস্যা বাংলা বানানকে প্রভাবিত করে। এবং এই প্রভাবেই বাংলা বানানের মধ্যে ভুল দেখা দেয়। বর্ণমালার বিভ্রান্তি ভাষা ও শব্দগত বিভ্রান্তিতে পরিণত হয়। বাংলা বানানে যে সমস্যা দেখা যায়, তার জন্য অনেকাংশে দায়ী হ'ল বাংলা বর্ণমালা।

ভাষার সমস্যা

বাংলা ভাষার মধ্যে এমন কিছু কিছু সমস্যা আছে যা বাংলা বানানের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। **ভাষার সমস্যা** বানানের সমস্যাকে জটিল করবার সুযোগ ক'রে দেয়। কাজেই এ সম্বন্ধেও আলোচনা করা প্রয়োজন ;—

॥ **এক** ॥ **বাংলা একটি মিশ্রভাষা**। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে যেমন সংস্কৃত তৎসম, তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দ আছে; তেমনি দেশী-বিদেশী বহু শব্দও আছে। অনেক সংস্কৃত ও দেশী-বিদেশী উপসর্গ ও প্রত্যয়ও আছে। বাংলা বানানে এ ক্ষেত্রেই বিপর্যয়

ঘটে। প্রত্যক ভাষারই নিজস্ব গতি-প্রকৃতি আছে। কাজেই সংস্কৃত বানান ও শব্দগঠন-প্রকৃতি দেশী-বিদেশী অন্যান্য শব্দগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। সংস্কৃত উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগে কোন সংস্কৃত তৎসম শব্দের গঠন যে রীতিতে সম্পাদিত হয়, দেশী-বিদেশী শব্দের গঠনে ঐ উপসর্গ ও প্রত্যয় সে ভাবে কাজ করে না। তাই উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগ ক'রে নতুন নতুন শব্দ গঠন ক'রতে সমস্থার সৃষ্টি হয়। ভাষার এই সমস্যা বানানের ক্ষেত্রেও এসে পড়ে।

বাংলা একটি মিশ্রভাষা

॥ **দুই** ॥ বাংলা ভাষায় এমন অনেকগুলি শব্দ আছে, যেগুলির বানান এক, উচ্চারণও এক ; কিন্তু অর্থ ভিন্ন। **সমোচ্চারিত শব্দযুগলের** অর্থের এই বিভিন্নতা বাংলা বানানে সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন—বই = পুস্তক, বই = ব্যতীত ; ডাল = গাছের শাখা, ডাল = খাদ্যদ্রব্য বিশেষ ; সই = সহ্য করি, সই = সখী ইত্যাদি। সমোচ্চারিত এই শব্দগুলি বাংলা বানানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

সমোচ্চারিত শব্দ

॥ **তিন** ॥ বাংলা ভাষায় অনেকগুলি **প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ** আছে। সেগুলি বাংলা বানানে সমস্যার সৃষ্টি করে। এগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বিপর্যয় দেখা দেয়। অনেক সময় প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক এই শব্দযুগলের মধ্যে একটির প্রয়োগ-স্থলে অন্যটিকে প্রয়োগ ক'রে অর্থ-বিভ্রান্তি ঘটে। এই-জাতীয় শব্দগুলি হ'ল—

প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

দিন = দিবস, দীন = গরীব ; বাণ—তীর, বান = বন্যা ; মুখ = বদন, মূক = বোবা ; অর্ঘ্য = মূল্য, অর্ঘ = পূজার উপকরণ ইত্যাদি।

॥ **চার** ॥ **বাংলা ভাষার বানান উচ্চারণভিত্তিক নয়।** বিভিন্ন শব্দের ধ্বনি ও উচ্চারণের মধ্যে সমতার অভাব আছে। এক্ষেত্রে স্বর ধ্বনিগুলি বানানের সমস্যাকে বাড়িয়ে দেয়। 'ভুল' ও দুর্গা' বানান ভুল হয়,- 'নদী' ও 'যদি' উচ্চারণ-সমতার জন্য ভুলের সুযোগ আসে। বালা ভাষার বানান উচ্চারণানুগ নয়। তাই বিভ্রান্তি আসে।

উচ্চারণ ও বানানের মধ্যে সমতা নেই

॥ **পাঁচ** ॥ বাংলা **সাধুভাষা ও চলিতভাষাও** বানানের সমস্যাকে জটিল করে। সাধুভাষা-চলিতভাষা মিশ্রণজনিত প্রমাদ বানান-ভুলকে সুযোগ করে দেয়। সাধুভাষার শব্দকে চলিত ভাষায় রূপান্তরের ক্ষেত্রেও বানান ভুল হয়। 'পাখী', 'পাখি'-র বানানের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক, না দু'টি-ই সঠিক, এ নিয়ে বিপত্তি আসে।

সাধুভাষা ও চলিতভাষা

বাংলা ভাষা ও শব্দের বিভিন্ন সমস্যা ও দুর্বলতা বাংলা বানানের সমস্যাকে জটিল ক'রে তোলে। শিক্ষার্থীরা ভাষার এই জটিলতার জালে জড়িয়ে প'ড়ে বানান ভুল করে। শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ভাষার এই জটিলতার হাত থেকে মুক্ত হ'তে পারেন না। ফলে, বানান ভুল করবার সুযোগ এসে যায়। বাংলা ভাষার বিভিন্ন সমস্যা তাই বানান-ভুলের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

ভাষার সমস্যা বানান-ভুলের জন্য অনেকাংশে দায়ী

উচ্চারণের সমস্যা ঃ

বাংলা ভাষার **উচ্চারণগত** কিছু কিছু অসুবিধা বানান-সমস্যায় জটিলতা বৃদ্ধি করে। উচ্চারণগত এই সমস্যাগুলি হ'ল,—

॥ **এক** ॥ যুক্তাক্ষরগুলির সঠিক উচ্চারণ করা কঠিন। 'অমৃত' শব্দটি অম্‌মৃত' এইভাবে উচ্চারিত হয়।

অনেক সময় যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে শব্দের রেখা-বিন্যাসের বিভ্রান্তি হয় ব'লে বানান ভুল হয়। যেমন,—সম্মান (সন্মান ?)।

॥ **দুই** ॥ উচ্চারণ যখন পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও আঞ্চলিকতার দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন বানান-ভুল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

॥ **তিন** ॥ আমাদের ভাষায় শব্দের বানান উচ্চারণের অনুগামী নয়। বানান তাই উচ্চারণ-নির্ভর নয়, স্মৃতি-নির্ভর।

॥ **চার** ॥ উচ্চারণের সময় হ্রস্ব-দীর্ঘ, অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ প্রভৃতি রক্ষা করা সম্ভব হয় না বলে বানান-ভুল হয়। এই-জাতীয় ভুলের সংখ্যা খুবই বেশী। ই-কার, ঈ-কার ; উ-কার, উ-কার প্রভৃতি জনিত বানান-ভুলের সংখ্যা কম নয়।

॥ **পাঁচ** ॥ উচ্চারণের ত্রুটির জন্য অনেক বানান ভুলভাবে করা হয়। যেমন—

শুদ্ধ	**অশুদ্ধ** (উচ্চারণে)
কাচ	কাঁচ
নারী	নাড়ী (এক্ষেত্রে অর্থও পালটে যাচ্ছে)
হাসি	হাঁসি ইত্যাদি

বাংলায় বানান-ভুলের কারণ

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন লেখায় প্রায়ই বানান-ভুল লক্ষ্য করা যায়। কেন এই বানান-ভুল হয় ? বানান-ভুলের কারণ কি ? এই কারণগুলি খুঁজে বের ক'রতে হবে। রোগের কারণ বা মূলকে বিনাশ ক'রতে না পারলে রোগ সারবে না, শুধুমাত্র লক্ষণ দেখে চিকিৎসায় রোগ নির্মূল করা যায় না। তাই বানান-ভুল প্রতিকার ক'রবার আগে তার কারণগুলি খুঁজে বের ক'রতে হবে। সেগুলি হ'ল ; —

॥ এক ॥ **বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অভাব** আছে। মাতৃভাষার প্রতি একটা অনীহা সকলেরই কথাবার্তায় আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। বিদ্যালয়েও এই ভাব নিয়ে বাংলা পড়ানো হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা একটা অশ্রদ্ধার ভাব নিয়ে বাংলা পড়াশুনা করে। তাই তাদের শিক্ষার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব থাকে না। শিক্ষক ও অভিভাবকেরা আশ্চর্যজনকভাবে মাতৃভাষার প্রতি অযত্ন ও অবহেলার মনোভাব পোষণ ক'রে থাকেন। শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা-শিক্ষায় তাই অনেক ফাঁকি থেকে যায়। সেই ফাঁকির সুযোগেই বানান-ভুল প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

মাতৃভাষা সম্বন্ধে শ্রদ্ধার অভাব

॥ **দুই** ॥ বাংলা বানান শুদ্ধ ক'রে জানতে হ'লে বা প্রয়োগ ক'রতে হ'লে যে পরিমাণ ব্যাকরণ-জ্ঞানের প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের তা নেই। সঠিকভাবে বানান জানতে হ'লে ব্যাকরণের সন্ধি, সমাস, ণত্ব-ষত্ব বিধি, উপসর্গ, কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয় প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। কিন্তু সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের যথাযথ ধারণার অভাব আছে। বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ-শিক্ষাদানও যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না। পুরাতন, গতানুগতিক অবরোহী পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষাদান করা হয়। কাজেই শব্দের পিছনে ব্যাকরণ-ঘটিত যে সব নিয়মকানুন কাজ ক'রে, তা ভাল ক'রে না জানলে বানান-ভুল হবেই। তাই দেখা যায় যে, যথাযথভাবে **ব্যাকরণ জ্ঞানের অভাবে শিক্ষার্থীরা বানান ভুল করে।**

ব্যাকরণ জ্ঞানের অভাব

॥ **তিন** ॥ শিক্ষার্থীদের হাতে যে সব ছাপানো বই যায়, তাতে অনেক বানান ভুল ক'রে মুদ্রিত থাকে। শিক্ষার্থীরা ছাপার অক্ষরের বানানকে মনস্তাত্ত্বিক কারণে খুব সহজেই গ্রহণ করে ও তাকেই ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করে। আমাদের দেশের প্রকাশিত পুস্তকগুলিতে মুদ্রণ-বিভ্রাটেই হোক, বা অন্য যে-কারণেই হোক, অনেক বানান-ভুল থেকে যায় এবং শিক্ষার্থীরা সহজেই তা গ্রহণ করে। সাইনবোর্ড প্রভৃতিতে যে সব লেখা থাকে, তাতে বানান-ভুল থাকলে শিক্ষার্থীরা তাকেও গ্রহণ করে। রাস্তাঘাটে, দোকানে, সিনেমা-ঘরে এমন অনেক সাইনবোর্ড দেখা যায়, যাতে বানান-ভুল থাকে। বিভিন্ন পোস্টারে বা দেওয়াল-লিখনেও অনেক বানান-ভুল দেখা যায়। শিক্ষার্থীরা এগুলিকে গ্রহণ করে। তাই তাদের লেখার মধ্যেও বানান-ভুল দেখা যায়।

পুস্তক, সাইনবোর্ড, পোস্টার ও দেওয়াল-লিখনে বানান-ভুল

॥ **চার** ॥ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বানান শিক্ষাদান হয় **বর্ণক্রম-পদ্ধতিতে।** শিক্ষাগ্রহণের প্রথম পর্যায়ে ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা বর্ণমালা আয়ত্ত করে ;—প্রথমে স্বরবর্ণ, পরে ব্যঞ্জনবর্ণ। তারপর শুরু হয় শব্দক্রম-পদ্ধতি। শিক্ষার্থীরা 'বর্ণপরিচয়' বা ঐ ধরনের অন্য কোন বই ধ'রে একটির পর একটি শব্দের বানান মুখস্থ করে এবং তা লেখা অভ্যাস করে। বিভিন্ন শব্দের বানান-শেখানোর সময়ও বর্ণক্রম-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় ;—প্রথমে অ-কারান্ত শব্দ, তারপর ক্রমান্বয়ে আ-কারান্ত, ই-কারান্ত, ঈ-কারান্ত শব্দ ইত্যাদি। বর্ণ ও শব্দ শেখানোর এই পদ্ধতি ভুল, অবৈজ্ঞানিক ও মনোবিজ্ঞান-বিরোধী। এই রীতিতে শিক্ষা গ্রহণের সময় শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবন, অভিজ্ঞতা ও মনের কোন সম্পর্ক খুঁজে পায় না। শিক্ষা তাই তাদের কাছে নিরানন্দময়, আকর্ষণহীন, শুষ্ক, নিরস ও কঠিন বলে মনে হয়। এ শিক্ষা তাদের উপর চাপিয়ে-দেওয়া শিক্ষা। বানান শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ণক্রম-পদ্ধতিও সঠিক পথ বা রীতি নয়। কারণ ঈ-কারান্ত বা উ-কারান্ত এমন অনেক শব্দ থাকতে পারে, যা অ-কারান্ত বা আ-কারান্ত অনেক শব্দের তুলনায় অনেক সহজ ও শিক্ষার্থীদের পরিচিত অভিজ্ঞতার মধ্যবর্তী। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেও বলা যেতে পারে যে, তাঁর **'বর্ণপরিচয়'** বাংলা বানান-শেখানোর পক্ষে

বাংলা বানান শেখানোর যে বর্ণক্রম পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তা ঠিক নয়

বৈজ্ঞানিক বিচারে সঠিক নয়। 'বর্ণপরিচয়ে'র (১ম) প্রথম পৃষ্ঠায় 'শশধর' শব্দটি আছে। শব্দটি অ-কারান্ত। কিন্তু তার তুলনায় 'চাঁদ' শব্দটি ও তার বানান গ্রহণ করা শিক্ষার্থীদের মনের দিক্ থেকে অনেক সহজ। এইভাবে অন্যান্য শব্দের কথাও বলা যেতে পারে। আমাদের বানান-শেখানোর এই বর্ণক্রম পদ্ধতির ত্রুটি এই ভাবে লক্ষ্য করা যায়। ভাষার সঙ্গে পরিচিত না হয়ে, জীবন ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কহীন বানান-শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিক্ষাদানের এই ভুল রীতির জন্য শিক্ষার্থীরা বানান সঠিকভাবে লিখতে পারে না।

বানান ভুলের মনস্তাত্ত্বিক কারণ

॥ **পাঁচ** ॥ অনেক সময় **মনস্তাত্ত্বিক কারণে** শিক্ষার্থীরা বানান ভুল করে বসে। কোন কারণে শিক্ষার্থীর যদি অন্তর্বিক্ষোভ বা মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকে, তবে সে জানা বানানও ভুল করে বসে। শ্রুতলিখন ও পরীক্ষার ভীতিময় পরিবেশে মানসিক বিভ্রান্তিতে শিক্ষার্থীরা জানা বানানও ভুল ক'রে বসে। তাই মনস্তাত্ত্বিক কারণও অনেক সময় বানান-ভুলের জন্য দায়ী হয়।

বানান-ভুলের পারিপার্শ্বিক কারণ

॥ **ছয়** ॥ **পারিপার্শ্বিক কারণ**ও অনেক সময় শিক্ষার্থীদের বানান-ভুলের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার্থীদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সঠিক বানান লেখার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। উচ্চারণে আঞ্চলিকতার প্রভাব শিক্ষার্থীদের বানান ভুল ক'রতে সুযোগ করে দেয়। বাড়ীর অভিভাবকদের মাতৃভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অনীহা শিক্ষার্থীদের বানান ভুল করবার কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। তাঁরা যদি বানান ভুল করেন, তবে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। বিজ্ঞাপনে, সাইনবোর্ডে, পোস্টারে, দেওয়াল লিখনে ও অন্যান্য স্থানের লেখায় বানান-ভুল থাকলে শিক্ষার্থীরা তা সহজেই গ্রহণ করে। দিদির আংটিতে 'দূর্গা' বানান থাকলে, বাড়ীর দেওয়ালে "এসো মা দূর্গা, বস মা দূর্গা" বলে দুর্গামাতাকে অভ্যর্থনা ক'রলে 'দুর্গা' শব্দের এই ভুল বানান শিশুদের মনে গেঁথে যায়। বানান-শিক্ষায় পিতামাতার ঔদাসিন্যও বানান-ভুলের কারণ হয়। কাজেই দেখা যায়, পারিপার্শ্বিক কারণে শিক্ষার্থীদের বানান-ভুলের সুযোগ এসে যায়।

মনোযোগের অভাব বানান-ভুলের কারণ

॥ **সাত** ॥ পড়বার সময় বা লিখবার সময় শিক্ষার্থীদের **মনোযোগ ও একাগ্রতার অভাব** বানান-ভুলের সুযোগ করে দেয়। পড়বার সময় শিক্ষার্থী যদি অন্যমনস্ক থাকে, তবে সঠিক বানান তার পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। আবার লেখবার সময় শিক্ষার্থী যদি অমনোযোগী থাকে, তবে সে জানা বানানও ভুল ক'রে ফেলে। অনেক সময় শ্রুতির অনবধানতা বানান-ভুলের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

দ্রুত লেখার সময় ভুল

॥ **আট** ॥ **দ্রুত লেখবার সময়ও** অনেক সময় বানান-ভুল হয় ;— কয়েকটি বর্ণের সমন্বয়ে শব্দের যে বানান, তার মধ্যে একটি বর্ণ ভুলক্রমে ছাড় হ'য়ে যায়। তখন কোন শব্দের বানান জানা থাকলেও তা ভুল হয়ে যায়।

॥ **নয়** ॥ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এমন কি অনেক পণ্ডিত ও সাহিত্যিকের মধ্যেও **আধুনিকতার উগ্র ঝোঁক** দেখা যায়। অপরের তুলনায় নিজের স্বাতন্ত্র্য-প্রকাশের প্রবণতা শব্দের অপরিচিত (কিন্তু নির্ভুল) বানান লেখার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। তাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং অনেক সময় শিক্ষার্থীরা উগ্র আধুনিকতার ঝোঁকে কোন শব্দের নতুন বানান লিখতে গিয়ে ভুল ক'রে ফেলে।

আধুনিকতার ঝোঁক বানান-ভুলের অন্যতম কারণ

শিক্ষার্থীদের বানান-ভুলের কারণ আলোচনা করা হ'ল। বাংলা বর্ণমালার সমস্যা, ভাষার সমস্যা ও উচ্চারণের সমস্যা সামগ্রিকভাবে বানানসমস্যাকে আরও জটিল ক'রেছে। এই সমস্যার উপরেও আছে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি। মাতৃভাষা-চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ-শিক্ষা এখনও গুরুত্ব পায়নি। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতম পরীক্ষাতে পাশ-করা ব্যক্তির মধ্যেও ব্যাকরণ-জ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের পর মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব ছাড়া ব্যাকরণের পঠন-পাঠনের স্থান পাঠ্যক্রমে নেই। তাই সামগ্রিক শিক্ষায় ব্যাকরণ অবহেলিত। তাই স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার্থীদের রচনায় বানান-ভুল দেখা যায়। বানান-শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রচলিত আছে, তাও অবৈজ্ঞানিক। মাতৃভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা— সকলের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী ও আচার-আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়। ফলে, শিক্ষার্থীরাও বানান সম্পর্কে উদাসীন হ'য়ে পড়ে। বানান নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা ক'রবার প্রবণতা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। এর পরিণতি ভয়ানক। কারণ ভাষার মধ্যে মনের ভাব প্রকাশিত হয়। সেই ভাষাতেই যদি প্রচুর বানান-ভুল থাকে, তবে ভাব-প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ভাষার গতি ব্যাহত হয়। বানান-ভুল ভাষায় ও অর্থে বিভ্রান্তি ঘটায়; ভাষা দ্রুত অবক্ষয়ের পথে চলে যায়। বানান-ভুলের এই সমস্যাটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের মধ্যে সুচিন্তিত-ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে শুদ্ধ বানান শিক্ষা দিতে হবে। বানান-সমস্যা-সম্পর্কে আলোচনা হ'ল, বাংলা বানান-ভুলের কারণগুলিও আলোচিত হল। এবার দেখা যাক, শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ কি-জাতীয় বানান-ভুল করে থাকে। তা'হলে বানান-ভুল দূর করবার কৌশলগুলিও খুঁজে বের করা সহজ হবে।

ব্যাকরণ ও বানান শিক্ষাদানের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে

শিক্ষার্থীরা সচরাচর কি-জাতীয় বানান ভুল করে থাকে?

শিক্ষার্থীদের রচনায় সাধারণতঃ দু'জাতীয় বানান-ভুল দেখা যায়,—

॥ **এক** ॥ **বর্ণের ভুল**

॥ **দুই** ॥ **পদের ভুল**

একে একে এই দু'জাতীয় ভুলের একটি সাধারণ তালিকা তৈরি করা যেতে পারে

॥ বর্ণের ভুল ॥

	ভুল	নির্ভুল
'অ', 'আ'-এর প্রয়োগগত বিভ্রম —	অজাগর	অজগর
	দুরাবস্থা	দুরবস্থা
'ই', 'ঈ'-এর প্রয়োগগত বিভ্রম—	পিপিলীকা	পিপীলিকা
	কেন্দ্রিয়	কেন্দ্রীয়
	নিরস	নীরস
	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
'উ,' 'ঊ'-এর প্রয়োগগত বিভ্রম —	ভূল	ভুল
	দূর্গা	দুর্গা
'ও'-এর প্রয়োগগত বিভ্রম—	ভৌগলিক	ভৌগোলিক
	পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য
'ন', 'ণ'-এর প্রয়োগগত বিভ্রম —	নারায়ন	নারায়ণ
	কল্যান	কল্যাণ
'শ', 'ষ', 'স'-এর প্রয়োগগত বিভ্রম—	পুরষ্কার	পুরস্কার
	পরিস্কার	পরিষ্কার
	নমস্কার	নমষ্কার
	ধ্বংশ	ধ্বংস
'ঁ'-এর প্রয়োগগত বিভ্রম —	হাঁসি	হাসি
	হাঁসপাতাল	হাসপাতাল
'ব'-এর প্রয়োগগত বিভ্রম—	স্বরস্বতী	সরস্বতী
	দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব
'ত', 'থ'-এর প্রয়োগগত বিভ্রম –	প্রশস্থ	প্রশস্ত
	মুখস্ত	মুখস্থ
'ট', 'ঠ'-এর প্রয়োগগত বিভ্রম -	বশিষ্ট	বশিষ্ঠ
	শ্রেষ্ট	শ্রেষ্ঠ
'য'-এর প্রয়োগগত বিভ্রম –	বৈচিত্র	বৈচিত্র্য
	বাখ্যা	ব্যাখ্যা
	দারিদ্র	দারিদ্র্য
'র', 'ড়'-এর প্রয়োগগত বিভ্রম—	ঘড়বারি	ঘরবাড়ী
	নরনাড়ী	নরনারী
'ঃ'-এ প্রয়োগগত বিভ্রম –	মনযোগ	মনোযোগ
	যশলাভ	যশোলাভ

যুক্ত বর্ণ ঠিকমত লিখতে না জানার জন্যও বানান-ভুল হয়। শিক্ষার্থীরা অনেক সময় যুক্তাক্ষরের সঠিক রেখাবিন্যাস জানে না। এর ফলে যে সব ভুল হয়, তার উদাহরণ—

ভুল	নির্ভুল
বক্র	বক্র
শক্র	শক্র ইত্যাদি

বর্ণ-মিলনই যখন সন্ধি, তখন সন্ধির ভুলও বানানের বর্ণের ভুল। যেমন—

				ভুল	নির্ভুল
নিঃ	+	রস	=	নিরস	নীরস
দুঃ	+	অবস্থা	=	দুরাবস্থা	দুরবস্থা
রবি	+	ইন্দ্র	=	রবিন্দ্র	রবীন্দ্র
জগৎ	+	বন্ধু	=	জগবন্ধু	জগদ্বন্ধু
যশঃ	+	লাভ	=	যশলাভ	যশোলাভ ইত্যাদি।

॥ পদের ভুল ॥

বাংলা পদের গঠনে ও শব্দের গঠনে বানান-ভুল হয়। শব্দগঠন-কৌশল ব্যাকরণগতভাবে ঠিকমত আয়ত্ত ক'রতে না পারলে এই বিভ্রান্তি ঘটে। শব্দের প্রয়োগও সঠিক স্থানে সঠিক অর্থে ক'রতে হবে। পদের ও শব্দের ভুল হয় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য—

ণত্ব-বিধান, ষত্ব-বিধান, সন্ধি, সমাস, প্রত্যয় ও শব্দের ভুল প্রয়োগ ইত্যাদি।

এগুলি সম্পর্কে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে—

	ভুল	নির্ভুল
ণ-ত্ব বিধান	তৃন	তৃণ
	রামায়ন	রামায়ণ
ষ-ত্ব বিধান	শ্রীচরণেসু	শ্রীচরণেষু
	অভিসেক	অভিষেক
সন্ধি	নিরোগ	নীরোগ
	মনযোগ	মনোযোগ
সমাস	নিরপরাধী	নিরপরাধ
	কালীদাস	কালিদাস
	ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ
প্রত্যয়	ঐক্যতা	ঐক্য, একতা
	অধীনস্থ	অধীন
	বৈচিত্র	বিচিত্রতা, বৈচিত্র্য

শব্দের প্রয়োগগত বানান-ভুল হয়, যখন তার অর্থ সঠিক জানা না থাকে। যেমন—

আপণ (সঠিক অর্থ দোকান) আপন (নিজ)
বাণ (সঠিক অর্থ—তীর) বান (বন্যা)
গিরিশ (মহাদেব) গিরীশ (হিমালয়) ইত্যাদি

বানান-ভুলের প্রতিকার ঃ বানান-শিক্ষাদানের পদ্ধতি ঃ

বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের বিভিন্ন স্তরে ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বানান-শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রতে হবে। বানান-শিক্ষাদানকে আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে। **বানান-শেখানোর প্রচলিত বর্ণক্রম-পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে। আগে ভাষা, পরে বানান ও ব্যকরণ ;— এ কথা সব সময় মনে রাখতে হবে।** অর্থহীন শব্দের বানান-শিক্ষা দিলে চলবে না। তা শিক্ষার্থীরা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে না, ফলে তাদের মনে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। প্রথম প্রথম শিক্ষার্থীরা এমন সব শব্দের বানান শিখবে যাদের সঙ্গে তার জীবনের যোগ আছে, অভিজ্ঞতার সম্পর্ক আছে। শিক্ষার্থীরা যে বয়সে বা যে সময়ে ভাষা-শিক্ষা শুরু করে, বা লিখতে পড়তে শুরু করে তার পূর্বেই সে পরিবেশ থেকে ভাষা-ব্যবহার (মাতৃভাষার ক্ষেত্রে) শিখে ফেলে। তারা যে ভাষা ব্যবহার করে, তার মধ্য থেকে কিছু শব্দকে বানান-শেখানোর জন্য নির্বাচিত করতে হবে। বলা বাহুল্য, এই নির্বাচন যথাযথ হওয়া চাই। নির্বাচিত শব্দগুলি সহজ হবে, ক্রমশঃ তা কঠিন ও জটিল হবে। নির্বাচিত শব্দগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীর জীবন ও অভিজ্ঞতার মধুর সম্পর্ক থাকবে। এ ক্ষেত্রে বর্ণক্রমপদ্ধতি একদম বাদ দিতে হবে। কতকগুলি অর্থহীন বর্ণ ও প্রাণহীন শব্দ শিখতে শিক্ষার্থীরা খুবই অসহায় ও বিব্রত বোধ করে। এ শিক্ষার সঙ্গে তার জীবনেরও কোন যোগ নেই। তাই ব্যবহৃত ভাষা থেকে সহজ ও পরিচিত কতকগুলি শব্দের লেখা ও অনুশীলন দিয়েই শিশুর বানান-শেখা শুরু হবে। এই প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, 'মা' শব্দটি আ-কারান্ত শব্দ হলেও এখান থেকেই শিশু বাংলা বানান শেখা শুরু করবে, 'মা' শব্দের বানান খুব কঠিন নয়, স্বরবর্ণের ঋ বা ঔ-কারের তুলনায় তো নয়ই। তাছাড়া, 'মা' শব্দটি তার জীবনের অতি-পরিচিত শব্দ, যার সঙ্গে স্নেহ-ভালবাসা ও জীবন-ধারণের সম্পর্ক। কজেই সেখান থেকেই সে বাংলা বানান-শিক্ষা-গ্রহণ শুরু করবে। তারপর ক্রমান্বয়ে মামা, বাবা, দাদা, কাকা, দিদি, কাকী, মাসী, পিসি, দিদিমা, পিসিমা প্রভৃতি শব্দগুলির বানান শিখবে। প্রথমেই শিশুদের বর্ণমালা ও বর্ণানুক্রমে শব্দমালা না শিখিয়ে এইভাবে পরিচিত বিভিন্ন সহজ শব্দের বানান শেখাতে হবে। বানান-শেখানোর শব্দগুলি ক্রমশঃ কঠিন ও জটিল হবে। তারপর বানান-শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে গেলে (যখন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শব্দের মধ্য দিয়ে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলি শিখে ফেলেছে) তখন

বর্ণ-ক্রম পদ্ধতি পরিবর্তন করে ব্যবহৃত ভাষা ও পরিচিত শব্দ থেকেই বানান শিক্ষা শুরু হবে

শিশু আগে ভাষা ও শব্দ শিখবে, তারপর বানান

তাদের বর্ণমালার বিভিন্ন বর্ণ ক্রমানুসারে শিখিয়ে দিলেই চলবে। কিন্তু প্রথম অবস্থাতে বর্ণ অনুযায়ী শেখানো ঠিক নয়।

পরবর্তী পর্যায়ে **শিক্ষার্থীরা সাহিত্য প্রভৃতি প'ড়ে সেখান থেকেই বিভিন্ন শব্দের বানান শিখবে।** সাহিত্যের মাধ্যমে বানান-শিক্ষা দেওয়া মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক ছাড়া যে সব সাহিত্য ও রচনা প্রথম অবস্থাতে মৌখিকভাবে শিখবে, তার মধ্য থেকে কতকগুলি শব্দকে নির্বাচিত ক'রে বানান শেখাতে হবে। ফলে, বানান শিক্ষা আকর্ষণীয় ও আনন্দময় হবে। আরও পরবর্তী কালে শিক্ষার্থীরা যখন সাহিত্য ও রচনা পড়তে পারবে, তখন তারা যাতে তার মধ্যবর্তী বিভিন্ন শব্দের বানান যথাযথভাবে শিখতে পারে এবং নিজের লেখায় সেগুলিকে ব্যবহার করতে পারে, তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একটু বেশী বয়স হলেও ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে একটু এগিয়ে গেলে তবেই শিক্ষার্থীরা যুক্তাক্ষর-সমৃদ্ধ বানান শিখবে।

সাহিত্যের মাধ্যমে বানান-শিক্ষা

বানান শিখবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট শব্দটির প্রতীকদ্যোতকতাও শিখবে। তা না হ'লে তাদের বানান-শিক্ষা সফল হবে না, শুদ্ধ বানান মনে দীর্ঘস্থায়ী হবে না। প্রতীকদ্যোতকতাই শব্দের সবচেয়ে বড় গুণ। আমরা কোন একটি বস্তু বা বিষয়ের প্রতীকরূপে কোন শব্দকে লিখিত রূপ দিই। 'বাঘ' শব্দটির প্রতীক হ'ল বিশেষ এক ধরনের হিংস্র জন্তু, শব্দের বানানের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা তার প্রতীকতাও শিখবে। নতুবা শব্দের বানান ও তার অর্থবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা স্পষ্ট হবে না। এইভাবে ভাষার সঙ্গে, সাহিত্যের সঙ্গে ও প্রতীকদ্যোতকতার সঙ্গে বানান শিখলে শিক্ষার্থীর মনে শব্দ ও অর্থের অনুষঙ্গ (Association) স্থাপিত হয়; এবং তা তার মনে চিরস্থায়ী হয়।

শব্দের প্রতীক-দ্যোতকার শিক্ষা

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলা শব্দের বানান-শেখার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয়ের সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অর্থাৎ, বানান-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে এবং কার্যক্ষেত্রে সেগুলিকে প্রয়োগ ক'রতে হবে। সেগুলি হ'ল,—

বাংলা বানান শেখানোর আনুষঙ্গিক চিন্তা ও কার্যধারা

॥ এক ॥ বানান-শিক্ষা সহজ থেকে ক্রমশঃ কঠিন হবে।

॥ **দুই** ॥ লেখার মধ্য দিয়েই বানান-ভুল ধরা পড়ে, এবং বাংলা বানানের সমস্যা মূলতঃ লেখ্য ভাষারই সমস্যা। তাই **বাংলা বানান-শিক্ষার অভ্যাস ও অনুশীলন লিখিতভাবেই হওয়া প্রয়োজন।** এই অনুশীলন শিক্ষার্থীদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী যতদূর সম্ভব বাড়াতে হবে।

লিখিত অনুশীলন

॥ **তিন** ॥ **মাতৃভাষার চর্চা ও অনুশীলনের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাতে হ'বে।** ভাষাতে বানান-ভুল লজ্জা ও ঘৃণার ব্যাপার—চিন্তা বদ্ধমূল ক'রতে হবে। উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সকলকেই মাতৃভাষার উপর শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব আরোপ ক'রতে হবে।

মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা

॥ **চার** ॥ বাংলা শব্দের বানান শেখবার সময় শিক্ষার্থীরা **অভিধান** ব্যবহার ক'রবে, এক্ষেত্রে '**চলন্তিকা**' খুবই সাহায্যকারী অভিধান হিসাবে কাজ করবে।

অভিধান ব্যবহার

॥ **পাঁচ** ॥ বিভিন্ন পুস্তক, পাঠ্যপুস্তক, সংবাদপত্র প্রভৃতিতে ছাপার অক্ষরে বানান-ভুল থাকলে চলবে না। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে, সাইনবোর্ডে, পোস্টারে, দেওয়াল-লিখনে ভুল বানান পরিহার ক'রতে হবে। এজন্য দরকার হ'লে আইন ক'রে এই **ভুল বানানের ব্যবহার বন্ধ ক'রতে হবে**।

পুস্তক, সাইনবোর্ড প্রভৃতিতে ভুল বানান রাখা চলবে না।

॥ **ছয়** ॥ শিক্ষার্থীদের বানান-শিক্ষায়, ব্যাকরণ-শিক্ষায় ও পরীক্ষায় যে '**অশুদ্ধি সংশোধন**' দেওয়া হয়, তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। কতকগুলি শব্দের ভুল বানান শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা কখনই ঠিক হ'বে না। তাতে ভুল-বানানের সঙ্গে তাদের চোখ, অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও মনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়, যা পরবর্তী কালে তাদের বানান-ভুল করবার সুযোগ করে দেয়।

অশুদ্ধি সংশোধন

॥ **সাত** ॥ প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর এক একটি ব্যক্তিগত **note book** থাকবে, তাতে তারা কঠিন কঠিন শব্দের বানান, নতুন-শেখা শব্দের বানান তুলে রাখবে, এবং অবসরমত সে *note book*-টি দেখবে। তাতে বানান-ভুলের সম্ভাবনা কমে যায়।

বানানের Note Book

॥ **আট** ॥ শিক্ষার্থীদের যথাযথ ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গুরুত্ব দিয়ে **ব্যাকরণ শিক্ষা** দিতে হবে। ব্যাকরণের জ্ঞানই তাদের শব্দগঠন-কৌশল শিক্ষা দেবে। সন্ধি সমাস, প্রত্যয়, ণ-ত্ব বিধি, ষ-ত্ব বিধি প্রভৃতি ব্যাকরণের যে স্থল থেকে বানান-ভুলের জন্ম হয়, সে অধ্যায়গুলি শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে শিক্ষা দিতে হবে। ব্যাকরণের যথাযথ জ্ঞানই শিক্ষার্থীদের বানান-ভুলের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

ব্যাকরণ শিক্ষা

॥ **নয়** ॥ শিক্ষার্থীদের **শুদ্ধ উচ্চারণ** শিক্ষা দিতে হবে। ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার প্রভাব এড়িয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারে, সেই দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা প্রতিটি বর্ণের প্রতিটি শব্দের শুদ্ধ ও সুষ্ঠু উচ্চারণ জানবে। ফলে, উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখবে। তাতে ভুলের সম্ভাবনা কম থাকবে। কিন্তু উচ্চারণ ও শ্রুতিনির্ভর না হ'য়ে বানান যদি স্মৃতিনির্ভর হয়, তাতে ভুলের সম্ভাবনা বেশী। কারণ এই স্মৃতিশক্তি সব সময় সমানভাবে কাজ না-ও করতে পারে।

শুদ্ধ উচ্চারণ

॥ **দশ** ॥ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন **Spelling Drill** শেখানো হবে। *Play way in education*-এর কথা সকল শিক্ষাবিদ্‌ই বলেছেন। খেলাধুলার মাধ্যমে বানান-শিক্ষাদান শিক্ষার্থীদের পক্ষে খুব কার্যকর হবে। *Spelling Drill* শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় ও আনন্দময় হবে; তাদের কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা বাড়বে। ফলে, শিক্ষাদানও সফল হবে। নিম্নলিখিতভাবে

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা বানান-শিক্ষার ক্ষেত্রে *Spelling Drill*-এর প্রচলন করা যেতে পারে ;—

(অ) একটি শব্দ লিখে তার যে কোন একটি বর্ণ পরিবর্তন ক'রে এই *Spelling Drill*-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে যেমন,

'কর', এর 'র' পরিবর্তন ক'রে হ'তে পারে– কম, কল, কত, কই ইত্যাদি।

'কর'-এর 'ক' পরিবর্তন করে হতে পারে, মর, ঘর, ঝর, পর, নর, ভর ইত্যাদি।

(আ) একটি বড় শব্দের অন্তর্গত বিভিন্ন বর্ণকে নিয়ে নতুন নতুন শব্দ করে *Spelling Drill* হ তে পারে। যেমন– মহাভারত মহা, ভার, রত, হাত ভাত, মত, হার, মর ইত্যাদি।

(ই) একটি শব্দের একটি বর্ণতে পরিবর্তন করে নতুন নতুন বিভিন্ন শব্দ গঠন ক'রে *Spelling Drill* হতে পারে। যেমন,– 'নবীন'-এর 'বী' অক্ষরটি পরিবর্তন ক'রে হ'তে পারে,– নতুন, নন্দন, নলিন, নয়ন, নলেন, নটন ইত্যাদি।

(ঈ) এমন এক ধরনের *Spelling Drill*-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেখানে একটি শব্দ দেওয়া হবে, যার শেষ অক্ষরটি দিয়ে পরবর্তী শব্দের প্রথম-অক্ষর যুক্ত নতুন একটি শব্দ গঠন ক'রতে হবে। একইভাবে পর পর বহু শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন. —

ভাত	নাম	রুচি	মশা
তল	মত	চিনি	শাল
লতা	তব	নিচু	লঘু
তার	বর	চুপ	ঘুম
রাজা	রাত	পথ	মন
জানা	তরু	থাম	নব

এক্ষেত্রে একই শব্দের দ্বিতীয় বার প্রয়োগ চলবে না।

—*Spelling Drill* এইভাবে বিভিন্ন রকম হতে পারে। নীচু শ্রেণীগুলিতে বানান-শিক্ষা-উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টিতে ও সঠিক বানান-শিক্ষায় এ এক অভিনব রীতি ও কৌশল।

॥ **এগারো** ॥ শিক্ষার্থীদের বয়স, শ্রেণী, বুদ্ধি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বানানের *chart* তৈরি করতে হবে। এই চার্ট সহজ থেকে কঠিন হবে। বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা যদি নতুন বানান সপ্তাহে দুটি ক'রে শেখে, তবে বিদ্যালয়-স্তরে সে এক হাজারেরও বেশী বানান সঠিকভাবে শিখতে পারবে। তার জন্য **শ্রেণী অনুযায়ী বৈজ্ঞানিকভাবে প্রস্তুত বানানের সম্পূর্ণ তালিকা চাই।** সেই তালিকার দিকে লক্ষ্য রেখেই বিদ্যালয়ে বানান-শিক্ষা চলবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষে শ্রেণী অনুযায়ী কঠিন কঠিন শব্দের কিছু বানান স্পষ্ট ও সুন্দর করে লেখা chart-এ থাকবে। বছরে কয়েক বার সেই *chart* পরিবর্তন ক'রে নতুন *chart* দেওয়া যেতে পারে। তাতে শিক্ষার্থীরা অনেকগুলি শব্দের বানান আয়ত্ত করতে পারবে।

বানান-শিক্ষায় বিজ্ঞান-সম্মত তালিকা ও বনানের Chart

॥ **বারো** ॥ খুব তাড়াতাড়ি পড়লে বানান ভাল শেখা যায় না। গল্প-উপন্যাস তাই বানান-শিক্ষার অনুকূল নয়। দ্রুত লিখলেও বানান-ভুলের সম্ভাবনা থেকে যায়। দেখা গেছে যে, পড়বার সময় চোখ আগে চলে, উচ্চারণ তার পরে পরে চলে। আর লেখবার সময় মন ও উচ্চারণ আগে আগে চলে, লেখা ও লেখার জন্য পেশী ও অঙ্গ-সঞ্চালন পরে পরে চলে। এই অবস্থাকে জয় ক'রতে পারলেই সঠিক বানান শেখা ও লেখা কষ্টকর নয়। অর্থাৎ পড়বার সময় দৃষ্টি যেখানে থাকবে পড়া ও উচ্চারণও সেখানেই হ'বে ; এবং লেখবার সময় মন ও উচ্চারণ যেখানে থাকবে, লেখা তার জন্য যথাযথ পেশী-সঞ্চালন সেখানেই হ'বে। এর জন্য চাই নিবিড় অভ্যাস ও একাগ্রচিত্ততা। চোখ ও হাতের আঙ্গুল ও পেশী (যার সাহায্যে লেখা হয়) পরস্পর চমৎকারভাবে সম্পর্কযুক্ত হবে, এবং তার পিছনে থাকবে মন। মন সমেত ইন্দ্রিয়গুলির সামগ্রিক সুসংহত ব্যবহারই বানান-ভুলের বিভ্রান্তি এড়াতে পারে। তার জন্য চাই নিবিড় অভ্যাস ও গভীর মনোযোগ। তবে **পড়া ও লেখার কাজে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে বানান-ভুল এড়ানো যাবে না,** ভাষা-শিক্ষাও সামগ্রিকভাবে সফল হবে না।

লেখায় ইন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ

॥ **তেরো** ॥ বানান-শিক্ষাদানের জন্য **Black Board-এর ব্যবহার** খুবই প্রয়োজন। নীচু শ্রেণীগুলিতে রঙিন চক ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষক মহাশয় কঠিন শব্দগুলির সঠিক বানান বোর্ডে যত্ন ও স্পষ্ট করে লিখে দেবেন। এই লেখায় শব্দের প্রতিটি বর্ণের রেখাবিন্যাস যথাযথ ও স্পষ্ট হবে। প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীরা বোর্ডের লেখা বানান নিজের খাতায় বা *Note Book*-এ লিখে নিতে পারে।

Black Board-এর ব্যবহার

॥ **চোদ্দ** ॥ বাংলা বানান-শিক্ষায় ও বানান-ভুল প্রতিরোধে **শ্রুতলিখন (Dictation)** খুবই কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে। ভাষা ও বানান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাই শ্রুতলিখন, বিশেষ করে নীচু শ্রেণীগুলিতে, বহুল-প্রচলিত। শ্রুতলিখন একদিকে যেমন শুদ্ধ বানান লিখতে ও বানানের শুদ্ধ প্রয়োগ ক'রতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়, অন্য দিকে তেমনি ভাষা-শিক্ষায় ও ভাষা-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ-বৃদ্ধিতেও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ে তাই বিভিন্ন শ্রেণীতে নিয়মিতভাবে শ্রুত-লিখনের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক মহাশয় কোন একটি সাহিত্য-সমৃদ্ধ লেখা শ্রেণীকক্ষে স্পষ্ট ও সুন্দর ক'রে ধীরে ধীরে পড়ে যাবেন এবং শিক্ষার্থীরা তা শুনে শুনে লিখে যাবে। কিন্তু শ্রুতলিখনের পূর্বে শিক্ষক মহাশয় নির্বাচিত অংশটি প'ড়ে সকলকে শোনাবেন। তাতে অংশটির ভাব ও অর্থ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের বোধ জন্মে। তারপর ঐ অংশের মধ্যেকার কঠিন শব্দগুলির সঠিক বানান তিনি বোর্ডে লিখে দেবেন। শব্দগুলি কয়েকবার স্পষ্ট ক'রে উচ্চারণ করবেন এবং শব্দগুলির গঠনবৈচিত্র্য সম্বন্ধেও আলোচনা করবেন। এইভাবে শিক্ষার্থীরা যে বানান শিখবে, তাতে পরবর্তী কালে আর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। তারপর শিক্ষক মহাশয় স্পষ্ট সুষ্ঠু উচ্চারণ ক'রে ধীরে ধীরে অংশটি প'ড়ে যাবেন।

শ্রুতলিখন

শিক্ষার্থীরা সুন্দরভাবে আগে শুনে নিয়ে তারপর লিখে যাবে। পড়বার সময় শিক্ষক ধীরে ধীরে পড়বেন, কিন্তু পারতপক্ষে কোন অংশের পুনরাবৃত্তি করবেন না। পড়বার *speed* শিক্ষার্থীদের শ্রেণী ও যোগ্যতা অনুযায়ী হবে, অংশটিও সামগ্রিকভাবে সেই অনুযায়ী নির্বাচিত হবে। **শ্রুতলিখন, দ্রুতলিখনও বটে।** শিক্ষক মহাশয়ের কথা শুনে শুনে ছাত্রেরা খাতায় স্পষ্ট ও সুন্দর করে লিখে যাবে। এই সময় তাদের মনোযোগ ও একাগ্রতা খুবই প্রয়োজন। শ্রুতলিখনের পর শিক্ষার্থীরা সব খাতাগুলি শিক্ষক মহাশয়ের কাছে জমা দেবে। তিনি প্রয়োজন ও সময়মত সেগুলি যথাযথভাবে নিষ্ঠা-সহকারে দেখে দেবেন, সহানুভূতিশীল হৃদয় নিয়ে সংশোধন ক'রে দেবেন। শ্রুতলিখনের এই ধারা, বাংলা বানান-শিক্ষা ও ভাষা-শিক্ষায় খুবই কার্যকরী। তাই বিদ্যালয়ের নীচু শ্রেণীগুলিতে শ্রুতলিখনের ব্যাপক প্রচলন করতে হবে।

॥**পনেরো**॥ বাংলা বানান-শিক্ষাদান ও বানান-ভুলপ্রতিরোধের ক্ষেত্রে **শিক্ষার্থী-দের খাতাগুলিকে যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে দেখে দেওয়া খুবই প্রয়োজন।** এ ব্যাপারে শিক্ষককে অতিরিক্ত সময় দিতে হ'বে, যত্ন নিতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষার্থীরা যে সব খাতা শিক্ষকের কাছে জমা দেয়, তার বানান-ভুলের প্রতি সব সময় লক্ষ্য রেখে সঠিক বানান খাতায় লিখে দিতে তাকে ভুল-সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে। এমন কি, পরীক্ষার খাতাতেও বানান-ভুল সংশাধন ক'রে খাতাগুলি শিক্ষার্থীদের ফেরৎ দিতে হবে। খাতা দেখা ও ভুল-সংশোধনের ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন। ভুল-সংশোধনের কোন প্রচেষ্টা যেন শিক্ষার্থীদের আত্মমর্যাদায় যেন আঘাত না দেয়। খাতা-দেখার ক্ষেত্রে লাল, নীল প্রভৃতি বিভিন্ন কালি ব্যবহার করতে হবে।

খাতা দেখা ও ভুল-সংশোধন

বাংলা বানান শিক্ষার ক্ষেত্রে **শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য** আছে। শিক্ষক মহাশয় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিশেষ যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে বানান শিক্ষা দেবেন। বানান শিক্ষাদানের সময় তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান প্রণালীগুলির ব্যবহার করবেন। ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বানান-শিক্ষাদানের পদ্ধতি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে প্রচলন করবেন। বানান-শিক্ষাদান কার্যে শিক্ষকের অসীম ধৈর্য প্রয়োজন। শিক্ষক বোর্ডে বা খাতায় লিখতে গিয়ে যদি ভুল বানান ব্যবহার করেন, তবে তা শিক্ষার্থীদের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে। কাজেই ভুল বানান সম্পর্কে তিনি নিজেও যথেষ্ট সচেতন থাকবেন। ব্যাকরণের নিয়মগুলি তিনি অবশ্যই জানাবেন এবং শব্দগঠন-কৌশলের সঙ্গে তিনি পরিচিত হবেন। শিক্ষকের কাছ থেকেই শিক্ষার্থীরা শুদ্ধ উচ্চারণ শিখবে। ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত করবার ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করবার দায়িত্ব তাঁরই। তিনিই বিভিন্ন বানানের *chart* তৈরি করবেন এবং শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন শব্দের বানান সঠিকভাবে লিখতে ও নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে বানান-শিক্ষার সময় ব্যাপকভাবে লেখার মধ্য দিয়ে অভ্যাস ও অনুশীলন করে, সেদিকে শিক্ষকের লক্ষ্য

বানান-শিক্ষাদানে শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব

থাকবে। তিনিই শিক্ষার্থীদের শ্রুতলিখন শেখাবেন, *Spelling Drill* করাবেন। শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের খাতাগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে সহানুভূতিশীল মন নিয়ে সংশোধন ক'রে দেবেন। বিদ্যালয়ে বানান শেখবার ও শুদ্ধভাবে বানান প্রয়োগ করবার মত সার্থক পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব শিক্ষকের। তাঁর জ্ঞান ও চিন্তাধারা শিক্ষার্থীদের বানান-শিক্ষায় অনেক কাজে লাগবে। সেই সঙ্গে চাই শিক্ষকের যত্ন, নিষ্ঠা, ধৈর্য, সহানুভূতি প্রভৃতি গুণ ; তা না হ'লে তাঁর পক্ষে যথাযথভাবে বানান-শিক্ষাদান সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বানান-শিক্ষাদান ও নির্ভুলভাবে বানানের যথাযথ প্রয়োগে সাহায্য করা একজন দু'জন শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। এ দায়িত্ব যৌথভাবে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের। সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সে দায়িত্ব তাঁদের পালন ক'রতে হবে। তবে ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন; তাঁরই নেতৃত্বে অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে বানান-শিক্ষাদান যথাযথভাবে করা যেতে পারে। শিক্ষকেরা তাঁদের জ্ঞান বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পুস্তক পড়বেন, পত্র-পত্রিকা পড়বেন, আলাপ-আলোচনা করবেন ও বিভিন্ন *seminar*-এ যোগ দেবেন। এইভাবে নিজেরা সমৃদ্ধ হয়ে তাঁরা যথাযথভাবে বানান-শিক্ষাদানে সাহায্য করতে পারবেন।

॥ বাংলা বানান-সংস্কার ॥

বাংলা বর্ণমালা ও ভাষার নানাবিধ সমস্যা ও জটিলতা আছে। সেগুলি আগেই আলোচনা করা হ'য়েছে। ভাষার প্রধান লক্ষণ হল সরলতা, প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা। ভাষার পরিবর্তন হয়, বিবর্তনের এই পথে ভাষা ক্রমশঃ সরল হয়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। সংস্কৃত তৎসম শব্দগুলি বিবর্তনের পথে সরলীকৃত হ'য়ে তদ্ভবশব্দ ও অর্ধতৎসম শব্দে পরিণত হয়েছে,—সাধুভাষার রক্ষণশীলতার বাধা এড়িয়ে চলিতভাষা সৃষ্ট হয়েছে ; এবং আজ তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধুভাষার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাংলা বর্ণমালার সমস্যা এখনও সমান থেকে গেছে। ব-ব, জ-য, ন-ণ, শ-ষ-স এখনও সহাবস্থান করেছে। যুক্তাক্ষরের সমস্যা এখনও আছে। দীর্ঘ বর্ণমালা এখনও ভাষার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে। এই সমস্যার সমাধান ক'রতে না পারলে বাংলা ভাষা গতিশীল একটি জীবন্ত ভাষাতে পরিণত হবে না। এ-নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা হয়েছে। বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের মধ্য দিয়ে বানান-সংস্কারের জন্য অনেকেই বলেছেন। বর্তমানে বাংলা *Typewriter* প্রচলিত হওয়ায় এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে। *Typewriter*-এ অতগুলি বর্ণ ও যুক্তাক্ষরের সংস্থান করা সহজ নয়। সরকারী কার্যে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে ; **বাংলা Typewriting-এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।** সেজন্যও বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের কথা উঠেছে। কাজেই বাংলা বর্ণমালাকে কিভাবে ছোট করা যায়, অপ্রচলিত বর্ণগুলিকে কিভাবে বাদ দেওয়া যায়, যুক্তাক্ষর সম্বন্ধে কিরূপ চিন্তা-ভাবনা করা যায়, তার অনুশীলনী করতে হবে। এ সম্বন্ধে আজও পর্যন্ত যে সব প্রচেষ্টা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের মধ্য দিয়ে বানান-সংস্কার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার :

বাংলা বানানকে নিয়ন্ত্রিত বা সরল করবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিছু নিয়ম রচনা করেন। এই নিয়মগুলি সংস্কৃত তৎসম শব্দ ও অসংস্কৃত দেশী-বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে-মে এই নিয়ম-কানুনগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেন। পরে এই নিয়মগুলি বাংলা বানানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এখন এগুলি বাংলা বানানের অন্তর্ভূর্ত হয়ে গেছে। প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা, শব্দ ও বানানকে সরল করবার জন্য যে প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন, তা সার্থক হয়েছে বলা যেতে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান-সংস্কারের ক্ষেত্রে যে নিয়মকানুনগুলি রচনা করেছিলেন, সেগুলি হল—

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার

সংস্কৃত তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে :

॥ এক ॥ **রেফের (́) পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব বর্জনীয়।**

যেমন—পূর্ব, সূর্য, কর্ম, অর্চনা, কার্তিক ইত্যাদি।

॥ দুই ॥ **সন্ধিতে 'ঙ' স্থানে 'ং' হবে।**

ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে ং, অথবা বিকল্পে ঙ্ হবে।

যেমন— অহংকার, সংগীত, ভয়ংকর অথবা অহঙ্কার, সঙ্গীত, ভয়ঙ্কর।

কিন্তু পূর্বে ম্ না-থাকার জন্য গংগা, সংগে প্রভৃতি হবে না।

অসংস্কৃত তদ্ভব, দেশী, বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে :

॥ তিন ॥ **রেফের** (́) পর দ্বিত্ব বর্জনীয়।

যেমন – শর্ত, চর্বি, কর্জ ইত্যাদি।

॥ চার ॥ **হসন্ত চিহ্ন।**

শব্দের শেষে হসন্ত চিহ্ন হবে না, যেমন— ডিস, টেবিল, মক্তব ইত্যাদি।

ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে হসন্ত চিহ্ন বিধেয়।

যেমন,—শাহ্; তথ্‌ত্ ইত্যাদি।

সুপ্রচলিত শব্দে হসন্ত চিহ্নের প্রয়োজন নেই।

যেমন,—আর্ট, গভর্ণমেণ্ট ইত্যাদি।

শব্দের শেষের স্বর যদি অত্যধিক হ্রস্ব হয়, তবে হসন্ত চিহ্ন প্রয়োজন।

যেমন,—চট্, সার্ ইত্যাদি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার অংশ মূলতঃ **চলন্তিকা (রাজশেখর বসু)** হ'তে সংগ্রহ করা হয়েছে। উৎসাহী পাঠক এ ব্যাপারে মূল গ্রন্থটি অনুসরণ করতে পারেন। —লেখক।

॥ পাঁচ ॥ ই, ঈ, উ, ঊ

মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ, ঊ থাকলে তদ্ভব বা অনুরূপ শব্দে ঈ ঊ বা বিকল্পে, ই, উ হবে।

যেমন - পাখী (পক্ষী)-র ক্ষেত্রে পাখী বা পাখি দুইই চলবে, পূর্ব (পূর্ব)-র ক্ষেত্রে পূর্ব বা পুব দুইই চলবে।

কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবলমাত্র ঈ, ই বা উ কার চলবে।

যেমন—হীরা, নীলা, পানি, চুল, জুয়া, দিয়াশলাই ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ, জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ-বাচক শব্দের শেষে ঈ হবে।

যেমন—বাঘিনী, ধোবানী, কেরাণী, ইংরেজী, হিন্দী, বিলাতী, দাগী, রেশমী ইত্যাদি। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হবে।

যেমন—ঝি, দিদি, বিবি, কবি, চলতি, মাঝারি, মিহি ইত্যাদি।

মনুষ্যের জীব, জন্তু, গুণ, ভাব, কর্ম প্রভৃতি বাচক শব্দে ও দ্বিরাবৃত্ত শব্দের শেষে কেবল ই হবে।

যেমন—বেঙাচি, কাঠি, সুজি, চুরি, পাগলামি, মারামারি ইত্যাদি।

॥ ছয় ॥ জ, য

নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে য না লিখে জ লিখতে হবে,—

কাজ, জুঁই, জুত, জো, জোড়া, জোয়াল ইত্যাদি।

॥ সাত ॥ ন, ণ

অসংস্কৃত শব্দে কেবলমাত্র ন হবে।

যেমন—বান, বামুন, সোনা, কার্নিস।

যুক্তাক্ষর ণ চলবে।

যেমন—লণ্ঠন, ঠাণ্ডা ইত্যাদি।

॥ আট ॥ ও, ঊর্ধ্ব কমা

সুপ্রচলিত শব্দের উৎপত্তি, উচ্চারণ বা অর্থের বিভিন্নতা বোঝাবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার বা ঊর্ধ্বকমা যতদূর সম্ভব বর্জনীয়। তবে অর্থ-গ্রহণে বাধা-সৃষ্টি হলে শব্দের শেষে ও-কার, ও প্রথমে ও মধ্যে ঊর্ধ্বকমা দেওয়া যেতে পারে।

যেমন—কাল, কালো; ভাল, ভালো; মত মতো; প'ড়ো (পড়ুয়া) ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত বানানগুলি চলবে,—

এত, কত, তত, যত, তো, হয়তো, কাল, চাল, ডাল ইত্যাদি।

॥ নয় ॥ ঙ্গ, ং, ঙ

বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন প্রভৃতি বানান চলবে। বিকল্পে বাংলা, বাঙলা, বাঙালী ভাঙন প্রভৃতিও চলবে।

হসন্ত ধ্বনি বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়।

যেমন—রঙ রং, সঙ সং, বাঙলা বাংলা ইত্যাদি।

স্বরাশ্রিত হলে ঙ হবে।

যেমন,—রঙের, বাঙালী ইত্যাদি।

॥ দশ ॥ শ, ষ, স

সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দে শ, ষ, স হবে।

যেমন—শস্য > শাঁস, হাস্য > হাসি, মশক > মশা ইত্যাদি।

কিন্তু কিছু কিছু ব্যতিক্রমও আছে।

যেমন—শ্রদ্ধা > সাধ, মনুষ্য > মিনসে ইত্যাদি।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুযায়ী s স্থানে স, sh স্থানে শ হবে।

যেমন—shirt > শার্ট, post > পোস্ট, August > আগস্ট ইত্যাদি।

ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দগুলির ক্ষেত্রেও মূল উচ্চারণের শ, স রক্ষিত হবে।

যেমন - মসলা, জিনিস, আসল, শামিল, সাবান ইত্যাদি।

॥ এগারো ॥ ঃ বিসর্গ

সংস্কৃত শব্দের অন্তে বিসর্গ (ঃ) বর্জনীয়।

যেমন—যশ, মন, বক্ষ ইত্যাদি।

যেমন - যশঃ + লাভ = যশোলাভ, মনঃ + যোগ = মনোযোগ ইত্যাদি।

বাংলা বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আরও কতকগুলি নিয়ম করেছেন। কিন্তু সেগুলি গৌণ বলে এখানে কিছু আলোচনা করা গেল না। বাংলা বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ভূমিকা ও প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। তাঁদের এই সংস্কার বাংলা ভাষা ও বানানকে প্রভাবিত করেছে এবং সেই অনুযায়ী বাংলা ভাষা, শব্দ ও বানান অনেকখানি সহজ হয়েছে, অনেক স্থিতিশীল হয়েছে। কিন্তু তার পরে দীর্ঘ দিন কেটে গেছে। এই সময়ে বাংলা বানান তার সমস্যা ও সমাধান নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা হয়েছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই হয় নি। অথচ এই-জাতীয় আরও কিছু পরিবর্তন ও সংস্কার প্রয়োজন ছিল।

পরবর্তীকালে বাংলা বানান সংস্কারের উল্লেখযোগ্য প্রয়াসের অভাব

সাম্প্রতিককালে **'আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী'** এ ব্যাপারে কিছু এগিয়েছিলেন। তাঁরা বাংলা যুক্তাক্ষরের সংস্কারের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলা যুক্তাক্ষরকে ভেঙ্গে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করবার রীতি আছে।

যেমন—মুক্তা > মুক্‌তা, শক্তি > শক্‌তি ইত্যাদি।

কিন্তু 'আনন্দবাজার গোষ্ঠী' বাংলা বানান সংস্কার ও যুক্তাক্ষর সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যুক্তাক্ষরের সংশ্লিষ্ট পূর্ব-বর্ণে হসন্ত চিহ্নটিও তুলে দিলেন। তাঁরা এখনও এই পদ্ধতিতে তাঁদের পত্রিকা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এ নিয়ে বিতর্ক হয়েছে।

আনন্দবাজার গোষ্ঠীর অন্যতম প্রকাশনা 'দেশ' পত্রিকার মধ্যমে এ বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রমুখ প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এর তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে এই পদ্ধতিতে বাংলা ভাষা দ্রুত অবক্ষয়ের মুখে নেমে যাবে এবং তার নিজস্ব উচ্চারণ-রীতি ও শব্দগঠন-বৈচিত্র্য হারিয়ে ফেলবে। এক্ষেত্রে অর্থ-গ্রহণেরও বিপত্তি হওয়ার সম্ভবনা। 'বোম্বাই' শব্দটির সঙ্গে আমরা পরিচিত, শব্দটির লিখিত রূপের সঙ্গে আমাদের চোখ, হাত, পেশী প্রভৃতি অংশগুলিও সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু ঐ শব্দটিকে 'বোমবাই' লিখতে, পড়তে ও উচ্চারণ করতে আমরা থমকে দাঁড়াই। কিন্তু এখনও ঐ শব্দটির মূল রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত আছি বলে খুঁজে খুঁজে চিন্তা ক'রে শব্দটির উচ্চারণ ও অর্থ বের ক'রতে পারি। কিন্তু আমাদের উত্তরসূরীদের বেলায় কি হবে? তারা এই শব্দটির কি উচ্চারণ করবে, কি অর্থ করবে? ভাষা ও শব্দের এক সমস্যার সমাধান ক'রতে গিয়ে আমরা নতুন এক সমস্যা সৃষ্টি করে ফেলব নাকি? কাজেই বানান-সংস্কারের রীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের সবিস্তার আলোচনা ক'রতে হবে।

আনন্দবাজার পত্রিকার বানান সংস্কার

বাংলা বর্ণমালা ও বানান-সংস্কারের আরও অনেক আলাপ-আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা হয়েছে। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রোমান হরফে বাংলা বর্ণমালা লেখার পক্ষপাতী। ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সমস্ত অনুনাসিক বর্ণের ক্ষেত্রে হিন্দীর মত বিন্দু (˙) ব্যাবহার করতে বলেছেন। কিন্তু এসব কথা আলোচনার স্তরেই আছে। এ নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে বা সরকারী ভাবে বৃহত্তর কোন প্রচেষ্টা এখনও হয় নি। বাংলা বানান সংস্কারের দায়িত্ব বহন করতে পারেন ভাষাতাত্ত্বিকেরাই। কিন্তু শিক্ষকদেরও এ ব্যাপারে করণীয় আছে। বিভিন্ন শিক্ষা-সংস্থা বানান ও বর্ণমালা-সংস্কারের জন্য আলোচনা-চক্র বা seminar প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু **বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রচলিত শিক্ষাকাঠামোর মধ্যেই যত্ন, নিষ্ঠা ও ধৈর্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলা বানান শিক্ষা দিতে হবে। তবেই শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষা সার্থক হতে পারবে।**

উপসংহার

অনুশীলনী

১। ছাত্রদের রচনায় সাধারণতঃ কি কি কারণে বর্ণাশুদ্ধি ঘটে এবং কি উপায়ে তা প্রতিকার করা যায়, সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব., বি.টি. ১৯৬০)

২। আজকাল ছাত্রদের রচনায় বহু বানান-ভুল দেখা যায়—ইহার কারণ কি? শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে কিভাবে ইহার প্রতিকার করা যাইতে পারে? (কলি. বিশ্ব., বি. টি ১৯৬১)

৩। বাংলা বানান সম্পর্কে যে সমস্যার কথা প্রায়ই শোনা যায়, তাহার স্বরূপটি কি বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়া উহার পথ নির্দেশ করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৫)

৪। ছাত্রদের লেখায় বানান-ভুলের কথা প্রায়ই শোনা যায়।—সাধারণতঃ কি-জাতীয় ভুল ঘটিয়া থাকে, তাহা আপনার অভিজ্ঞতা হইতে বিবৃত করুন এবং কি উপায়ে তাহা সংশোধন করা যায়, সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। (কলি. বিশ্ব. বি. টি. ১৯৬৭)

৫। ছাত্র-ছাত্রী যে সব বানান ভুল করিয়া থাকে, সেগুলির কারণ নির্ণয় করুন। বানান শিখাইতে কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন? (কলি বিশ্ব., বি এড. ১৯৭০)

৬। মাতৃভাষা বাংলাতেও বানান-ভুল হয় কেন? বর্ণাশুদ্ধি দূর করিবার কোন্ কোন্ উপায় উল্লেখ-যোগ্য? কোন্ মূল নীতির উপর ভিত্তি করিয়া বানান শিক্ষা দেওয়া উচিত?

(বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৬)

৭। বাংলা বানান-সমস্যা ও ইহার প্রতিকার সম্বন্ধে আপনার অভিমত যুক্তিসহ ব্যক্ত করুন।

(উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৯)

৮। কি কি কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের রচনায় বানান-ভুল ঘটিয়া থাকে এবং তাহার প্রতিকারের উপায় হিসাবে কি করা যাইতে পারে, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করুন।

(কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৬৬)

৯। বানান-সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া বাঙলা বানান-বিধির যে সংস্কার প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া প্রচলিত রীতির সহিত তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি: এড. ১৯৬৭)

১০। বাংলা-বানান সম্পর্কে যে সমস্যার কথা প্রায়ই শোনা যায়, তাহার স্বরূপ কি, তাহা আলোচনা করিয়া উহার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করুন। (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড ১৯৬৮)

১১। মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণতঃ কি কি কারণে বানান ভুল হয়? কি উপায়ে এই ত্রুটি নিবারণ করা যায়? (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বি. এড ১৯৭২)

১২। সাধারণতঃ কি কি কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখায় বানান-ভুল হয়? বানান-ভুল নিবারণের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তাহা আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব., বি, এড ১৯৭২)

১৩। বাংলা ভাষায় বানান সম্পর্কে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে কেন? এই সমস্যা সমাধানের জন্য কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে?

(কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বি. এড. ১৯৭১)

১৪। বাংলা বানানের সমস্যা কি? এই সমস্যার সহিত শিক্ষার্থীদের বাংলা বানান-ভুলের সমস্যার কোন সম্পর্ক আছে কি? বাংলা ভাষার শিক্ষক বানান-ভুলের সমস্যার ব্যাপারে কোন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন কি? (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৪)

১৫। "শিক্ষার্থীদের বানান ভুল ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মৌল সমস্যা; কিন্তু ইহা প্রতিকারসাধ্য"—উক্তিটি সম্পর্কে আলোকপাত করুন। (কলি. বিশ্ব. বি. এড. ১৯৭৬)

১৬। সাধারণতঃ কি কি কারণে ছাত্রছাত্রীদের লেখায় বানান ভুল হয়? বানান-ভুল নিবারণের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে?—তাহা আলোচনা করুন। শুদ্ধ বানান শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিগুলি বিশদভাবে আলোচনা করুন। (কলি বিশ্ব., বি এড. ১৯৭৮)

চতুর্দশ অধ্যায়
হাতের লেখা
[Hand-writing]

ভাষার দুটি রূপ,—কথ্য (*spoken*) ও লেখ্য (*written*)। কথ্যভাষার মধ্য দিয়ে আমরা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের জৈব প্রয়োজন সিদ্ধ করি,—সম্মুখস্থ শ্রোতার কাছে আমাদের মনের ভাব ব্যক্ত করি। আর ভাষার লেখ্য রূপের মধ্য দিয়ে আমরা শিল্প ও সাহিত্যের সৌন্দর্যময় সম্ভার স্থায়ীভাবে রেখে যাই আগামী দিনের মানুষের জন্য। ভাষার লিখিত রূপ তাই অবহেলার যোগ্য নয়। মুখের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে আমরা কথা বলি, আর হাতের পেশী-সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে আমরা মনের ভাষার নীরব উচ্চারণ স্থায়ী করে রাখি লিখিতভাবে। ভাষার লিখিত রূপ তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় প্রতিটি সমৃদ্ধিশালী ভাষারই লিখিত রূপ আছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম নেই। ভাষার লিখিত রূপ কতকগুলি অর্থহীন রেখা-বিন্যাসের সাহায্যে সৃষ্ট বর্ণের (*Letters*) সাহায্যে গড়ে উঠে। বর্ণগুলিকে নিয়েই হয় বর্ণমালা (*Alphabet*)। প্রায় প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব বর্ণমালা আছে। এই বর্ণমালার বিভিন্ন বর্ণের সাহায্যেই অর্থময় এক একটি শব্দ (*word*) গড়ে উঠে। কতকগুলি শব্দ যখন মনের একটা ভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে, তখন তাকে বলা হয় বাক্য (*Sentence*)। বর্ণ, শব্দ, বাক্য—ক্রমান্বয়ে এইগুলি অবলম্বন ক'রে ভাষার লিখিত রূপ গড়ে উঠে। ভাষার এই লিখিত রূপের সঙ্গে যথাযথ পরিচয় না থাকলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে লিখন-শিক্ষা তাই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা বর্ণ-শব্দ-বাক্য সমন্বিত ভাষার যে লেখ্য দেহ, তার সঙ্গে যথাযথভাবে পরিচিত হবে। এবং বিদ্যালয়ে সে শিক্ষা তাদের দিতে হবে।

লেখ্য ভাষার মাধ্যমেই ভাষা স্থায়ীরূপ লাভ করে

হাতের লেখার মধ্য দিয়ে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয় বলে অনেকে মনে করেন। তাঁরা বলেন,—ভালো হাতের লেখা উন্নত ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ চরিত্রের পরিচায়ক, তা না হলেও হাতের লেখা যে একটি শিল্পকর্ম (*Art*), সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। **হাতের লেখাকে ভাষা ও ভাব প্রকাশের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে শিল্প ও সৌন্দর্যের জগতে নিয়ে যেতে হবে**। শিল্পগত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই হাতের লেখার বিচার করতে হবে,—সৃজনশীলতা ও সৌন্দর্য-বিকাশই যার মূলকথা। শিক্ষার্থীদের তাই হাতের লেখার চর্চা ও অনুশীলনের সময় শিল্পধর্ম ও সৃজনশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রতে হবে। এক একজন খুব সুন্দর ক'রে লিখতে পারে,—তাদের প্রতিটি শব্দ, বর্ণের রেখা-বিন্যাস, লেখবার নিজস্ব রীতি শিল্প-সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। হাতের লেখার মধ্য দিয়ে তাই সৌন্দর্য সৃষ্টি করা সম্ভব।

হাতের লেখার মাধ্যমে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়

॥ হাতের লেখা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ॥

ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে হাতের লেখা শিক্ষাদানের প্রয়োজন আছে। নিম্ন-লিখিত কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের হাতের লেখা শিক্ষাদানের প্রয়োজন আছে ;—

॥ **এক** ॥ হাতের লেখার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা ভাষা আয়ত্ত করবে।

॥ **দুই** ॥ হাতের লেখার মধ্য দিয়ে তারা ভাষা-ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত ক'রবে।

॥ **তিন** ॥ বিভিন্ন বর্ণ ও শব্দের সঠিক রেখাবিন্যাস ও বানান নির্ভুলভাবে আয়ত্ত ক'রবে।

॥ **চার** ॥ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষাগত দক্ষতা বাড়বে, সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হবে।

॥ **পাঁচ** ॥ শিক্ষার্থীরা শিল্প-সৌন্দর্য চেতনায় সমৃদ্ধ হবে।

॥ **ছয়** ॥ তারা সাহিত্য-সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হবে ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্য বিদ্যালয়ে হাতের লেখার শিক্ষাদান করতে হবে। ভাষা-ব্যবহারের কৌশল-শিক্ষা, ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা-অর্জন ও শিল্প সৌন্দর্যের চেতনা-বিকাশ সাধন করতে হ'লে বিদ্যালয়ে যথাযথভাবে হাতের লেখা শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

॥ হাতের লেখা শিক্ষাদান ॥

বিদ্যালয়ে যথাযথভাবে হাতের লেখা শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন **প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা** গ্রহণ ক'রতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বসবার ও লেখার জন্য বেঞ্চ ও ডেস্কগুলিকে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক ক'রতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে লেখবার কোন অসুবিধা না হয়। শ্রেণীকক্ষে প্রচুর আলো-বাতাস যাতায়াতের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কারণ কম আলোয় কখনই ভাল হাতের লেখা সম্ভব নয়। লেখবার উপকরণগুলি যথাযথভাবে হওয়া প্রয়োজন ; পেন, পেনসিল, চক ও কাগজ, শ্লেট ও বোর্ড যথাযথ হওয়া চাই। এই উপকরণগুলি যেন লেখবার সময় শিক্ষার্থীদের কোনরূপ অসুবিধা না করে। কাগজ চুপসে যাবে, পেন থেকে কালি ঝরবে, পেনসিলে ঠিকমত লেখা হবে না, চকে বালি থাকবে, বোর্ডে লেখা যাবে না- এই অবস্থা থাকলে যথাযথভাবে হাতের লেখা শিক্ষাদান সম্ভব নয়, শিক্ষার্থীরাও শিক্ষাগ্রহণে বিরক্তি প্রকাশ ক'রবে। হাতের লেখার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও একাগ্রতা। লেখার সময় অমনোযোগী হ'লে লেখা ভাল হবে না, ভুলও থেকে যাবে। হাতের লেখার জন্য চোখের দৃষ্টি বিশেষ প্রয়োজন। চোখের দৃষ্টি খারাপ থাকলে ভাল হাতের লেখা সম্ভব নয়। এর সঙ্গে প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের পেশী-সঞ্চালন ও পেশী-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও দক্ষতা। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ঠিক ক'রে তবেই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের হাতের লেখা শেখাতে হবে।

হাতের লেখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ে হাতের লেখা শেখানোর প্রচলিত পদ্ধতি নিতান্তই গতানুগতিক ও অবৈতনিক। ভাষা-শিক্ষাগ্রহণের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা পর পর কতকগুলি অর্থহীন বর্ণ আয়ত্ত করে যার সঙ্গে তাদের প্রাণের বা অন্তরের কোন যোগ নেই। বর্ণমালার লেখা আয়ত্ত হ'লে শিক্ষার্থীদের বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে শব্দমালা শেখানো হয়। সেক্ষেত্রেও একই অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা, শব্দার্থ না জেনেই শব্দের প্রতীকদ্যোতকতা যথাযথভাবে উপলব্ধি না ক'রেই শিক্ষার্থীরা শব্দ লেখার অভ্যাস করে, তাও নিতান্ত গতানুগতিক-ভাবে। লেখার উপকরণগুলি ত্রুটিযুক্ত,—কলম থেকে কালি ঝরে; 'হাতে মসী, মুখে মসী' নিয়ে শিশু যেন মেঘে-ঢাকা শিশু শশী' হয়েই দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে ব'সবার ও লেখবার বেঞ্চ-ডেস্কগুলিও লেখবার উপযুক্ত নয়। কাগজ-কালির সেই একই হাল। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই হাতের লেখাতে শিক্ষার্থীরা আকর্ষণ ও বৈচিত্র্যহীনতা অনুভব করে,—কোন রকমে দায়িত্ব সারবার চেষ্টা করে; বিদ্যালয়ে হস্তাক্ষর লেখার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এক্ষেত্রেও শিক্ষক শিক্ষার্থী সকলেই দায়-সারা কাজ সারে। বিদ্যালয়ে ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের লেখা আজ চরমভাবে অবহেলিত। পাঠ্যক্রম, সময়-তালিকা, পরীক্ষা প্রভৃতি কিছুতেই হাতের লেখা যথাযথ স্থান পায় নি। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ কেউই হাতের লেখার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী নয়। শিক্ষার্থীদের হাতের লেখার মান তাই ক্রমশঃই নেমে যাচ্ছে।

বিদ্যালয়ে হাতের লেখা শিক্ষাদানের প্রচলিত ব্যবস্থা

হাতের লেখা শেখার ক্ষেত্রে হাতের আঙুল ও পেশী খুবই কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। বস্তুতপক্ষে, হাতের আঙুল ও পেশীগুলিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রে সুনিপুণভাবে সঞ্চালন করতে পারলেই হাতের লেখা ভাল হয়। তাই আঙুল ও পেশী-নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চালনের উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রতে হবে। কারণ আঙুলে কলম বা পেনসিল ধ'রে পেশী সঞ্চালন ক'রেই হাতের লেখা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। সেজন্য ছোটবেলা থেকেই হাতের লেখার অভ্যাস ও অনুশীলনের ব্যবস্থা ক'রতে হবে। কারণ ছোট বেলাতে আঙুল, পেশী ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নমনীয় থাকে। সেই সময়েই তাদের লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ভাষার লিখিত রূপ বর্ণ-নির্ভর। শিক্ষার্থীরা তাই প্রতিটি বর্ণের সঠিক রেখাবিন্যাস আঙুল ও পেশী-সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে শিখবে;—শিক্ষার্থীরা যুক্তাক্ষরের বিচিত্র, জটিল ও কঠিন রেখা-বিন্যাসও সঠিকভাবে আয়ত্ত ক'রবে। কাজেই বিভিন্ন বর্ণের রেখাবিন্যাসে হাতের আঙুল ও পেশী যথাযথভাবে সঞ্চালন করাই হাতের লেখা শেখানোর মূল কথা।

হাতের লেখা শেখানোর পেশী-সঞ্চালন ও রেখাবিন্যাস

হাতের লেখা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রথম ক্ষেত্রটি হল শিক্ষার বহিরঙ্গ ব্যবস্থা। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের **লেখার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে**। লেখবার ঘর, ব'সবার ডেস্ক-বেঞ্চ প্রভৃতি যথাযথ করতে হবে ; বিভিন্ন উপকরণও (কালি কলম, কাগজ, পেনসিল, চক, বোর্ড ইত্যাদি) লেখবার উপযোগী করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজন **যথাযথভাবে পেশী-নিয়ন্ত্রণ ও পেশী-সঞ্চালনের শিক্ষা**। কারণ, যথাযথভাবে পেশী-নিয়ন্ত্রণ ছাড়া হাতের লেখা শেখানো যুক্তিহীন। শিক্ষার এই বহিরঙ্গ অবস্থা ও ব্যবস্থা যথারীতি রেখে শিক্ষার্থীদের মনের জগতে প্রবেশ ক'রতে হবে। হাতের লেখা শেখার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মনের যোগসাধন করতে হবে, মনের ক্রমবিকাশের পর্যায়কে সমগতি দান করতে হবে। ছোট শিশু আপনাকে প্রকাশ ক'রতে চায়। ছোটবেলায় সে আবোল-তাবোল কথায় নিজেকে প্রকাশ করে —কয়লা, চক-পেনসিল, পেনসিল, পেন প্রভৃতি পেলে দেওয়াল, মেঝে, শ্লেট, বোর্ড, কাগজ, খাতা প্রভৃতিতে হিজিবিজি লিখে ও এলোমেলো রেখাবিন্যাস ক'রে আপনাকে প্রকাশ করতে চায়। তার এই মৌলিক প্রবণতাকে হাতের লেখা শেখানোর কাজে লাগাতে হবে। এই বিশৃংখল রেখাবিন্যাসের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে, পেশী সঞ্চালনের এই ঝোঁককে হাতের লেখা শেখানোর কাজে লাগিয়ে ভাষাশিক্ষাকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে।

হাতের লেখা শেখানোর দুটি দিক

হাতের লেখাকে কোন্ অবস্থায় আদর্শ বলবো ? **ভালো হাতের লেখার গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?** এই প্রশ্নের উত্তর যদি খুঁজে বের করতে পারি, তবে সেদিকে লক্ষ্য রেখে হাতের লেখা শিক্ষা দিতে পারলে শিক্ষার্থীরাও যথাযথভাবে তা গ্রহণ করতে পারবে। আদর্শ হাতের লেখার মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা উচিত ;—

॥ ১ ॥ **স্পষ্টতা** হাতের লেখার সবচেয়ে বড় গুণ। হাতের লেখা গোটা গোটা ও স্পষ্ট হবে। এমন কি, টানা লেখার সময় ও দ্রুত লেখার সময়ও লেখা স্পষ্ট হবে। লেখা যেন অপরে সহজে ও স্বচ্ছন্দে পড়তে পারে। লেখার মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা থাকবে না। লেখার মধ্যে কাটাকাটি হ'লে তা স্পষ্ট করে কাটতে হবে। হাতের লেখা হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট।

॥ ২ ॥ হাতের লেখা **নির্ভুল** হবে। লেখার মধ্যে বানান-ভুল থাকবে না। ভাষার ভুল থাকবে না। দেখে-লেখা হ'লে মূল অংশটি অবিকলভাবে লিখতে হবে। লেখার যথাস্থানে যতিচিহ্ন দিতে হবে। নিয়মিত অনুচ্ছেদ রচনা করতে হবে। হাতের লেখার মধ্যে যেন কোন ধরনের ভুল না থাকে।

॥ ৩ ॥ হাতের লেখার অন্যতম গুণ হ'ল তার **দ্রুততা** (speed)। খুব ধীরে ধীরে হয়ত স্পষ্ট করে লেখা যায়, নির্ভুল করে লেখা যায়, কিন্তু দ্রুততার সঙ্গে লেখাও প্রয়োজন। বয়স, বুদ্ধি ও শ্রেণী বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে লেখার এই দ্রুততাও বাড়বে। কাজেই স্পষ্টতা ও নির্ভুলতার সঙ্গে দ্রুততাও হাতের লেখার মস্ত বড় একটি বৈশিষ্ট্য।

॥ ৪ ॥ হাতের লেখা একটি শিল্পকার্য। ভালো হাতের লেখার মধ্য দিয়ে শিল্পগত ভাবে **সৌন্দর্য সৃষ্টি** করা যায়। মানুষের শিল্পমনই হাতের লেখার রেখাবিন্যাসের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। হাতের লেখা দেখতে ভাল হবে ; লেখকের লেখার *style* পাঠককে আকৃষ্ট করবে।

॥ ৫ ॥ হাতের লেখার মধ্যে যথাস্থানে **অনুচ্ছেদ রচনা** করতে হবে এবং **যতিচিহ্ন স্থাপন** করতে হবে। যদি কোন অংশকে দেখে বা শুনে লেখা হয়; তবে মূল অংশের অনুরূপভাবে তার মধ্যেও অনুচ্ছেদ রক্ষিত হবে, যতিচিহ্ন স্থাপিত হবে, আর হাতের লেখা যদি কোনরূপ সৃষ্টিধর্মী রচনা হয়. তবে তার মধ্যেও বিষয়বস্তু, ভাব ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী অনুচ্ছেদ রচিত হবে এবং যতিচিহ্ন স্থাপিত হবে।

॥ ৬ ॥ হাতের লেখার **অক্ষরগুলি সমানুপাতিক হবে এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে**। প্রতিটি অক্ষরের প্রকৃতি অনুযায়ী যথাযথভাবে তাদের রেখাগুলি বিন্যস্ত হবে। অক্ষরগুলির আকৃতি সমান হবে। অক্ষরের প্রকৃতি অনুযায়ী কলমের চাপ পড়বে কোথাও বেশী, কোথাও কম। মনে রাখতে হবে যে, শব্দের মধ্যে বর্ণগুলির অবস্থান বিছিন্নভাবে নয়,—অক্ষরগুলির পরস্পর সমন্বয় সামগ্রিকভাবে একটি শব্দ গড়ে তুলে সেদিকে তাকিয়ে হাতের লেখাকে পরিচালিত ক'রতে হবে। হাতের লেখার মধ্যে প্রতিটি অক্ষর ও বর্ণের নিয়মিত মাত্রা থাকলেও তা নিয়মমত হবে। এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। হাতের লেখা হবে নীচু শ্রেণীতে *rule*-টানা কাগজের সুনির্দিষ্ট ছকে ঘরগুলি নিয়মমাফিক ভর্তি ক'রে ; আর উঁচু শ্রেণীতে কল্পিত লাইনের ভিত্তিতে বর্ণ ও অক্ষরগুলির আকৃতির সমানুপাতের ভিত্তিতে। এ বিষয়ে সংস্কৃতে একটি সুন্দর শ্লোক আছে।

"সমানি সমশীর্ষাণি ঘনানি বিরলানি চ।
অব্যাকুলিত মাতানি যো বৈ লিখতি লেখকঃ ॥"

—অর্থাৎ, 'অক্ষরগুলি সমান আকৃতির হবে. অক্ষরগুলির মাত্রা (শীর্ষ) একই *line*-এ থাকবে, শব্দগুলির মধ্যেকার অক্ষরগুলি পরস্পর ঘনসন্নিবিষ্ট হবে, শব্দগুলির মধ্যে ব্যবধান থাকবে এবং মাত্রাগুলি *uniform* (অব্যাকুলিত) হবে।"—এইসব গুণ থাকলেই তো ভালো হাতের লেখা বলে গণ্য হবে। মনে রাখতে হবে যে,—একটি শব্দের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণ বা অক্ষর পরস্পরের কাছাকাছি থাকবে, কিন্তু পাশাপাশি অবস্থিত দুটি শব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যবধান বা দূরত্ব থাকবে।

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় হাতের লেখা শিক্ষাদানের **বর্ণক্রম-পদ্ধতি** ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ; এই পদ্ধতির জনপ্রিয়তাও কম নয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ পরম্পরায় একটির পর একটি বর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ বইখানা সম্পূর্ণ ক'রলে শিক্ষার্থীদের শব্দ লেখানো অভ্যাস করানো হয়,—তারপর বাক্য ও পরে অনুচ্ছেদ ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে শ্লেটের উপর শিক্ষার্থীদের একটি বিশেষ বর্ণ লিখে দেওয়া হয়। তারা একটি পেন্‌সিল নিয়ে তার উপর দাগ টানতে থাকে। এইভাবে

একটি আদর্শ স্থানীয় বর্ণের লিপি থেকে শিক্ষার্থীরা বর্ণ অনুসারে হাতর লেখা শিক্ষা করে। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অমনস্তাত্ত্বিক। কারণ, অর্থহীন বিভিন্ন বর্ণের শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ, আকর্ষণ ও আনন্দ অনুভব করে না। লেখা যেন তাদের উপরে, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ভাষার অর্থবোধকে বাদ দিয়ে কতকগুলি নীরস, অর্থহীন, জড় বর্ণ লেখার মতো কৃত্রিমতা ও অযৌক্তিকতা আর কি আছে! কোন একটি নির্দিষ্ট অক্ষরের উপর পরপর দাগ টানার ফলে অচিরেই বর্ণটির *shape* নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বর্ণগুলির যথাযথ রেখাবিন্যাস শিখতে পারে না। কিন্তু এত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই পদ্ধতির প্রচলন আছে। কিন্তু যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারলে এই পদ্ধতির মাধ্যমেও শিক্ষার্থীরা ভালো হাতের লেখা শিখতে পারে। শিক্ষার্থীরা যদি বালি বা ধুলির মধ্যে আঙ্গুলি চালনা ক'রে বর্ণ শেখে, যদি তেঁতুলবীচি দিয়ে প্রতিটি বর্ণ ঠিকমত রচনা করতে পারে, যদি কাঠের তৈরি বিভিন্ন বর্ণের রঙিন হরফ তাদের হাতে খেলনার মতো তুলে দেওয়া যায়, তবে এই পদ্ধতি বহুলাংশে সার্থক হতে পারে। কারণ খেলাচ্ছলে শিক্ষা-গ্রহণের ফলে তাদের হাতের লেখা সার্থকভাবে আয়ত্ত হয়। শিক্ষা আকর্ষণীয় হয়। শিক্ষার্থীরা পেশী-সঞ্চালন ও পেশীনিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে আয়ত্ত করে। তারা প্রতিটি বর্ণের রেখা-বিন্যাস ও টান সম্বন্ধেও যথাযথভাবে অবহিত হয়। প্রতিটি হরফের সঙ্গে তাদের চোখের অনুষঙ্গ (*Association*) ঘটে। তাই যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারলে বর্ণক্রমও হাতের লেখা শিক্ষাদানের একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি।

হাতের লেখা শেখানোর বর্ণক্রম পদ্ধতি

হাতের লেখা শিক্ষাদানের অন্যতম পদ্ধতি হ'ল **ভাষাক্রম পদ্ধতি**। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা প্রথমে মৌখিকভাবে ভাষা আয়ত্ত করে। ভাষা-ব্যবহারের কৌশল ও ভাষার ভাব বা অর্থ সম্বন্ধে শিশু কিছুটা সচেতন হ'লে হাতের লেখা শিক্ষাদান শুরু হয়। শুরু হয় প্রথমে শব্দ, পরে বাক্য ও ভাষা। প্রথমে শিক্ষার্থীরা সহজ সহজ শব্দ শেখে; এমন সব শব্দ শেখে যার সঙ্গে তার প্রাণের সম্পর্ক আছে,—অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ আছে। মা, বাবা, মামা, কাকা, দাদা, দিদি, কাকী, মামী, পিসি, ভাত, মাছ, হাত, পা, চাঁদ প্রভৃতি শব্দগুলি সম্বন্ধে শিশুর ধারণা অত্যন্ত সহজেই জন্মে এবং বেশ কম বয়সেই জন্মে। এখান থেকেই হাতের লেখা শেখানো শুরু করতে হবে। এই পদ্ধতি শিক্ষাতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে হাতের লেখায় উৎসাহিত করে, লেখার সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক স্থাপন করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শব্দ শেখবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতীকদ্যোতকতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারে। ভাষা-ব্যবহারের মাধ্যমে, অর্থের আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে হাতের লেখা শেখা হয় বলে তা তাদের মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়, কাজেই হাতের লেখা শেখানোর ক্ষেত্রে ভাষাক্রম-পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। লেখার মধ্য দিয়ে ভাষা ও শব্দ আয়ত্ত হয়ে গেলে তার পর বিভিন্ন বর্ণ সম্বন্ধে ধারণা দিতে বেশী সময় লাগবে

হাতের লেখা শেখানোর ভাষাক্রম পদ্ধতি

না। এতে শিক্ষার্থীরা প্রতিটি শব্দের মধ্যস্থিত অক্ষরগুলির পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবহিত হয়। ফলে, হাতের লেখা শিক্ষাও সার্থক হয়।

হাতের লেখা শেখানোর **প্রাথমিক পর্যায় (Primary Stage)** হ'ল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই পর্যায়েই শিক্ষার্থী পেশী-নিয়ন্ত্রণ ও পেশী-সঞ্চালন আয়ত্ত করে। বর্ণগুলির যথাযথ রেখাবিন্যাস আয়ত্ত করে। এই সময়ই তাদের চোখে ও মনে যদি প্রতিটি বর্ণ, অক্ষর ও শব্দের চিত্ররূপ গেঁথে যায়, তবে তা পরবর্তী কালে হাতের লেখায় বিশেষভাবে সাহায্য করে। প্রতিটি বর্ণের মূল কথা হ'ল তার রেখা-বিন্যাস ; এই রেখা কখনও সরল, কখনও বৃত্তাকার বা অর্ধবৃত্তাকার। শিক্ষার্থীরাও কয়লা বা চক পেলে মেঝেতে বা শ্লেটে, পেনসিল বা কলম পেলে কাগজে হিজিবিজি রেখা টানতে ভালবাসে। তাদের এই মৌলিক প্রবণতাকে হাতের লেখা শেখানোর কাজে ব্যবহার ক'রতে হবে। শিক্ষার্থীরা মেঝেতে, শ্লেটে বা কাগজে চক-পেন্সিল বা কলম দিয়ে এলোমেলো অর্থহীন হিজিবিজি রেখা টানবে। তাদের এইরূপ রেখা টানবার সুযোগ ক'রে দিতে হবে। ধীরে ধীরে এই রেখাটানাকে হাতের লেখা শেখানোর কাজে ব্যবহার ক'রতে হবে। তারা সরল রেখা টানবে, বৃত্তাকার বা অর্ধবৃত্তাকার রেখা টানবে। এতেই তারা হাতের লেখার প্রাথমিক কৌশল আয়ত্ত ক'রবে। কলম ইত্যাদি ধরবার কৌশল আয়ত্ত ক'রবে, পেশী-সঞ্চালনের অভ্যাস ক'রবে। ফলে, ধীরে ধীরে তারা লিখবার উপযোগী হ'য়ে গড়ে উঠবে। তারপর ধীরে ধীরে তাদের হাতের লেখার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এই সময় সাধারণ বস্তুকে অবলম্বন ক'রে চিত্রাঙ্কন ক'রতে উৎসাহ দিলে সেখান থেকেও ভাল ফল পাওয়া যায়। তারা ছবি আঁকবে এবং তার মধ্য দিয়ে রেখা-বিন্যাসের দক্ষতা অর্জন ক'রবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-প্রকাশের কৌশলও আয়ত্ত ক'রবে। বালি বা ধূলির উপর আঙুল দিয়ে বিভিন্ন বর্ণের লিপি আঁকতে দিতে হবে, তেঁতুলবীচি প্রভৃতি দিয়ে খেলাচ্ছলে বর্ণের প্রতিরূপ তৈরির সুযোগ দিতে হবে। বিদ্যালয়ে জানালার সমান উঁচু পর্যন্ত চার দেওয়ালেই সিমেন্টের *black board* তৈরি ক'রে দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে সাদা ও রঙিন চক দিতে হবে। তারা তাদের ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী ছবি আঁকবে, রেখা টানবে ও বিভিন্ন কথা লিখবে। শিক্ষক মহাশয় এগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রবেন এবং ভালো হাতের লেখা গড়ে তুলবার জন্য এগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার ক'রবেন। লেখার সময় শিক্ষার্থীরা কলম, পেনসিল, কাগজ, শ্লেট প্রভৃতি যেসব উপকরণ ব্যবহার ক'রবে, সেগুলি যেন লেখার কাজে কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। শিক্ষার্থীদের খেলাচ্ছলে হাতের লেখা শিক্ষা দিতে হবে, এবং লেখার মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি ক'রতে হবে। তাদের হাতে কাঠের তৈরি বিভিন্ন বর্ণের রঙিন হরফ তুলে দিলে তারা তা নিয়ে নাড়াচাড়া করবে, বিভিন্ন ভাবে সাজিয়ে খেলা করবে ; তাতে প্রতিটি বর্ণের চিত্ররূপ তাদের মনে গেঁথে যাবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে হাতের লেখা শেখানো

শিক্ষার্থীরা যাতে যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে হাতের লেখার অনুশীলনে ব্যাপ্ত হয়, তার দিকে সতর্ক থাকতে হবে।

হাতের লেখা শিক্ষার ব্যাপারে **আদর্শ লিপির (Copy Book)** ব্যবহার আছে। কিন্তু আদর্শলিপি ধ'রে হাতের লেখা শেখানোর যতখানি গুরুত্ব ইংরেজীর ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, ততখানি গুরুত্ব বাংলার ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না। বাংলা ভাষায় আদর্শলিপিরও অভাব আছে। আদর্শলিপি অনুযায়ী হাতের লেখা অভ্যাসের জন্য নির্দিষ্ট রুল-টানা কাগজ চাই। কামাদের দেশে ইংরেজী লিপি অভ্যাসের রুলটানা কাগজ ও খাতা বাজারে পাওয়া যায়, বাংলা ভাষার জন্য পাওয়া যায় না। এ ছাড়া এ পদ্ধতিও হাতের লেখা শেখানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে বৈজ্ঞানিক নয়। এতে শিক্ষার্থীরা সত্যিকারের টানা হাতের লেখার কৌশল আয়ত্ত করতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের সঠিক রেখা-বিন্যাস মাত্রা সম্বন্ধে আয়ত্ত করতে ও বর্ণের চিত্ররূপকে চোখের সঙ্গে অনুষঙ্গ করতে এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী। এ প্রসঙ্গে **হস্তাক্ষর লেখার** কথাও বলা যায়। আদর্শলিপি দেখে হস্তাক্ষর লেখানোর ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে আছে। শিক্ষার্থীরা যাতে যথাযথভাবে যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুন্দর ও সুস্পষ্ট ও নির্ভুল ক'রে হস্তাক্ষর লেখে তার উপর জোর দিতে হবে। হাতের লেখা শেখানোর ক্ষেত্রে আদর্শলিপিকে ব্যবহার করতে হবে এবং হস্তাক্ষরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতের লেখার অনুশীলনে উৎসাহী করতে হবে।

আদর্শলিপি ও হস্তাক্ষর

শিক্ষার্থীরাভাষা-শিক্ষা ও হাতের লেখার ক্ষেত্রে একটু এগিয়ে গেলে তখন **হাতের লেখার জন্য সঠিকভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচন ক'রতে হবে।** বিষয়বস্তুটি যেন শিক্ষার্থীদের কাছে লেখবার জন্য গ্রহণযোগ্য হয়। বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের রুচি, চাহিদা, যোগ্যতা, মানসিকতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী হবে। বিষয়বস্তুটি সরল ও আকর্ষণীয় হবে। লেখবার বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ থেকে ক্রমশঃ কঠিন হবে। হাতের লেখার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব যে কম নয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বিষয়বস্তু নির্বাচন

হাতের খেলা ও বানান-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে **শ্রুতলিখন (Dictation)** একটি বিশেষ কার্যকরী পদ্ধতি। ভাষা-ব্যবহার ও হাতের লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কিছুদূর অগ্রসর হ'লে তবেই শ্রুতলিখন আরম্ভ করতে হবে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক মহাশয় কোন একটি অংশ স্পষ্ট ক'রে ধীরে ধীরে পড়ে যাবেন, তা শুনে শুনে শিক্ষার্থীরা তা খাতায় লিখবে। লেখার পূর্বে শিক্ষক মহাশয় বিষয়টি একবার পড়ে দেবেন,—বিষয়টির ভাবও একটু বুঝিয়ে দেবেন। কঠিন শব্দ থাকলে সেটি বোর্ডে লিখে ব্যাখ্যা করে দেবেন। তারপর সেটিকে মুছে শ্রুতলিখন শুরু করবেন। শ্রুতলিখনের ক্ষেত্রে বিষয়টি বার বার পড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। একবার ধীরে ধীরে স্পষ্ট ক'রে শিক্ষার্থীদের লেখবার উপযোগী ক'রে বলে দিলেই চলবে। বলবার সময় উচ্চারণ স্পষ্ট হবে। যতিচিহ্নস্থাপনের কথা যথাস্থানে বলে দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষক মহাশয়ের পড়া শুনে

শ্রুতলিখন

নিজেদের খাতায় লিখে যাবে। এই লেখা স্পষ্ট, নির্ভুল ও সুন্দর হবে। লেখার মধ্যে প্রতিটি বর্ণ, অক্ষর ও শব্দ স্পষ্ট হবে,—বানান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে লেখা নির্ভুল হবে;—লেখার মধ্য দিয়ে শিল্প ও সৌন্দর্য প্রকাশিত হবে। শ্রুতলিখনের খাতাগুলিকে শিক্ষকমহাশয় সহানুভূতি ও নিষ্ঠার সঙ্গে দেখে দেবেন।

প্রতি ভাষাতেই ভাবপ্রকাশের জন্য কতকগুলি চিহ্ন থাকে। এগুলিকে **যতিচিহ্ন** বলে। কমা (,), পূর্ণচ্ছেদ (।), প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?), বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!), সেমিকোলন (;) প্রভৃতি চিহ্নগুলি ভাষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। লেখার সময় ঠিক স্থানে ঠিক চিহ্নটি বসাতে হবে। তা না হ'লে ভাষার অর্থ ও ভাবগ্রহণের ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। 'আপনি আমার বাড়ী আসিবেন, না আসিলে দুঃখ পাইব।" এবং "আপনি আমার বাড়ী আসিবেন না, আসিলে দুঃখ পাইব।" এই দুটি উদাহরণে কমা-চিহ্নটি একটু স্থান-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। কাজেই হাতের লেখা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের **যতিচিহ্ন-স্থাপন (Punctuation)** শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা প্রতিটি যতিচিহ্নের রেখা-বিন্যাস আয়ত্ত করবে এবং কোন্ চিহ্ন কোন্ স্থানে বসে তাও জানবে। তারপর লেখার সময় সেগুলিকে যথাযথ স্থানে ব্যবহার করবে। হাতের লেখার মধ্যে শিক্ষার্থীরা যাতে যতিচিহ্ন স্থাপন করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

যতিচিহ্ন স্থাপন

ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাগ্রহণের সময় শিক্ষার্থীদের হাতের লেখার উপর জোর দেওয়া খুবই প্রয়োজন। যথাযথ যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে ব্যাপক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে হাতের লেখাকে আয়ত্ত করতে হয়। বিদ্যালয়ে তাদের সে সুযোগ দিতে হবে, এবং শিক্ষকও তার জন্য যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা, চেষ্টা-চরিত্র ও পরিশ্রম করবেন। হাতের লেখার অভ্যাস ও অনুশীলন নিয়মিত হবে। প্রতিদিনের শিক্ষাগ্রহণ কার্যক্রমের একটি অংশ জুড়ে থাকবে হাতের লেখা। অনেকের হাতের লেখার নিজস্ব **style** আছে। হাতের লেখার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে যথাযথ রেখে সৌন্দর্য ও নিজস্বতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেউ যদি কোন *style*-এর পথ ধরে তো বলবার কিছুই নেই। কিন্তু *style*-এর নাম ক'রে হাতের লেখাকে দুর্বোধ্য করে তুলবারও কোন যুক্তি নেই। চোখের দৃষ্টি ও মনোযোগ হাতের লেখার জন্য প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিশক্তি ও মনোযোগ-একাগ্রতার উপর লক্ষ্য রেখেই হাতের লেখার অভ্যাস ও অনুশীলন শিক্ষা দিতে হবে।

মন্তব্য

॥ অনুশীলনী ॥

১। কিভাবে অক্ষর-পরিচয় আরম্ভ করা উচিত? লেখন কখন শিখাইবে? (কলি বিশ্ব., বি টি. ১৯৪৬)

২। হাতের লেখা কি করিয়া শেখানো যায়? এবিষয়ে শ্রুতি-লিখনের স্থান কোথায়?
(কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৫০)

৩। হাতের লেখা শিখাইবার উদ্দেশ্য কি? কি করিয়া ইহা শেখানো যায়? এবিষয়ে শ্রুতিলিখনের স্থান কোথায়? (কলি. বিশ্ব., বি. টি, ১৯৫৫)

৪। বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের কার্যতালিকায় 'শ্রুতিলিখন' ব্যবস্থা থাকিবার কারণ কি? বানান শিখাইতে কিরূপ 'শ্রুতিলিখন পদ্ধতি' অবলম্বন করিবেন, তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া আলোচনা করুন।
(বর্ধমান বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৩)

৫। শিশুদের লিখন-বৈশিষ্ট্য আলোচনাপূর্বক তাহাদের হস্তলিপি অনুশীলন কিভাবে করানো যায়, তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করুন। (কল্যাণী বিশ্ব., বি. এড. ১৯৬৭)

পঞ্চদশ অধ্যায়

অনুবাদ

[Translation]

অনুবাদ সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। দেশী-বিদেশী বহু ভাষা ও সাহিত্য থেকে বাংলাভাষার বহু কাব্য-নাটক-উপন্যাস অনূদিত হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। অনুবাদ তাই আজ বাংলা ভাষার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা। মধ্যযুগেই কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাস ওঝা মহাভারত রামায়ণের অনুবাদ ক'রেছিলেন। চৈতন্য ভাগবতেরও অনুবাদ (কৃষ্ণদাস কবিরাজ) হ'য়েছে এই মধ্যযুগেই। সমস্তই সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী ভাষা-চর্চা ও অনুশীলনের সূত্রপাত হয়। তখন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে অনুবাদের প্রবণতা দেখা দেয়। মধুসূদন দত্ত 'নীলদর্পণ' (দীনবন্ধু মিত্র) নাটকের ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'ম্যাকবেথ' (শেক্সপীয়ার) নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নৈবেদ্য', খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি' ও 'গীতিমাল্য' থেকে বিভিন্ন কবিতা ও গান সংকলন ক'রে ইংরেজীতে তার অনুবাদ করেন। এই সংকলনের নাম হয় 'গীতাঞ্জলি'। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদ নোবেল পুরস্কার পায়। এই সময় 'মেঘদূত' অনূদিত হয় বাংলা-ভাষায়—অনুবাদক বুদ্ধদেব বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি কবি ও লেখকগণ। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের কাব্য কবিতার সার্থক অনুবাদ করেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। পরবর্তী কালে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনেক গল্প-উপন্যাস-কবিতা বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। কবি মনীন্দ্র রায় শেক্সপীয়ারের সনেটগুলির সার্থক বাংলা অনুবাদ করেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তা সত্ত্বেও আমাদের অনুবাদ-সাহিত্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয় ; তাই এ সম্বন্ধে আরও চিন্তা-ভাবনা করবার প্রয়োজন আছে।

বাংলা অনুবাদ-সাহিত্য

ব্রিটিশ আমলে ইংরেজী ভাষার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীই ছিল মাধ্যম ; ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় ইংরেজীর মাধ্যমে পড়াশুনা ক'রতে হ'ত। দেশীয় ভাষাগুলি তখন সার্থক ভাবে বিকশিত হয় নি। বাংলা গদ্য-সাহিত্য তার যাত্রাপথ শুরু করে বিদেশীদের আনুকূল্যেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেবাদের প্রশাসন-যন্ত্রকে চালু রাখতে শিক্ষিত কিছু কেরানীকুলের প্রয়োজন ছিল। তাই সে যুগে শিক্ষা-ব্যবস্থাও সে-অনুযায়ী পরিচালিত হ'ত। তাই ইংরেজী থেকে মাতৃভাষায় অনুবাদেরও প্রয়োজন ছিল। এক সময় বাংলা ভাষার প্রশ্নপত্রও ইংরেজীতে করা হ'ত। পাঠ্যক্রমের মধ্যে তখন ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদের স্থান ছিল অবধারিত। ইংরেজ আমলে দেশীয় ভাষাগুলিকে বিকশিত করবার বিশেষ প্রচেষ্টা হয় নি। শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেশীয়

ব্রিটিশ আমলে অনুবাদ শিক্ষা

ভাষার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তাই ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য, ইংরেজী ভাষাকে বোঝাবার জন্যই পাঠ্যক্রমে ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদকে স্থান দেওয়া হ'য়েছিল।

মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবাদ অপ্রয়োজনীয় বলে অনেকে মনে করেন। নীচু শ্রেণীগুলিতে অনুবাদ-শিক্ষা সম্ভব নয়। যখন দু'টি ভাষাতে দক্ষতা অর্জিত হয়, তখনই অনুবাদ শুরু করা যেতে পারে। নীচু শ্রেণীগুলিতে শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষা-ব্যবহারে দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ত ক'রতেই ব্যস্ত। কাজেই এ সময় বিদেশী ও অজানা ভাষা থেকে অনুবাদ-শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। বিদ্যালয়ের উঁচু শ্রেণীগুলিতে ও মাতৃভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবাদ শুধু মাত্র অপ্রয়োজনীয় নয়, ক্ষতিকর বলেই অনেকে মনে করেন। বিদেশী ভাষা স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের কাছে কঠিন ও আকর্ষণহীন বলে মনে হয়। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করাও অপেক্ষাকৃত শক্ত। তাই অনুবাদ ক'রতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা অসুবিধায় পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে তারা মূল ভাষাটির বিভিন্ন শব্দের অর্থই জানে না। তাছাড়া, মনস্তাত্ত্বিক কারণেও শিক্ষার্থীরা অনুবাদ ক'রতে চায় না। অনুবাদের সঙ্গে বাস্তব জীবনের বিশেষ যোগ প্রয়োজন। অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনে ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে লক্ষ্য করে না। তাই অনুবাদ তাদের কাছে আনন্দহীন, আকর্ষণহীন হয়ে দেখা দেয়;—অনুবাদকে তারা তাদের উপর চাপিয়ে-দেওয়া বলেই মনে করে। বিষয়টি তাদের কাছে ক্লান্তিকর মনে হয়। তাই মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবাদকে অপ্রয়োজনীয় ও অনিষ্টকর বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই কথা সর্বাংশে সত্য নয়। অনুবাদ নীরস ও জটিল হ'তে পারে, কিন্তু তা ভাষা-শিক্ষার পক্ষে একেবারে অনাবশ্যক নয়। অনুবাদের মধ্য দিয়েও বিশেষ বিশেষ ভাবে শিক্ষার্থীরা ভাষা-ব্যবহারের কৌশল ও দক্ষতা অর্জন করে। ফলে, ভাষাজ্ঞান আয়ত্ত হয়। অনুবাদের মধ্য দিয়ে অন্য ভাষার সাহিত্য-সৃষ্টি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প-সৌন্দর্য-চর্চা আমাদের ভাষায় নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়। অনুবাদের মধ্য দিয়ে অন্য ভাষার শব্দসম্পদ ও গঠন-প্রক্রিয়া আমাদের ভাষার মধ্যে অনুপ্রবেশ ক'রে ভাষাকে আরও সমৃদ্ধিশালী ক'রে তোলে। বিশেষ ক'রে **বাংলা ভাষার মতো একটি বিকাশমান ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী ক'রতে হ'লে অনুবাদ প্রয়োজন**। মাতৃভাষা-শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে অনুবাদ-শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মাতৃভাষা শিক্ষা ও অনুবাদ

বিদেশী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবাদ অপরিহার্য। পরিচিত পরিবেশের মধ্য থেকে ব্যক্তি স্বাভাবিক ভাবেই মাতৃভাষা আয়ত্ত করে। কিন্তু বিদেশী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সে সুযোগ নেই বলে পঠন-পাঠনের মাধ্যমেই বিদেশী ভাষা শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে অনুবাদ অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। বিদেশী ভাষায় কোন শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ বা রচনাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে গ্রহণ ক'রতে না পারলে সে সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট (*Clear concep-*

বিদেশী ভাষা শিক্ষার অনুবাদ অপরিহার্য

tion) হওয়া সম্ভব নয়। কারণ **মননের প্রক্রিয়া মাতৃভাষাতেই কাজ করে।** বিদ্যালয়-স্তরে বিদেশী ভাষা শিক্ষা ও আয়ত্ত ক'রতে হ'লে অনুবাদ অপরিহার্য।

সামগ্রিক ভাবে বিচার ক'রলে শিক্ষাক্ষেত্রে অনুবাদ-চর্চাকে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার ক'রতে হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুবাদ-চর্চার এই প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় ;—

॥ এক। ব্যবহার ॥

জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনুবাদ-চর্চার গুরুত্ব অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যেসব বিচিত্র ঘটনা ঘটছে, তার খবর সংগ্রহ ক'রে দেশের মধ্যে প্রচার করবার সময় অনুবাদের প্রয়োজন হয়। অনুবাদ তাই সাংবাদিকদের বিশেষ প্রয়োজনে লাগে। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে গিয়ে অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দেয়। দো-ভাষীকে ভাল অনুবাদ জানতে হয়।

॥ দুই। শিক্ষা ॥

আমাদের মাতৃভাষা এখনও একটি দুর্বল ভাষা। ব্রিটিশ আমলে অবহেলিত বাংলা ভাষার সার্থক বিকাশ আজও সম্ভব হয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্য পুস্তকই আমাদের ভাষায় নেই। তাই অনুবাদ ক'রে বিদেশী ভাষার বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তক রচনা ক'রতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি বিবর্তনের পথে অনেক এগিয়ে গেছে। সে তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। তাই অনুবাদ ক'রে আমাদের সে অভাব পূর্ণ ক'রতে হবে।

॥ তিন। ভাষা-সমন্বয় ॥

যে কোন গতিশীল ভাষার উপরই দেশী-বিদেশী বহু ভাষার প্রভাব থেকে যায়। অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ, বাগ্ধারা ও বাক্যগঠন-কৌশল গ্রহণ ক'রে ভাষা সমৃদ্ধ হয়। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষাও দেশী-বিদেশী ভাষা থেকে বহু শব্দকে গ্রহণ করে তার শব্দ-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রেছে। অন্যান্য ভাষার শিল্পরীতি; গঠন-রীতি, আঙ্গিক, কলা-কৌশল, *Style* প্রভৃতি বাংলাভাষাকে প্রভাবান্বিত ক'রেছে। ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী ও গতিশীল ক'রতে তাই অনুবাদের প্রয়োজন আছে।

॥ চার। সংস্কৃতি-সমন্বয় ॥

অনুবাদের মধ্য দিয়ে এক ভাষার সংস্কৃতিগত সম্পদ অন্য ভাষা গ্রহণ ক'রতে পারে। অনুবাদের মধ্য দিয়ে আমরা অন্য ভাষায় লেখা শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদিকে বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত ক'রতে পারি। অন্য ভাষায় লেখা বিভিন্ন জাতির চিন্তার ফসল, মনীষীদের রচনা, উল্লেখযোগ্য পুস্তকের বিষয়বস্তু, সাংস্কৃতিক চিন্তাধারাকে আমরা অনুবাদের মাধ্যমে নিজেদের ভাষার সম্পদে পরিণত ক'রে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালী ক'রতে পারি।

উল্লিখিত বিভিন্ন কারণে অনুবাদ-চর্চার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অস্বীকার করা যায়

না। বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-এর অভাব আছে। তাই অনুবাদ ক'রে আমাদের সে দৈন্য কাটাতে হবে। সেজন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেও অনুবাদ-শিক্ষাকে গ্রহণ ক'রতে হবে, ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবাদকে গুরুত্ব দিতে হবে,—মাতৃভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনুবাদ-শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে।

অনুবাদ সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। অনুবাদের মাধ্যমে অন্যভাষা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন চিন্তাধারা আমরা আমাদের ভাষায় গ্রহণ ক'রতে পারি, অন্য ভাষার শব্দ ও গঠন-কৌশলকে গ্রহণ ক'রে আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী ক'রতে পারি। কিন্তু বিদ্যালয়-স্তরে মাতৃভাষার পাঠ্যক্রমে অনুবাদের স্থান নেই। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্য বাংলা থেকে ইংরেজী রচনা করবার ব্যবস্থা পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পাঠ্যক্রমে ইংরেজী থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ ক'রবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রচলিত পাঠ্যক্রমে বিদ্যালয়ে অনুবাদ-শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয় নি। ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ ক'রবার আরও কিছু ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পঠন-পাঠনের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত হ'লে ভাল হ'ত। ইংরেজী হ'ল আন্তর্জাতিক ভাষা, বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী ভাষা। কাজেই সেই ভাষা থেকে অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ের চিন্তাধারা আমাদের ভাষায় গ্রহণ ক'রবার সুযোগ বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের মধ্যে স্থান দিলে ভাল হ'ত। তাতে শিক্ষার্থীদের মনে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উচ্চতর ক্ষেত্রে উন্নতি হওয়ার ভিত্তি স্থাপিত হ'ত। সুখের কথা, ১৯৭৪ থেকে যে নতুন পাঠ্যক্রম প্রচলিত হয়েছে, তাতে অনুবাদ স্থান পেয়েছে।

বাংলা ভাষায় প্রচলিত পাঠ্যক্রমের অনুবাদের স্থান নেই

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ ক'রবার কতকগুলি **বাস্তব অসুবিধা** আছে। অনুবাদ ক'রতে গেলে সংশ্লিষ্ট দুটি ভাষাতেই যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যে ভাষা থেকে মাতৃভাষায় কোন বিষয়কে অনুবাদ করা হবে, সে ভাষা যদি ভাল ক'রে জানা না থাকে, কোন শব্দের অর্থ যদি অজানা থাকে, সেই ভাষার গঠন-রীতি ও সাধারণ ব্যাকরণ যদি জানা না থাকে, তবে অনুবাদের সময় অসুবিধা হয়। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ আছে ; প্রত্যেক ভাষারই শব্দ-বৈচিত্র্য ও গঠন-প্রক্রিয়া আছে। অনুবাদ ক'রতে সে ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়, কারণ অনুবাদের সময় দু'টি ভাষারই নিজস্বতা বজায় রাখতে হবে। '*100% pure*' অনুবাদ ক'রতে হবে—'ষোল আনা খাঁটি'। তাছাড়া প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচন আছে। বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচনে সমাজ-জীবনের প্রভাব পড়ে ; সমাজ-জীবনের বহু ঘটনা ও লৌকিক কাহিনী বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে প্রতিফলিত, এগুলি অনুবাদের সময় অসুবিধা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদের সময় বাগ্‌ধারা বা প্রবাদ-প্রবচনের অর্থযুক্ত শব্দ পাওয়া যায় না ; অনুরূপ বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচন আমাদের ভাষাতেও নেই। অনেক *Technical* শব্দ, নাম, স্থান প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত না থাকলে

অনুবাদের অসুবিধা

অনুবাদে বিভ্রান্তি আসে। *Livingstone*-এর অনুবাদ তখন ভুল ক'রে হয় 'জীবিত পাথর'। চলতি ভাষায় লেখা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত ক'রবার সময়ও অসুবিধা দেখা দেয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় অন্য ভাষায় বিষয়বস্তু ও ভাব যথাযথ-ভাবে রূপান্তরিত ক'রবারও অসুবিধা দেখা দেয়। অনুবাদের এই সব অসুবিধার কথা মনে রেখেই বিদ্যালয়ে অনুবাদ শিক্ষা দিতে হবে। অনুবাদের শিক্ষাদান-পদ্ধতি এমন-ভাবে নির্ধারিত হবে, যাতে এইসব অসুবিধা দূর ক'রে শিক্ষার্থীদের যথার্থ ভাবেই অনুবাদ শিক্ষা দেওয়া যায়।

॥ **অনুবাদ শিক্ষাদান** ॥

অনুবাদ-শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার ক'রে বিদ্যালয়ে অনুবাদকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূত ক'রতে হবে ; বিদ্যালয়ের সময়-তালিকা ও পরীক্ষার ক্ষেত্রেও অনুবাদকে নির্দিষ্ট স্থান দিতে হবে। অনুবাদ-শিক্ষাদান একটি জটিল ব্যাপার। কারণ এ ক্ষেত্রে দু'টি ভাষারই যথেষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। তাই অন্তঃপক্ষে দু'টি ভাষাতে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জিত না হ'লে অনুবাদ-শিক্ষাদান শুরু করা উচিত নয়। শিক্ষার্থীরা প্রথমে বিভিন্ন শব্দের অনুবাদ ক'রে তার প্রতিশব্দ জানবে, এবং শব্দের প্রতীকদ্যোতকতা সম্বন্ধে সচেতন হবে। তারপর ছোট ছোট বাক্যাংশ ও বাক্য অনুবাদ ক'রে দু'টি ভাষার গঠন-প্রকৃতির তুলনামূলক ধারণা ক'রবে। তারপরে তারা সহজ সহজ অংশের অনুবাদ ক'রতে শিখবে। ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণীর পূর্বে বিষয়বস্তুর অনুবাদ শিক্ষা দেওয়া শুরু করা যায় না, কারণ তখন পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা দু'টি ভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন ক'রতে পারে না। তারপর ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম শ্রেণী ইংরাজী *Text Book* থেকেই বিভিন্ন অংশ অনুবাদ ক রবে। পরে অনুবাদের বিষয়বস্তু ক্রমশঃ জটিল হবে। শ্রেণীকক্ষে অনুবাদ শিক্ষাদান করবার সময় শিক্ষক মহাশয় নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন ক'রবেন—

অনুবাদ-শিক্ষাদান পদ্ধতি

॥ **এক** ॥ অনুবাদের জন্য নির্বাচিত অংশটি পড়ে দেবেন, এবং তার ভাবও সাধারণভাবে ব্যাখ্যা ক'রে দেবেন।

॥ **দুই** ॥ কঠিন শব্দ, বাগ্‌ধারা, *Technical* শব্দ ও মূল অংশের কঠিন স্থান-গুলির অর্থগুলি বোর্ডে লিখে দেবেন।

॥ **তিন** ॥ অনুবাদের সময় শিক্ষার্থীদের অভিধান ব্যবহার ক'রতে দেবেন।

॥ **চার** ॥ মূল অংশের মধ্যে চলিত ভাষা থাকলে বা প্রয়োগরীতির বৈচিত্র্য ও জটিলতা থাকলে সে জায়গাগুলি নির্দেশ ক'রে শিক্ষার্থীদের অনুবাদ ক'রতে সাহায্য করবেন।

॥ **পাঁচ** ॥ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা অনুবাদ ক'রবে। শিক্ষক মহাশয় ঘুরে ঘুরে দেখবেন,—তাদের অনুবাদ-কার্যে সাহায্য ক'রবেন।

॥ **ছয়** ॥ শিক্ষক মহাশয় সহানুভূতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের খাতাগুলি সংশোধন ক'রে দেবেন।

অনুবাদ ক'রবার আনুষঙ্গিক কতকগুলি কার্য শিক্ষার্থীদের ক'রতে হবে। তারা

যথাযথভাবে অভিধান ব্যবহার করতে শিখবে। বিদ্যালয়ের পাঠাগার থেকে অনুবাদের কতকগুলি ভালো বই তারা পড়বে, সেই সঙ্গে মূল ভাষায় লেখা বইটিও পড়বে। তখন তারা সার্থক অনুবাদের কৌশল আয়ত্ত ক'রবে। শ্রেণীকক্ষের বাইরেও শিক্ষার্থীদের অনুবাদের অনুশীলন ক'রতে হবে। অনুবাদের জন্য যে অংশটি নির্ধারিত হবে, তা যেন শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি ও যোগ্যতা অনুযায়ী হয়;—তাদের কাছে বিষয়বস্তু কোন আকর্ষণীয় ও আনন্দময় হয়। হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বের উপর নির্ভর ক'রে পঞ্চসোপান-পদ্ধতিতে পূর্বপরিকল্পিত পাঠটীকা অনুযায়ী অনুবাদ শিক্ষা দিতে হবে। অনুবাদ-কর্মে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত ক'রতে হবে। সাহিত্যের প্রতি শিক্ষার্থীদের অনুরাগ বাড়িয়ে তুলতে হবে। শিল্প-সাহিত্যের প্রতি যথার্থ অনুরাগ শিক্ষার্থীদের অনুবাদ-চর্চায় উৎসাহিত ক'রবে।

অনুবাদ প্রধানতঃ তিন প্রকার; (১) **আক্ষরিক অনুবাদ**, (২) **ভাবানুবাদ**, (৩) **রসানুবাদ**

শব্দার্থকে বিশদভাবে অনুসরণ ক'রে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত ক'রবার প্রক্রিয়া যে **আক্ষরিক অনুবাদ**, তা শিল্প-সাহিত্যের বিচারে উৎকৃষ্ট নয়। কারণ, অনুবাদ এখানে শব্দার্থক্রমেই হয়; ভাষার লালিত্য, গঠন-কৌশল ও কলা-নৈপুণ্য তখন অবহেলিত হয়। **ভাবানুবাদ** মূল বিষয়বস্তুর ভাব ও তার বিশ্লেষণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনূদিত অংশে রক্ষা করা হয়। মূল অংশের ভাববস্তু ও তার বিশ্লেষণ অনূদিত অংশেও অনুরূপভাবে স্থান পায়। **রসানুবাদই** সাহিত্যের বিচারে সার্থক অনুবাদ। এ ক্ষেত্রে মূল অংশে রস, ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা অনূদিত অংশের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। তাই নন্দন-তত্ত্বের বিচারে রসানুবাদই সর্বাধিক গ্রহণীয়। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব গঠন-বৈচিত্র্য আছে। প্রত্যেক মহৎ সাহিত্যই সৃষ্টিধর্মী। কাজেই যে অংশটির অনুবদে করা হবে, তার মধ্যেও লেখকের নিজস্ব রচনাশৈলী, ভাষা-বিন্যাস ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য থাকবে, থাকবে সাহিত্যের বিচারে সার্থক রস-পরিণতি। রসানুবাদের ক্ষেত্রে অনূদিত অংশের মধ্যেও অনুবাদকের নিজস্ব রচনাশৈলী, শব্দ-বিন্যাস, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য থাকবে; তার সঙ্গে তিনি অনূদিত অংশের মধ্যে রসধ্বনি সঞ্চারিত ক'রবেন, সাহিত্যগুণে তাকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলবেন। **কেবলমাত্র শব্দার্থের পরিবর্তন ক'রে যে অনুবাদ, সাহিত্যের বিচারে তা আদর্শ অনুবাদ নয়।** অনুবাদ সাহিত্যের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা। কাজেই **অনূদিত অংশের মধ্যেও সাহিত্যগুণ থাকবে।** শিক্ষার্থীদের আক্ষরিক অনুবাদ থেকে অনুবাদ-শিক্ষাদান শুরু ক'রতে হবে। কিন্তু ভাবানুবাদের মধ্য দিয়ে রসানুবাদে নিয়ে গিয়ে শেষ ক'রতে হবে। এর জন্য শ্রেণীকক্ষের মধ্যে পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে অনুবাদের চর্চা ও অনুশীলন যথেষ্ট নয়। অনুবাদ-কার্যে উৎসাহী ও আগ্রহী হ'য়ে শিক্ষার্থীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে এ কাজ ক'রতে এগিয়ে আসবে। তখন তারা নির্দিষ্ট পড়াশুনার বাইরেও অনুবাদ-চর্চা ক'রবে। এই জাতীয় অনুবাদের মধ্যে তাদের সৃজনশীল সৃষ্টিধর্মী মন

অনুবাদের প্রকারভেদ ও সাহিত্যধর্মী অনুবাদ

সার্থকভাবে অনূদিত অংশের মধ্যে প্রতিফলিত হবে ; অনূদিত অংশটিও সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে। **শিক্ষার্থীদের রসানুবাদের শিল্প-সাহিত্যের জগতে নিয়ে যাওয়াই হবে অনুবাদ-শিক্ষাদানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি।**

অনুবাদ একটি সাহিত্য-কর্ম ; অনুবাদ-শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল মনকে সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। অনুবাদ-চর্চা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা ভাষা-ব্যবহারের কৌশল ও দক্ষতা সার্থকভাবে অর্জন ক'রবে। অনুবাদ দু'টি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে ; অনুবাদ-চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট দু'টি ভাষাতেই দক্ষতা অর্জন করে। এই প্রসঙ্গে **রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,**—"আমার বিশ্বাস যদি যথোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে দুই বৎসরকাল এই অনুবাদ ও প্রত্যনুবাদের পন্থা ধ'রে ভাষা-ব্যবহারের অভ্যাস ঘটানো যায়, তাহলে ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই দখল জন্মানো সহজ হবে।" সে কারণে বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানের পাঠ্যক্রমে বাংলা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ ও বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের পাঠ্যক্রমে ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ শিক্ষাদানকে অন্তর্ভূক্ত ক'রতে হবে। তাতে দু'টি ভাষাতেই শিক্ষার্থীরা ব্যুৎপত্তি অর্জন ক'রবে। সার্থক অনুবাদের চর্চা ও অনুশীলন শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি ক'রবে, ভাষা ব্যবহারের কৌশল শিক্ষা দেবে, অনূদিত অংশে সৃজনশীল মনকে সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ ক'রে প্রতিফলিত ক'রবার উৎসাহ সৃষ্টি ক'রবে ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি ক'রবে। বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের ভাষা সমৃদ্ধিশালী হবে। অনুবাদের মধ্য দিয়ে আমরা অন্যান্য ভাষার শব্দ-সম্পদ ও ভাব-সম্পদকে গ্রহণ ক'রে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাব। আমাদের ভাষা তখন হবে যথার্থ শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী।

॥ অনুশীলনী ॥

১। বিদ্যালয়ে বাংলা পড়াইবার সময় ইংরাজী হইতে বাংলায় অনুবাদের অভ্যাস করাইবার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, কারণসহ আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব, বি. টি. ১৯৬৩)

২। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুবাদচর্চা গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন,—"আমার বিশ্বাস যদি যথোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে দুই বৎসরকাল এই অনুবাদ প্রত্যানুবাদের পন্থা ধরে ভাষা-ব্যবহারের অভ্যাস ঘটানো যায়, তাহলে ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই দখল জন্মানো সহজ হবে।"—এই মন্তব্যের আলোকে অনুবাদকে ইংরাজি ও বাঙলা উভয় বিষয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত কি না, সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত বিবৃত করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি ১৯৬৬)

৩। ভাষা-শিক্ষার পক্ষে অনুবাদচর্চার প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে আপনার অভিমত যুক্তি সহযোগে বিশদভাবে ব্যক্ত করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৮)

৪। মাতৃভাষা-শিক্ষায় অনুবাদশিক্ষার স্থান নির্দেশ কর। কোন্ স্তরে এই কাজ আরম্ভ করিবে এবং তাহার পর শ্রেণীতে ইহা কি পদ্ধতিতে শিখাইবে সংক্ষেপে লিখ। (বর্ধমান বিশ্ব., বি. এড. ১৯৬৭)

৫। অনুবাদ শেখানোর মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ শেখাবার সময় কোন্ কোন্ দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত? (বর্ধমান বিশ্ব, বি. এড., ১৯৭০)

৬। "ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবাদের আবশ্যিকতা আছে। অনুবাদ শিক্ষা উদ্দেশ্যহীন নহে"—উক্তিটি সম্বন্ধে আলোচনা করুন। এই প্রসঙ্গে অনুবাদ শিক্ষার উপায়গুলি লিপিবদ্ধ করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৭)

ষোড়শ অধ্যায়

সাহিত্যানুশীলনের কার্যাবলী

[Literary Activities]

আত্মপ্রকাশের এক দুরন্ত কামনা মানুষের মধ্যে অহরহ গুমরে গুমরে মরছে। অন্তর-অনুভূতির এই প্রকাশ-বেদনাই সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ মানুষের মনে যে বিচিত্র অনুভূতি এনে দেয়, তারই সোনার ফসল হ'ল সাহিত্য।

সাহিত্য

মানুষের জীবনের বহুবিচিত্র গতি-প্রকৃতি সাহিত্যে অপরূপ মূর্তিতে ধরা পড়ে। জীবনের অনুভূতি, প্রকৃতির সৌন্দর্য, বাস্তবতার স্পর্শ অবলম্বনে কবি-সাহিত্যিক শিল্পরসের বাণীমূর্তি রচনা করেন সাহিত্যের মধ্যে। সাহিত্যের মধ্যে তাই অনুভূতির সূক্ষ্ম প্রকাশ, জীবন-রসের অপূর্ব অভিব্যক্তি, নন্দন-চেতনার বিচিত্র প্রতিফলন ও বিশ্ব-সৌন্দর্যের মধুর অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়; সাহিত্যের মধ্যে এক অনির্বচনীয় রস ও সৌন্দর্যের জগৎ রচিত হয়।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য পাঠ্যক্রম হিসাবে প্রচলিত আছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ২।৩টি ভাষা ও সাহিত্য পড়তে হয়। তার মধ্যে মাতৃভাষা হ'ল প্রধান। মাতৃভাষা আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের জৈব প্রয়োজন সিদ্ধ করে; প্রাত্যহিক জীবনে আমরা মাতৃভাষার মাধ্যমেই ভাব প্রকাশ করি। কেবলমাত্র কথাবার্তায় ভাব-প্রকাশের উপযোগী ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা-অর্জন, লেখা ও পড়া মাতৃ-ভাষা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়। মাতৃভাষা আমাদের প্রাণের ভাষা; অন্তরের অনুভূতি, আকুতি, ভাবাবেগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও আনন্দ-বেদনা মাতৃভাষার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। মাতৃভাষা শিক্ষার্থীদের মানসিক বৃত্তিগুলির বিকাশ সাধন করে, সামগ্রিক ব্যক্তিসত্বাকে জাগ্রত করে, সুকুমার বৃত্তিগুলির উন্মেষ ও বিকাশ সাধন করে। মাতৃভাষা চর্চা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সাহিত্যানুরাগ বাড়ে, শিল্প-চেতনা জাগ্রত হয়। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনাশক্তি, যুক্তিবোধ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি মাতৃভাষার চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই সম্ভব। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মপ্রকাশের কামনা আছে, সৌন্দর্য-চেতনা আছে, শিল্প-বোধ আছে;—সেগুলিকে জাগ্রত ক'রে তাদের ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার যথাযথ উদ্বোধন করাই মাতৃভাষা-শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল জীবনবোধ যথার্থভাবে প্রকাশিত হয়। কাজেই মাতৃভাষা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত ব্যাপক। জীবনের আনন্দময় ও সৌন্দর্যময় মধুর পরিমণ্ডল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহিত্য এক অনিবার্য অবলম্বন, সেদিকে

মাতৃভাষা শিক্ষা দানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপক ক্ষেত্র

তাকিয়েই মাতৃভাষা শিক্ষা দিতে হবে। মাতৃভাষা-শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হ'ল,—আত্মপ্রকাশে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করা, ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা-অর্জনে সাহায্য করা, তাদের সৃজনশীলতার পরিপূর্ণ বিকাশসাধন করা, আনন্দ ও সৌন্দর্য চেতনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার সামগ্রিক বিকাশ সাধন ক'রে তাদের মধ্যে সুকুমার বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলা। সৃজনশীল কর্মে অনুপ্রাণিত করাই মাতৃভাষা-শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। **"The teaching of the mother-tongue should always have as one of its most important aims for the encouragement of creative work."**—*Ryburn*. মাতৃভাষা শিক্ষাদানের সময় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের এই ব্যাপক ক্ষেত্রের কথা মনে রাখতে হবে,—এবং সেই অনুযায়ী বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদান যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হবে।

শ্রেণীকক্ষের মধ্যে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি সার্থক হয় না।

বিদ্যালয়ে প্রচলিত পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদানের মধ্যে মাতৃভাষা-শিক্ষাদানের এই ব্যাপক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সাধিত হয় না। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা-শিক্ষাদানের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত। প্রচলিত নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমকে কেন্দ্র ক'রে বিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদান নিতান্তই গতানুগতিক ও পুস্তক-কেন্দ্রিক পথে প্রবাহিত হয়। শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে ঘেরা পরিবেশে সাহিত্যানুভূতি, সৌন্দর্য-উপলব্ধি ও কল্পনাশক্তি-বিকাশের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; শিক্ষার্থীদের মধ্যে নন্দন-চেতনা, শিল্পবোধ, সৃজনশীলতা প্রভৃতির উন্মেষ ও বিকাশ সার্থক ভাবে সম্ভব হয় না। প্রচলিত শিক্ষা-কাঠামোর মধ্যে তাই মাতৃভাষা-শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত হয় না। শিক্ষার্থীদের সাহিত্যানুশীলনের ক্ষেত্র তাই আরও প্রসারিত ক'রতে হবে।

পাঠ্যাতিরিক্ত সাহিত্যানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

বিদ্যালয়ের প্রচলিত পাঠ্যক্রম ও শ্রেণীকক্ষের গতানুগতিক শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকায় শিক্ষার্থীদের সাহিত্যানুশীলনের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত ক'রতে হয়। তখন প্রয়োজন হয় পাঠ্যক্রমের অতিরিক্ত কার্যাবলীর। পাঠ্যক্রমের অতিরিক্ত এই সব কার্যাবলীকে সকলে এতদিন উন্নাসিক দৃষ্টিতে দেখতেন। কিন্তু ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় শিক্ষা কমিশন এ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ক'রে বলেছেন,—"*They are as integral a part of the activities of a school as its curricular work and their proper organization needs just as much care and forethought.*" আজকাল সকলেই এই-জাতীয় কার্যাবলীকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই রকম কিছু কিছু কার্যাবলীর প্রয়োজন আছে। শ্রেণীকক্ষের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে মাতৃভাষা-শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হয় না বলেই এই-জাতীয় কার্যাবলীর প্রয়োজন হয়। **পাঠ্যাতিরিক্ত এইসব কার্যাবলী পাঠ্যক্রমের পরিপূরক।**

শিক্ষার্থীদের মননশীলতা, কল্পনাশক্তি, সাহিত্যানুরাগ, নন্দন-চেতনা, সৌন্দর্যানুভূতি, সৃজনশীলতা প্রভৃতির বিকাশে এইসব সাহিত্যানুশীলনমূলক কার্যাবলী অত্যাবশ্যক। বিদ্যালয়ে তাই এই-জাতীয় কার্যাবলীকে গুরুত্ব সহকারে যথাযথভাবে রূপায়িত ক'রতে হবে।

বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের সহায়ক বিভিন্ন পরিপূরক কার্যাবলীর সংগঠন যথাযথভাবে গড়ে তুলতে হবে। সমগ্র বিদ্যালয়ে সাহিত্যানুশীলনের এক সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য চাই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বিদ্যালয়ে সাহিত্যানুশীলনের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে; এর নেতৃত্ব দেবেন ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক। পাঠ্যাতিরিক্ত এই সব বিষয়ের সংগঠন গড়ে তুলতে বিদ্যালয়ে সবসময় যে বেশী অর্থের প্রয়োজন হয়, তা নয়। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলিকে রূপায়িত করবার জন্য বেশী অর্থের প্রয়োজন হয় না;—সেক্ষেত্রে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, যত্ন ও নিষ্ঠার প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী। শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার স্বচ্ছ জ্ঞান, সাহিত্য-জ্ঞান, সৌন্দর্যানুভূতি, শিল্পচেতনা ও সৃজনশীলতার উন্মেষ ও বিকাশ সাধন ক'রতে এই সব কার্যাবলী বিশেষ প্রয়োজন। তাই আবৃত্তি, সাহিত্য-সভা, বিতর্ক, অভিনয়, পত্রিকা-পরিচালনা প্রভৃতি বিষয় ও কার্যাবলী বিদ্যালয়ে গুরুত্ব দিয়ে সংগঠিত ক'রতে হবে।

পাঠ্যক্রমের অতিরিক্ত সাহিত্যানুশীলনের বিভিন্ন কার্যাবলী

।। সাহিত্যানুশীলনের বিভিন্ন কার্যাবলী ।।

॥ এক ॥ আবৃত্তি (Recitation) ঃ

সার্থক আবৃত্তি শিল্প-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ভাষার সার্থক সরব পাঠ আবৃত্তির মাধ্যমে শিল্প-পর্যায়ে উন্নীত হয়। বিদ্যালয়ের সব ছেলেমেয়েই কিছু-না-কিছু আবৃত্তি ক'রতে পারে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সেই আবৃত্তিকে শিল্পসুষমামণ্ডিত ক'রতে হবে। আবৃত্তির জন্য চাই স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণ, সুন্দর কণ্ঠস্বর ও ছন্দের জ্ঞান। কবিতার ছন্দ, ভাব ও রস শিশুচিত্তকে সহজেই আকৃষ্ট করে। আবৃত্তির ব্যাপক অনুশীলন ক'রতে হবে। শিক্ষক মহাশয় সার্থক আবৃত্তি ক'রে শিক্ষার্থীদের শোনাবেন ও রেকর্ড থেকে ভাল আবৃত্তি বাজিয়ে শোনাবেন। বাইরে থেকে বিভিন্ন শিল্পীরা এসে শিক্ষার্থীদের ভাল আবৃত্তি সম্বন্ধে ধারণা দিয়ে যাবেন। নিয়মিত আবৃত্তি ক'রতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি ক'রতে হবে। আবৃত্তির মধ্যে মনের ভাব ও অনুভূতি ভাবাবেগের মাধ্যমে কণ্ঠস্বরের মধ্যে ধ্বনিত হবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে আবৃত্তির একটি স্বতন্ত্র ও স্থায়ী আসন থাকবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কিছু কিছু কবিতা মুখস্থ ক'রে আবৃত্তি ক'রবার জন্য সব সময় *Stock* থাকবে। নিয়মিত-ভাবে আবৃত্তির অনুশীলন ক'রতে হবে। কেবলমাত্র কবিতার আবৃত্তি হবে না, গদ্যাংশ

আবৃত্তি

ও নাট্যাংশেরও সরল আবৃত্তি হ'তে পারে। আবৃত্তির মধ্য দিয়ে মাতৃভাষা-শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি বিশেষভাবে চরিতার্থ হয়। তাই বিদ্যালয়ে গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত আবৃত্তি অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

॥ দুই ॥ অভিনয় (Histrionics) :

মনের ভাব প্রকাশের, ভাষা-ব্যবহারের ও ভাষা-চর্চার অন্যতম সার্থক শিল্প-মাধ্যম হ'ল অভিনয়। আধুনিক অভিনয় মঞ্চসজ্জা ও অভিনয়-সৌৎকর্ষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন ক'রেছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বছরে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে নাটকের অভিনয় ক'রবে। সেক্ষেত্রে নাটকের বিভিন্ন আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে অভিনয় পরিচালনা ক'রতে হবে; যেমন,—মঞ্চসজ্জা, আলোক-সম্পাত, পোষাক-পরিচ্ছদ, অঙ্গভঙ্গী, সংলাপ-বিনিময়, দলগত অভিনয়, *Make up, speed* প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এর এক-একটির দায়িত্ব এক-একজনকে দিতে হবে। তারা প্রত্যেকে যাতে নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন ক'রতে পারে, তার জন্য যথাযথভাবে তাদের তৈরি ক'রতে হবে। অভিনয়ের সামগ্রিক সাফল্য চাই।

অভিনয়

বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে নাটকের ছোট ছোট অংশ, ছোটগল্পের নাট্যীকরণের উপর অভিনয় পরিচালিত হ'তে পারে। মাতৃভাষা-শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনেকাংশে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হয়। বিদ্যালয়ে তাই ভাষাচর্চা ও সাহিত্যানুশীলনের পরিপূরক এক শিল্প-মাধ্যম হিসাবে অভিনয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

॥ তিন ॥ বিতর্ক (Debates) :

সাহিত্যানুশীলনের পরিপূরক কার্যাবলী হিসাবে বিদ্যালয়ে বিতর্কের অনুষ্ঠান ক'রতে হবে। বিতর্কের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভাষা-ব্যবহারে যুক্তিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ জোরালোভাবে উপস্থাপিত ক'রবার প্রয়োজন হয়। বিতর্কের মধ্যে এমন একটা উত্তেজনা থাকে, আক্রমণের ঝাঁঝ থাকে যা শিশু-চিত্তকে সহজেই আকৃষ্ট করে।

বিতর্ক

শিক্ষার্থীরা বিতর্ক ক'রবার কৌশল জানবে। তারপর আপন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আক্রমণের সুরে যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার ক'রে প্রতিপক্ষকে আঘাত করবে। যুক্তিনিষ্ঠ উপস্থাপনে তাই বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

॥ চার ॥ বক্তৃতা (Lecture) :

পাঠ্যক্রমের অতিরিক্ত যেসব কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা শিক্ষা সার্থক হয়, বক্তৃতা তার মধ্যে অন্যতম। বক্তৃতার মধ্য দিয়ে কোন একটি বিষয়ের সমস্ত দিককে যুক্তি-তর্ক, তথ্য-তত্ত্ব, অভিজ্ঞতা-দৃষ্টান্ত প্রভৃতির মাধ্যমে সাবলীলভাবে স্বচ্ছন্দ গতিতে উপস্থাপিত করা যায়। বক্তৃতার মধ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টি, ব্যঙ্গ কৌতুক ব্যবহার প্রভৃতি বক্তৃতাকে আকর্ষণীয় করে। বক্তৃতা (*Oration*) একটি

বক্তৃতা

শিল্পকর্ম। *Public oration*-এর মধ্য দিয়ে বক্তব্য যথাযথভাবে উপস্থাপিত করা সহজ কাজ নয়। শিক্ষার্থীদের বাগ্মিতা-শক্তিও বক্তৃতা-কৌশলকে (*Elocution*) উজ্জীবিত ক'রতেএই পদ্ধতি খুবই প্রয়োজনীয়।

॥ পাঁচ ॥ সংগীত (Music) ঃ

মনের যে ভাব ও অনুভূতি বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, তাকে সংগীতের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কথায়,—

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।"

গানের মধ্য দিয়ে অনুভূতির সূক্ষ্মতম প্রকাশ হয়। বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের পরিপূরক হিসাবে সাহিত্যানুশীলনের কার্যাবলীর মধ্যে সংগীত-চর্চাকে স্থান দিতে হবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে সংগীত প্রধান স্থান পাবে। শিক্ষার্থীরাও গান গাইবে, গান শুনবে।

॥ ছয় ॥ চিত্রাংকন (Drawing and Painting) ঃ

মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে চিত্রাংকনের মূল্য আছে, একথা পূর্বে অনেক বার আলোচনা করা হ'য়েছে। চিত্রাংকনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা রেখা-বিন্যাসের শিক্ষাগ্রহণ করে। সেখান থেকেই সে বর্ণ বা লিপি লেখবার অনুশীলন আয়ত্ত করে। চিত্রাংকনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের কল্পনা-শক্তির বিকাশ হয়, অনুভূতির প্রকাশ হয়, সৃজনশীল মন বিকশিত হয়, শিল্প-সৌন্দর্য চেতনাসমৃদ্ধ হয়। মাতৃভাষা-শিক্ষার লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে পৌঁছাতেও এগুলির প্রয়োজন। ভাষা ও সাহিত্যানুশীলনের পরিপূরক হিসাবে চিত্রাংকনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষার্থীরাও চিত্রাংকনের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের চিত্রাংকন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। ছোটদের জন্য বিদ্যালয়ে জানালার নীচে পর্যন্ত সমস্ত দেওয়ালে সিমেন্টের ব্ল্যাকবোর্ড থাকবে। শিক্ষার্থীদের সাদা ও রঙিন চক্ দেওয়া হবে। তারা বোর্ডে তাদের ইচ্ছে-মত লিখবে, ছবি আঁকবে, হিজিবিজি রেখা টানবে। তার মধ্য দিয়েও ঈপ্সিত ফললাভ করা যাবে। বড় হ'লে শিক্ষার্থীদের পেনসিল, রং, তুলি, *art paper* নিয়ে চিত্রাংকন শেখাতে হবে। তখন শিক্ষার্থীরা চিত্রাংকনের মধ্য দিয়ে আপন মনের সার্থক প্রকাশ ক'রতে পারবে।

চিত্রাংকন

॥ সাত ॥ দেওয়াল-পত্রিকা (Wall Magazine) ঃ

ভাষা ও সাহিত্য-চর্চা তখনই সর্বাধিক সাফল্যমণ্ডিত হয়, যখন শিক্ষার্থীরা সৃষ্টিমূলক রচনায় নিজেকে প্রকাশ ক'রতে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থীরা যাতে গল্প, কবিতা, রচনা, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি মৌলিকভাবে রচনা ক'রতে সক্ষম হয়, তার জন্য বিদ্যালয়ে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন 'দেওয়াল-পত্রিকা'। সাপ্তাহিক এই দেওয়াল-পত্রিকা শিক্ষার্থীরাই পরিচালনা ও প্রকাশনা ক'রবে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণী এক-একটি ক'রে হাতে-লেখা 'দেওয়াল-পত্রিকা' পরিচালনা ও প্রকাশনা করতে পারে। দেওয়াল-পত্রিকা হাতে-লেখা হবে এবং তাতে শিক্ষার্থীদের কাঁচা হাতের রচনা প্রকাশিত হবে। দেওয়াল-পত্রিকায় শিক্ষার্থীদের লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ,

দেওয়াল-পত্রিকা

রচনা, ভ্রমণকাহিনী, চিঠি, অভিজ্ঞতার কাহিনী, খবর, ধাঁধা, ছবি, আল্পনা প্রভৃতি প্রকাশিত হবে। ফলে, শিক্ষার্থীরাও সাহিত্য-সৃষ্টিতে উৎসাহিত হবে এবং তাদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্যচেতনা বাড়বে।

॥ আট ॥ মুদ্রিত পত্রিকা (Printed Magazine) ঃ

মুদ্রিত পত্রিকা

ছাপার অক্ষরে নিজের নাম ও লেখা প্রকাশের অন্যরকম অনুভূতি ও সার্থকতা আছে। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের লেখা নিয়ে বছরে অন্ততঃ একটি মুদ্রিত পত্রিকার সংখ্যা প্রকাশ ক'রতে পারলে তাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্ট হয়। মুদ্রিত পত্রিকার ঐ সংখ্যাটিতে শিক্ষার্থীদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি প্রকাশিত হবে এবং তাতে বিদ্যালয়ের সাহিত্যানুশীলনের চিত্র ফুটে উঠবে।

॥ নয় ॥ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (Social Function) ঃ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

পাঠ্যক্রম-অতিরিক্ত যেসব বিষয় ও কার্যাবলীর মধ্যে শিক্ষার্থীদের সাহিত্যানুশীলন হয়, তার মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনে আনন্দ ও উৎসাহের জোয়ার বয়ে যায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, অভিনয়, বক্তৃতা প্রভৃতি প্রধান স্থান অধিকার ক'রে থাকে। তা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অন্যান্য যে কাজকর্ম ও সামগ্রিক কার্যক্রম, তা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও শিল্পচেতনাকে সমৃদ্ধ করে,—তাদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ জাগ্রত করে।

॥ দশ ॥ সাহিত্য-আলোচনা (Literary Discussion) ঃ

সাহিত্য আলোচনা

আলোচনার মাধ্যমে কোন বিষয় সম্বন্ধে বিতর্কের মধ্য দিয়ে সমাধান বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। সুষ্ঠু ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে পরস্পরের মধ্যে সার্থক মত-বিনিময়ই আলোচনা। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রবে। কোন একটি পুস্তক (উপন্যাস, গল্প, কাব্য বা নাটক ইত্যাদি) নিয়ে তার উপর বিভিন্ন শিক্ষার্থী আলোচনা ক'রবে ও সিদ্ধান্তে উপনীত হবে ; কোন একজন লেখকের সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধেও অনুরূপ আলোচনা হ'তে পারে।

॥ এগারো ॥ সাহিত্য প্রতিযোগিতা (Literary Competition) ঃ

সাহিত্য প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার যদিও মনস্তত্ত্বের বিচারে অবৈজ্ঞানিক, তবুও তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহী ও আগ্রহী করা যায়। এই ধরনের উৎসাহ ও আগ্রহ কৃত্রিম হ'লেও তা যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি ক'রতে পারে, তবে তার মূল্যও কম নয়। বিদ্যালয়ে কবিতা, প্রবন্ধ, রচনা, গল্প, একাংক নাটক প্রভৃতি রচনা ও ছবি-আঁকার প্রতিযোগিতা হ'তে পারে। এছাড়াও আবৃত্তি, অভিনয়, বাগ্মিতা, সংগীত প্রভৃতির উপরও প্রতিযোগিতা হ'তে পারে। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিজয়ীদের কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হবে।

॥ বারো ॥ **সাহিত্য-চক্র (Literary Circle) ঃ**

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সাহিত্য-চক্রের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই ধরনের চক্র হ'বে ঘরোয়া পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিচালিত সাহিত্য-সভা। এই সভাতে কোন সাহিত্যিক উপস্থিত থাকবেন এবং তাঁর বক্তব্য রাখবেন। শিক্ষার্থীরাও এই বৈঠকে আবৃত্তি ক'রবে, গান গাইবে, স্বরচিত কবিতা পড়বে, আলোচনায় অংশগ্রহণ ক'রবে এবং প্রশ্ন ক'রে সাহিত্যধর্মী কৌতূহল চরিতার্থ ক'রবে। একটি সুন্দর, মনোরম ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে এই-জাতীয় সাহিত্য-চক্র পরিচালিত হবে। তাতে সাহিত্যানুরাগ শিক্ষার্থীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে।

সাহিত্য-বৈঠক

॥ তেরো ॥ **সংকলন-গ্রন্থ (Collection Book) ঃ**

প্রত্যেক শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যমূলক বিভিন্ন বিষয় সংগ্রহ ও সংকলন ক'রবে। বিভিন্ন কবির সার্থক রচনা, বিভিন্ন লেখকের লেখা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অংশ, আবৃত্তি ক'রবার কবিতা, নতুন নতুন শব্দ ও বাগ্‌ধারা ইত্যাদি বিষয়কে তারা সংগ্রহের ঝুলিতে সঞ্চয় ক'রে রাখবে। বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনা, তাদের জন্মমৃত্যু ও সাহিত্য-জগতের উল্লেখযোগ্য খবর শিক্ষার্থীদের সংকলন-গ্রন্থে থাকবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনের এক-একটি সংকলন-গ্রন্থ রক্ষা ক'রবে।

সংকলন-গ্রন্থ

॥ চৌদ্দ ॥ **চিত্র-সংকলন (Picture Collection) ঃ**

সংকলন-গ্রন্থের মত শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ ক'রে রাখবে। এই সব ছবির মধ্যে যদি একটা ধারাবাহিকতা থাকে বা বিষয়বস্তুর ক্রম-চিত্রায়ণ হয়, তবে সেগুলির সাহিত্যমূল্য যথেষ্ট। দৈনিক সংবাদপত্রের 'অরণ্যদেব', 'গোয়েন্দা রিপ' প্রভৃতি চিত্রের ধারাবাহিকতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে কল্পনাশক্তির বিকাশসাধন করে, গল্পরসের খোরাক যোগায়। এতে শিক্ষার্থীরা আনন্দ ও আকর্ষণ অনুভব করে। তাই চিত্র-সংকলনের সাহিত্যগত ও ভাষাগত মূল্যও আছে।

চিত্র-সংকলন

॥ পনেরো ॥ **গল্প-উপন্যাসের নাট্যীকরণ (Dramatization of stories and fictions) ঃ**

উঁচু শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যদি গল্প বা উপন্যাসের বিভিন্ন কাহিনীকে নাটকে রূপান্তরিত করে, তবে তারও সাহিত্যগত মূল্য আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জীবনে বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে অভিনয়মূলক খেলা করে; যেমন,—পুতুল-খেলা, বরকনে খেলা। শিক্ষার্থীদের এই মৌলিক প্রবণতাকে পরবর্তী কালে সাহিত্যানুশীলনের কাজে লাগাতে হবে। গল্প, উপন্যাস ও নাটকের বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কাহিনীর নাট্যীকরণ ক'রবে এবং সম্ভব হ'লে সেগুলি অভিনয়েরও ব্যবস্থা ক'রবে। এ ব্যাপারে শিক্ষকমহাশয় তাদের সাহায্য ক'রবেন ও পরামর্শ দেবেন।

নাট্যীকরণ

॥ ষোল ॥ সাহিত্য-সংঘ (Literary Club) :

বিদ্যালয়ে সাহিত্য-সংঘ প্রতিষ্ঠা ক'রতে হবে। স্বায়ত্তশাসনমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা তাকে পরিচালনা ক'রবে। এই সংঘের মাধ্যমেই বিদ্যালয়ের সমস্ত সাহিত্যানুশীলনমূলক কার্যাবলী রূপায়িত ও পরিচালিত হবে। ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক এই সংঘ-পরিচালনায় সহায়তা ক'রবেন, পরামর্শ দেবেন। পাঠ্যক্রমের অতিরিক্ত সাহিত্যানুশীলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়, তার রূপায়ণে ও পরিচালনায় সাহিত্য-সংঘের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সাহিত্য-সংঘ

॥ সতেরো ॥ পাঠাগার-ব্যবহার (Library Work) :

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে পাঠাগারের সাহায্য ছাড়া কোন বিষয়েরই শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই পাঠাগার-ব্যবহার শিক্ষার্থীদের পক্ষে খুবই প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগার (*Central Library*) থেকে গল্প, উপন্যাস, কাব্য, প্রবন্ধ, সমালোচনা প্রভৃতি সাহিত্যগুণ-সমৃদ্ধ বই নিয়ে পড়াশুনা ক'রবে। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের পক্ষে যে বিষয়-পাঠাগার (*Subject Library*) থাকবে, সেখান থেকেও শিক্ষার্থীরা বই নিয়ে পড়বে। তারা *Library reading room*-এও বই পড়তে পারে, বা বাড়ীতেও বই পড়তে পারে। পাঠাগার থেকে বিভিন্ন বই প'ড়ে তারা সাহিত্য-জ্ঞান অর্জন ক'রবে, সাহিত্য-শিল্প-চেতনায় সমৃদ্ধ হবে এবং সাহিত্যানুরাগ জাগ্রত ক'রবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সাময়িক পত্রও (*Periodicals*) খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠাগার-ব্যবহার তাই অপরিহার্য।

পাঠাগার ব্যবহার

বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের ও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের অতিরিক্ত সাহিত্যানুশীলনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী-রূপায়ণে শিক্ষকের দায়িত্ব অসীম। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষকের সাহিত্যের প্রতি সত্যিকারের অনুরাগ থাকবে। এই সব কার্যসূচীর মধ্যে তিনি নিজেও জড়িয়ে পড়বেন। তাঁরই *initiative*-এ বিদ্যালয়ে এই সমস্ত কর্মসূচী রূপায়িত ও পরিচালিত হবে। তিনি যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে বিদ্যালয়ে সাহিত্য-অনুশীলনের পরিবেশ ও পরিস্থিতি গড়ে তুলবেন। এর জন্য প্রয়োজন হ'লে তাঁকে অতিরিক্ত সময় দিতে হবে, বাড়তি পরিশ্রমও ক'রতে হবে। তিনি নিজে ভাল আবৃত্তি ক'রতে পারবেন, অভিনয়দক্ষ হবেন ; গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি রচনায় পারদর্শী হবেন। তাঁরই সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্যানুশীলন শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত ক'রবে। এ বিষয়ে মুদালিয়ার কমিশনও বলেছেন যে,—**"All teachers should devote a definite time to such activities."** ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষককে সাহিত্যানুশীলনের এই কর্মসূচী-রূপায়ণে অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দও আন্তরিক সক্রিয় সহযোগিতা করবেন।

সাহিত্যানুশীলনের কার্যাবলী রূপায়ণে শিক্ষকের ভূমিকা

বিদ্যালয়ে সংগঠন ও পরিচালনায় সাহিত্যানুশীলনের এইসব কর্মসূচীকে যথেষ্ট গুরুত্ব

দিতে হবে। এ ব্যাপারে অভিভাবক ও অন্যান্যদের যে অনীহা ও বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী আছে, তার পরিবর্তন ক'রতে হবে। বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষকে এই সমস্ত কর্মসূচী রূপায়ণে আর্থিক সাহায্য করতে হবে, সময় ও সুযোগ ক'রে দিতে হবে। সাহিত্যানুশীলনের এই সব কার্যাবলী বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনকে আনন্দমুখর ক'রে তুলবে; তার প্রভাবে পারিপার্শ্বিক সমাজ-জীবনও প্রভাবান্বিত হবে।

উপসংহার

অনুশীলনী

১। এই রাষ্ট্রের বিদ্যালয়গুলিতে—বিশেষত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে—নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ের পঠন-পাঠন ব্যতীত ছাত্রগণের সাহিত্যানুশীলনের অনুকূল আর কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা সঙ্গত এবং বর্তমান অবস্থায় সম্ভব, তাহা যুক্তিসহকারে বিবৃত করুন। (কলি. বিশ্ব. বি. টি. ১৯৬৬)

২। ছাত্রগণের সাহিত্যরসোপলব্ধির সহায়করূপে নাটকাভিনয়, নাটক-আবৃত্তি, গল্প-উপন্যাস নাট্যীকরণ, সাহিত্য-বৈঠক, প্রাচীরপত্র-রচনা, চিত্রাদি সংগ্রহ ও সংকলন, পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি বিবিধ সাহিত্যিক কার্যাবলীর উপযোগিতা কতখানি, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করুন। বর্তমান সময়ে শিক্ষকগণের পক্ষে তাঁহাদের নির্ধারিত কর্তব্য সমাপনের পর এ বিষয়ে ছাত্রগণকে কতখানি সাহায্য করা সম্ভব তাহাও আলোচনা করিয়া দেখান। (কলি. বিশ্ব. বি. টি. ১৯৬৭)

৩। বিদ্যার্থীগণের রসোপলব্ধি ও চিৎপ্রকর্ষের সহায়তাকল্পে তাহাদের আবৃত্তি, নাট্যাভিনয়, প্রবন্ধ লেখন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, চিত্রসংগ্রহ, পত্রিকা প্রকাশন প্রভৃতি সাংস্কৃতিক উদ্‌যোগে উৎসাহদান করা আবশ্যক।—কেন আবশ্যক, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন এবং বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকগণের পক্ষে ছাত্রদিগকে এই উদ্‌যোগে কতটা উপযুক্ত করা সম্ভব, তাহাও আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব. বি, টি. ১৯৬৯)

৪। মাতৃভাষা ও সাহিত্য-চর্চার বহুমুখী উদ্দেশ্য যাহাতে বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে তাহার জন্য কেবলমাত্র পাঠ্যসূচীর উপর নির্ভর না করিয়া বিদ্যালয়ে সহ-পাঠ্য কর্মসূচী প্রবর্তন করিতে হইবে—এই উক্তিটির সারবত্তা ব্যক্ত করুন। ভাষা ও সাহিত্যচর্চার অনুকূল কি কি ধরনের সহপাঠ্য কর্মসূচী বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা সম্ভব। (কলি. বিশ্ব. বি. টি. ১৯৭১)

৫। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীগণের সৃজনশীল মানসিক বিকাশ সুনিশ্চিত করিবার জন্য সাহিত্যের শিক্ষক সাহিত্যিক কার্যাবলী কিভাবে সংগঠিত করিতে পারেন, তাহা আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব. বি. এড. ১৯৭৩)

৬। মাতৃভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা বিচার প্রসঙ্গে অন্যান্য পরিপূরক উপায় ও কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। (কলি. বিশ্ব. বি. এড. ১৯৭৫)

সপ্তদশ অধ্যায়

শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ

[Teaching Aids]

আধুনিক শিক্ষাদর্শন ও মনোবিজ্ঞান শিক্ষা-পদ্ধতিকে নতুন চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে। শিক্ষাদান আজ আর গতানুগতিকতার পথ ধ'রে চলে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক-কেন্দ্রিকতার যুগ আজ অতিক্রান্ত,—এসেছে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্বাকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ ক'রে দেয়। শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে পুঁথি-সর্বস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থা অপসৃত হ'য়ে শিক্ষার্থীর স্বাধীন শিক্ষা আজ স্বীকৃত হ'চ্ছে। শিক্ষাকে শিশু-কেন্দ্রিক ক'রতে বিভিন্ন শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলি অপরিহার্য। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিল্প-সহায়ক উপকরণগুলির গুরুত্ব সকলেই স্বীকার ক'রেছেন। শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ-গুলির ব্যবহারে পাঠদান জীবন্ত হয়, ধারণা (*conception*) সম্পূর্ণ (*clear*) হয়, শিক্ষা আনন্দময় হয়। কাজেই আধুনিক শিক্ষার পদ্ধতি-বিজ্ঞানে ও প্রয়োগ-শাস্ত্রে এই জাতীয় উপকরণগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। শিক্ষাদান-কালে শিক্ষক এই সহায়ক উপকরণগুলিকে ব্যবহার করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও এই উপকরণগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষককে তাই এই উপকরণ-গুলি সংগ্রহ ও ব্যবহার সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানতে হবে। তবেই তিনি ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষাদানকে সার্থক ক'রে তুলতে পারবেন।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উপকরণগুলির গুরুত্ব

শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলি শিক্ষার্থীর মনে প্রত্যক্ষ আবেদনের (*Direct appeal*) সৃষ্টি করে, ধারণাকে পূর্ণ করে ও অভিজ্ঞতাকে বাস্তবভিত্তিক করে। উপকরণগুলির ব্যবহারে পাঠদান জীবন্ত হয়, এবং শিক্ষার্থীরা পাঠে আগ্রহ অনুভব করে। ফলে, পাঠদান আনন্দময় ও আকর্ষণীয় হয়। শিক্ষাসহায়ক উপকরণ-গুলির সাহায্যে ভালো ও মন্দ,—দুই শ্রেণীর ছাত্রেরাই সমান উপকৃত হয়। উপকরণগুলির সাহায্যে পাঠদানের ফলে পুঁথি-সর্বস্ব মুখস্থ-নির্ভর যান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার অবসান হ'য়ে স্বাধীন শিক্ষা প্রবর্তিত হয়; তার মধ্যেই শিক্ষার্থীর বুদ্ধি-বৃত্তির যথাযথ বিকাশ সম্ভব। তখন শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি ও যুক্তি-নির্ভরতা বাড়ে; তারা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণামূলক কাজে উৎসাহ পায়। উপকরণগুলির ব্যবহারে পাঠদানের মান উন্নত হয় এবং শিক্ষার্থীরাও মনের সংকীর্ণতা দূর ক'রে যথার্থ শিক্ষা-গ্রহণের সুযোগ পায়। সকল শিক্ষা-বিজ্ঞানীই তাই শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলির প্রয়োগের যৌক্তিকতা স্বীকার ক'রেছেন।

শিক্ষাসহায়ক উপকরণ-গুলির প্রয়োজনীয়তা

উপকরণগুলি তিন শ্রেণীর :—

।। এক ।। **দৃষ্টি-নির্ভর উপকরণ (Visual Aids)**

।। দুই ।। **শ্রুতি-নির্ভর উপকরণ** (**Audio Aids**)

।। তিন ।। **দৃষ্টি-শ্রুতি-নির্ভর উপকরণ** (**Audio-visual-Aids**)

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে উপকরণগুলি ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে **দৃষ্টি-নির্ভর উপকরণ** (**Audio Aids**) সংখ্যায় বেশী। এই-জাতীয় উপকরণগুলি সংগ্রহ করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দৃষ্টি-নির্ভর উপকরণগুলির ব্যবহার সর্বাধিক। শিক্ষা-গ্রহণের ক্ষেত্রে চোখের একটি মস্ত বড় ভূমিকা আছে। দৃষ্টি-নির্ভর উপকরণগুলি চোখে দে'খে গ্রহণ করা যায়,—উপলব্ধি করা যায়। পাঠ্যপুস্তক (***Text book***), ব্ল্যাক বোর্ড (***Black Board***), ম্যাজিক লণ্ঠন (***Magic Lantern***), মানচিত্র (***Map***), এপিডায়োস্কোপ (***Apidioscope***), রেখাচিত্র ও লেখাচিত্র (***Graphs and charts***), নক্সা (***Diagram***), নমুনা (***Specimen***), ছবি (***Pictures***), অনুকৃতি (***Model***), গ্লোব (***Globe***), সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র (***Newspaper and Periodicals***), দেওয়াল-পত্রিকা (***Wall Magazine***), নিউজ বোর্ড ও বুলেটিন বোর্ড (***News Board and Bulletin Board***) ইত্যাদি দৃষ্টি-নির্ভর উপকরণ সচরাচর বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। উপকরণগুলি দৃষ্টি-নির্ভর ; কারণ কেবল মাত্র চোখের সাহায্যেই এগুলির ব্যবহারের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

দৃষ্টিনির্ভর উপকরণ

এমন অনেকগুলি উপকরণ আছে, যেগুলির আবেদন কেবলমাত্র কানের কাছে ; অর্থাৎ কেবলমাত্র শ্রবণ-শক্তির দ্বারা এই উপকরণগুলির ব্যবহারের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। এগুলির সংখ্যা খুব বেশী নয় এবং শিক্ষাদানের সময় এগুলির ব্যবহারও খুব সহজ নয়। **শ্রুতি-নির্ভর প্রদীপনগুলির** (**Visual Aids**) মধ্যে রেডিও (***Radio***) প্রধান। বর্তমানে রেডিওর ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় ;—এমন কি অনুন্নত দেশগুলির গ্রামাঞ্চলেও রেডিও-র ব্যাপক প্রচলন আছে। সুনির্দিষ্ট শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-সূচী গ্রহণ ক'রে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌গণের সাহায্যে রেডিও-র মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্ভব। বিদ্যালয়েও রেডিওর ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্রামোফোন (***Gramophone***) ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রেকর্ডের মাধ্যমেও শিক্ষাদান সম্ভব। এক্ষেত্রে রেকর্ডগুলি যদি শিক্ষামূলক ও শিক্ষা-সহায়ক হয় তবেই ভাল। শ্রুতি-নির্ভর উপকরণ-গুলির মধ্যে টেপ রেকর্ডার (***Tape Recorder***) একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। বিভিন্ন স্থানের অনুষ্ঠান, বক্তৃতা ও আলোচনা প্রভৃতি রেকর্ড করিয়ে পরে শিক্ষাদানের সময় সেগুলিকে যথাস্থানে ব্যবহার করা যেতে পারে।

শ্রুতিনির্ভর উপকরণ

কতকগুলি শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ আছে, যেগুলির ব্যবহারের সার্থকতার জন্য চোখ ও কান;—দু'টি ইন্দ্রিয়েরই প্রয়োজন। এগুলি **দৃষ্টি-শ্রুতিনির্ভর উপকরণ** (**Audio-**

Visual Aids)। এগুলি সংগ্রহ করাও শক্ত, ব্যবহারও কম। চলচ্চিত্র (*Cinema*) এমন একটি উপকরণ। শিক্ষাগত ও তথ্যমূলক বিভিন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন করিয়ে শিক্ষা-প্রসারের চেষ্টা করা যায়। বর্তমানে আবার টেলিভিশনের (*Television*) ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে টেলিভিশনের সাহায্যে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে শিক্ষামূলক জ্ঞানগর্ভ বিভিন্ন অনুষ্ঠান সংযোজন ক'রে শিক্ষাবিস্তার সম্ভব।

দৃষ্টি-শ্রুতিনির্ভর উপকরণ

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ বিশেষ কার্যকরী। শিক্ষার্থীদের ভাষা-ব্যবহারে শুদ্ধতা ও দক্ষতা অর্জন ক'রতে, সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি কর'তে ও শিল্পসৌন্দর্যচেতনা সৃষ্টি ক'রতে শিক্ষাদানের সময় সহায়ক উপকরণগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক শিক্ষাদানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকরণগুলি ব্যবহার ক'রবেন। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের সময় নানাভাবে বোর্ডের ব্যবহার করা যায়। বানান-শিক্ষায়, ব্যাকরণ-শিক্ষায়, হাতের লেখা শিক্ষায় বোর্ডের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নীচু শ্রেণীগুলিতে রঙিন চক ব্যবহার ক'রতে পারলে শিক্ষাদান বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের সময় বিভিন্ন ছবির ব্যবহার করা যেতে পারে। গদ্যাংশ ও কবিতা পড়ানোর সময় বিষয়বস্তুর সার্থক চিত্ররূপ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধ'রতে পারলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিষয়বস্তুর মর্মগ্রহণ সহজ ও সার্থক হয়। বানান ও ব্যাকরণ পড়ানোর সময় বিভিন্ন ধরনের *Chart* বিশেষ কার্যকর। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য-সমৃদ্ধ সাহিত্যের বিষয় পড়ানোর জন্য মানচিত্রের ব্যবহারও করা যেতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ের মডেল সাহিত্য-শিক্ষাদানের পক্ষে সহায়ক। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলি শিক্ষার্থীদের ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের পরিপূরক। এগুলি নিয়মিত পাঠ ক'রে শিক্ষার্থীরা ভাষা ব্যবহারে দক্ষ হয়, সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হয়। দেওয়াল-পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি করা যায়, সৃজনশীলতার প্রতিফলন করা যায়। গ্রামোফোনের সাহায্যে বিভিন্ন আবৃত্তি, অভিনয় ও গানের রেকর্ড বাজিয়ে শিক্ষার্থীদের ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষাকে সার্থক ক'রে তোলা যায়। রেডিওর ও টেলিভিশনের বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান (আবৃত্তি, অভিনয়, আলোচনা, গান) শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষায় সহায়তা করে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সময়োপযোগী ক'রে এইসব উপকরণগুলিকে শিক্ষার সহায়ক হিসাবে ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ব্যবহার ক'রতে পারেন। এ ব্যাপারে *Tape recorder*-ও যথেষ্ট সাহায্য ক'রতে পারে। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথাযথ স্থানে উপযুক্ত শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ব্যবহার ক'রে শিক্ষাকে জীবন্ত ও সার্থক ক'রে তুলতে হবে।

ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষায় উপকরণের ব্যবহার

শিক্ষা-সহায়ক আরও কতকগুলি এমন বিষয় ও বস্তু আছে, যেগুলি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় বিশেষভাবে সহায়তা করে। পাঠ্যাগারকে যথাযথভাবে ব্যবহার ক'রতে পারলে

শিক্ষার্থীদের পক্ষে ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষায় বিশেষ সাহায্য হবে। শিক্ষার্থীরা পাঠাগার থেকে গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য ইত্যাদি বিভিন্ন বই নিয়ে পড়বে ও সাহিত্য-চর্চা ক'রবে, ফলে তাদের সাহিত্যানুরাগ বাড়বে, ভাষা-ব্যবহারে দক্ষতা আসবে। সাহিত্য ও সৃজনমূলক বিভিন্ন লেখার অনুশীলনও শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষায় বিশেষ সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের সৃজনধর্মী রচনায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ক'রতে হবে। শিক্ষার্থীরা আবৃত্তি, অভিনয় ও বিতর্কের অনুশীলন ক'রবে। বিভিন্ন সাহিত্যচক্র ও সাহিত্য-আলোচনাও শিক্ষার্থীদের ভাষাশিক্ষার পরিপূরক। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ক'রলেও শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষায় সাহায্য হয়। সাহিত্যমূলক বিভিন্ন প্রতিযোগিতাও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভাষা-শিক্ষার সহায়ক কর্ম হিসাবে এই ব্যবস্থাগুলিকে বিদ্যালয়ে কার্যকরী ক'রতে পারলে শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হবে।

ভাষা শিক্ষায় পরিপূরক অন্যান্য কার্যাবলী

শিক্ষা-সহায়ক বিভিন্ন উপকরণ **প্রস্তুত (Preparation)** করা যেতে পারে। শিক্ষক মহাশয় নিজে এগুলি ক'রতে পারেন, ছাত্রদের সাহায্যেও এগুলি প্রস্তুত ক'রতে পারেন। বিভিন্ন স্থান ও উৎস থেকে উপকরণগুলি **সংগ্রহ (Collection)** করা যেতে পারে। বাজার থেকে বিভিন্ন উপকরণ **ক্রয় (Purchase)** করা যেতে পারে। বাজারে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রকৃত বিভিন্ন উপকরণের সরবরাহ ও যোগান থাকলে সুবিধা হয়।

উপকরণগুলির পাওয়ার উপায়

শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলির ব্যবহার যথাযথ হওয়া প্রয়োজন। সব সময় মনে রাখতে হবে যে, উপকরণগুলি শিক্ষা-সহায়ক হবে। নতুবা কেবলমাত্র কতকগুলি উপকরণ দেখানোর কোন অর্থ হয় না। এই সব উপকরণগুলি সুনির্বাচিত হবে, প্রাসঙ্গিক হবে। এগুলিকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত ক'রতে পারলে, তাতে শিক্ষার্থীদের মনে তীব্র আবেদন ও অনুভূতির সৃষ্টি হয়। উপকরণগুলি ব্যবহারের জন্য পূর্বপরিকল্পনা থাকবে। উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের শ্রেণী বয়স ও বুদ্ধির উপযোগী হবে। একই উপকরণ বিভিন্ন শ্রেণীতে দেখানো উচিত নয়। উপকরণের সংখ্যাধিক্য যেন শিক্ষার অগ্রগতিকে ব্যাহত না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। উপকরণগুলি এমন স্পষ্ট, সুন্দর ও শিল্পমণ্ডিত হবে, যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোন অসুবিধা না হয়। শিক্ষক-শিক্ষণের সময় অথবা বিশেষ কোন *training*-এর মাধ্যমে এই সব উপকরণ প্রস্তুত ও প্রয়োগের কৌশল শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক মহাশয় উপকরণগুলির ব্যবহার সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকবেন। উপকরণগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার ক'রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাকে সার্থক ক'রে তুলবেন।

উপকরণগুলির ব্যবহার

কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলির ব্যবহারে বিশেষ সমস্যা দেখা যায়। সরকার, কর্তৃপক্ষ, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকের এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ নেই। অর্থের অভাবেও উপকরণগুলিকে সংগ্রহ করা যায় না। মাতৃভাষার

চর্চা ও অনুশীলন সম্পর্কে অনীহা ও শ্রদ্ধার অভাব সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে ভাল ও উন্নত মানের শিক্ষাসহায়ক উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। পাঠ্যক্রমের চাপে সময়ের অভাব দেখা যায় ফলে, ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের সময় উপকরণগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায় না। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্যোগের অভাবে শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলির ব্যবহারের সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে,—শিক্ষাও চলেছে পুরানো গতানুগতিক পথে।

বাস্তব অবস্থা

অনুশীলনী

১। শিক্ষণকালে বাংলা পড়াইতে যেসব বিশেষ উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার উপকারিতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব. বি. এড. ১৯৭০)

অষ্টাদশ অধ্যায়

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

[Test and Evaluation]

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরীক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিদ্যালয়-পরিচালনার জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। পরীক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের পরবর্তী উচ্চশ্রেণীতে উত্তীর্ণ ক'রে শ্রেণী-পাঠন (*class teaching*) ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়। শিক্ষার্থীরা একটি শিক্ষাবর্ষে কোন্ বিষয় কতখানি জ্ঞান অর্জন ক'রল, তার পরিমাপ পরীক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। ফলে, ভালো ছাত্র আরও ভাল ক'রবার ও পিছিয়ে-পড়া ছাত্র তার দুর্বলতা দূর ক'রবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রতে পারে। পরীক্ষার মাধ্যমে অভিভাবকেরাও তাঁদের পুত্র-কন্যা-ভ্রাতার শিক্ষাগত অগ্রগতি জানতে পারেন। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষকের যোগ্যতার পরিমাপ সম্ভব। কোন একটি শিক্ষা-বর্ষে কোন একজন শিক্ষক কোন একটি বিষয় পড়িয়ে কতখানি সাফল্য লাভ ক'রেছেন, তা পরীক্ষার মাধ্যমেই জানা যায়। পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষাদান-পদ্ধতির দোষ-গুণ ধরা পড়ে। কোন শিক্ষাদান-পদ্ধতির মাধ্যমে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাচ্ছে কি না, তা ধরা প'ড়ে পরীক্ষার মাধ্যমেই। সরকার শিক্ষাখাতে অর্থবরাদ্দ করেন, অর্থব্যয় করেন। কাজেই জাতীয় শিক্ষানীতি রক্ষা ক'রতে হ'লে সরকারের দিক্ থেকেও পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। পরীক্ষাকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ ও উৎসাহ অনেক বেড়ে যায়। পরীক্ষার মাধ্যমে কোন বিষয়ে যোগ্যতম প্রার্থী-নির্বাচন সম্ভব। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরীক্ষা তাই অপরিহার্য।

পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা পুস্তক-সর্বস্ব, মুখস্থ-নির্ভর, শিক্ষক-কেন্দ্রিক ও পরীক্ষা-শাসিত। প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থাতেও তাই পুস্তক-প্রাধান্য ও মুখস্থ-নির্ভরতা লক্ষ্য করা যায়। তাই বর্তমানের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি সকলেই আস্থা হারিয়েছেন। পরীক্ষায় পাশ (*Pass*) করাই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত হ'য়েছে। শিক্ষার্থীরা চায় পরীক্ষায় পাশ ক'রতে, অভিভাবকেরা চান তাঁদের ছেলে-মেয়ে পরীক্ষায় পাশ করুক,—শিক্ষকও চান যে, তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় পাশ করুক। গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থাই পরীক্ষার দিকে তাকিয়ে অগ্রসর হ'চ্ছে। শিক্ষা এইভাবে পরীক্ষা-শাসিত হ'য়ে পড়েছে। শিক্ষাও জ্ঞানের যথাযথ পরিমাপ প্রচলিত পরীক্ষায় সম্ভব নয়। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মুখস্থ শক্তির যতখানি পরিমাপ করা যায়, জ্ঞান ও শিক্ষার পরিমাপ ততখানি হয় না। **তাই পরীক্ষা (Examination) নয়,—প্রয়োজন মূল্যায়ন (Evaluation)**। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও শিক্ষার যথাযথ মূল্যায়ন ক'রতে হবে। এমন একটি ব্যবস্থা প্রচলিত ক'রতে হবে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চরিত্রের উন্নতি, বুদ্ধির বিকাশ, জ্ঞানের গভীরতা, মননের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতির পরিমাপ সম্ভবপর হয়। সেই পরিমাপই হবে যথার্থ মূল্যায়ন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তখন পুস্তক ও মুখস্থের প্রাধান্য

পরীক্ষা নয়,—মূল্যায়ন

অবলুপ্ত হ'য়ে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার যথাযথ কদর বেড়ে যাবে। শিক্ষার গুণগত ও মানগত পরিমাপই হ'ল মূল্যায়ন।

ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন হ'ল শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ। কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হয়, তার পরিমাপই হ'ল মূল্যায়ন। ভাষা-ব্যবহারে দক্ষতা-অর্জন ও রসানুভূতির আস্বাদনই ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের মূল কথা। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি হ'ল,—শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তন, মনন, লিখন, কথন প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতি-বিধান। শিক্ষার্থীরা ভাষা-ব্যবহারে দক্ষ হবে। তারা ভাষার সঠিক উচ্চারণ জানবে, নির্ভুল বানান জানবে, শব্দগুলির অর্থ জানবে; বাক্যগঠন-কৌশল জানবে ও ভাষার অর্থ গ্রহণ এবং বিষয়বস্তু উপলব্ধি ক'রতে সক্ষম হবে। শিক্ষার্থী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার মাধ্যমে শুদ্ধভাবে ভাষা লিখতে, পড়তে ও বলতে পারবে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবহিত হবে, লেখকের বক্তব্য ও *style* গ্রহণ ক'রতে সক্ষম হবে এবং নিজেদের স্বাধীন ধারণা ও চিন্তাশক্তিতে সমুজ্জ্বল হবে। তবে সাহিত্য-শিক্ষাদানে রসানুভূতির দিকটি অবহেলিত হ'লে চলবে না। ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাই শুধুমাত্র বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পরিমাপ ক'রলে চলবে না। ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে পৌছাতে পেরেছে কিনা, তা পরিমাপ করাই মূল্যায়নের কাজ। শিক্ষার্থীদের ভাষা-ব্যবহারে দক্ষতা-অর্জন, রসধ্বনির আস্বাদন ও বিষয়বস্তু আয়ত্তীকরণের সার্থক পরিমাপই হ'চ্ছে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সার্থক মূল্যায়ন।

ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের ভূমিকা

ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে **রচনাধর্মী অভীক্ষা (Essay-type Examination)** বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। গদ্যাংশ ও কবিতা ইত্যাদি শিক্ষাগ্রহণ ক'রে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু কতখানি আয়ত্ত ক'রতে পেরেছে, তার পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। রচনাধর্মী পরীক্ষার অনেকগুলি সুবিধা আছে। *"Essay-type tests are easy to prepare and administer, that it is possible to use them for all subjects of curriclum."* এই শ্রেণীর অভীক্ষায় কোন একটি গদ্যাংশ বা কবিতা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর পূর্ণ ধারণার পরিমাপ ক'রতে পারা যায়। শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান, শব্দ-ব্যবহার, বাক্যগঠন-কৌশল, যুক্তি-নির্ভরতা, ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা ইত্যাদি রচনাধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়। শিক্ষার্থীদের রসানুভূতিমূলক পাঠে (*Appreciation lesson*) রচনাধর্মী অভীক্ষার প্রয়োজন আছে। তবে রচনাধর্মী অভীক্ষার অনেকগুলি ত্রুটি আছে। শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ বই থেকে মুখস্থ ক'রে এসে পরীক্ষার উত্তর দেয়। কয়েকটি নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ ক'রেই অনেকে পরীক্ষা-বৈতরণী পার হ'য়ে যায়। সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে ভাল ধারণা না থাকলেও

তারা ভাল নম্বর পায়। এর ফলে *Suggestion, Note Book, Made Easy* প্রভৃতি পুস্তকে বাজার ছেয়ে যায়। *Tutorial Home* প্রভৃতির সংখ্যাও বেড়ে যায়। শিক্ষা তখন পুরোপুরি ব্যবসায়ে পরিণত হয়। এই অবস্থা কখনই কাম্য নয়। শিক্ষার মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দিতে চাই,—কেবলমাত্র পরীক্ষায় পাশ করাতে চাই না। রচনাধর্মী পরীক্ষায় মুখস্থ বিদ্যা ও পুস্তকের প্রাধান্য অনেক বেশী। তাছাড়া, এই জাতীয় পরীক্ষায় নম্বরগুলিও মান অনুযায়ী সমভাবে দেওয়া যায় না। একই উত্তরপত্রে বিভিন্ন পরীক্ষক বিভিন্ন নম্বর দেন ; অনেক সময় একই পরীক্ষক একই উত্তরপত্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নম্বর দেন। *Prof. Sandiford* তাই ব্যঙ্গ ক'রে ব'লেছেন,—*"It (marks) alters from hour to hour and does not mean the same thing before lunch and after lunch".* রচনাধর্মী পরীক্ষায় কয়েকটি মাত্র প্রশ্ন করা সম্ভব। কাজেই সম্পূর্ণ পাঠ্য-ক্রমের উপর শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় না। শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা এই জাতীয় পরীক্ষা গ্রহণের অন্তরায় সৃষ্টি করে। রচনাধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক সত্তা ও সম্পূর্ণ যোগ্যতার পরিমাপ সম্ভব নয়। তাই এই ব্যবস্থার প্রতি সকলেই আস্থা হারিয়েছে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, আগ্রহ, প্রবণতা, কৌতূহল প্রভৃতি কোনটারই যথাযথ পরিমাপ হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় রচনাধর্মী অভীক্ষার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যায়নে রচনাধর্মী অভীক্ষার প্রয়োজন আছে। রচনাধর্মী অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান, যুক্তিবিন্যাসের ক্ষমতা, বিষয়বস্তুর আয়ত্তীকরণ প্রভৃতির মূল্যায়ন সম্ভব হয়। রসানুভূতিমূলক পাঠে রচনাধর্মী অভীক্ষার প্রয়োজন আছে। ভাব-সম্প্রসারণ, রচনালেখা, পত্রলিখন প্রভৃতিও রচনাধর্মী পরীক্ষার মধ্যে পড়ে। দ্রুতপঠনের উপরও রচনাধর্মী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

রচনাধর্মী পরীক্ষা

সংক্ষিপ্ত উত্তরদানের প্রশ্ন (short-answer-type question), টিকা-টিপ্পনী (short-notes) ও ব্যাখ্যা (Explanation) রচনাধর্মী পরীক্ষার ভিন্নতর অবস্থা মাত্র। কোন বিষয়ের বিভিন্ন দিকের উপর ছোট ছোট কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। কয়েকটি ছোট প্রশ্ন নিয়ে একটি বড় প্রশ্ন হয়। ছোট ছোট প্রশ্ন হয় বলে কোন বিষয়ের বিভিন্ন দিকের আলোচনা এই ব্যবস্থায় সম্ভব হয়। এই জাতীয় পরীক্ষাকে সংক্ষিপ্ত উত্তরদানের প্রশ্নাবলী বলে। কখনও কখনও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম, স্থান, বিষয় প্রভৃতি দিয়ে তার উপর আলোচনা ক'রতে বলা হয়, একে টীকা-টিপ্পনী বলে। গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ থেকে ২।৪টি গুরুত্বপূর্ণ ছত্র লিখে তার অন্তর্নিহিত ভাবকে বিশ্লেষণ ক'রতে বলা হয়। এগুলিকে ব্যাখ্যা বলে। ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত উত্তর দানের প্রশ্নাবলী, টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যার বিশেষ গুরুত্ব আছে। প্রচলিত পরীক্ষাতে এগুলির যথাযথ প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দানের প্রশ্ন, টীকাটিপ্পনি ও ব্যাখ্যা

রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি এড়াতে **নৈর্ব্যক্তিক বস্তুধর্মী অভীক্ষার (objective**

test) ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। এই শ্রেণীর প্রশ্নে খুব ছোট ছোট উত্তরযুক্ত অনেকগুলি প্রশ্ন করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের সমস্ত পাঠক্রমই পড়তে হয়। সমস্ত পাঠ্যক্রম জুড়ে প্রশ্ন থাকে। মুখস্থ চলে না। পুস্তক প্রাধান্য খর্ব হয়। ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রয়োজন আছে। বস্তুনিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তথ্যজ্ঞান, সামাজিক প্রথা, ঘটনার কালগত পরিচয়, শব্দার্থ, শব্দ প্রয়োগ, বিষয়বস্তুর সম্যক ধারণা, চরিত্র-চিত্রণ, ভাষা ও ভাববোধের যাথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব হয়। পাঠ্যাংশটিকে শিক্ষার্থীরা নিখুঁত-ভাবে পড়েছে কিনা, তার মূল্যায়ন নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। এই জাতীয় অভীক্ষায় সঠিক নম্বর দান সম্ভব হয়। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বাংলা সাহিত্যের উপর নিদর্শন-মূলক নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাপত্র প্রকাশ করেন। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা নানারকম হয়। সামঞ্জস্য বিধান, সম্পূর্ণকরণ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়, সত্য-মিথ্যা নির্ণয়, স্মৃতি-রোমন্থন, সংজ্ঞামূলক, পার্থক্য নির্দেশক, সম্পর্ক-স্থাপয়ক, শ্রেণীবিন্যাস ও সাদৃশ্য অনুযায়ী সাজানো ইত্যাদি হল বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষার বিভিন্ন রূপ। কোনো একটি রচনার বিভিন্ন শব্দ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার ও মূল্যায়নের সুযোগ বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষায় থাকে। শব্দগুলির বানান, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ (বিশেষ্য পদ, বিশেষণ পদ ইত্যাদি) ইত্যাদি সম্পর্কে মূল্যায়ন নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। বিভিন্ন শব্দের মধ্যে আবার প্রকৃতি বর্ণনামূলক, প্রাণীবিষয়ক, উদ্ভিদ-বিষয়ক, বিভিন্ন ধরনের বিশেষণ, পুস্তক বস্তুমূলক শব্দের পরিচয় ইত্যাদির সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানা যায় নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা থেকে। ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষায় তাই নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার গুরুত্ব আছে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় প্রশ্ন করা কঠিন। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার *Hall*-এ কথা বলে ও আন্দাজের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দেয়। তাই নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ব্যবস্থাও পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক নয়।

বস্তুনিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা

যথাযথ মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের **মৌখিক পরীক্ষা (oral test)** গ্রহণ ক'রতে হবে। মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময় কেবলমাত্র সময়ের উপর গুরুত্ব না দিয়ে যথাযথ পরিমাপ ও মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা, ভাষার দখল, উচ্চারণ ক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি, মনে রাখার ক্ষমতা, শব্দ চেতনা, বাক্যগঠন কৌশল, সাহিত্যচেতনা প্রভৃতির পরিমাপ মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। প্রচলিত পরীক্ষায় ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যায়নে মৌখিক পরীক্ষার স্থান নেই। কিন্তু ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে নতুন শিক্ষাক্রম শুরু হ'য়েছে, তাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যায়নে মৌখিক পরীক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সুনির্দিষ্ট কথা বলেছেন। যা হোক, ষষ্ঠ শ্রেণীতে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ১০% নম্বর নির্দিষ্ট আছে। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতেও তাই। ষষ্ঠ শ্রেণীতে মৌখিক পরীক্ষার বিষয় হল 'আবৃত্তি, গদ্য-পদ্য হইতে পাঠ, প্রশ্নোত্তরদান', সপ্তম শ্রেণীতে 'আবৃত্তি, সাহিত্যপাঠ, অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে আলোচনা বা প্রশ্নোত্তর দান', অষ্টম শ্রেণীতে 'আবৃত্তি, সাহিত্যপাঠ, অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে আলোচনা বা প্রশ্নোত্তর

মৌখিক পরীক্ষা

দান'। নবম ও দশম শ্রেণীতে মৌখিক পরীক্ষার উপর আরও গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। এক্ষেত্রে ২০% নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট আছে। নবম ও দশম শ্রেণী বাংলাভাষার মোট দুটি প্রত্রের ২০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। তার মধ্যে ২০+২০=৪০ নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট আছে। এক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার বিষয় হ'ল,—'আবৃত্তিপাঠ, নাট্যাংশ পঠন, বিতর্ক, আলোচনা, কথোপকথন, প্রশ্নোত্তরদান ইত্যাদি'। ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যায়নে মৌখিক পরীক্ষার প্রবর্তনকে স্বাগত জানাতে হয়। তবে বিদ্যালয়ে যদি আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক ইত্যাদির যথাযথ ব্যবস্থা না থাকে, তবে মৌখিক পরীক্ষা সফল হ'তে পারে না।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন শাখা আছে। গদ্যাংশ, কবিতা, ব্যাকরণ, দ্রুতপঠন, ভাবসম্প্রসারণ, ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাস, রচনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় বাংলা ভাষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূত। এগুলির উপর শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। প্রচলিত পরীক্ষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রই রচনাধর্মী অভীক্ষায় ব্যবস্থা আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত উত্তর দানের প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনী থাকে। বাংলা ভাষার মূল্যায়নে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তবে রসানুভূতিমূলক সাহিত্যের মূল্যায়নে রচনাধর্মী অভীক্ষাকেও অস্বীকার করা যায় না। যথেষ্ট চিন্তা ও পরিকল্পনা সহকারে শিক্ষার্থীদের মান অনুযায়ী তাদের শিক্ষাগত অগ্রগতির পরিমাপ ক'রতে হবে। প্রশ্নগুলির ভাষা হবে সহজ। প্রশ্নপত্র পাণ্ডিত্য প্রকাশের ক্ষেত্র নয়,—একথা মনে রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হয়ে তাদের ভাষা ও সাহিত্যের অর্জিত জ্ঞানের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে।

ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মূল্যায়ন

ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। এই জাতীয় কার্যাবলী শ্রেণীপাঠনের পরিপূরক। শিক্ষার্থীদের ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা ও সাহিত্যরসানুভূতি সহপাঠ্যক্রমিক বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়, বিদ্যালয়ে আবৃত্তি, বিতর্ক, আলোচনা, রচনা, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি লেখা ইত্যাদি সাহিত্যানুশীলনমূক কার্যাবলীর ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকবে। সেসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা, অনুরাগ ও দক্ষতাকে মূল্যায়নের সময় গুরুত্ব দিতে হবে। কোন একদিনের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এক বছরের সাহিত্যানুভূতিমূলক অগ্রগতির বিচার হয় না। তাই সার্থক মূল্যায়নের জন্য তাদের প্রতিদিনের কার্যক্রম ও *performance*-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শিক্ষার্থীরা নির্ভুলভাবে ভাষা ব্যবহার ক'রছে কি না, ভাষা-ব্যবহারে তারা দক্ষ হ'য়ে উঠেছে কি না, তারা সাহিত্যানুরাগী হ'য়েছে কি না, সাহিত্যের রসানুভূতির আস্বাদন তাদের পক্ষে সম্ভব হ'চ্ছে কি না, সৃজনমূলক সাহিত্যসৃষ্টি তাদের পক্ষে সম্ভব হ'চ্ছে কি না,—এগুলিই মূল্যায়নের মূল কথা। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অগ্রগতির পরিমাপ ক'রতে বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর আয়ত্তীকরণের পরিমাপ কখনই সার্থক মূল্যায়ন হ'তে পারে না, ভাষা ও সাহিত্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষাদানের মাধ্যমে কতখানি সফল হ'য়েছে তারই পরিমাপ হয় মূল্যায়নের মাধ্যমে। **মূল্যায়ন তাই শিক্ষার্থীদেরও মুখস্থবিদ্যার পরিমাপ নয়, শিক্ষার্থীদের ভাষা জ্ঞান ও সাহিত্য চেতনার সামগ্রিক বিচারই হ'চ্ছে ভাষা ও সাহিত্যের সার্থক মূল্যায়ন।** ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যায়নে তাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে ;—

সার্থক মূল্যায়ন

॥ এক। শিক্ষার্থীরা নির্ভুলভাবে ভাষা ব্যবহার করবে, ভাষা ব্যবহারে তারা দক্ষ হবে। এই প্রসঙ্গে শুদ্ধ বানান, শব্দার্থ, বাক্যগঠন কৌশল ও *Style* সম্বন্ধে তারা যথেষ্ট সচেতন হবে।

॥ দুই ॥ সাহিত্য শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা রসাস্বাদনে সক্ষম হবে। তাদের মধ্যে সাহিত্য, সৌন্দর্য্যবোধ নন্দনকলা বিকশিত হবে, শিল্প ও সৌন্দর্যের অভিনব আস্বাদনে তারা সক্ষম হবে।

॥ তিন ॥ শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় সক্ষম হবে—তারা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি সৌন্দর্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি ক'রতে সক্ষম হবে।

॥ চার ॥ ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরিষ্কারভাবে বিষয়বস্তুকে গ্রহণ ক'রতে সক্ষম হবে। কোন গল্প কবিতার ইত্যাদির মাধ্যমে লেখক কি বলতে চেয়েছেন, তা তারা জানবে এবং তার উপর নিজস্ব মতামত দানে তারা সক্ষম হবে।

॥ পাঁচ ॥ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ জাগবে, তারা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠাগার থেকে বিভিন্ন বই নিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ হবে।

॥ ছয়। আবৃত্তি, অভিনয়, আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা জাগবে।

এই সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়, তার প্রচেষ্টা শিক্ষাদানের মধ্যে থাকবে, এবং তার উপরই হবে সার্থক মূল্যায়ন।

অনুশীলনী

১। ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষার কোন্ কোন্ স্থলে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন সার্থকভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে? বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নাদি উল্লেখ করিয়া আলোচনা করুন।

(উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৮)

বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

বিষয় [Contents]

প্রথম অধ্যায়

বাংলা লিপি

[The Bengali Script]

ভাষার স্থায়ী রূপের জন্য লিপির প্রয়োজন। ভাবের আদান-প্রদানের জন্যই ভাষা। মনের ভাব অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভাষার লিপি-নির্ভর লেখ্য রূপের প্রয়োজন হয়। 'বাঙ্ময় ধ্বনির দৃশ্যরূপই লিপি।'[১] ভাষা মানুষের সচেতন মনের বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি। ভাষাকে স্থায়ী, লেখ্য ও সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়ার জন্য বর্ণমালা বা লিপির প্রয়োজন। মানুষের মন প্রকাশ-প্রবণ,—সে আপনাকে প্রকাশ ক'রতে চায়; অভিব্যক্ত ক'রতে চায় মনের ভাব, অনুভূতি ও চিন্তাধারাকে। শিল্প-সাহিত্য হ'ল প্রকাশের স্থায়ী মাধ্যম। ভাষা ও সাহিত্যের লিপি-নির্ভর লিখিত রূপের মধ্যেই মানুষ তার আপন ভাবনা ও অনুভূতি সুন্দর ক'রে পৌঁছে দিয়ে যায় আগামী দিনের মানুষের জন্য,—চিরস্থায়ী ক'রে ধ'রে রাখতে চায় আপন ভাবনা-বেদনার আনন্দময় অভিব্যক্তি। তার জন্য প্রয়োজন লিপি। লিপির উদ্ভব ও বিকাশের বিবর্তনে কয়েকটি সুস্পষ্ট স্তর লক্ষ্য করা যায়।

লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

॥ এক ॥ চিত্রাঙ্কনই হ'ল লিপির প্রাথমিক পর্যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ চিত্রাঙ্কনের মধ্যেই মনের ভাব প্রকাশ ক'রত। পর্বতগাত্রে ও গুহায় এর নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখনও বহু প্রাচীন অনুন্নত সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে লিপির চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি বর্তমান। বিভিন্ন রঙের দড়িতে গিঁট দিয়ে বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুকে প্রকাশ ক'রবার প্রচলনও দেখা যায়। একে **কুইপু (Quipu)** বা গ্রন্থিলিপি বলে।

॥ দুই ॥ লিপির ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে চিত্রলিপি **(Pictogram)** ও **ভাবলিপি (Ideogram)** দেখা যায়। এই পর্যায়ে রেখাচিত্রের মাধ্যমে কোন ঘটনা বা বস্তুকে বোঝানো হ'ত, যেমন,—মাথায় বোঝা মানুষ-এর রেখাচিত্র দিয়ে 'বহন করা'—এই অর্থ প্রকাশ করা হ'ত।

॥ তিন ॥ লিপির বিবর্তনের তৃতীয় পর্যায় হ'ল **শব্দলিপি (Phonogram)**। শব্দলিপিতে রেখাচিত্র বস্তু ও বিষয়-নির্দেশক শব্দ বা ধ্বনিগুচ্ছ নির্দেশিত ক'রল। প্রাচীন চীন ও প্রাচীন মিশরের চিত্র ও প্রতীক-লিপি এই স্তরের নিদর্শন।

॥ চার ॥ লিপির ক্রম-বিবর্তনের **চতুর্থ পর্যায়** হ'ল **অক্ষর লিপি (Syllabic Script)**। অক্ষর লিপিতে শব্দচিত্র সংক্ষিপ্ত ও সাংকেতিক হয়, শব্দচিত্রের রেখাও সংক্ষিপ্ত হয়।

১। ডঃ সুকুমার সেন

॥ **পাঁচ** ॥ লিপির বিবর্তনের শেষ বা **পঞ্চম পর্যায়** হ'ল **ধ্বনি-লিপি (Alphabetic Script)**। ধ্বনি-লিপিতে একক ধ্বনির লিপিরূপ নির্দিষ্ট হ'ল।

চারটি প্রাচীন লিপি পদ্ধতি থেকে আজকের সভ্যজগতের লিপিগুলি উদ্ভূত হ'য়েছে, সেগুলি হ'ল,—

১। **মিশরীয় লিপিচিত্র** ৩। **চীনীয় লিপিচিত্র**
২। **ভারতীয় লিপিচিত্র** ৪। **মেসোপোটেমীয় লিপিচিত্র।**

মিশরীয় লিপিচিত্রের প্রাচীন রূপ হ'ল প্রতীক-লিপি *(Hieroglyphic)*। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ফিনিশীয়রা মিশরে গিয়ে এই লিপি গ্রহণ করে। ফিনিশীয় লিপি থেকেই গ্রীক, রোমান, হিব্রু, আরবী প্রভৃতি বর্ণমালার উদ্ভব হয়। অশোকের অনুশাসনে ভারতের প্রাচীন লিপি খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মীর পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে আধুনিক ভারতীয় লিপিমালার উদ্ভব হয় ব্রাহ্মী লিপি থেকে। চীন ও জাপানে প্রচলিত লিপির উদ্ভব হ'য়েছে চীনীয় লিপি থেকে। মেসোপোটেমীয় লিপিকে বাণমুখ বলা হয়। এই লিপি-পদ্ধতি বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে।

ভারতবর্ষে অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে। প্রত্যেকটি উন্নত ভাষারই নিজস্ব লিপিমালা আছে। ভারতবর্ষে প্রধানত তিন রকমের লিপিমালা প্রচলিত আছে। সেগুলি হ'ল—

১। **ব্রাহ্মী লিপি** ২। **খরোষ্ঠী লিপি** ৩। **রোমান লিপি**

ফিনিশীয় লিপির সঙ্গে **ব্রাহ্মী লিপির** সাদৃশ্য আছে বলে অনেকে মনে করেন। কিভাবে এই লিপির উদ্ভব হয়েছে, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। ব্রাহ্মী লিপিই ভারতের প্রাচীনতম লিপি। ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব সম্পর্কে তিনটি মত প্রচলিত আছে ;—

(১) ভারতের মাটিতে আর্যরাই এই লিপি সৃষ্টি ক'রেছে।

(২) খ্রীষ্ট-পূর্ব আনুমানিক এক হাজার অব্দে ভারতীয় বণিকগণ এই লিপি বিদেশ থেকে গ্রহণ করেছেন। ফিনিশীয় লিপির সঙ্গে ব্রাহ্মী লিপির সম্পর্ক দেখে অনেক এই কথা মনে করেন।

(৩) মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার প্রাক্-আর্য যুগের লিপিচিত্র পরবর্তী কালে ব্রাহ্মী লিপিতে রূপান্তরিত হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার অব্দে ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন ছিল বলে অনুমান করা হয়। অশোকের অধিকাংশ অনুশাসনই ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ ছিল। পরবর্তী কালে নানা বিবর্তনের পথ ধ'রে ব্রাহ্মী সহজ ও সরল হ'য়ে নানাভাবে পরিবর্তিত হ'য়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির লিপিমালার জন্ম দেয়। ব্রাহ্মী লিপি দু'প্রকার,—

১। **কুষাণ লিপি,** ২। **দক্ষিণ ভারতের লিপি।**

কুষাণ লিপি প্রধানত উত্তর ভারতের লিপি। কুষাণ লিপি পরবর্তী কালে গুপ্ত লিপিতে রূপান্তরিত হয়। **গুপ্ত লিপি** পরবর্তী কালে তিনটি ধারায় বিভক্ত হয় :—

॥ **এক** ॥ উত্তর-পশ্চিম ভারতের **'শারদা'**। এই ধারা থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের আধুনিক ভাষার (যেমন—গুরুমুখী, তিব্বতী, কাশ্মীরী প্রভৃতি) লিপিমালা উদ্ভূত হ'য়েছে।

॥ **দুই** ॥ মধ্য ভারতের **'নাগর'**। এই ধারা থেকে দেবনাগরী, গুজরাটী প্রভৃতি লিপির উদ্ভব হয়।

॥ **তিন** ॥ পূর্ব ভারতের **'কুটিল'**। এই ধারা থেকে পূর্ব ভারতের ওড়িয়া, নেপালী, বাংলা, অসমিয়া প্রভৃতি লিপির উদ্ভব হয়।

দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মী লিপি থেকে তামিল, তেলেগু, কানাডা, মালয়ালাম প্রভৃতি লিপি উদ্ভূত হয়।

হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে তিব্বত, সুমাত্রা, জাভা, বর্ণিয়ো, মালয়, শ্যামদেশ, কাম্বোজ ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন ভাষার লিপির উপর ব্রাহ্মী লিপির প্রভাব পড়ে। মূল ব্রাহ্মী লিপি থেকেই এই লিপিমালা উদ্ভূত।

ব্রাহ্মী লিপির পূর্ব ভারতীয় 'কুটিল' শাখা থেকেই বাংলা লিপির উদ্ভব। দ্বাদশ শতাব্দীতেই বাংলা লিপি তার নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করে।

শেমীয় লিপি থেকে **খরোষ্ঠী লিপির** উদ্ভব হয়। সিরীয়দের নিকট থেকে আরবেরা এই লিপি গ্রহণ করে। আরবেরা পারস্য জয় করে, তখন পারস্যেও এই লিপি প্রচলিত হয়। এখান থেকেই আরবী-ফারসী লিপির উদ্ভব হ'য়েছে। অশোকের কিছু কিছু অনুশাসনে খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার দেখা যায়। আরবী, উর্দু, সিন্ধী প্রভৃতি লিপি খরোষ্ঠী লিপি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

গ্রীক লিপি পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হ'য়ে **রোমান লিপিতে** পরিণত হয়। গ্রীক লিপি এসেছিল ফিনিশীয় লিপি থেকে। ওলন্দাজ নাবিকগণ এদেশে এলে রোমান হরফের প্রচলন শুরু হয়। ম্যানুয়েল-দ্য-আসুস্পসাঁও রচিত বাংলা ব্যাকরণ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন শহর থেকে প্রকাশিত হয়। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-ও রোমান হরফে লিখিত। ইংরেজী ভাষার লিপি প্রধানত রোমান হরফ। আমাদের দেশে ইংরেজীকে বাদ দিয়ে রোমান লিপির বিশেষ ব্যবহার অন্য কোথাও নেই।

॥ ভারতের লিপি-সমস্যা ॥

ভারতবর্ষে অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে, লিপিও অনেকগুলি। এতগুলি ভাষা ও লিপি জাতীয় ভাবগত ঐক্যে *(National Emotional Integration)* বাধার সৃষ্টি করে। তাই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যবহারের ভাষা হিসেবে একটি ভাষা ও একটি লিপিকে গ্রহণ ক'রতে পারলে ভাল হ'ত।

খরোষ্ঠী লিপিতে উর্দু, সিন্ধী প্রভৃতি ভাষা প্রকাশিত হয়। এই লিপিতে সংখ্যা-বাচক শব্দগুলি বাম থেকে ডানে লেখা হয়, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ডান থেকে বামে লেখা হয়। ইহা প্রচলিত রীতির বিপরীত। কিছু কিছু বিন্দু দিয়ে অনেকগুলি অক্ষর প্রকাশ করা হয়। এই লিপি অবৈজ্ঞানিক। ফরাসী ভাষার সমস্ত ধ্বনি এই লিপিতে প্রকাশ করা যায় না; তার জন্য আরও ৪টি পৃথক লিপির প্রয়োজন হয়। উর্দুর ৩৫টি বর্ণের ২৮টির লিপি আরবী। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই লিপির সঙ্গে অন্য লিপির বিশেষ কোন সম্পর্ক বা সাদৃশ্য নেই।

খরোষ্ঠী লিপির অসুবিধা

রোমান লিপির প্রচলন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমান। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ও সর্বাধিক প্রচলিত আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীর অক্ষরগুলির লিপি হ'ল রোমান লিপি। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রোমান লিপিকে ভারতীয় ভাষার উপযোগী করে গ্রহণ করতে বলেছেন। রোমান লিপি অনেক সহজ, লিপির রেখাবিন্যাসও সহজ, বর্ণের সংখ্যা বেশী নয়, যুক্তাক্ষরের সমস্যা নেই। শিক্ষিত মানুষ মাত্রেই রোমান লিপির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু রোমান লিপিতে ভারতের সব ভাষাগুলির সব ধ্বনিকে প্রকাশ ক'রবার অস্থবিধা আছে। রোমান লিপিমালা বৈজ্ঞানিক নয়। রোমান লিপি ভারতের ক্ষেত্রে গ্রহণ ক'রতে হ'লে আমাদের প্রচলিত লিপি-রীতির আমূল পরিবর্তন করতে হ'বে।

রোমান লিপিবদ্ধ সম্বন্ধে মতামত

ব্রাহ্মী লিপি থেকেই ভারতবর্ষের অধিকাংশ আধুনিক লিপিগুলির উদ্ভব হ'য়েছে। ব্রাহ্মী লিপির দেবনাগরী হরফের অনেক স্থবিধা আছে। দেবনাগরী লিপির সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় অধিকাংশ লিপির সম্পর্ক আছে। দেবনাগরী লিপিগুলি বৈজ্ঞানিক ভাবে সজ্জিত। ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃত ভাষার মূল্যবান গ্রন্থ ইত্যাদি এই হরফেই প্রকাশিত। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার ৬% মানুষ এই লিপির সঙ্গে কম বেশী পরিচিত। তবে দেবনাগরী লিপির অস্থবিধা আছে। দেবনাগরীর অনেকগুলি বর্ণ, যুক্তাক্ষরও আছে। স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণের জটিলতা আছে।

ব্রাহ্মী লিপির দাবী

ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী ও রোমান যে তিন শ্রেণীর লিপি ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তাদের স্থবিধা অস্থবিধা আলোচনা করা হ'ল। অবস্থা পর্যালোচনা করে খরোষ্ঠী লিপিকে সর্বভারতীয় লিপির ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, এই লিপিতে ডান থেকে বামে লিখতে হয়, যা প্রচলিত রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। রোমান লিপির স্থবিধা অনেক, কিন্তু এই লিপি গ্রহণ করতে হ'লে প্রচলিত অনেক লিপি ও বর্ণকে পরিত্যাগ ক'রতে হবে। তাই ব্যাপারটি অত সহজ নয়। সেক্ষেত্রে দেবনাগরী লিপিকে কিছুটা সহজ ও সরল ক'রে নিয়ে সর্বভারতীয় লিপি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্রাহ্মী লিপি থেকে ভারতের অন্যান্য আধুনিক ভাষার লিপিমালা উদ্ভূত হয়েছে। তাই প্রচলিত দেবনাগরী লিপিকে সংস্কার করে সহজ, সরলভাবে সর্বভারতীয় লিপি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভাষা-ব্যবহারের স্থবিধা হবে, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হবে। ফলে, জাতীয় ভাবগত ঐক্য প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।

সিদ্ধান্ত

॥ বাংলা লিপি ॥

ব্রাহ্মী লিপির পূর্বভারতীয় 'কুটিল' শাখা থেকেই বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে। তাই ব্রাহ্মী লিপির অন্যান্য ভাষা ও লিপির সঙ্গে বাংলা লিপির সম্পর্ক আছে।

যে-কোন উন্নত ভাষার মত বাংলা ভাষারও নিজস্ব লিপিমালা আছে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলা লিপির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বাংলা বর্ণমালা বহিরঙ্গে বাংলা হলেও অন্তরঙ্গে দেবনাগরী। বাংলা লিপির বাইরে লিখিত রূপ নিজস্ব হ'লেও অন্তরঙ্গ উচ্চারণে তা দেবনাগরীর সামিল। তবে উচ্চারণের ক্ষেত্রে দেবনাগীরর মত অত হ্রস্ব-দীর্ঘ, ঘোষ-অঘোষ ইত্যাদি সূক্ষ্ম 'উচ্চারণ মেনে চলা হয় না। বাংলা লিপি দু'ভাগে বিভক্ত—স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।

স্বরবর্ণ

(অ, আ, ই, ঈ' উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ) ১১টি স্বরবর্ণ হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণে বিভক্ত হলেও উচ্চারণে তা সব সময় রক্ষিত হয় না। অনাবশ্যক বলে স্বরবর্ণ থেকে ঌ ও ৠ পরিত্যক্ত হ'য়েছে। স্বরবর্ণের মধ্যে কতকগুলি হ্রস্বস্বর (অ, ই, উ, এ, ও প্রভৃতি), কতকগুলি দীর্ঘস্বর (আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ ইত্যাদি)।

ব্যঞ্জনবর্ণ

স্বরবর্ণের সাহায্য নিয়েই ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হয়, তবে ব্যঞ্জনবর্ণের নিজস্ব লিখিত রূপ আছে। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৮টি—ক, খ, গ, ঘ, ঙ ; চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ; ত, থ, দ, ধ, ন ; প, ফ, ব, ভ, ম ; য, র, ল, ব ; শ, ষ, স, হ ; ড়, ঢ়, ং, ঃ, ঁ। ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মধ্যে প্রথম ২৫টি বর্ণ বর্গীয় বর্ণ। বর্গ পাঁচটি—ক, চ, ট, ত, প। ক বর্গের সমস্ত বর্ণের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ্য, চ বর্গের তালু, ট বর্গের মূর্ধা, ত-বর্গের দন্ত ও প-বর্গের ওষ্ঠ। বর্গীয় পঞ্চম বর্ণ (ঙ, ঞ, ন, ণ, ম) ও ং, ঁ—এই বর্ণগুলি অনুনাসিক। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ মৃদু ও গাম্ভীর্যবিহীন ব'লে এগুলি অঘোষ বর্ণ ; আর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণ গম্ভীর ব'লে এগুলি ঘোষ বর্ণ। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণে অধিক শ্বাসবায়ু প্রয়োজন হয় ব'লে এগুলি মহাপ্রাণ বর্ণ। আর প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণে অল্প শ্বাসবায়ুর প্রয়োজন হয় ব'লে এগুলি অল্পপ্রাণ বর্ণ। শ, ষ, স, হ উচ্চারণে অধিক শ্বাসবায়ুর প্রয়োজন হয় হ'লে এগুলি উষ্মবর্ণ। বর্গীয় বর্ণ ও উষ্ম বর্ণের মধ্যে অবস্থিত য, র, ল, ব অন্তঃস্থ বর্ণ। এইভাবে বাংলা লিপিমালা বৈজ্ঞানিকভাবে সুসজ্জিত। এ ছাড়াও বাংলা লিপিতে বিভিন্ন সংখ্যাবাচক শব্দের নির্দেশক বর্ণ আছে। বিভিন্ন যুক্তাক্ষরও আছে। ি, ী, ু, ূ, ৃ—প্রভৃতি কিছু চিহ্ন দিয়ে অনেকগুলি বর্ণকে লিপিরূপ দেওয়া হয়। তা তত্ত্বেও বাংলা লিপিমালা জটিল।

বাংলা বর্ণমালার অন্যান্য রূপ

অনেকগুলি বর্ণ ও যুক্তাক্ষরের জটিলতার সমস্যা আছে। ব-ব, জ-য, ন-ণ, শ-ষ-স, র-ড়-ঢ়, ঙ-ং প্রভৃতির উচ্চারণ ইত্যাদির জটিলতা আছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলা বর্ণমালাকে সংস্কার ক'রতে পারলে বাংলা লিপি আরও উন্নত, আরও শক্তিশালী হতে পারত। বাংলা ভাষার সমৃদ্ধ সাহিত্য বাংলা লিপিতেই প্রকাশিত, বাংলা লিপির মুদ্রণ ব্যবস্থা এ ব্যাপারে অনেক সহায়তা করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ

বহুজনবোধ্য ধ্বনি-সমষ্টিকেই বলে ভাষা। পৃথিবীতে তিন হাজারেরও বেশী ভাষা আছে ;—কিন্তু সমস্ত ভাষারই লিখিত রূপ ও সাহিত্য নেই। বাঙালী জনসমাজ যে ভাষার মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করে, তাই বাংলাভাষা। প্রাচীন লিখিত রূপ ও সাহিত্য-সমৃদ্ধ বহুযোগ্যতাসম্পন্ন বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা থেকেই আমাদের বাংলাভাষার উদ্ভব হ'য়েছে। কাজেই বাংলাভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিভিন্ন স্তর পর্যালোচনা ক'রতে হ'লে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে হয়। আর্যগণ ভারতে এসে বৈদিক ভাষার প্রবর্তন ক'রেছিলেন। আর্যরা আসবার পূর্বে এদেশে দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন ছিল ; কিন্তু তার কোন সাহিত্য বা লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। আর্যদের বৈদিক ভাষাই বাংলাভাষার উদ্ভবের উৎস। **এই বৈদিক ভাষা থেকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম ক'রে নানা ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষার উদ্ভব হয়েছে।**

উদ্ভবের উৎস

আর্যগণ দেবস্তুতিমূলক সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের রচিত সাহিত্য হ'ল **'চতুর্বেদ'—ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব**। এগুলির মধ্যে ঋক্ বেদ সবচেয়ে প্রাচীন, খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ১২০০ অব্দে ঋক্ বেদ রচিত হয়েছিল। ঋক্ বেদের ভাষা হোল বৈদিক ভাষা, বর্তমান ভারতের সমস্ত আর্যভাষাগুলির আদি জননী হোল বেদের ভাষা। বৈদিক ভাষার অন্যতম নাম হ'ল "ছান্দস", যা ছিল আর্যজাতির ভাষা। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০ শতকের আগে আর্যগণ ইরানের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁদের একটি শাখা ইরানেই থেকে যায়। যাঁরা ভারতে এলেন, তাঁদের নাম হোল **ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan)**। এঁদের সুপ্রাচীন সাহিত্য হোল বৈদিক সাহিত্য। বৈদিক সাহিত্যের ভাষাকে বলা হয় **প্রাচীন বা আদি ভারতীয় আর্য ভাষা**, ইংরেজী নাম **Old Indo-Aryan** বা **O. I. A.**। পরে এই বৈদিক ভাষাকে সরল ক'রে কয়েক শতাব্দী পরে লৌকিক সংস্কৃতের জন্ম হয়। **পাণিনি** এই লৌকিক সংস্কৃতকে ধরা-বাঁধার মধ্যে আনবার জন্য **'অষ্টাধ্যায়ী'** ব্যাকরণ রচনা করেন।

আদি ভারতীয় আর্যভাষা

লৌকিক সংস্কৃত ব্যাপকভাবে সমস্ত জনসাধারণের স্থায়ী কথ্য ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারলো না। অনার্যগণ সংস্কৃতের উচ্চারণ-কৌশল আয়ত্ত করতে পারল না। এর ফলে আর্যভাষা কিছু কিছু অঞ্চলে প্রসারলাভ করলেও সমগ্র ভারতে ছড়াতে পারে নি। ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের পথে চলতে চলতে আর্য সংস্কৃত-ভাষা অনার্য ভাষার সংস্পর্শে প'ড়ে নিজস্ব রূপ পরিবর্তন করতে শুরু করে। এই ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা রূপান্তরিত হয় **পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ** প্রভৃতি ভাষায়। ভাষার এই পরিবর্তিত

মধ্যে ভারতীয় আর্যভাষা

রূপকে বলা হয় **মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা** বা **Middle Indo-Aryan language (M. I. A)**। এই মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা কথন ও লিখনের মধ্য দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্থিতিশীল হ'ল।

মধ্য-ভারতীয় আর্য ভাষার প্রথম অবস্থায় দু'টি সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল—সংস্কৃত ও পালি। লৌকিক সংস্কৃতের কাঠামো তৈরি করেন পাণিনি ও উদীচী। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃত এবং পালি কখনই কথ্য ভাষা ছিল না। ভাষা-বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথ্যরূপ (সংস্কৃত) থেকে ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের ফলে **প্রাকৃত ভাষার** উদ্ভব হ'ল। আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে প্রাকৃত ভাষা **উদাচী প্রাকৃত, মধ্যদেশীয় প্রাকৃত ও প্রাচ্য প্রাকৃত**-তে রূপ নেয়। তার মধ্যে প্রাচ্য প্রাকৃত আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়,—**(১) পূর্বী প্রাচ্য** ও **(২) পশ্চিমী প্রাচ্য**। পূর্বী প্রাচ্য মগধ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল ব'লে এর অন্য নাম হ'ল **মগধী প্রাকৃত**।
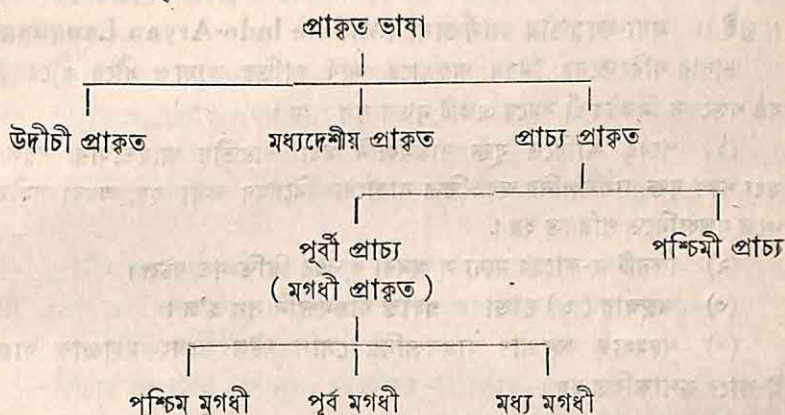
প্রাকৃত ভাষা

মগধী প্রাকৃত আবার লোকমুখে উচ্চারিত হতে হতে ভাষাতাত্ত্বিক বিকৃতি লাভ করে। এই বিকৃত ভাষাকে বলা হয় **অপভ্রংশ**। মগধী প্রাকৃতের ছিল তিনটি ধারা—**(১) পশ্চিম মগধী, (২) পূর্ব মগধী, (৩) মধ্য মগধী**। এর মধ্যে **পূর্ব মগধী ভাষার অপভ্রংশ থেকে বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি আধুনিক পূর্ব-ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির সৃষ্টি হয়েছে।**

॥ ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর ॥

ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসকে তিনটি সুস্পষ্ট স্তরে ভাগ করা যায়,—

॥ এক ॥ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (Old Indo-Aryan Language) :

এ ভাষা হোল বৈদিক সংস্কৃত। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত এই ভাষা চলে এসেছে। বৈদিক যুগের প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল,—

(১) ঋ, ঋৃ, ৯, এ, ঐ সহ সমস্ত স্বরধ্বনি এবং তিনটি এ-কার সহ সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার হয়েছে।

(২) দুই পাশাপাশি অবস্থিত দুই সন্নিহিত স্বরধ্বনির মিলন বা স্বরসন্ধি।

(৩) স্বরধ্বনির গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ (Vowel gradation)। যেমন,—কৃ<করণ, কারণ, কৃত।

(৪) বৈদিক স্বরের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। এই স্বরের স্থান পরিবর্তনে শব্দের অর্থের এবং লিঙ্গের পরিবর্তন ঘটতো।

(৫) শব্দরূপের বিপুল বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

(৬) বিভিন্ন যুক্ত ব্যঞ্জন বৈদিক বর্ণমালার মধ্যে অন্তর্ভূ`ত ছিল।

(৭) ধাতুরূপে বিরাট সমাবেশ ও বৈচিত্র্য।

(৮) বৈদিক ভাষায়, প্র, পরা, অপ, আ প্রভৃতি উপসর্গগুলি স্বতন্ত্র পদরূপে ব্যবহার করা হ'ত। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে উপসর্গের স্বাধীন ব্যবহার লুপ্ত হয়েছে।

॥ **দুই** ॥ **মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা (Middle Indo-Aryan Language) :**

ভাষার পরিবর্তনের নিয়ম অনুসারে আর্য জাতির ভাষাও ধীরে ধীরে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের নিকটবর্তী সময়ে একটি নূতন রূপ পায়।

(১) পদের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় সরল হয়। মধ্য পদস্থ যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির স্বরভক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়, অথবা সমীভবনের ফলে যুগ্মধ্বনিতে পরিণত হয়।

(২) তিনটি স-কারের মধ্যে স্ অথবা শ্-এর স্থিতিলাভ ঘটল।

(৩) অনুস্বার (ং) ছাড়া। পদান্ত ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হ'ল।

(৪) পদমধ্যস্থ অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ ঘটল এবং মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি ই-কারে রূপান্তরিত হয়।

(৫) স্বর এবং ব্যঞ্জনের সংখ্যা হ্রাস পেল। ঋ স্বরধ্বনি অ, ই, উ এবং এ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হ'ল। ঐ, ঔ স্বরধ্বনি যথাক্রমে এ এবং ও ধ্বনিতে পরিবর্তিত হ'ল। যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী এ, ও ধ্বনি হ্রস্বতা-প্রাপ্ত হ'ল। সংবৃত অক্ষরে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হ'ল।

(৬) স্বরাঘাতের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এই ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৭) অসমাপিকার বৈচিত্র্য হ্রাস পেল। নিষ্ঠান্ত ত, এবং প্রত্যয়ের সাহায্যে অতীতকালের পদগঠন করা হ'ল।

(৮) শব্দরূপের সরলতাবিধান করা হ'ল। দ্বিবচনের ব্যবহার লুপ্ত হ'ল। আ-কারান্ত শব্দের সাদৃশ্যে ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত শব্দরূপের সাধন মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঋ-কারান্ত শব্দরূপের লোপ হ'ল। অনেক ক্ষেত্রে প্রথমা, দ্বিতীয়া বহুবচনের পার্থক্য লুপ্ত হ'ল। চতুর্থী বিভক্তির লোপ হ'ল,—পঞ্চমীর অর্থে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োজন দেখা গেল।

(৯) ছন্দ-পদ্ধতি মাত্রাযুক্ত করা হ'ল।

(১০) বিভক্তির অর্থে বিভিন্ন অনুসর্গের প্রয়োগ করা হ'ল।

(১১) ধাতুরূপে দ্বিবচনের লোপ হ'ল। আত্মনেপদের ব্যবহার লুপ্ত হ'ল। লিট্-কালের লোপ এবং লঙ্-লুঙ্ কালের মিশ্রণ ঘটলো। পরবর্তী কালে এই ব্যবহার লুপ্ত হ'ল।

। তিন ।। নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা (New Indo-Aryan Language) ঃ

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষা ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের পথে আরও পরিবর্তিত হয়। প্রাকৃত যুগের এই শেষ স্তরের নাম হ'ল অপভ্রংশ। কেবল সৌরশ্রেণী অপভ্রংশের নাম পাওয়া যায়। অনুমান করা হয় যে, অন্যান্য প্রাকৃতেরও অপভ্রংশ স্তর ছিল। বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির উৎপত্তি হ'য়েছে। নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা, ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল,—

(১) যৌগিক কালের প্রচলন।

(২) ক্লীবলিঙ্গের লোপ-প্রবণতা।

(৩) ছন্দ-পদ্ধতি মাত্রামূলক এবং স্থানে স্থানে অক্ষরমূলক।

(৪) যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সমীকরণ এবং তার ফলে পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরের দীর্ঘতা প্রাপ্তি।

(৫) প্রাচীন কালের মধ্যে কেবলমাত্র বর্তমান ও অনুজ্ঞার প্রয়োগ।

(৬) নিষ্ঠা এবং শতৃপ্রত্যয়ের সাহায্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের পদগঠন।

(৭) পদমধ্যস্থিত সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনির সন্ধি।

(৮) প্রাচীন বিভক্তির স্থলে নূতন বিভক্তির আবির্ভাব এবং বার বার অর্থজ্ঞাপনের অন্য অনুসর্গের ব্যবহার।

।। বাংলা ভাষার উদ্ভব ।।

প্রাচীন বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা থেকে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের স্তর পেরিয়ে কিভাবে বাংলা ভাষার সৃষ্টি করেছে, তা একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে,—
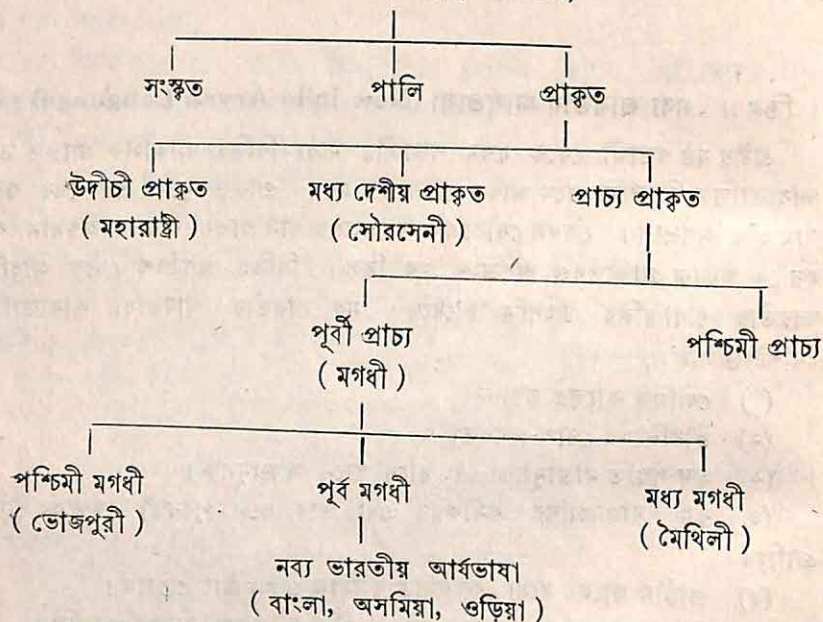
তবে একথা অনস্বীকার্য যে, বৈদিক ভাষা থেকে বিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার উদ্ভব হ'লেও ভাষার রূপগঠনে অনার্যদের ভাষার প্রভাবও রয়েছে। বাংলা ভাষার উপর দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষা-গোষ্ঠীর প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়।

।। বাংলা ভাষার বিকাশ ।।

বিকাশ

বাংলা ভাষা আজ স্থিতিশীল, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সাহিত্য-সম্পদে সমৃদ্ধিশালী একটি উল্লেখযোগ্য ভাষা। দীর্ঘ দিনের ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষা বর্তমানের রূপ পেয়েছে। বহু সাহিত্যিক তাঁদের মূল্যবান সৃষ্টি দিয়ে একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, অন্য দিকে তেমনি বাংলা ভাষার বিবর্তনকেও ত্বরান্বিত করেছেন। বাংলা ভাষার এই বিকাশকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়,—

।। এক ।। **প্রাচীন যুগ** (১০ম থেকে ১২শ শতাব্দী)

।। দুই ।। **মধ্য যুগ** (১২শ থেকে ১৮শ শতাব্দী)

।। তিন ।। **আধুনিক যুগ** (১৮শ শতাব্দী থেকে বর্তমান সময়)

বাংলা ভাষার বিকাশের এই তিনটি যুগকে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে ;—

॥ এক ॥ প্রাচীন যুগ (১০ম থেকে ১২শ শতাব্দী) :

দশম শতাব্দী থেকে যে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় প্রাচীন বাংলা। এই প্রাচীন বাংলা ভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন হ'ল **চর্যাপদ**। চর্যাপদের ভাষা বাংলা হ'লেও এর মধ্য দিয়ে সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম সাধনার গোপন কথা সংকেতপূর্ণ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে ব'লে সাধারণের পক্ষে এই ভাষার পরিপূর্ণ অর্থবোধের অসুবিধা হয়। তা ছাড়া, প্রথম অবস্থায় বাংলা ভাষা পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয় নি। তাই **চর্যাপদের ভাষাকে বলা হয় সন্ধ্যা বা আলো-আঁধারি ভাষা।**

॥ দুই ॥ মধ্য যুগ (১২শ থেকে ১৮শ শতাব্দী) :

মধ্যযুগের বাংলা ভাষার নিখুঁত নিদর্শন হ'ল চণ্ডীদাসের **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"**। এই গ্রন্থে বাংলা ভাষার রূপান্তরের আর একটি স্তর বা পর্যায় লক্ষ্য করা গেল। এই সময় থেকে শুরু হয় বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগ। লক্ষ্য ক'রলে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা অনেকটা সরলতা ও স্পষ্টতা লাভ করেছে।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের ভাষা পর্যালোচনা করলে মধ্য-যুগীয় বাংলা ভাষার কয়েকটি বিশেষত্ব স্পষ্ট হবে ;—(ক) বহুশব্দে চন্দ্রবিন্দুর (ँ) প্রয়োগ-বাহুল্য, (খ) বিভিন্ন আদ্য অ-কার আ-কারে রূপান্তরিত হ'য়েছে (যেমন নান্দের>নন্দের)। এ ছাড়া, এ-যুগের **মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ-কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী** প্রভৃতিতে বাংলা ভাষার মধ্য যুগের বিশেষ রূপটি ধরা পড়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর ব্রজবুলি ভাষা এ যুগের অন্যতম সম্পদ। পঞ্চদশ শতকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এই ভাবে মধ্যযুগে বাংলা ভাষার ধারাটি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে।

॥ তিন ॥ আধুনিক যুগ (১৮শ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল) :

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে গদ্য ভাষার প্রচলন শুরু হয়। তার পূর্বে বাংলা গদ্য কেবলমাত্র কথ্য ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু উইলিয়াম কেরী, রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ইত্যাদির প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের বিকাশ হয়। রাজা রামমোহন রায় তাতে বলিষ্ঠ গতি সঞ্চারিত করেন। বিদ্যাসাগর যতিচিহ্ন বিন্যাসের সূচনা করেন। পরবর্তী কালে বাংলা গদ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করে। প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে গ্রাম্য শব্দ ও গ্রাম্য ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাচার নক্শা' গ্রন্থে সে প্রচেষ্টাকে জোরদার করেন।

আধুনিক যুগের বাংলা ভাষা বিশ্বের অন্যতম অগ্রগণ্য ভাষা। রামমোহন থেকে শুরু ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশংকর, মজুতবা আলী প্রমুখ গদ্য-শিল্পী ও কথা-সাহিত্যিকদের অবদানে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে। সাহিত্যে বলিষ্ঠ **চলিত রীতির প্রয়োগ** বাংলা ভাষাকে যুগোপযোগী ও গতিশীল করেছে। আধুনিক বাংলা ভাষার কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়। সেগুলি হ'ল ;—

(১) লেখ্য ভাষা রূপে সাধু ভাষার সৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে কথ্য ভাষাও ভাব-প্রকাশের সহজ বাহনরূপে সাধু ভাষার সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলেছে।

(২) অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি প্রভৃতি ধ্বনি-পরিবর্তনের বিচিত্র রীতি গড়ে উঠেছে।

(৩) ক্রিয়া-পদের ব্যবহার বেড়েছে ও সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে।

(৪) বাক্য-গঠনে বৈচিত্র্য ও সংহতি সৃষ্টি হ'য়েছে।

(৫) ভাষার মধ্যে ইংরেজী বাক্য-বিন্যাস ও শব্দ-সম্ভারের ক্রমবর্ধমান প্রভাব পড়েছে।

এই যুগেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। বাংলা ভাষাকে ব্যাকরণের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ভাবে বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা হয়েছে এযুগেই। ফলে আমাদের ভাষা-বিজ্ঞানের 'ব্যাকরণ' গড়ে উঠেছে। এইভাবে আধুনিক যুগে বাংলা ভাষার সর্বাত্মক বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। তবে বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরিভাষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার দুর্বলতা এখনও লক্ষ্য করা যায়। তবে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সৃজনধর্মী লেখনীর যাদুস্পর্শে বাংলা ভাষা আধুনিক ভারতের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পেরেছে।*

আজকের বাংলা ভাষা

অনুশীলনী

১। আমাদের মাতৃভাষা কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়া কোন্ কোম্ স্তর অতিক্রম করিয়া কিভাবে আজিকার বাংলা ভাষায় পরিণত হইয়াছে, তাহা পরম্পরাক্রমে প্রদর্শন করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৫)

২। প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃত কিরূপে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া আজিকার বাংলা ভাষায় পরিণত হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি, ১৯৬৮)

৩। প্রাক-চৈতন্য যুগে বাংলা ভাষার বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৭০)

৪। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও চৈতন্য-পূর্ব যুগ পর্যন্ত ইহার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭২)

৫। বাংলা ভাষাকে নব্য-ভারতীয় আর্য (**New Indo-Aryan**) ভাষা বলা হয় কেন? আদি-ভারতীয় আর্য (**Old Indo-Aryan**) ভাষার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ? (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৪)

৬। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও চৈতন্য-পূর্ব যুগ পর্যন্ত ইহার ক্রমবিকাশ উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৬)

---

* শ্রীমতী শুক্লা বসুরায়ের সৌজন্যে

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা শব্দভাণ্ডার

শব্দ-ভাণ্ডারই হ'ল ভাষার প্রধান সম্পদ। শব্দ-সম্পদই ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী ক'রে তোলে। ভাষার শব্দ-গঠনের পদ্ধতি হ'ল শব্দ ও ধাতুতে প্রত্যয় যোগ ক'রে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করা, বা উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন করা। আধুনিক ভাষাগুলি অন্য ভাষা থেকে শব্দসম্ভার গ্রহণ ক'রে নিজস্ব শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধিশালী করে।

বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধিশালী

প্রাচীন গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষার শব্দনির্মাণ-ক্ষমতা শক্তিশালী ছিল। আধুনিক ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষা অন্য ভাষা থেকে শব্দ-গ্রহণ ক্ষমতায় সমৃদ্ধ। বাংলা ভাষার শব্দগঠনের উভয় ক্ষমতাই আছে,—প্রত্যয় ও উপসর্গ যোগে নতুন নতুন শব্দ গঠন এবং দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ। নানা বিবর্তনের পথ ধ'রে পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হ'য়েছে। তাই সংস্কৃত থেকে বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন রূপে বাংলায় এসেছে। ভারতবর্ষে দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক প্রভৃতি প্রাচীন অধিবাসীর সংস্পর্শে এসে আর্যরাই তাদের ভাষা থেকে বিভিন্ন শব্দ গ্রহণ ক'রে-ছিলেন। তার কিছু শব্দ বাংলায় এসেছে। তাছাড়া কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্যদের ভাষা থেকেও বাংলায় বহু শব্দ এসেছে। ফলে, বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে অনেকগুলি বিদেশী ভাষা থেকে বিভিন্ন শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। ভারতবর্ষে বার বার বিদেশীদের আক্রমণ হয়েছে। মুসলমান আক্রমণের ফলে এদেশে মুসলিম শাসন দীর্ঘ দিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই তাদের আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষা থেকে বহু বিদেশী শব্দ ঐ সময় বাংলায় এসেছে। ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসবার জলপথ আবিষ্কারের পর থেকে এ দেশে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজরা এসেছে। তারা এসেছে বাণিজ্য ক'রতে ; তারপর তারা এদেশে বসবাস ক'রেছে, রাজ্য বিস্তার করেছে। ফলে, তাদের সংস্পর্শে এসে বিদেশীদের ভাষা থেকে বহু শব্দ গ্রহণ ক'রে বাংলা শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হ'য়েছে। প্রত্যেক গতিশীল ভাষাই শব্দ-সম্পদে সমৃদ্ধিশালী। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ। এখনও বাংলা ভাষা বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ ক'রে বা প্রত্যয়-উপসর্গ যোগে নতুন শব্দ গঠন ক'রে শব্দ-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধিশালী করছে।

বাংলা ভাষার শব্দ-গঠন ও শব্দ-গ্রহণ ক্ষমতা

বাংলা ভাষায় প্রধানতঃ দু'ধরনের শব্দ আছে ;—

(১) **মৌলিক শব্দ ঃ** মৌলিক শব্দগুলি ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে এসেছে বা গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) **আগন্তুক শব্দ :** আগন্তুক শব্দগুলি দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ভাষা থেকে এসেছে।

॥ মৌলিক শব্দ ॥

ভারতীয় আর্যভাষা থেকে আগত মৌলিক শব্দগুলি তিন ধরনের :—

॥ এক ॥ তৎসম শব্দ
॥ দুই ॥ অর্ধতৎসম শব্দ
॥ তিন ॥ তদ্ভব শব্দ ।

॥ এক ॥ তৎসম শব্দ : যে সকল শব্দ সংস্কৃত হ'তে অবিকল বা অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় এসেছে, সেগুলিকে তৎসম শব্দ বলে। এই শব্দগুলিকে সংস্কৃত থেকে অপরিবর্তিতভাবে গ্রহণ করা হ'য়েছে। এই জাতীয় শব্দগুলিকে তৎসম (তৎ=তাহার, অর্থাৎ সংস্কৃতের, সম=সমান) শব্দ বলে।

উদাহরণ—চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, গৃহ, নর, লতা, সাধু, ভাল, বায়ু ইত্যাদি।

॥ দুই ॥ অর্ধতৎসম শব্দ : যে সকল শব্দ অর্ধবিকৃত হ'য়ে, কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হ'য়ে, কিছুটা ভগ্ন হ'য়ে সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে, সেগুলিকে অর্ধতৎসম শব্দ বলে। অর্ধতৎসম শব্দগুলি একদা তৎসম শব্দগুলির মতোই অবিকৃতভাবে বাংলায় গৃহীত হ'য়েছিল ; কিন্তু পরবর্তী কালে তা ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে বা উচ্চারণগত পরিবর্তনের মধ্যে বিকৃত হ'য়ে নিজস্ব রূপে পৌচেছে।

উদাহরণ—কৃষ্ণ>কেষ্ট, নিমন্ত্রণ>নেমন্তন্ন, জ্যোৎস্না>জোছনা, বৈষ্ণব>বোষ্টম, শ্রদ্ধা>ছেদ্দা ইত্যাদি।

॥ তিন ॥ তদ্ভব শব্দ : যে সকল শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে নানাবিধ বিবর্তনের ধাপ বা পর্যায় অতিক্রম ক'রে বাংলা ভাষায় এসেছে, তাদের তদ্ভব শব্দ বলে। তদ্ভব শব্দগুলি আদি-ভারতীয় আর্যভাষা থেকে মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার মধ্য দিয়ে বিবর্তনের স্তর অতিক্রম ক'রে বাংলা ভাষায় গৃহীত হ'য়েছে। বাংলা তদ্ভব শব্দের মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় ও ইন্দো-ইরাণীয় শব্দ ছাড়াও অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয়, চীনীয় প্রভৃতি শব্দও আছে। কারণ, এই ভাষাগুলি থেকে বিভিন্ন শব্দ সংস্কৃত ভাষাতেই প্রবেশ ক'রেছিল। এই রকম বিভিন্ন ধরনের শব্দ সংস্কৃত থেকে পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম ক'রে বাংলায় তদ্ভব শব্দে পরিণত হ'য়েছে।

উদাহরণ—প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে :—

ষোড়শ>সোলহ>ষোল ; গায়তি>গা অই>গাই ; একাদশ>এগ গারহ>এগার ; ইন্দ্রাগার>ইন্দ্রা আর>ইঁদারা ইত্যাদি।

(অ) অষ্ট্রিক বর্গ হ'তে—

ঢৌকয়তি>ঢুক্কই>ঢোকে ; টঙ্ক>টঙ্ক>টঙ্গ ইত্যাদি।

(ই) দ্রাবিড় বর্গ হ'তে—
কুপট>কুডব>কুড়া (বিঘা অর্থে); (তামিল); মূটে>সংস্কৃত (মূটক)>মূডঅ>মোট ইত্যাদি।

(ঈ) মোঙ্গল বর্গ হ'তে—
তুরুক>তুরুক্ক>তুর্কী, তুর্ক।

(উ) ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গ হতে—
(গ্রীক) দ্রাখ্‌মে>(সংস্কৃত) দ্রম্য>দম্ম>দাম।
(গ্রীক) স্যুরংক্স>(সংস্কৃত) সুরুঙ্গ>সুড়ঙ্গ ইত্যাদি।

অনেক সময় একই শব্দের দুই তদ্ভব রূপ, বা অর্ধতৎসম ও তদ্ভব রূপ দেখা যায়। এগুলিকে **যমজ শব্দ** বলে।

উদাহরণ—শ্রদ্ধা>সাধ, ছেদ্দা; ক্ষুদ্র>খুদ, খুড়া; কক্ষ>কাজ, কাঁখ ইত্যাদি।

॥ আগন্তুক শব্দ ॥

বাংলা ভাষার আগন্তুক শব্দ দু' ধরনের ;—

॥ এক ॥ **দেশী শব্দ** ॥ দুই ॥ **বিদেশী শব্দ**

॥ এক ॥ **দেশী শব্দ** : এই দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষা থেকে যে শব্দগুলি বাংলা ভাষায় এসেছে, সেগুলিকে দেশী শব্দ বলে। এই শব্দগুলি বাইরের কোন ভাষা থেকে আসে নি। অষ্ট্রিক বর্গ ও দ্রাবিড় বর্গ থেকে এই শব্দগুলি বাংলা ভাষায় এসেছে। চোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি বিভিন্ন অনার্য ও উপজাতিদের ভাষা থেকে যে সকল শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে, সেগুলিই হ'ল বাংলা শব্দ-ভাণ্ডরের যথার্থ দেশী শব্দ।

উদাহরণ—ঝোল, ঝিঙ্গা, ঢোল, ঢেউ, ঢিল, ঢাল, ডাহা, ডাঙ্গা, ডিঙ্গি, ঢেঁকি, ঝাঁটা, কুলা, ডাব প্রভৃতি।

॥ দুই ॥ **বিদেশী শব্দ** : বিদেশী বিভিন্ন ভাষা হ'তে যে সকল শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে, সেগুলিকে বিদেশী শব্দ বলে। বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারে বিদেশী শব্দের সংখ্যা কম নয়। বিদেশী বিভিন্ন ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ আহরণ ক'রে বাংলা ভাষা শক্তিশালী হ'য়েছে, বাংলা শব্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধিশালী হ'য়েছে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণের পরে বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান শাসনে প্রচুর ফারসী, আরবী ও তুর্কী শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করে। বিশেষ করে মোঘল যুগে প্রচুর ফারসী শব্দ বাংলায় অনুপ্রবেশ করে। বাংলায় প্রায় ২½ হাজার ফারসী-আরবী-তুর্কী শব্দ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষার মধ্যে ফারসী প্রভাব সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। পরে ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাভাষীরা এদেশে আসে। পরবর্তী কালে ব্রিটিশ শাসনে ইংরেজীর ব্যাপক প্রচলন হয়, এবং প্রচুর ইংরেজী শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। সে

বিদেশী শব্দ ও তার ইতিহাস

সময় শতাধিক পতুর্গীজ শব্দ বাংলায় প্রবেশ ক'রেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উপর ইংরেজী ভাষার প্রভাব সর্বাধিক অনুভূত হয়। এই সময় প্রচুর ইংরেজী শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করে; এখনও বিদেশী ভাষা হতে প্রচুর আগন্তুক শব্দ বাংলায় গ্রহণ করা হ'চ্ছে। নীচে বিভিন্ন ভাষা থেকে আগত বিদেশী আগন্তুক শব্দগুলির পরিচয় দেওয়া হ'ল ;—

ফারসী শব্দ ঃ

(অ) **শিক্ষা-সংস্কৃতি সংক্রান্ত**—সেতার, হরফ, আদব, কেচ্ছা, শাগরেদ ইত্যাদি।

(আ) **ধর্ম-বিষয়ক**—বাবর, ইমান, দরবেশ, দীন, দোয়া, মোহরম, মোল্লা, শহীদ, শিয়া ইত্যাদি।

(ই) **দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সংক্রান্ত**—হজম, হুজুগ, চাকর, জাহাজ, তাজা, দোকান, সাদা, হপ্তা, খোরাক, খবর, কদম, ওজন ইত্যাদি।

(ঈ) **রাজকার্য সংক্রান্ত**—হুজুর, উজীর, বাদশা, মালিক, খেতাব, বাহাদুর, সেপাই, শিকার, তাঁবু, তোপ, আমীর, ওমরাহ, রসদ ইত্যাদি।

(উ) **প্রশাসন সংক্রান্ত**—সরকার, মহকুমা, আদালত, মোকদ্দমা, হাকিম, সালিশ, কানুন, খারিজ, আবাদ, জমা, তালুক, বীমা, পেশা, নালিশ, রুজু, ইত্যাদি।

(ঊ) **ফারসী প্রত্যয়**—'—গিরি'—বাবুগিরি, কেরানীগিরি।
'—দার'—জমিদার, অংশীদার।
'—আনা'—মুন্সীয়ানা, বাবুয়ানা।
'—বাজ'—মাবলাবাজ, যুদ্ধবাজ।
'—সই'—টেঁকসই, জুৎসই ইত্যাদি।

(ঋ) **ফারসী উপসর্গ**—'দর—' —দরকাঁচা, দরপত্তনি
'ফি—' —ফি-সন, ফি-হপ্তা
'বে—' —বেপাত্তা, বেহাত ইত্যাদি।

আরবী শব্দ (ফারসীর মধ্য দিয়ে) ঃ—কেতাব, আইন, তামাসা, জবাব, গলদ, খাজনা, ফসল, মুহুরী, বাকী, জিলা ইত্যাদি।

তুর্কী শব্দ (ফারসীর মধ্য দিয়ে) ঃ—দারোগা, গালিচা, বেগম, খাঁ, চাকু, লাশ, বিবি, কুলী ইত্যাদি।

পতুর্গীজ শব্দ—জানালা, নীলাম, আলমারী, বোতাম, বালতি, কেরানী, ফিতা, চাবি, কপি, বোমা, মার্কা, মিস্ত্রী, বেহালা, সাবান, বারান্দা, আলকাতরা, আলপিন, বাসন ইত্যাদি।

ওলন্দাজ শব্দ—রুইতন, ইস্কাবন, হরতন, তুরুপ ইত্যাদি।

ফরাসী শব্দ—কুপন, কার্তুজ ইত্যাদি।

ইতালীয় শব্দ—গেজেট, কোম্পানী ইত্যাদি।
রাশিয়ান শব্দ—বলশেভিক, সোভিয়েত ইত্যাদি।
চীনীয় শব্দ—চা, চিনি ইত্যাদি।
বর্মী শব্দ—ঘুগনি, লুঙ্গি ইত্যাদি।
হিন্দী শব্দ—বন্ধ, ঠিকানা, হাতিয়ার, ঝগড়া, লোটা।
গুজরাটী শব্দ—হরতাল, হরিজন।
জাপানী শব্দ—রিক্শা।
মালাই শব্দ—গুদাম, সাগু।
তিব্বতী শব্দ—লামা
দক্ষিণ আমেরিকার শব্দ—কুইনাইন
দক্ষিণ আফ্রিকার শব্দ—জেব্রা
মারাঠী—বর্গী
তামিল—একচেটিয়া
সাঁওতালী—হাঁড়িয়া
অস্ট্রেলীয়—কাঙ্গারু
বাটাভীয়—বাতাবি

ইংরেজী শব্দ ঃ

ইংরেজী তৎসম শব্দ—কলেজ, চেয়ার, টেবিল, ট্রেন, কোট, কোর্ট, ফোন, সিনেমা, হোটেল, ফটো, থিয়েটার, পেন, টিকিট ইত্যাদি।

ইংরেজী তদ্ভব শব্দ—*Lord*>লাট, *Lantern*>লণ্ঠন, *Glass*>গেলাস ইত্যাদি।

ইংরেজী উপসর্গ—'হেড—' হেডপণ্ডিত, হেডমাস্টার।
'হাফ—' হাফ-হাতা জামা।
'ফুল—' ফুল-হাতা জামা, ফুল-মোজা।

Translation Loan—

কিছু কিছু বিদেশী শব্দ অনূদিত হয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে, এগুলিকে *Translation loan* বলা হয়।

উদাহরণ—*Golden age*—স্বর্ণযুগ
Golden opportunity—সুবর্ণ সুযোগ
Sorry—দুঃখিত
Lighthouse—বাতিঘর
Necktie—গলাবন্ধ
Obliged—অনুগৃহীত ইত্যাদি।

এগুলির প্রয়োগ বাংলা ভাষার বক্তব্যের উপস্থাপনকে জোরালো ক'রেছে,

Style-কে শক্তিশালী হতে সাহায্য ক'রেছে। এ জাতীয় শব্দগুলিকেও আগন্তুক শব্দ বলা যেতে পারে। কারণ এগুলির সঙ্গে বিদেশী ভাষার প্রত্যক্ষ যোগ আছে।

।। মিশ্র শব্দ, সঙ্কর শব্দ বা জোড়কলম শব্দ ।।

উল্লিখিত মৌলিক ও আগন্তুক বিভিন্ন ধরনের মিশ্রণের ফলে, বিভিন্ন শব্দের পরস্পর যোগাযোগের ফলে, প্রত্যয় ও উপসর্গ যোগে যখন বাংলা ভাষায় নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়, তখন তাকে মিশ্র, সঙ্কর বা জোড়কলম শব্দ বলে।

উদাহরণ—দেশী+বিদেশী—হাটবাজার
তৎসম+বিদেশী প্রত্যয়—পণ্ডিতগিরি, ধূপদান
বিদেশী+বিদেশী প্রত্যয়—মাস্টারি
বিদেশী+বিদেশী—উকিল-ব্যারিস্টার, পুলিশ-সাহেব
বিদেশী+দেশী—মাস্টার মশায়, হেডপণ্ডিত
বিদেশী+বাংলা প্রত্যয়—বেহায়া-পনা
বাংলা শব্দ+বিদেশী প্রত্যয়—বামুনগিরি, বাড়ীওয়ালা

প্রত্যয় ও উপসর্গ যোগে বাংলা ভাষায় নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হ'চ্ছে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় প্রচুর আগন্তুক শব্দের অনুপ্রবেশ হ'চ্ছে। ফলে, বাংলা ভাষা শক্তিশালী হ'চ্ছে, বাংলা শব্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হ'চ্ছে। শব্দ-গ্রহণের এই প্রবণতা ভাষার প্রাণ-স্পন্দন ও সজীবতার লক্ষণ।

অনুশীলনী

১। বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারে কয়শ্রেণীর শব্দ পাওয়া যায়? প্রত্যেক প্রধান শ্রেণীর দুইটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বাংলা ভাষার পরিণতির ইতিহাসে তাহাদের স্থান নির্দেশ করুন।
(কলি. বিশ্ব., বি. টি., ১৯৬৩)

২। বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারে পর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজী শব্দের অবদানে কনখানি সমৃদ্ধ, যথেষ্ট উদাহরণ উপস্থাপিত করিয়া তাহা আলোচনা কর। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি., ১৯৩৮)

৩। এদেশে যুগে যুগে বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়াছে। বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার বিশ্লেষণ করিয়া এই উক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি, ১৯৬৬)

৪। বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারের বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে একটি নিবন্ধিকা লিখুন।
(কলি. বিশ্ব., বি. এড.—১৯৭৩)

৫। বাংলা ভাষার শব্দ-সম্ভার সম্পর্কে যথোচিত উদাহরণসহ আলোচনা করুন।
(কলি. বিশ্ব., বি. এড.—১৯৭৫)

৬। বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার সম্বন্ধে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।
(কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৭)

চতুর্থ অধ্যায়
শব্দার্থতত্ত্ব

কতকগুলি বর্ণ মিলে যখন কোন অর্থ নির্দেশ করে, তখন তাকে শব্দ বলে। শব্দ-রম্পরায় ভাষা মূর্ত হ'য়ে ওঠে। প্রত্যেক শব্দেরই নিজস্ব অর্থ আছে। কোন বস্তু, বিষয় বা ভাবের প্রতীক রূপ হল শব্দ। প্রতীকদ্যোতকতা-ই শব্দের সবচেয়ে বড় গুণ। কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতীকতা যখন কোন শব্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন শব্দার্থ পরিবর্তনের কথা উঠতে পারে না। কিন্তু শব্দের অর্থ সর্বক্ষেত্রেই স্থিতিশীল নয়। কখনও কখনও শব্দার্থ পরিবর্তিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শব্দের প্রতীকতাও পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন লেখক ভাষাকে শক্তিশালী ক'রে তুলবার জন্য একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে, বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করেন। শব্দার্থের এই পরিবর্তনকে ভাষাবিজ্ঞানে শব্দার্থতত্ত্ব বা বাগর্থবিজ্ঞান বলা হয়।

শব্দার্থতত্ত্ব

শব্দের অর্থ তিন প্রকারের হয় ঃ—

১। বাচ্যার্থ ২। লক্ষণার্থ ৩। ব্যঙ্গ্যার্থ।

১। **বাচ্যার্থ** ঃ—শব্দ যখন কেবলমাত্র তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে প্রকাশ করে, তখন তাকে শব্দের বাচ্যার্থ বলে। বাচ্যার্থে শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রকাশ পায়।

যেমন—'গরু' শব্দটিতে একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীকে বোঝায়।

২। **লক্ষণার্থ** ঃ—কোন শব্দকে যখন বাচ্যার্থ বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে পৃথক ক'রে অথচ শব্দটির ভাবগত ঐক্য বজায় রেখে তাকে ভিন্ন একটি অর্থে ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে শব্দের লক্ষণার্থ বলে।

যেমন—গুরুজন যখন তাঁর স্নেহভাজন ব্যক্তিকে আদর করে 'গরু' ব'লে সম্বোধন করেন, তখন শব্দটির লক্ষণার্থ প্রকাশিত হয়।

৩। **ব্যঙ্গার্থ** ঃ—শব্দের অর্থ যখন বাচ্যার্থ, লক্ষণার্থ প্রভৃতিকে অতিক্রম ক'রে একটি গূঢ় অথচ ভাবগম্ভীর স্বতন্ত্র অর্থকে প্রকাশ করে, তখন তাকে শব্দের ব্যঙ্গার্থ বলে।

যেমন—গোবর-গণেশ—অপদার্থ, বকধার্মিক—ভণ্ড, জড়ভরত—অলস প্রভৃতি শব্দের ব্যঙ্গার্থ প্রকাশ ক'রছে।

অতএব দেখা যায় যে, শব্দের প্রয়োগকৌশলের উপরই শব্দের অর্থ নির্ভরশীল। শব্দের অর্থও তিনি প্রকার। এই সুযোগ ও সূত্র থেকেই শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা এসে যায়।

শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণঃ

অনেক ক্ষেত্রে শব্দ তার মূল অর্থকে পরিহার ক'রে অন্য একটি অর্থে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ আছে। এই কারণগুলি হ'ল :—

॥ এক ॥ একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ ঃ

অনেক সময় কোনও শব্দ অন্যান্য শব্দের সহযোগে বিশিষ্টার্থে অন্য প্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। চোখ, মাটি, মাথা, মুখ, কান, হাত, কাঁচা, পাকা প্রভৃতি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ ; ধর্, উঠ্, কাট্, লাগ্ প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলি এইরূপ বিভিন্নভাবে বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করা হয়। যেমন,— **মুখ**।

প্রয়োগ	অর্থ
আমি তাকে **মুখের** মত জবাব দিয়েছি।	উপযুক্ত
টাকার জন্য আমি তোমার **মুখের** দিকে তাকিয়ে বসে আছি।	ভরসা
ছেলেটি দেশের **মুখ** রাখবে।	সম্মান রক্ষা করা
দীনদয়াল প্রভু কি **মুখ** তুলে চাইবেন না ?	করুণা করা
মুখ সাম্‌লে কথা বল।	সংযতভাবে
ভদ্রলোকের ছেলে অত **মুখ** খারাপ করে কথা বলছ কেন ?	গালাগালি
সকলে যা বলুক তুমি **মুখ** বন্ধ করে বসে থাক।	চুপ করা
সামান্য কথাটা মাস্টার মহাশয়কে **মুখ** ফুটে বলতে পারলে না ?	অসংকোচে
ছেলে পরীক্ষায় ফেল করলে, তার **মুখ** চুন হয়ে গেল।	লজ্জায় মলিন
এতক্ষণ পরে রাম **মুখ** খুলল।	কথা আরম্ভ ক'রল
	ইত্যাদি

॥ দুই ॥ আলংকারিক প্রয়োগে শব্দার্থের পরিবর্তন ঃ

বর্ণনার বৈচিত্র্য, অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য এবং ভাষার সৌন্দর্য- বৃদ্ধির জন্য অলংকারের প্রয়োগ করা হয়। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, অতি-শয়োক্তি, ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি অলংকার শব্দ ও ভাষাকে বাচ্যার্থ অতিক্রম ক'রে নতুন এক অর্থে স্থাপিত করে, এবং পরিবর্তিত অর্থটিই স্থায়ীরূপ লাভ করে। লক্ষ্যার্থে ও ব্যঙ্গার্থে বাংলায় বহু শব্দ বা শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ আছে। এগুলি ভাষা ও শব্দের অর্থগৌরব ও শিল্পসৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। **যেমন,—**

'স্তম্ভিত' শব্দের মূল অর্থ 'স্তম্ভে পরিবর্তিত', পরিবর্তিত অর্থ 'বিস্মিত'।
'মধুর' শব্দের মূল অর্থ 'মধুযুক্ত', পরিবর্তিত অর্থ 'সুন্দর'।
'দারুণ' শব্দের মূল অর্থ 'দারু নির্মিত', পরিবর্তিত অর্থ 'কঠিন'।
'গবাক্ষ' শব্দের মূল অর্থ 'গরুর চোখ', পরিবর্তিত অর্থ 'জানালা'।
ইত্যাদি

॥ তিন ॥ সুভাষণের ফলে শব্দার্থের পরিবর্তন ঃ

কটু, নিন্দনীয়, অকল্যাণ ও অমঙ্গল সূচক কথাকে সমাজে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হয়। একে সুভাষণ (*Euphemism*) বলা হয়। যেমন,—

নাগর>নগরের অধিবাসী>রসিক প্রণয়ী।

পিরীতি>প্রেম>অবৈধ প্রণয়

'চাল বাড়ন্ত'>চালের অভাব

আন্নাকালী>মেয়ের নাম>আর না কালী (অর্থাৎ, কালীমাতা, আর কন্যা দিয়ো না) ইত্যাদি।

॥ চার ॥ শব্দ-সংহতির প্রয়োগের ফলে শব্দার্থের পরিবর্তন ঃ

অনেক সময় বাক্যাংশকে সংক্ষিপ্ত ক'রতে গিয়ে শব্দার্থ পরিবর্তিত হ'য়ে বিশেষ একটি ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব লাভ করে। যেমন,—

ক্ষুদ্র শস্য>ক্ষুদ্দ>খুদ (চালের ক্ষুদ্র অংশ)

খাবার>খাদ্য দ্রব্য>বিশেষ শ্রেণীর খাবার ইত্যাদি।

॥ পাঁচ ॥ 'আ'-প্রত্যয় যোগে শব্দার্থের পরিবর্তন ঃ

যেমন— হাত>হাতা

ছাদ>ছাত>ছাতা

ভাত>ভাতা

পা>পায়া

॥ ছয় ॥ সামাজিক রীতিনীতি ঃ

মানুষের সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রীতিনীতি ও অভ্যাস-অনুশীলনের পরিবর্তন, চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন, সভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রগতি, দেশকাল-ভেদে বিশেষ বিশেষ অর্থে শব্দের প্রয়োগ হয়, শব্দার্থের পরিবর্তন হয়। যেমন,—

কলম>শর বা খাগ>লেখবার কলম, এমন কি ঝরনা-কলমও।

শালা>স্ত্রীর ভাই>গালাগালির ভাষা।

কাপড়>কার্পাস জাত দ্রব্য>বস্ত্র, এমন কি, রেশমের বস্ত্রও।

সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় শব্দের মূল অর্থের অবলুপ্তি ঘটে এবং নতুন অর্থ স্থায়িত্ব লাভ করে।

॥ সাত ॥ একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ ঃ

একই শব্দ অনেক সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। দুই বা ততোধিক বিভিন্ন শব্দ ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে বা অন্য কারণে একই রূপ ধারণ করে, সেক্ষেত্রে অর্থ ভিন্ন থেকে যায়। যেমন,—বই—পুস্তক, বই—ব্যতীত; সই—সহকারী, সই—সখী ডাল—গাছের শাখা-বিশেষ, ডাল—খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি।

॥ আট ॥ বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ :

বাগ্‌ধারা প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব সম্পদ। বাগ্‌ধারার মধ্যে সামাজিক রীতিনীতি প্রকাশ পায়। বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের মধ্য দিয়ে শব্দার্থ তার মূল অর্থ ছেড়ে নতুন একটি অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন,—আকাশকুসুম—অলীক কল্পনা, অরণ্যে রোদন—মিথ্যা প্রচেষ্টা, অর্ধচন্দ্র—গলা ধাক্কা দেওয়া ইত্যাদি।

বাগ্‌ধারা

নানা কারণে শব্দার্থ পরিবর্তিত হয়। শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা ও কারণ অনেক সময় খুবই আকর্ষণীয়। শব্দার্থ পরিবর্তনের ভৌগোলিক ও সামাজিক কারণ আছে। মনস্তাত্ত্বিক কারণেও শব্দার্থ পরিবর্তিত হয়। সব সময় সুনির্দিষ্ট পথে বা ধারায় শব্দার্থ পরিবর্তিত হয় না। তাই শব্দার্থ পরিবর্তনের সঠিক কারণ বা ধারাগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায় না। অনেক শব্দেরই একাধিক অর্থ থাকে। বাক্য-মধ্যস্থিত শব্দগুলির পরস্পর প্রভাবে কোন একটি অর্থ গৌণ হ'য়ে যায়। ভাবাবেগের আতিশয্যে শব্দ প্রয়োগ ক'রলে শব্দ তার সঠিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অস্পষ্টতা থাকলে, শব্দের প্রতীক-দ্যোতকতার সঠিক জ্ঞান না থাকলে শব্দার্থ পরিবর্তনের সুযোগ এসে যায়। শব্দকে তার সঠিক স্থানে প্রয়োগ ক'রতে না জানলেও শব্দের অর্থ পরিবর্তনের সুযোগ এসে যায়। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখকের নতুনত্বের ঝোঁক থাকে, অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়াস থাকে। সেক্ষেত্রেও শব্দার্থের পরিবর্তন হয়। শব্দার্থের পরিবর্তন তাই বিশেষ কোন সুনির্দিষ্ট পথ ধরে চলে না।

শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ পর্যালোচনা

॥ শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা ॥

নানা কারণে শব্দার্থ পরিবর্তিত হয়। শব্দার্থ পরিবর্তনের পাঁচটি বিভিন্ন ধারা আছে। সেগুলি হ'ল,—

(১) অর্থ-বিস্তার (Expansion of Meaning)

(২) অর্থ-সংকোচ (Contraction of Meaning)

(৩) অর্থ-সংশ্লেষ (Transference of Meaning)

(৪) অর্থের উন্নতি (Elevation of Meaning)

(৫) অর্থের অবনতি (Deterioration of Meaning)

এগুলি সম্বন্ধে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ এক ॥ অর্থ-বিস্তার (Expansion of Meaning) :

রূপক বা অতিশয়োক্তির প্রভাবে শব্দার্থ যখন বস্তু-নিরপেক্ষ হ'য়ে পড়ে, তখন তার অর্থ অনেকখানি প্রসারিত হয়। শব্দার্থের বিস্তারে ব্যক্তি বা বস্তুর গুণ ও ধর্ম সংকীর্ণ গণ্ডী ছেড়ে সাধারণ বহু বস্তুর সাধারণ গুণ ও ধর্মে পরিণত হয়। শব্দার্থের এই প্রসারকে অর্থ-বিস্তার বলে।

উদাহরণ—'গুণ' শব্দের প্রাচীন অর্থ হ'ল 'গরু সম্বন্ধীয়', পরে তার অর্থ হ'ল 'গরুর নাড়ী-ভুঁড়ির তাঁত', এখন 'গুণ' শব্দের অর্থ 'দড়ি'। 'ধন্য' শব্দের অর্থ 'ধনশালী', সম্প্রসারিত অর্থ হ'ল 'সৌভাগ্যবান'। সংস্কৃত 'গঙ্গা' শব্দ থেকে আগত 'গাঙ্' শব্দের অর্থ 'যে কোন নদী' এখন 'নদীর শুকনো খাত'।

।। দুই ।। অর্থ-সংকোচ (Contraction of Meaning) :

একটি শব্দের অনেকগুলি অর্থ থাকলে তার মধ্যে একটি প্রধান হ'য়ে উঠলে অন্য অর্থগুলি অবলুপ্ত হয়। তখন শব্দার্থের সংকোচ হয়।

উদাহরণ—সংস্কৃত 'অন্ন' শব্দের অর্থ খাদ্য, বাংলায় বিশিষ্ট খাদ্য 'ভাত'।
সংস্কৃত 'মৃগ' শব্দের অর্থ 'পশু', বাংলার বিশিষ্ট পশু 'হরিণ'।
'সন্দেশ' শব্দের মূল অর্থ 'খবর', বাংলায় বিশেষ 'মিষ্টান্ন'।

।। তিন ।। অর্থ-সংশ্লেষ (Transference of Meaning) :

শব্দার্থের একাধিক প্রসার ও সংকোচের ফলে অনেক সময় তার মূল অর্থই লুপ্ত হ'য়ে এমন একটি অন্য অর্থ দাঁড়ায় যার সঙ্গে মূল অর্থের বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকে না। একে বলে শব্দার্থের সংশ্লেষ। এক্ষেত্রে শব্দের নতুন অর্থের আগমন হয়।

উদাহরণ—সংস্কৃত 'ঘর্ম' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'গরম', বাংলায় এর প্রচলিত অর্থ হ'ল 'শরীরের উপর গরমের ফল', অর্থাৎ ঘাম ; এবং তা থেকে 'স্বেদ' এই অর্থ দাঁড়িয়েছে।

'পাত্র' শব্দের অর্থ 'পান করবার আধার'>পরে অর্থ-প্রসারের ফলে 'আধার'> পরে 'কন্যা সম্প্রদানের আধার'>অর্থ সংকোচের ফলে 'বর'।

'পাষণ্ড' শব্দের মৌলিক অর্থ ছিল 'ধর্ম সম্প্রদায়', পরে 'অন্য ধর্ম সম্প্রদায়', তা থেকে 'বিরুদ্ধ ধর্ম সম্প্রদায়', পরে 'বিরুদ্ধ ধর্মের উপাসক', এবং সেখান থেকে 'ধর্ম-জ্ঞানহীন', 'অত্যাচারী'।

।। চার ।। অর্থের উন্নতি (Elevation of Meaning) :

শব্দের সাধারণ অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যখন উচ্চ ভাব বা গুণের অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন শব্দার্থের উন্নতি হয়।

উদাহরণ—'মন্দির' শব্দের মূল অর্থ 'গৃহ', এখন 'দেবালয়'।
'সম্ভ্রম' শব্দের মূল অর্থ 'ভয় করা', এখন 'মান্য করা'।

।। পাঁচ ।। শব্দার্থের অবনতি (Deterioration of Meaning) :

কোন শব্দের অর্থ প্রথমে যদি 'উৎকর্ষ-দ্যোতক' থাকে, পরে যদি তা হীনার্থে ব্যবহৃত হয়, তখন শব্দার্থের অবনতি হয়।

উদাহরণ—'রাগ' শব্দের অর্থ 'আকর্ষণ', এখন 'ক্রোধ'।
'কৃপণ' শব্দের অর্থ 'কৃপার পাত্র', এখন 'কঞ্জুস'।
'ঠাকুর' শব্দের অর্থ 'দেবতা' বা 'গুরুজন', এখন 'পাচক ব্রাহ্মণ'।
'মহাজন' শব্দের অর্থ 'মহান্ ব্যক্তি', এখন 'সুদ-খোর'।

অনেক সময় সমগ্র বাক্য বা বাক্যাংশ অর্থ পরিবর্তন ক'রে এক একটি শব্দে পরিণত হয়।

যেমন—লাটিন 'নন্ পার'>ইংরেজী '*Umpire*'
ফরাসী 'ন অস্ত্ ন বুদ্'>বাংলায় 'নাস্তানাবুদ'
সংস্কৃত 'ইতি হ আস'>বাংলায় 'ইতিহাস' ইত্যাদি।

নানা কারণে নানাভাবে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়। সভ্যতার অগ্রগতি, জীবনযাত্রার পরিবর্তন প্রভৃতির সঙ্গে তাল রেখে শব্দার্থ পরিবর্তিত হয়। শব্দার্থ পরিবর্তনের প্রচুর নিদর্শন আছে। সবসময় সুনির্দিষ্ট নিয়ম ধ'রে শব্দার্থের পরিবর্তন হয় না। শব্দার্থ পরিবর্তনের আলোচনা খুবই আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক। শব্দার্থ পরিবর্তনের পর্যালোচনা সামাজিক বিবর্তনের অনেক কথা ব্যক্ত করে। বাগ্ধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের অর্থ পর্যালোচনা অনেক সামাজিক রীতি-নীতির পরিচয় দেয়। শব্দ-প্রয়োগে অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়াস, চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রবণতা শব্দার্থ পরিবর্তনে সাহায্য করে। গতিশীল ভাষায় শব্দার্থ পরিবর্তন তাই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শব্দার্থের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ভাষার স্থায়ী রূপের ক্ষতি সাধন করে।

অনুশীলনী

১। শব্দের অর্থ কি কি কারণে পরিবর্তিত হয় এবং কত প্রকারে পরিবর্তিত হয়, তাহা দৃষ্টান্ত সহযোগে বিবৃত করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৬)

২। শব্দের অর্থ কিভাবে এবং কত প্রকারে পরিবর্তিত হয়, তাহা বহুল দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রদর্শন করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৯)

৩। বাংলা ভাষায় শব্দার্থ পরিবর্তন সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৩)

৪। বাংলা ভাষার শব্দার্থ পবিবর্তনের কারণগুলি দৃষ্টান্ত সহযোগে বর্ণনা করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৫)

পঞ্চম অধ্যায়

ছন্দ

সমস্ত প্রকৃতি ও জীবজগতের মধ্যে এক ছন্দ-স্পন্দতা অপূর্বভাবে পরিলক্ষিত হয়। সমস্ত জগৎই ছন্দোময়। চন্দ্র-সূর্য-বায়ু ছন্দে ছন্দে আবর্তিত হয়। ছন্দের তালে তালে আসে দিন-রাত, ঋতু-পর্যায়। ছন্দের দোলায় দুলছে বিশ্বজগৎ। মানুষের জীবনও ছন্দোময়। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ছন্দের মত পরপর আবর্তিত হ'তে থাকে। ছন্দের তালে তালে তাই জীবজগতের শোভাযাত্রা,—প্রাণের স্পন্দন। প্রকৃতির সর্বত্র পুনরাবৃত্তির ছন্দ-তান অপরূপ অনুভূতি ও আনন্দোচ্ছ্বাসের আকর্ষণ আনে। ছন্দের প্রতি তাই মানুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক। ছন্দের স্পন্দনে অপূর্ব অনুভূতি ও আনন্দোচ্ছ্বাসে দুলছে বিশ্বজগৎ, তারই অনিবার্য আকর্ষণ মানুষের জীবনে, প্রাণে ও মনে।

সমস্ত জগৎই ছন্দোময়

সামাজিক কারণে মানুষের জৈব প্রয়োজন সৃষ্টির জন্য ভাষার প্রয়োজন। ভাষা তাই মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে। কিন্তু মানুষ ভাষাকে শিল্প-সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। ফলে শব্দের অর্থ ও ভাষার বক্তব্য ছন্দের স্পন্দনে ভাবের মাধুর্য সৃষ্টি করে। ভাষার ভাব, অনুভূতি ও ব্যঞ্জনার মুক্তি এনে দেয় ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"কথাকে তার জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দে ছন্দে সেই তার বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।" ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথায়,—"বাক্যস্থিত পদগুলিকে যে ভাবে সাজাইলে বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয় ও তাহার মধ্যে একটা কালগত ও ধ্বনিগত সুষমা উপলব্ধ হয়, পদ সাজাইবার সেই পদ্ধতিকে ছন্দ বলে। পদগুলির অবস্থান এমনভাবে হওয়া চাই, যাহাতে ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতির কোন পরিবর্তন না হয় এবং রচনাটির মধ্যে একটি সহজ লক্ষণীয় এবং সুসঙ্গত পরিপাটি বা আদর্শ (*pattern*) দেখিতে পাওয়া যায়।" ভাষা তখন তার ব্যবহারিক প্রয়োজনের উর্ধ্বে উঠে, নিয়মের বন্ধনে ভাবকে অনুভূতির রাজ্যে মুক্তি দেয়, ভাষা তখন ছন্দোবদ্ধ হ'য়ে শিল্প-সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন,—

ছন্দ কি ?

"মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর
অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর
ভাবের স্বাধীন লোকে।" ('ভাষা ও ছন্দ')

ভাষা মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে। কিন্তু ভাষার মধ্য দিয়ে অনুভূতি-প্রবণ ভাব যখন ছন্দের বন্ধনে ধরা পড়ে, তখন সৃষ্টি হয় কাব্য। কাব্য-কবিতায় ছন্দের একটি সুনির্দিষ্ট স্থান আছে। ছন্দের দোলায় কবিতার ভাব, অনুভূতি ও ব্যঞ্জনা অপরূপ

তরঙ্গে দোলায়িত হয়। ছন্দ কবিতার ধ্বনি-বৈচিত্র্যকে সুমধুর করে, ভাবকে সুদূর-প্রসারী ব্যঞ্জনাধর্মী করে। কবিতার যতি, ছেদ, ভাব ও ছন্দ পাঠকচিত্তে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করে। কাব্য-কবিতার ছন্দ তাই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। 'রোমাণি ছন্দাংসি',—কাব্য-পুরুষের দেহগত রোম হল ছন্দ, ছন্দের সুস্পষ্ট প্রভাব কাব্য-কবিতার অনুভূতির উচ্ছ্বাসকে প্রগাঢ় ক'রে তোলে। **Aristotle** ব'লেছেন,—*Imitation being natural to us and also melody and rhythm, men....produced Poetry."* ছন্দের মাধ্যমে উৎসারিত সুরঝংকার ও ভাবতরঙ্গ কবিতাকে সার্থক ক'রে তোলে। **Hegel**-এর মতে, "*Metre is the first and only condition absolutely demanded of poetry.*"

কবিতা ছন্দ

রবীন্দ্রনাথও ব'লেছেন,—"কবিতার বিশেষত্ব হ'চ্ছে তার গতিশীলতা। অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ ক'রে সুদূর নক্ষত্রলোক পর্যন্ত সর্বত্র নিরন্তর গতিবেগের মধ্যে ছন্দ রয়েছে, বস্তুতঃ এই ছন্দই রূপ, উপাদানকে ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত ক'রলেই সৃষ্টি রূপ ধারণ করে। ছন্দের বৈচিত্র্যই রূপের বৈচিত্র্য। বাতাস যখন ছন্দে কাঁপে, তখনই সে সুর হ'য়ে ওঠে। ভাবকে, কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই তা কবিতা হয়।" কবিতার মধ্যে যে ছন্দের তরঙ্গ আছে, তা পাঠকবর্গের হৃদয়তন্ত্রীকে অনুরণিত করে। রসধ্বনি কবিতার প্রাণ হলেও ছন্দ তার অবলম্বন, এমন কি গদ্যছন্দের মধ্যেও ভাবতরঙ্গ অনুরণিত হয়। কাব্য-কবিতায় ছন্দ তাই অপরিহার্য।

শিক্ষার্থীরা বা পাঠকবর্গ কাব্য-কবিতার প্রতি যে অনিবার্য আকর্ষণ অনুভব করে, ছন্দের জন্যই তা অনেক পরিমাণে সম্ভব হ'য়েছে। বিশ্বজগৎ ছন্দোময়। মানুষের প্রকৃতিতে ছন্দের আভাস আসে। ছন্দ তাই মানুষকে স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট করে। শিশুরা যে ছড়া ভালোবাসে, তা প্রধানতঃ তার ছন্দের জন্যই। ছড়ার সুস্পষ্ট শ্বাসাঘাত ও দ্রুতলয় মনস্তাত্ত্বিক কারণে শিশুচিত্তকে আকর্ষণ করে। ছন্দের মাধ্যমে সৃষ্ট কবিতার ধ্বনি-বৈচিত্র্য ও ভাবতরঙ্গ মনের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। ছন্দই কাব্য-কবিতার শিল্পগত সৌন্দর্যকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। তাই ছন্দের আবেদনে সকলেই সাড়া দেয়। কাব্য-কবিতায় বিভিন্ন ছন্দের মাধ্যমে ভাবকে কিভাবে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পর্যায়ে প্রকাশ করা যায়, কিভাবে অনুভূতির তীব্রতা বৃদ্ধি করা যায়, বক্তব্য কিভাবে সুমধুরভাবে বৈচিত্র্যের সঙ্গে উপস্থাপিত করা যায়, তার জন্য বিভিন্ন কবি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুশীলন ও গবেষণা ক'রেছেন, ফলে নতুন নতুন ছন্দ সৃষ্টি হ'য়েছে। কাব্যতত্ত্ব ও নন্দনচেতনা নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়েছে। নতুন নতুন ছন্দে লেখা সার্থক কবিতাগুলি যুগে যুগে পাঠকবর্গকে আকর্ষণ ক'রেছে। ভাবতরঙ্গায়িত, ধ্বনিমুখরিত, ছন্দ-সুষমাময় কাব্য তাই মানুষের মধ্যে এক বিবিত্র অনুভূতি ও সার্থক আবেদন সৃষ্টি করে। এই আবেদন বিশ্বজননী ;—এই আবেদন দেশকাল, পাত্র-পাত্রীর গণ্ডী ছাড়িয়ে সর্বব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। সেখানেই শিল্প-সাহিত্যের সার্থকতা।

ছন্দের আবেদন

ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকের পক্ষে ছন্দের জ্ঞান কেবলমাত্র আবশ্যক নয়, অপরিহার্যও। কাব্য-সাহিত্যের প্রথাগত গতানুগতিকতাকে বর্জন ক'রে তাকে শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ক'রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপস্থাপিত ক'রতে হবে;—এবং তার জন্যই শিক্ষকের ছন্দের জ্ঞান অপরিহার্য। কাব্য-কবিতার রসধ্বনি গ্রহণ করা সবসময় সব-স্তরের শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ছন্দের আবেদন সকলেরই প্রকৃতিগত। শিশু ছড়া ভালোবাসে ছন্দের জন্যই। কাজেই কাব্য কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দের অপরিহার্য গুরুত্ব বিবেচনা ক'রলে ভাষা ও সাহিত্যের ছন্দ-জ্ঞান অত্যাবশ্যক বলেই স্বীকার ক'রতে হয়। ছন্দের জ্ঞান শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সংক্রামিত হবে। তাই শিক্ষককে ছন্দ সম্বন্ধে জানতে হবে। ছন্দের ছেদ, যতি, পর্ব, চরণ, মাত্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষকের পরিষ্কার ধারণা *(Clear conception)* থাকবে। তিনি বাংলা ছন্দের রীতি-প্রকৃতি জানবেন, বিভিন্ন ছন্দ সম্বন্ধে অবহিত হবেন। বাংলা ছন্দের উপর সংস্কৃত ছন্দ ও ইংরেজী ছন্দের প্রভাব সম্বন্ধে তিনি অবহিত হবেন। ছন্দ সম্বন্ধে এই সমস্ত জ্ঞান শিক্ষক কেবলমাত্র পুঁথিগত ভাবে অর্জন ক'রবেন না,—এ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব দক্ষতা প্রয়োজন। তার জন্য প্রয়োজন ছন্দের অনুশীলন ও চর্চা। ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক নিজের সৃজনশীল রচনার মধ্যে বিভিন্ন ছন্দকে প্রয়োগ ক'রবেন, ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রবেন। তিনি বিভিন্ন কাব্য-কবিতা ছন্দ অনুযায়ী সঠিকভাবে আবৃত্তি করবেন, বিভিন্ন কাব্য-কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ ক'রবেন। এইভাবে অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে তাঁর ছন্দ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। কাব্য-কবিতা শিক্ষাদানের সময় তিনি সেগুলি প্রয়োগ করবেন। কবিতার রসসঞ্চারী পাঠ ছন্দ ছাড়া সম্ভব নয়। শিক্ষক মহাশয় যখন কাব্য কবিতা পড়াতে গিয়ে সরব আবৃত্তি ক'রবেন,—তখন তাঁর ছন্দ-জ্ঞানের প্রয়োজন হবে। ছন্দের উপর নির্ভরশীল না হ'লে সার্থক সরব পাঠ ও শিল্পধর্মী আবৃত্তি সম্ভব নয়। ছন্দ অনুযায়ী কবিতা পাঠ না হলে বিষয়বস্তুর অর্থগ্রহণ ক'রতে ও ব্যঞ্জনা হৃদয়ঙ্গম ক'রতে অসুবিধা হয়। তাই ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকের ছন্দের জ্ঞান প্রয়োজন হয়। শিক্ষক যদি সরব আবৃত্তির মাধ্যমে কবিতা পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ ক'রতে না পারেন তবে কার্যত তাঁর শিক্ষাদান কি ব্যর্থ হয়ে যায় না? শিক্ষকের ছন্দ-জ্ঞান সরব-আবৃত্তিতে প্রতিফলিত হ'য়ে শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করবে। তখন শিক্ষার্থীরাও ছন্দ অনুসারে কবিতার পাঠগ্রহণ করতে সক্ষম হবে। ছন্দের জ্ঞান ছাড়া কবিতার অর্থগ্রহণ, ব্যঞ্জনার হৃদয়ঙ্গম, ধ্বনি-ঝংকারের অনুভূতি, ভাবতরঙ্গের অনুভূতি সম্ভব নয়। ছন্দ তাই কাব্য-সাহিত্যের চর্চায় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শিক্ষক মহাশয় বাংলা ছন্দের মূল সূত্রগুলি জানবেন, কবিতায় ছন্দের উৎস ও শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হবেন, ছন্দের মাধ্যমে সৌন্দর্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে জানবেন; তবেই তাঁর পক্ষে সার্থকভাবে কাব্য-কবিতা শিক্ষাদান সম্ভব। ছন্দ-বিজ্ঞানের জ্ঞানের মাধ্যমেই তিনি শিক্ষার্থীদের সামনে কবিতার গীতি-

ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকের ছন্দের জ্ঞান অপরিহার্য

শিক্ষকের নিজের ছন্দের জ্ঞান থাকবে

মাধুর্য, ধ্বনি-ঝংকার, সুর-মূর্ছনা ও ভাবতরঙ্গ তুলে ধ'রতে পারবেন। নতুবা কাব্য-কবিতার শিক্ষাদান ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। শিক্ষার্থীদের শ্রবণ-সুখকে চরিতার্থ করাও ছন্দের মাধ্যমে সম্ভব। কাজেই দেখা যায় যে, ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকের পক্ষে ছন্দের জ্ঞান কেবলমাত্র আবশ্যক নয়, একেবারে অপরিহার্য।

বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যক্রমে ছন্দকে অন্তর্ভূত করা হয় নি। ছন্দের জ্ঞান অর্জনের মত মানসিকতা বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অর্জিত হয় না বলেই সঠিক কারণে ছন্দকে বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূত করা হয় নি। তাই বিভিন্ন শ্রেণীতে ছন্দের পঠন-পাঠন হয় না। কিন্তু প্রতিটি শ্রেণীতেই বাংলা সাহিত্যের শিক্ষা ও অনুশীলনে কবিতাকে পাঠ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হ'য়েছে। কবিতা শিক্ষাদান, বা কবিতা শিক্ষাগ্রহণ ছন্দের জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীরা কবিতা পড়বে, রসসঞ্চারী সরব পাঠের মাধ্যমেই কাব্য-কবিতার সার্থক আস্বাদন ক'রতে পারবে। তার জন্য ছন্দের জ্ঞান প্রয়োজন, কবিতার বিষয়বস্তু উদ্ধার, অর্থের উপলব্ধি, ভাবগ্রহণ, শিল্প-সৌন্দর্য নিরূপণ, কবিতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও ছন্দের জ্ঞান অপরিহার্য। তাই ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাগ্রহণের সময় শিক্ষার্থীদের ছন্দের জ্ঞান আবশ্যক হয়। কিন্তু ছন্দের এই জ্ঞান তারা পাবে কোথায়? শিক্ষক মহাশয়ই বা কিভাবে শিক্ষার্থীদের ছন্দের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ধারণা দেবেন? এর উত্তর পেতে হ'লে বিদ্যালয়-স্তরে ছন্দ-শিক্ষার দু'টি পৃথক স্তর বা পর্যায়ে শিক্ষাদানের রীতি ও কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে হয়। তা হ'ল ;—

বিদ্যালয়ে ছন্দ শিক্ষাদান

॥ এক ॥ নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর :

নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে কবিতার ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করবার অবকাশ নেই। কারণ শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তা ও মানসিকতা সেই পর্যায়ে গড়ে ওঠে নি। কিন্তু কবিতার পাঠগ্রহণ ছন্দের জ্ঞান ছাডা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশী। শিক্ষক মহাশয় প্রতিটি কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ সঠিকভাবে ক'রবেন। তারপর ছন্দ অনুযায়ী কবিতার সরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছন্দের জ্ঞান সংক্রামিত করবেন। তিনি ছন্দ, যতি, ছেদ, মাত্রা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে সুস্পষ্টভাবে কবিতার রসসঞ্চারী সরব পাঠ দেবেন। তাঁর পাঠের অনুকরণ করেই শিক্ষার্থীরা ছন্দের জ্ঞান অর্জন ক'রবে। কবিতার সরব আবৃত্তির মধ্যে শিক্ষক ছন্দের লয়, শ্বাসাঘাত প্রভৃতিকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত ক'রবেন। শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের ছন্দ রক্ষা করে সরব আবৃত্তিতে উৎসাহিত ক'রবেন। এই ভাবে শিক্ষক মহাশয় নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ছন্দ শিক্ষা দেবেন।

নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে ছন্দ শিক্ষা

॥ দুই ॥ মাধ্যমিক স্তর :

নবম দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক স্তরেও ছন্দ শিক্ষদানের সময় মূলতঃ সরব আবৃত্তির

দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। ছন্দকে গ্রহণ ক'রবার মত শিক্ষার্থীদের কান ও মনকে সচেতন ক'রতে হবে। তবে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিকতা অনেকখানি এগিয়ে যায়। কাজেই এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। 'পাঠ সংকলন' প্রভৃতি পাঠ্য গ্রন্থে যে সব কবিতা সংকলিত থাকে, সেগুলি শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক মহাশয় প্রাসঙ্গিকভাবে ছন্দের আলোচনা ক'রবেন। বিশেষ কোন একটি কবিতা আলোচনার সময় শিক্ষক সেই কবিতায় ব্যবহৃত ছন্দের প্রকৃতি ও রীতি সম্বন্ধে আলোচনা ও বিশ্লেষণ ক'রবেন। কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর আলোচনাই কবিতা শিক্ষাদানের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়। কবিতার কাব্যরস, শিল্পকার্য, গঠন-রীতি, রূপনির্মিতি, শব্দযোজনা প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের যথাযথ অবহিত করাই কাব্য-কবিতা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই কবিতা শিক্ষাদানের সময় প্রাসঙ্গিকভাবে ছন্দের আলোচনা ক'রলে শিক্ষার্থীরা তা সহজে গ্রহণ ক'রতে পারবে। এই ভাবে বিভিন্ন কবিতা শিক্ষাদানের সময় তার ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলে শিক্ষার্থীরা বাংলা ছন্দের রীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হবে। কারণ পাঠ্য পুস্তকে প্রায় সব জাতীয় ছন্দের কবিতা সংকলিত থাকে। মাঝে মাঝে ছন্দ সম্বন্ধে পৃথক আলোচনাও ক'রতে হবে। এইভাবে শিক্ষক মহাশয় বিভিন্ন শ্রেণীতে ছন্দ শিক্ষা দেবেন।

মাধ্যমিক স্তরে ছন্দ-শিক্ষা

বিদ্যালয়-স্তরে ছন্দ শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে আবৃত্তির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বিদ্যালয়-স্তরে ছন্দ পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূ'ত নয়। অথচ কবিতার পাঠগ্রহণ ছন্দের জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। আবৃত্তি ক'রতে গেলেও ছন্দের জ্ঞান অপরিহার্য হ'য়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছন্দ-বোধ জাগ্রত ক'রতে আবৃত্তিই প্রধান অবলম্বন। শিক্ষক মহাশয় সার্থক আবৃত্তির মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছন্দ-বোধ জাগ্রত ক'রবেন। আবৃত্তি শিল্পকার্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কবিতার সরব আবৃত্তিকে শিক্ষার্থীরা শিল্পগত দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখবে, এবং সেই অনুযায়ী আবৃত্তির অনুশীলন ক'রবে। শিক্ষক মহাশয় ছন্দের আনুগত্য মেনে নিয়ে সার্থক সরব আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে ছন্দ-বোধ সংক্রমিত করবেন। শিক্ষার্থীরা ছন্দের চর্চা ক'রবে, ছন্দ সম্বন্ধে ধারণা অর্জন ক'রবে। ছন্দ-শিক্ষায় আবৃত্তির স্থান তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আবৃত্তি ও ছন্দ-বোধ

বাংলা ছন্দ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান। নানা কবির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাংলা ছন্দ সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলা ছন্দের আলোচনা ও বিশ্লেষণও অনেক হয়েছে। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তাই এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। বাংলা ছন্দের আলোচনা জটিল ও বিতর্কমূলক। তাই এ সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠক ছন্দের অন্যান্য বই দেখে নিতে পারেন।

বাংলা ছন্দ-বিজ্ঞান

বাংলা ছন্দের উপাদান ঃ

বাংলা ছন্দের আলোচনায় অক্ষর, মাত্রা, যতি, পর্ব, চরণ ও স্তবক প্রভৃতির আলোচনা খুবই প্রয়োজন। কারণ এগুলিই বাংলা ছন্দের উপাদান। বাংলা ছন্দের বিশ্লেষণে এই

উপাদানগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। একে একে বাংলা ছন্দের এই উপাদানগুলির আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ অক্ষর (Syllable) ॥

বাগ্‌যন্ত্রের সামান্য প্রচেষ্টায় যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বলা হয়। অক্ষর হ'ল উচ্চারণ-সাধ্য ক্ষুদ্রতম ধ্বনি। ইংরেজী *syllable* ই হ'ল বাংলা অক্ষর। 'বিজন' শব্দটিতে 'বি' ও 'জন' দুটি অক্ষর। অক্ষর দু' প্রকার—স্বরান্ত ও হলন্ত। যেসব অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকে, তাকে স্বরান্ত অক্ষর ও যে সব অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে, তাকে হলন্ত অক্ষর বলে।

॥ মাত্রা (Mora) ॥

উচ্চারণে সময়ের পরিমাপ হল মাত্রা। এক একটি অক্ষর উচ্চারণ ক'রতে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, সেই অনুযায়ী অক্ষরের মাত্রা নির্ধারিত হয়। সাধারণতঃ অক্ষর যখন হ্রস্ব উচ্চারিত হয়, তখন এক মাত্রা ধরা হয়, এবং যখন দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তখন দুই মাত্রা ধরা হয়। তবে বাংলা ছন্দে মাত্রা সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। কারণ বাংলা কবিতায় ভাব ও ছন্দের প্রকৃতি অনুযায়ী অক্ষরের মাত্রা নির্ধারিত হয়।

॥ যতি ও ছন্দ (Metrical Pause and Sense Pause) ॥

উচ্চারণের জন্য শ্বাসবায়ুর প্রয়োজন হয়। তাই আমরা একটানা উচ্চারণ ক'রে যেতে পারি না। শ্বাসবায়ু নেওয়ার জন্য ও উচ্চারণে অর্থকে প্রকাশিত করার জন্য মাঝে মাঝে থামতে হয়। উচ্চারণের এই বিরতিই যতি ও ছেদ। যতি ও ছেদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কবিতার কোন ছত্রের যতখানি অংশ ছন্দের তাগিদে এক ঝোঁকে (*Impulse*) উচ্চারিত হয়, তার পরই যতি (*Metrical Pause*) ব্যবহার করা হয়। আবার কবিতার অর্থপ্রকাশ ও শ্বাসবায়ু গ্রহণের জন্য উচ্চারণের যে স্থানে বিরতি হয়, সেখানে ছেদ পড়ে। ছন্দের প্রকৃতি ও কবিতার রূপনির্মিতি অনুযায়ী যতি ও ছেদের অবস্থান হয়। কবিতায় কোন ছত্রের কিছুটা অংশ উচ্চারিত হওয়ার পর জিহ্বা যেখানে ছন্দের ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টি ক'রবার জন্য নিয়মানুযারী কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেয়, সেখানেই যতি বসে। বাক্যের অর্থ প্রকাশের সঙ্গে ছেদের গভীর যোগ আছে। কারণ অর্থ যখন কোন একটি জায়গায় সম্পূর্ণ হয়, সেখানে ছেদ বসে। যতি ও ছেদ তাই কবিতায় ধ্বনি-বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য।

॥ পর্ব ও পর্বাঙ্গ (Bar and Beat) ॥

কবিতায় যতি দ্বারা খণ্ডিত এক একটি অংশকে পর্ব বলে। কবিতার প্রারম্ভ থেকে যতি পর্যন্ত অংশকে বা দু'টি যতির মধ্যবর্তী অংশকে পর্ব বলে। পর্বের ছোট ছোট অংশগুলিকে পর্বাঙ্গ বলে। যেমন,—

সাগর : জলে/সিনান : করি/সজল : এলো/চুলে
বসিয়া : ছিলে/উপল : উপ/কূলে।

এখানে সাগর, জল, সিনান, করি প্রভৃতি পর্বাঙ্গ, এবং দু'টি ক'রে পর্বাঙ্গ নিয়ে এক একটি পর্ব হ'য়েছে। বাংলা ছন্দে ৮/১০ মাত্রারও পর্ব দেখা যায়।

॥ চরণ (Metrical Line) ॥

বাংলা ছন্দে কয়েকটি পর্ব মিলে এক একটি চরণ গঠিত হয়। কবিতার পূর্ণ যতি যেক্ষেত্রে ধ্বনি-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই নিয়ন্ত্রিত পূর্ণ-ধ্বনি-প্রবাহই চরণ (*Metrical Line*)। বাংলায় পংক্তি আর চরণ এক নয়। কখনও কখনও ২-৩টি পংক্তি নিয়ে এক-একটি চরণ হ'তে পারে। পংক্তি (*Written Line*) হ'ল কবিতায় লেখা-সাজানোর বিন্যাসমাত্র। বাংলা ছন্দে ৪-৫ পর্বের চরণও লক্ষ্য করা যায়।

॥ স্তবক (Stanza) ॥

দু'টি বা তার বেশী চরণ পরস্পর সন্নিবিষ্ট হ'য়ে সার্থকতামণ্ডিত হ'লে তাকে স্তবক বলে। কবিতার এক একটি স্তবকে এক একটি ভাব সংহত হয়। ৮-১০ চরণের স্তবক বাংলা কবিতায় লক্ষ্য করা যায়।

॥ বল বা শ্বাসাঘাত (Stress or Accent ॥

বাংলা কবিতার উচ্চারণে কোন কোন অক্ষরে অন্যান্য অক্ষরের চেয়ে বেশী ঝোঁক পড়ে। উচ্চারণের এই অতিরিক্ত ঝোঁককে বল, শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত বা প্রস্বর বলে। যেমন,—

ওই, সিঁ'ন্ধুর টিপ/সিং'হল দ্বীপ/কাঁ'ঞ্চন্‌ময়/দেঁ'শ

—উল্লিখিত উপাদানগুলিকে অবলম্বন ক'রে বাংলা-কাব্যে ছন্দরীতি গ'ড়ে ওঠে।

॥ বাংলা ছন্দের প্রকার-ভেদ ॥

রীতি ও বৈচিত্র্য অনুযায়ী বাংলা ছন্দের প্রকারভেদ আছে। ধ্বনি ও উচ্চারণগত পার্থক্য থাকায় বাংলা কাব্যে সংস্কৃত ছন্দের যথাযথ অনুকরণ সম্ভব হয় নি। বাংলা ছন্দ তিন প্রকার,—

১। অক্ষর বৃত্ত বা তান প্রধান ছন্দ
২। মাত্রা বৃত্ত বা ধ্বনি প্রধান ছন্দ
৩। স্বর বৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ

একে একে এগুলির আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ অক্ষর বৃত্ত বা তান প্রধান ছন্দ ॥

অক্ষর বৃত্ত ছন্দে প্রতি অক্ষরই এক মাত্রার। তবে শব্দের অন্তে অবস্থিত হলন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর দু'মাত্রার হয়। তান প্রধান ছন্দ ধীর:লয়ের ছন্দ। এই ছন্দে একটি

মধুর স্বর বা তান থাকে ; এবং সেটিই এই ছন্দের প্রাণ। **তান প্রধান এই ছন্দে শব্দধ্বনির একটি অতিরিক্ত তান বা অখণ্ড সুরপ্রবাহ প্রকাশিত হয়।** প্রাচীন পয়ারের ভিত্তিতেই তান প্রধান ছন্দ রচিত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ৬, ৮ বা ১০ মাত্রার পর্বও লক্ষ্য করা যায়। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, সনেট, অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রভৃতি তান প্রধান ছন্দের অন্তর্ভূ'ত। শব্দের আদিতে বা মধ্যে যুক্তাক্ষর একমাত্রার বলে এই ছন্দে যুক্তাক্ষর ব্যবহারের সুযোগ বেশী। তানপ্রধান ছন্দে তাই যেমন যুক্তাক্ষরবর্জিত কবিতা রচনা করা যায়, তেমনি যুক্তাক্ষর-বহুল কবিতাও রচনা করা যায়। অন্য কোন ছন্দে অক্ষরের এতখানি স্থিরতা লক্ষ্য করা যায় না। এই ছন্দে তানই প্রধান বলে অক্ষরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। যুক্তাক্ষরের এক-মাত্রিকতা ও সংকোচন শক্তিকে রবীন্দ্রনাথ **'শোষণ শক্তি'** বলে অভিহিত করেছেন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ তান প্রধান বলে এতে গতিমন্থরতা এসে যায়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সুমধুর সুরে আবৃত্তি করা যায়, অনুভূতিপ্রবণ বিষয়বস্তুকে ব্যঞ্জনধর্মী ক'রে প্রকাশ করা যায়। তৎসম, অর্ধতৎসম প্রভৃতি শব্দ এই ছন্দে ব্যবহারের সুযোগ বেশী বলে রবীন্দ্রনাথ একে **'সাধুভাষার ছন্দ'** ব'লেছেন। তানপ্রধান ছন্দ অমিত্রাক্ষরের উপযোগী, মহাকাব্য রচনার উপযোগী। ধীর লয়ে অক্ষরগুলির সুনির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী আবেগমধুর স্বরধ্বনির তান প্রবাহে এই ছন্দ প্রান-স্পন্দিত হয়। উদাহরণ—

পয়ার— "একথা জানিতে তুমি/ভারত-ঈশ্বর সাজাহান
কালস্রোতে ভেসে যায়/জীবন যৌবন ধনমান।"

ত্রিপদী— "শুধু বিঘে দুই/ছিল মোর ভুঁই/বাকি সব গেছে ঋণে,
বাবু কহিলেন,/"বুঝেছ উপেন,/এ জমি লইব কিনে।"

চৌপদী— "চির সুখীজন/ভ্রমে কি কখন/ব্যথিত বেদন/বুঝিতে পারে!
কি যাতনা বিষে/বুঝিবে সে কিসে/কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

অমিত্রাক্ষর— "গাঁথিব নূতন মালা/তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল/ইচ্ছা সাজাইতে… …..
………………… …. ……………………. ………… ।"

সনেট— যে কোন চতুর্দশপদী কবিতা।

শোষণশক্তি— "গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর।" (যুক্তাক্ষর নেই)
"উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে।"
যুক্তাক্ষর আছে)

মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ :

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনি বা যুক্তাক্ষরকে দু'মাত্রারও অযুগ্ম ও অযুক্ত অক্ষরগুলি একমাত্রার। এই ছন্দে প্রতিটি অক্ষর ধ্বনিই বিশেষ প্রাধান্য পায়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অযুক্ত ও অযুগ্ম ধ্বনিগুলিও কখনও কখনও দু'মাত্রার হয়। এই ছন্দে শব্দধ্বনি প্রাধান্য

পাওয়ায় একে ধ্বনিপ্রধান ছন্দ বলা হয়। ধ্বনিপ্রধান ছন্দের পর্বগুলি খুব বড় বড় হয় না ; সাধারণত ৫ থেকে ৭ মাত্রার পর্ব দেখা যায়,—এই ছন্দে ৫ বা ৭ বারে অসম মাত্রার পূর্ণ পর্ব পাওয়া যায়। সংস্কৃত দীর্ঘস্বর দু মাত্রার। বাংলায় এ ধরনের উচ্চারণ রীতি প্রচলিত নেই। কিন্তু এই পদ্ধতিতে প্রত্নরীতির মাত্রাবৃত্ত ছন্দ দেখা যায়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুক্তাক্ষরের শোষণশক্তি নেই। এই ছন্দ ধ্বনিপ্রধান মধ্যলয়ের ছন্দ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ দু প্রকার,—

(১) প্রত্নরীতির— "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী"

বৈষ্ণব পদাবলী মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রত্নরীতিতে রচিত। রবীন্দ্রনাথের "জনগণ মন অধিনায়ক", "অন্তর মম বিকশিত কর………………" ইত্যাদি গান ও কবিতা প্রত্ন-মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

(২) নব্যরীতির— "দুর্গম গিরি/কান্তার মরু/দুস্তর পারাবার হে
লঙ্ঘিতে হবে/রাত্রি নিশীথে/যাত্রীরা হুঁশিয়ার।"

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে হলন্ত শব্দ উচ্চারণে স্বাভাবিক পদ্ধতির একটু ব্যতিক্রম হয়। কিন্তু তা এই ছন্দকে সুমধুর ধ্বনিময় ক'রে তুলে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের গঠন তাই একটু ঢিলে-ঢালা, কিন্তু তার সুর-মূর্ছনা লক্ষণীয়।

॥ বলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ ॥

যে ছন্দের পর্বগুলি ৪ মাত্রার এবং প্রতিপর্বের প্রথমে একটি ক'রে শ্বাসাঘাত পড়ে, তাকে বলবৃত্ত ছন্দ বলে। এই ছন্দে প্রতি পর্বে চারমাত্রা থাকে এবং দু'টি পর্বাঙ্গ থাকে। শেষের পর্বটি সম্পূর্ণ থাকতে পারে। বাংলা ভাষায় ছড়াগুলি এই ছন্দে লিখিত বলে একে 'ছড়ার ছন্দ' বলা হয়। বলবৃত্ত ছন্দে প্রতি অক্ষর এক মাত্রার। এই ছন্দে প্রতি পর্বের গোড়ায় বল, শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর পড়ে, এবং সেটাই এই ছন্দের প্রাণসম্পদ। বলবৃত্ত ছন্দ দ্রুতলয়ের। বলবৃত্ত ছন্দে প্রতিচরণের প্রতিপর্বের গোড়ায় শ্বাসাঘাত পড়ে, ফলে পর্বের ব্যঞ্জনান্ত শব্দ সংকুচিত হ'য়ে একমাত্রায় পরিণত হয়। ছড়ার ছন্দে ২, ৩, ৪, ও ৫ পর্বেরও চরণ দেখা যায়। এই ছন্দে প্রতি পর্বে যুক্তধ্বনির অবস্থান দেখা দেয়। লৌকিক ছড়া এই ছন্দে লিখিত বলে একে **'লৌকিক ছন্দ'**ও বলা হয়। শ্বাসাঘাত, যুগ্মধ্বনি ও দ্রুতলয়—এই ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য। যেমন—

১। "ওই সিঁন্দুর টিপ/সিংহল দ্বীপ/কাঁঞ্চনময়/দেঁশ"।

২। "মৃত্যুকে যে/এঁড়িয়ে চলে/মৃঁত্যু তারেই/টাঁনে
মৃঁত্যু যারা/বুঁক পেতে লয়/বাঁচতে তারাই জাঁনে"।

৩। "ঐঁ যে গাঁটি/যাঁচ্ছে দেখা/আঁইরি/খেতের/আঁড়ে।

৪। "ছোঁটো যে হায়/অঁনেক সময়/বঁড়োর দাবী/দাঁবিয়ে চলে।

বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ঃ

বিশেষ করে ভারতচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ বহু সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা ক'রেছেন। যেমন—

তোটক ছন্দ— ১। "দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ গুণে।
"কবি রাজ কহে গৌড় জনে॥" —ভারতচন্দ্র

২। "একি ভাণ্ডারে লুট করে ধান লোটানো।"
একি চাষ দিয়ে রাশ করে ফুল ফোটানো।"
—সত্যেন্দ্রনাথ

ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দ— "মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙা ঘোর বাজে॥"
—ভারতচন্দ্র

মালিনী ছন্দ— "উড়ে চলে গেছে বুল্ বুল্ শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।"
—সত্যেন্দ্রনাথ

রুচিরা ছন্দ— "তখন কাহার আঁচলে গোপন যূথীর মালা
মধুর মধুর ছড়াইত বাস—কে সেই বালা ?"
—সত্যেন্দ্রনাথ

তূণক ছন্দ— "ভূতনাথ ভূতনাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে
যক্ষরক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।"
—ভারতচন্দ্র

পঞ্চ চামর ছন্দ— "মহৎ ভয়ের মূরত সাগর বরণ তোমার তমঃ শ্যামল ;
মহেশ্বরের প্রলয় পিনাক শোনাও আমায় শোনাও
কেবল।"
—সত্যেন্দ্রনাথ

মন্দাক্রান্ত ছন্দা— "পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্র মন্থর বচন কও।"

—সত্যেন্দ্রনাথ

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ঃ

ইংরেজ কবি মিলটনের অনুকরণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পয়ার-জাতীয় রচনা। পয়ারের সঙ্গে গঠন কাঠামো একই রকম, মাত্রাও প্রতিচরণে ৮+৬। অমিত্রাক্ষর ছন্দে অর্থযতি ও পূর্ণযতি পয়ারের মতো একই স্থানে পড়ে। তবে অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রতিচরণে পয়ারের মত অন্ত্যমিল নেই, যতি ও ছেদ পয়ারের মত একই স্থানে পড়ে না। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছেদ যতির

বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। পয়ারে প্রতিচরণে এক একটি ভাব সম্পূর্ণতা লাভ করে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে চরণের বন্ধন হতে ভাব মুক্তি পেয়েছে। এই ছন্দে তাই ভাবের প্রবহমাণতা লক্ষ্য করা যায়। অমিত্রাক্ষর ইংরেজী *Blank verse*-এর অনুরূপ। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ধীর লয়ের তানপ্রধান ছন্দ। পয়ারের মত অন্ত্যমিল না থাকলেও এই ছন্দে সংস্কৃত তৎসম শব্দ, যুক্তাক্ষর ও অনুপ্রাসের প্রয়োগ অপূর্ব ধ্বনি-ঝংকার সৃষ্টি করে এবং অন্ত্যমিলের অভাব পূর্ণ করে। এই ছন্দ মহাকাব্য রচনার উপযোগী। মধুসূদন দত্ত তাঁর কাব্যে এই ছন্দের মাধ্যমে একই সঙ্গে গাম্ভীর্য ও ধ্বনিপ্রবাহ সৃষ্টি ক'রতে পেরেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এতখানি কৃতিত্ব অর্জন ক'রতে সক্ষম হন নি।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদাহরণ ঃ

"সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবি, অমৃত-ভাষিণী,
কোন্ বীরবরে বরি' সেনাপতি পদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ?" —মধুসূদন (মেঘনাদবধ-কাব্য)

'বলাকা'র ছন্দ ঃ

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ছন্দ নতুন রীতিতে লেখা। অনেকে একে মুক্তবন্ধ ছন্দ, মুক্তক ছন্দ বা *Free verse* বলেছেন। কিন্তু বলাকার ছন্দ ঠিক মুক্তক ছন্দ বা *Free verse* নয়। বলাকার পংক্তিগুলিতে অন্ত্যানুপ্রাস, কিন্তু প্রতিটি পংক্তিতে অক্ষর-সংখ্যা সমান নয়। বলাকা কাব্যের কবিতাগুলিতে পংক্তিগুলি এক একটি চরণ নয়। যতি ও ছেদের ক্ষেত্রে এই ছন্দ বন্ধনমুক্ত। কোথায় যে ছেদ পড়বে, তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। বলাকার পংক্তিগুলি অসম্পূর্ণ। অনেক স্থলে ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ যোগ করা হ'য়েছে। কিন্তু তা ছন্দের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলে গেছে। কাব্যের ভাব ও অনুভূতির সঙ্গে 'বলাকা'র ছন্দের মিল আছে, ভাবের যতি ছন্দের গতিতে প্রতিফলিত হ'য়েছে। ছোট পংক্তির সঙ্গে বড় পংক্তির অন্ত্যমিল ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ছন্দের মধ্যে এক ভাবতরঙ্গ ও ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি ক'রেছেন। যেমন,—

"তার চেয়ে যবে
ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
বসন্তে আমার পুষ্পবনে
চলিতে চলিতে অন্য মনে
অজানা গোপন গন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি,

পথহারা সেই উপহার,
হবে সে তোমার।
যেতে যেতে বীথিকায় মোর
চোখেতে লাগিবে ঘোর,
দেখিবে সহসা—
সন্ধ্যার কবরী হতে খসা
একটি রঙ্গিন আলো কাঁপি থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের 'পরে,
সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেই তো তোমার।"

—১০ নং কবিতা
(বলাকা)

॥ গৈরিশ ছন্দ ॥

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর নাটকে পদ্যের ক্ষেত্রে যে ছন্দ ব্যবহার ক'রেছেন, তাকে 'গৈরিশ ছন্দ' বলে অভিহিত করা হয়। গিরিশচন্দ্রের আগে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'র দ্বিতীয় ভাগে এই জাতীয় ছন্দ ব্যবহার ক'রেছেন; গিরিশচন্দ্রের পূর্বে রাজকৃষ্ণ রায়ও সে প্রচেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের হাতে এই ছন্দ পরিপূর্ণতা লাভ ক'রেছে বলে তা 'গৈরিশ ছন্দ' নামে খ্যাত। ডঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এই ছন্দকে মুক্তক ছন্দ বা *free verse* ব'লেছেন। গৈরিশ ছন্দে পর্বসংখ্যা ও পর্বের দৈর্ঘ্য সমান নয়। মধুসূদন দত্তর অমিত্রাক্ষার ছন্দকে গিরিশচন্দ্র আরও মুক্তি দিয়েছেন। তবে পয়ার ছন্দের কাঠামোতেই গৈরিশ ছন্দ রচিত। এই ছন্দে পর্বগুলিকে অস্বীকার করা হয় নি। পৌরাণিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে গৈরিশ ছন্দ খুবই উপযোগী। এতে নাটকের গতিবেগ অক্ষুণ্ণ থাকে। তবে ছন্দের বন্ধনকে গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম ক'রতে পারেন নি। গৈরিশ ছন্দের উদাহরণ,—

"আরে-রে অর্জুন,
আরে পুত্রঘাতী কপট ফাল্গুনী,
আরে বীর গর্বে গর্বী ধনঞ্জয়,
দেখি, কে রাখে তোমায়—
কৃষ্ণসখা কেমনে নিস্তারে!
দুস্তর এ প্রতিহিংসানল—
দেখি, তোরে কে তারে, পামর!
যাই, রাজা, কাল ব'য়ে যায়,
প্রতিবিধিৎসার কাল বহে,
চলে জনা, প্রতিবিধিৎসিতে।" — 'জনা'

গদ্যছন্দ ঃ

গদ্যছন্দে অন্ত্যমিল থাকে না। ইংরেজীর *Free verse* বা *Prose verse*-এর সঙ্গে গদ্যছন্দের মিল আছে। গদ্যছন্দে মিলের অপেক্ষা থাকে না, থাকে ছন্দের দোলা। ছন্দের যেসব বাঁধাধরা নিয়ম আছে, গদ্য কবিতায় তা নেই। গদ্য কবিতায় কবিতার বিশেষ গঠন-ভঙ্গীকেও পরিহার করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গদ্য কবিতা পড়তে গিয়ে সুরের রেশ থেকে যায়। তাই গদ্য কবিতার মধ্যেও ছন্দের বিকাশ আছে। ছন্দের প্রথাগত রীতির বন্ধন মুক্ত ক'রে গদ্যছন্দকে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত ক'রেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁরই কথায়, "গদ্য কাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্য কাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ রীতিতে যে একটি সলজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন-প্রথা আছে, তাও দূর ক'রলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হ'তে পারে।" গদ্যছন্দে ভাব অনুযায়ী যতি ও ছেদ পড়ে। গদ্যছন্দে প্রতিটি পংক্তিই এক একটি চরণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লিপিকা' গ্রন্থে ছন্দের প্রয়োগ শুরু ক'রেছিলেন। তাঁর 'পুনশ্চ', 'পত্রপুট', 'শেষ সপ্তক', 'পরিশেষ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ সার্থক গদ্যছন্দের কাব্য। গদ্যছন্দের উদাহরণ,—

"বিষয়টা হচ্ছে আমার নাটক।
বন্ধুদের ফরমাস, ভাষা হওয়া চাই অমিত্রাক্ষর।
আমি লিখেছি গদ্যে।
পদ্য হল সমুদ্র
সাহিত্যের আদি যুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দ তরঙ্গে,
কল কল্লোলে!
গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি করে।
... ...
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে।
সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে
আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।"

'নাটক'—পুনশ্চ

*   *   *   *   *

"বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েই শুধোল,
'আমাদের গেছে যে দিন
একেবারেই কি গেছে,
কিছুই কি নেই বাকি।'
একটুকু রইলেম চুপ করে ;
তারপর বললেম,
'রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।"

'হঠাৎ দেখা'—শ্যামলী

অনুশীলনী

১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কবিতা পড়াইবার সময় শিক্ষকের ছন্দ সম্পর্কে কি পরিমাণ জ্ঞান থাক উচিত ? উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের তিনি ঐ জ্ঞান কতটুকু দান করিবেন ? নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে কবিতা পাঠের সময় ছাত্ররা যাহাতে ছন্দটি সম্যকরূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, সেই বোধ তাহাদের মধ্যে কিরূপে জাগ্রত করিবেন ? (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৮)

২। ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকের পক্ষে ছন্দোবিদ্যার জ্ঞান অত্যাবশ্যক ;—যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক এই মন্তব্যের যথার্থতা বিচার করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৪)

৩। বাংলা ছন্দ বিচারে এত মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় কেন ? তৎসম ছন্দ কাহাকে বলে ? সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে রচিত কয়েকটি বাংলা কবিতার উল্লেখ করিয়া ঐ ছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৬৭)

৪। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের পাঠ দিতে গেলে শিক্ষকের ছন্দ-জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করেন কি ? এ বিষয়ে আপনার মতামত বিবৃত করুন। (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৬৮)

৫। পর্ব, পর্বাঙ্গ, অক্ষর, যতি, ছেদের লক্ষণ কি কি ? কোনও কবিতাংশকে অবলম্বন করিয়া উদাহরণ দিতে হইবে। (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৮)

৬। বাংলা গদ্য ও সাহিত্য পড়াইবার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকার ছন্দ ও অলংকার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দুইটি ছন্দ ও দুইটি অলংকারের উদাহরণ দিয়া বিস্তৃত আলোচনা করুন। (উত্তরবঙ্গ বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৭)

৭। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক প্রচলিত ছন্দ কোন্‌টি ? এই ছন্দের প্রধান লক্ষণ কি ? এই ছন্দের মূল কাঠামো বজায় রাখিয়াও কি কি ভাবে তাহার বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা হইয়াছে দৃষ্টান্ত সহকারে উল্লেখ করুন। (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৭৩)

ষষ্ঠ অধ্যায়

অলংকার

ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। ভাষা হ'ল ভাবের বাহন। মানুষের জৈব প্রয়োজন সিদ্ধ ক'রতে ভাষার সৃষ্টি। কিন্তু আনন্দের আরাধনায়, শিল্পের মণ্ডন-কলায় ও সৌন্দর্যের নন্দন-চেতনায় মানুষ ভাষাকে নতুন ক'রে সজ্জিত করে। তখন সৃষ্টি হয় শিল্প ও সাহিত্য। ভাষাকে নব কলেবরে সজ্জিত ক'রবার প্রধান অবলম্বন হল 'অলংকার'। মেয়েরা অলংকার পরিধান

কাব্যে অলংকারবাদ

করে সৌন্দর্যের জন্য; যথাযথভাবে অলংকার পরিধান ক'রলে সৌন্দর্যের প্রকাশ হয়। ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে অলংকার সন্নিবেশিত ক'রতে পারলে তেমনি শিল্প-সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। নারীদেহের অলংকার বহু বিচিত্র ধরনের। কাব্যের অলংকারও বহুবিধ। 'অলম্' শব্দটির অর্থ হল 'ভূষণ'। যার দ্বারা ভূষিত করা হয়, তাই অলংকার। কাব্যে অলংকার প্রয়োগের মাধ্যমে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় সাহিত্যতত্ত্বে, তাই অলংকারবাদকে স্বীকার করা হ'য়েছে। কাব্যতত্ত্বের নাম তাই 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' বা কাব্যসৌন্দর্য বিজ্ঞান। কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ক'রবার জন্য কবিগণ অলংকার প্রয়োগ ক'রে থাকেন। আচার্য বামনের মতে **'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ'**। অলংকারের গুণেই বাক্য কাব্য হয়। কাব্য-লক্ষ্মীর দেহে যখন অলংকার সজ্জিত করা হয়, তখন তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

এখন কথা আসে,—অলংকার কি ? আচার্য বামনের মতে, **"সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ"**, —সৌন্দর্যই অলংকার। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, অলংকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে মাত্র, সৌন্দর্য সৃষ্টি করে না। নির্দোষ রমণীদেহে যথাযথভাবে

অলংকার কি ?

অলংকার সজ্জিত ক'রতে পারলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রমণীর অবয়ব-সংস্থান যদি সঠিক না হয়, তবে কেবলমাত্র অলংকার সৌন্দর্য সৃষ্টি ক'রতে পারে না। তেমনি কাব্যের মধ্যেও যথাযথ স্থানে যথাযথভাবে অলংকার সংস্থান কর'তে হবে। প্রত্যেক কাব্যেরই বিষয়বস্তু থাকে, শরীর থাকে। সেই বিষয়বস্তুকে অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত ক'রলেই তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

অলংকারই কাব্যের একমাত্র সম্পদ নয়। অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে অথচ কাব্য হয় নি, এমন বহু উদাহরণ আছে। আবার অলংকার ব্যবহৃত না হ'লেও কাব্য হ'য়েছে, এমন অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু অলংকার যে কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে, সে বিষয়ে বিতর্ক নেই। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি কবিতা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে, সেটি হ'ল,—

"হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়,
এবার কঠিন-কঠোর গদ্য আনো,—

পদ-লালিত্য ঝংকার মুছে যাক্
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা,
কবিতা, তোমায় দিলেম আজকে ছুটি।
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়,—
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

কবিতাটির মধ্যে ছন্দ আছে, রূপনির্মিতি আছে, শব্দপ্রয়োগ-কৌশল আছে, ধ্বনিবৈচিত্র্য আছে, বক্তব্যের ক্ষুরধার আছে। কিন্তু গোটা কবিতাটি শেষ ছত্রের উৎপ্রেক্ষা অলংকারের উপর দাঁড়িয়ে আছে;—এবং সেখানেই কবিতাটির কাব্য-সৌন্দর্য। তবে কাব্যের রস-বিচারের প্রশ্নে অলংকার কাব্য-কবিতার পক্ষে অপরিহার্য নয়। **অনুভূতির উচ্ছ্বাসই কাব্য,—রসধ্বনি যার প্রাণ।** অলংকার রসধ্বনিকে সমৃদ্ধ করে, বক্তব্যের উপস্থাপনে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে, কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

কাব্যে অলংকার অপরিহার্য নয়

অনেকগুলি অলংকার কাব্যের বিষয়বস্তু বা কাব্যের শোভা বর্ধন ক'রতে গিয়ে নিঃশেষিত হয়ে যায়;—কেবলমাত্র কাব্যের বহিরঙ্গের শোভাবর্ধন করে মাত্র। এগুলিকে বলে **বাচ্যালংকার**। কিন্তু বাচ্যের চমৎকারিত্ব, ভাষার অসাধারণত্ব ও অলংকারের সৌন্দর্য কাব্যের আত্মা নয়। কাব্যের আত্মা হ'ল রসধ্বনি। কিছু কিছু অলংকার কাব্যের মধ্যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়, তখন তাকে বলে **'অলংকারধ্বনি'**। কাব্যে অলংকার স্বাভাবিকভাবে প্রযুক্ত হবে; কবি-হৃদয় থেকে স্বতঃ উৎসারিত হ'য়ে অলংকার কাব্যে আশ্রয় নেবে। অলংকার তাই কাব্যের পক্ষে অপরিহার্য নয়। তবে কাব্যের সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে অলংকার হ'ল অন্যতম উপায় বা অবলম্বন, সার্থক কবি ও সাহিত্যিকের হাতে অলংকার ব্যঞ্জনাধর্মী হ'য়ে ওঠে।

বিদ্যালয়-স্তরে মাতৃভাষার পঠন-পাঠনে অলংকারকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূত করা হ'য়েছিল। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (*H. S. School*) বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পাঠক্রমে নবম-দশম-একাদশ শ্রেণীর জন্য অলংকারকে পাঠ্য নির্ধারিত করা হ'য়েছিল।

প্রচলিত পাঠক্রম ও অলংকার

শব্দালংকারের অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ও অর্থালংকারের উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি, ব্যতিরেক প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান প্রধান অলংকারকে বিদ্যালয়-স্তরে পাঠ্যক্রমের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৪ সাল থেকে প্রচলিত মাধ্যমিক পাঠক্রমে অলংকারের স্থান নেই। কাব্য-পাঠে ও কবিতার রসাস্বাদনে অলংকারের জ্ঞান অপরিহার্য। ফলে, শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠক্রম থেকে অলংকারের জ্ঞানের মাধ্যমে কাব্য-সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে গিয়ে বঞ্চিত হবে। কাজেই মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে অলংকারের অনুপস্থিত অযৌক্তিক।

কাব্য-সাহিত্য পাঠে অলংকার জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। কবি তাঁর কাব্যে সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে অলংকারের সার্থক প্রয়োগ ক'রে থাকেন। কাজেই কাব্য পাঠের

ক্ষেত্রে অলংকারের জ্ঞান অপরিহার্য। কাব্যের ধ্বনি-ঝংকারের উপলব্ধি শব্দালংকার থেকে হবে, আর অর্থগ্রহণ অর্থালঙ্কার থেকে সম্ভব হবে। সামগ্রিকভাবে কাব্যের সৌন্দর্য গ্রহণ ক'রতে হ'লে, রসধ্বনির অনুভূতি পেতে হ'লে তাই অলংকারের জ্ঞান অপরিহার্য হ'য়ে পড়ে। কবির শব্দযোজনা, বাক্যরীতি, গঠন-কৌশল প্রভৃতির সার্থক উপলব্ধি অলংকার ছাড়া সম্ভব নয়। বিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য যেসব কাব্য-কবিতা ও সাহিত্য পাঠ্য হিসাবে নির্ধারিত আছে, তার মধ্যে বহু অলংকারের প্রয়োগ আছে। কাজেই সেগুলির উপলব্ধি ও বিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষার্থীদের ভাষা ও সাহিত্য-চর্চা তাই অলংকারের জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়।

কাব্যপাঠে অলংকারের জ্ঞান অপরিহার্য

বিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষার্থীদের অলংকার শিক্ষা দিতে হবে। অলংকার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার ক'রতে হবে। আরোহী পদ্ধতিতে (*Inductive Method*) অলংকার শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের সামনে সমধর্মী কতকগুলি উদাহরণ তুলে ধ'রতে হবে। এই উদাহরণগুলি একই অলংকারের একই জাতীয় হবে। পরে অলংকারগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রতে হবে। তখন আরোহী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সূত্র নির্মাণে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে পৌঁছবে। এই উদাহরণগুলি শিক্ষার্থীদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হবে। অলংকারকে পাঠ্য বিষয় থেকে, ভাষা ও সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে শিক্ষাদান ক'রলে চলবে না। পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন গল্প-কবিতা শিক্ষাদানের সময় ব্যবহৃত অলংকারগুলিকে যথাযথ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অলংকার শিক্ষা দিতে হবে। অলংকার সম্বন্ধে ও অলংকারের প্রয়োগ সম্বন্ধে শিক্ষকের পরিষ্কার ধারণা (*clear conception*) থাকবে। শিক্ষার্থীরাও অলংকার চর্চা ক'রবে, কাব্য-সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে অলংকার সম্বন্ধে ধারণা ক'রবে। পরে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সৃজনধর্মী রচনায় বিভিন্ন অলংকার প্রয়োগ ক'রতে সচেষ্ট হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষক মহাশয় তাদের সহযোগিতা ক'রবেন। কাব্য-পাঠ ও সাহিত্য-অনুশীলনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা অলংকারের জ্ঞান যথাযথভাবে অর্জন ক'রতে পারবে। কাজেই কাব্য-সাহিত্য পাঠে তাদের উৎসাহিত ক'রতে হবে।

অলংকার শিক্ষাদানের পদ্ধতি

ভাষার দু'টি গুণ। **বহিরঙ্গে ভাষা ধ্বনি-প্রধান, অন্তরঙ্গে অর্থপ্রধান। শব্দেরও দু'টি রূপ ;—একটি তার Sound বা ধ্বনি, অন্যটি তার Sense বা অর্থ।** ভাষায় উচ্চারণগত শব্দ-ধ্বনির আবেদন কাব্যের মধ্যে থাকে ; কাব্যের অর্থ-মধুরতার আবেদন সহৃদয় পাঠকের মনে। ভাষা ও শব্দের এই দ্বিবিধ রূপের উপর ভিত্তি ক'রে দু'জাতীয় অলংকার গড়ে উঠেছে ;—

(১) **শব্দালংকার**

(২) **অর্থালংকার**

শব্দালংকার ধ্বনি-প্রধান আর অর্থালংকার অর্থ-প্রধান। অলংকার যখন কাব্যে ধ্বনিঝংকার সৃষ্টি করে, তখন তাকে শব্দালংকার বলে। আর অলংক্যর যখন কাব্যে

অর্থ-সৌন্দর্য ও ভাব-গৌরব সৃষ্টি করে তখন তাকে অর্থালংকার বলে। শব্দালংকারের আবেদন কানের কাছে। অর্থালংকার মনের দুয়ারে আবেদন সৃষ্টি করে। শব্দালংকারের ধ্বনিবৈচিত্র্য ইন্দ্রিয় জগৎকে নাড়া দেয়, আর অর্থালংকারের ভাব-সুষমা মনের অনুভূতি-রাজ্যে জোয়ার আনে। শব্দালংকারের মাধ্যমে কাব্যে ধ্বনি-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়, আর অর্থালংকারের মাধ্যমে কাব্যে অর্থ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়। শব্দালংকার ও অর্থালংকার —দুই-ই কাব্যে সৌন্দর্যসৃষ্টিতে সাহায্য করে।

শব্দালংকার

॥ অনুপ্রাস ।

একই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যখন যুক্তভাবে বা বিযুক্তভাবে বার বার ধ্বনিত হ'য়ে কাব্য-সৌন্দর্য লাভ করে, তখন অনুপ্রাস অলংকার হয়। বাংলায় স্বরধ্বনির অনুপ্রাস হয় না।

যেমন—'**চ**ল **চ**পলার **চ**কিত **চ**মকে
করিছে **চ**রণ বি**চ**রণ,
কোথা **চ**ম্পক আভরণ!' —রবীন্দ্রনাথ

বাংলায় অনুপ্রাস প্রধানতঃ তিন প্রকার—

(১) **অন্ত্যানুপ্রাস**—মিত্রাক্ষর পদ্য মাত্রেই অন্ত্যানুপ্রাস। কোন কবিতায় পর পর দু'টি ছত্রে অন্ত্যমিল থাকলেই অন্ত্যানুপ্রাস হয়। যেমন,—

(ক) 'তপন কেবল ভরিছে গগন নূতন **মেঘে**,
কদম কোরক তুলিছে বাদল বাতাস **লেগে**।'

(খ) 'রজনীগন্ধা বাস বিলালো
সজনী সন্ধ্যা আসবি না লো?' —যতীন্দ্রমোহন

শেষের উদাহরণটিতে দু'টি ছত্রের প্রায় সমস্ত অংশেই অনুপ্রাস হ'য়েছে।

(২) **বৃত্তানুপ্রাস**—একটি ব্যঞ্জন 'দু'বার, বা বহুবার ধ্বনিত হ'লে, ব্যঞ্জনগুচ্ছ স্বরূপানুসারে বা যুক্ত-বিযুক্তভাবে ক্রমানুসারে ধ্বনিত হ'লে বৃত্তানুপ্রাস হয়। যেমন—

(ক) 'নাহি চাহি নিরাপদে **রা**জভোগ নব'।—রবীন্দ্রনাথ

(খ) '**কে**তকী **কে**তকী **কে**শরে **কে**শপাশ কর সুরভি'—রবীন্দ্রনাথ

(গ) '**ক**বির **বু**কের দুখের কাব্য
ভক্তে চমৎকার'। —যতীন্দ্রনাথ

(ঘ) 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার'।

(৩) **ছেকানুপ্রাস**—দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনি যখন যুক্ত বা বিযুক্তভাবে ক্রমানুসারে দু'বার ধ্বনিত হয়, তখন তাকে ছেকানুপ্রাস বলে। যেমন,—

'এখনি অন্ধ বন্ধ কর না পাখা'। —রবীন্দ্রনাথ
'লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে'। —মধুসূদন
'জল সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে'। —রবীন্দ্রনাথ

॥ যমক ॥

দুই বা ততোধিক বর্ণ স্বরধ্বনি সমেত যদি সার্থক বা নিরর্থকভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন যমক অলংকার হয়। যমকে একই শব্দ দু'বার ব্যবহৃত হয়। তাদের অর্থ বিভিন্ন হয়, অনেক সময় একটির অর্থ থাকে না। যেমন,—

(১) 'কোথা হা অন্ত, চির **বসন্ত**, আমি **বসন্তে** মরি'। —রবীন্দ্রনাথ
বসন্ত=বসন্ত ঋতু, বসন্ত=বসন্ত রোগ।

(২) 'ভারত ভারত-খ্যাত আপনার গুণে"—ভারতচন্দ্র
ভারত=কবি ভারতচন্দ্র, ভারত=ভারতবর্ষ।

(৩) 'আছি গো তা**রিণী ঋণী** তব পায়'। —দাশরথি রায়
রিণী=নিরর্থক, ঋণী=কৃতজ্ঞ।

॥ শ্লেষ ॥

একটি শব্দ যখন কোন বাক্যে একবার মাত্র ব্যবহৃত হ'য়ে একাধিক অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে শ্লেষ অলংকার বলে; যেমন,—

"এনেছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজ **গুণে**"—মুকুন্দরাম
গুণ=স্বভাবের চমৎকারিত্ব, গুণ=ধনুকের ছিলা।

শ্লেষ দু'প্রকার,—অভঙ্গ শ্লেষ ও সভঙ্গ শ্লেষ।

(১) **অভঙ্গ শ্লেষ**— অভঙ্গ শ্লেষে শব্দকে না ভেঙ্গে গোটা শব্দটির দু'টি অর্থ প্রকাশ করা হয়। যেমন,—

"অতিবড় বৃদ্ধ পতি **সিদ্ধিতে** নিপুণ,
কোন **গুণ নাই** তার **কপালে আগুন**।" —ভারতচন্দ্র

বৃদ্ধ=বুড়ো	সিদ্ধি=মাদক দ্রব্য বিশেষ
বৃদ্ধ=জ্ঞানী	সিদ্ধি=মুক্তি
গুণ নাই=গুণহীন	কপালে আগুন=পোড়া কপাল
গুণ নাই=গুণাতীত	কপালে আগুন=শিবের তৃতীয় নেত্র বহ্নি।

(২) **সভঙ্গ শ্লেষ**—সভঙ্গ শ্লেষে একটি শব্দকে ভেঙ্গে নিলে একটি অর্থ, এবং মূল শব্দের একটি অর্থ। এইভাবে দু'টি অর্থের সাহায্যে শ্লেষ অলংকার হয়। যেমন,—

"অপরূপ রূপ **কেশবে**।
দেখরে তোরা এমন ধারা কালো রূপ কি আছে ভবে"। —দাশরথি
কেশব=কৃষ্ণ, কে শবে=শবের উপরে কে (কালী)।

অর্থালংকার

শব্দের অর্থের উপর ভিত্তি করে কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি ক'রলে অর্থালংকার হয়। শ্রেণীগত বিচারে অর্থালংকার পাঁচটি। এই পাঁচটি শ্রেণীর প্রত্যেকটিতে আবার অনেকগুলি ক'রে অর্থালংকার আছে। যেমন,—

(ক) সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার—
উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, উল্লেখ, সন্দেহ, ভ্রান্তিমান, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, প্রতিবস্তূপমা, নির্দেশনা, দৃষ্টান্ত, সমাসোক্তি, ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি।

(খ) বিরোধমূলক অর্থালংকার—
বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম।

(গ) শৃংখলামূলক অর্থালংকার—
একাবলী, কারণমালা, সার।

(ঘ) ন্যায়মূলক অর্থালংকার—
অপ্রস্তুত প্রশংসা, অর্থান্তরন্যাস, কাব্যলিঙ্গ, আক্ষেপ, প্রতীক।

(ঙ) গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূলক অর্থালংকার—
ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি।

এ ছাড়াও অনেকগুলি গৌণ অর্থালংকার আছে। একে একে এই অলংকারগুলির আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ সাদৃশ্যমূলক অলংকার ॥

॥ উপমা ॥

সমান ধর্ম বা গুণ বিশিষ্ট দু'টি ভিন্নজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হ'লে উপমা অলংকার হয়। উপমা অলংকারের চারটি বৈশিষ্ট্য। যেমন,—

(১) উপমান, যার সঙ্গে তুলনা করা হয়।

(২) উপমেয়, যা তুলনার বিষয়।

(৩) তুলনাবাচক শব্দ—মত, সম, ন্যায়, হেন, যথা প্রভৃতি।

(৪) সাধারণ ধর্মবাচক শব্দ—উপমান ও উপমেয়ের যেখানে সাদৃশ্য। উপমা অলংকার প্রধানত চার প্রকারের। যেমন,—

(১) **পূর্ণোপমা**—যে উপমা অলংকারে উপমান, উপমেয়, তুলনাবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্মবাচক শব্দ—এই চারটি বৈশিষ্ট্যই থাকে, তাকে পূর্ণোপমা বলে। যেমন,—

*"এও যে রক্তের মত রাঙা দু'টি জবাফুল।" —রবীন্দ্রনাথ

উপমান—জবাফুল, উপমেয়—রক্ত, তুলনাবাচক শব্দ—মত, সাধারণ ধর্মবাচক শব্দ—রাঙা।

*"সেই আলোটি মায়ের প্রাণে
ভয়ের মতো দোলে।" —রবীন্দ্রনাথ

উপমান—আলো, উপমেয়—ভয়, তুলনাবাচক শব্দ—মতো, সাধারণ ধর্মবাচক শব্দ—দোলে।

(২) **লুপ্তোপমা**—উপমান অলংকারের চারটি বৈশিষ্ট্যের (উপমান, উপমেয়,

তুলনাবাচক শব্দ, সাধারণ ধর্মবাচক শব্দ) মধ্যে যখন একটি, দু'টি বা তিনটি বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকে, তখন লুপ্তোপমা অলংকার হয়। যেমন,—

(১) "তিলেক না দেখি ও চাঁদ বদন
মরমে মরিয়া থাকি।" —চণ্ডীদাস

এখানে তুলনাবাচক শব্দ অনুপস্থিত।

(২) "তড়িত-বরণী হরিণ-নয়নী দেখিনু আঙিনা মাঝে।" —চণ্ডীদাস

এখানে উপমেয় ছাড়া সবাই অনুপস্থিত।

(৩) **মালোপমা** যখন একটি উপমেয়, কিন্তু অনেকগুলি উপমানের সাহায্যে উপমা অলংকার হয়, তখন তাকে মালোপমা বলে। যেমন,—

"কুন্দেন্দু তুষার শংখ শুচিশুভ্র সৌন্দর্যের রাণী
মূর্তি মাঝে উর বীণাপাণি।" —যতীন্দ্রমোহন

এখানে উপমেয় (বীণাপাণি) একটি, কিন্তু উপমান চারটি—
কুন্দ, ইন্দু, তুষার ও শঙ্খ।

(৪) **স্মরণোপমা**—কোন একটি বিষয়ের অনুভূতি থেকে যদি অন্য একটি বিষয়ের স্মৃতি জাগে এবং তা থেকে যদি কাব্য-সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়, তখন তাকে স্মরণোপমা অলংকার বলে। যেমন,—

"পাখী তোর আন্‌চানানির চঞ্চলতার চম্‌কানিতে
কবে কার চোখ দু'টি কার ডাক দিয়ে যায় হাতছানিতে!
সে ছিল তোর মতনই মন্‌মোহিনী কৃষ্ণকলি।" —যতীন্দ্রমোহন

এখানে পাখীর চঞ্চলতা প্রিয়ার স্মৃতিকে জাগিয়ে দিচ্ছে।

॥ রূপক ॥

রূপক অলংকারে উপমান-উপমেয় অভেদ কল্পনা করা হয়। এই অলংকারে উপমেয়ের উপর উপমানের আরোপ করা হয় ব'লে দু'টি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যেও অভিন্নতা আরোপিত হয়। এই অলংকারে উপমানের প্রভাবই বেশী। রূপক অলংকার প্রধানতঃ তিন প্রকার—সাঙ্গরূপক, নিরঙ্গরূপক ও পরম্পরিত রূপক।

(১) **সাঙ্গরূপক**—উপমান-উপমেয়ের অভেদ কল্পনা ক'রবার সময় যদি তাদের অঙ্গেরও অভেদ নির্দেশ করা হয়। যেমন,—

(অ) "বক্ষ বীণায় বেদনার তার
এই মত পুনঃ বাঁধিব আবার'—রবীন্দ্রনাথ

(আ) "দেহদীপাধারে জ্বলিত লেলিহ যৌবন জয় শিখা" —অচিন্ত্যকুমার

(২) **নিরঙ্গ রূপক**—নিরঙ্গ রূপকের দু'টি ভাগ—কেবল ও মালা।

(ক) **কেবল**—যখন অঙ্গে রূপক অলংকার হয় না, কেবলমাত্র উপমান-উপমেয়ে অভেদ কল্পনা করা হয়, তখন কেবল রূপক অলংকার হয়। যেমন,—

(অ) "আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই
কাব্যের জাল বুনি।" —যতীন্দ্রনাথ

(অ) "মেলিতেছে **অঙ্কুরের পাখা,**
লক্ষ লক্ষ **বীজের বলাকা।**" —রবীন্দ্রনাথ

(খ) **মালা রূপক**—একটি উপমেয়ের উপর বহু উপমান আরোপিত হ'লে মালা রূপক হয়। যেমন,—

(অ) "**শেফালির সৌরভ** আমি, রাত্রির **নিঃশ্বাস,** ভোরের **ভৈরবী।**"
—বুদ্ধদেব বসু

(আ) "আমি কি তোমার **উপদ্রব, অভিশাপ,**
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপন, করলগ্ন কাঁটা?" —রবীন্দ্রনাথ

(গ) **পরম্পরিত রূপক**—একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ যদি অন্য একটি উপমেয়ে উপমান আরোপের কারণ হয়, তবে পরম্পরিত রূপক হয়। যেমন,—

"**চেতনার** নটমঞ্চে **নিদ্রা** যবে ফেলে **যবনিকা,**
অচেতন নেপথ্যের অভিনয় কর **প্রয়োজন।**" —বুদ্ধদেব বসু

॥ **উৎপ্রেক্ষা** ॥

প্রবল সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান ব'লে প্রতীয়মান হ'লে বা সংশয় উপস্থিত হ'লে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। উৎপ্রেক্ষা অলংকার দু'প্রকার—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

(ক) **বাচ্যোৎপ্রেক্ষা**—এই জাতীয় উৎপ্রেক্ষা অলংকারে 'যেন', 'বুঝি' প্রভৃতি সংশয়বাচক শব্দ থাকে। যেমন,—

(অ) "আমি জানি কিছুই থাকে না
পলকে শুকায়ে যায়—সবই **যেন** সাবানের ফেনা।" —বুদ্ধদেব বসু

(আ) "সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'ল, **যেন** খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার।" —রবীন্দ্রনাথ

(খ) **প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা**—উপমেয়কে উপমান ব'লে সংশয় যেখানে প্রতীয়মান হয়,—'যেন', 'বুঝি' প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহার ক'রে বোঝানো হয় না, সেখানে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। যেমন,—

(অ) "মোগল শিখের রণে মরণ আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে। —রবীন্দ্রনাথ
(যেন) দংশনক্ষত বিহঙ্গ শ্যেন্য যুঝে ভুজঙ্গ সনে।" —রবীন্দ্রনাথ

॥ **উল্লেখ** ॥

অনেকগুলি গুণ থাকবার জন্য যদি একটি বস্তু বা বিষয়ের এক-একটি গুণ এক-একজনের চোখে ধরা পড়ে, বা একই ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে বিচার করে, তবে উল্লেখ অলংকার হয়। যেমন,—

(অ) "স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ।" —রবীন্দ্রনাথ

(আ) "হে সন্ন্যাসী
রুদ্ররূপে ঘটল তোমার আবির্ভাব,
তারই আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে
প্রেমিকের দ্বন্দ্বজয়ী প্রেম,
তুমি ভীষণ, তুমি কোমল, তুমি মধুর।"

॥ সন্দেহ ॥

উপমান ও উপমেয়—উভয় ক্ষেত্রেই সন্দেহের দ্বারা কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হ'লে সন্দেহ অলংকার হয়। যেমন,—

(অ) "সোনার হাতে সোনার চুড়ি, কে কার অলংকার।" —মোহিতলাল

(আ) "দুই ধারে একি প্রাসাদের সারি? অথবা তরুর মূল?
অথবা, এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল?" —রবীন্দ্রনাথ

॥ ভ্রান্তিমান ॥

সাদৃশ্যের জন্য যদি উপমান-উপমেয়ে ভ্রম হ'য়ে, একটিকে অপরটি ব'লে ভ্রম হয় এবং সেক্ষেত্রে যদি কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্ট হয়, তবে ভ্রান্তিমান অলংকার হয়। যেমন,—

(অ) "কি বা সে বদন শোভা, যাই বলি হরি,
মুগ্ধ অলি ধেয়ে আসে পদ্ম মনে করি।"

(আ) "পূর্ণিমা চাঁদ শারদ রাতে
খেলিছে আলোর খেলা,
বুঝি দিন হ'ল—রাতের পাখীরা
বসাল গানের মেলা—
মনে ভাবে তারা যায় বুঝি বয়ে
গান গাহিবার বেলা।"

॥ অপহ্নুতি ॥

উপমেয়কে গোপন ক'রে বা অস্বীকার ক'রে যখন উপমানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তখন অপহ্নুতি অলংকার হয়। যেমন,—

(অ) "চোখে চোখে কথা নয় গো বন্ধু, আগুনে আগুনে কথা।" —অন্নদাশংকর

(আ) "ষড়্ ঋতুছলে ষড় রিপু খেলে কাম হতে মাৎসর্য।" —যতীন্দ্রনাথ

॥ নিশ্চয় ॥

উপমানকে গোপন ক'রে, অস্বীকার ক'রে উপমেয়কে প্রতিষ্ঠিত করা হ'লে নিশ্চয় অলংকার হয়। যেমন,—

(অ) 'নয়নে ফেলিত ছায়া—মেঘ নয়, তব কেশপাশ।" —অজিত দত্ত

(আ) "অসীম নীরদ নয়,
ওই গিরি হিমালয়।" —বিহারীলাল

॥ প্রতিবস্তূপমা ॥

প্রতিবস্তূপমা অলংকারে উপমান ও উপমেয় দু'টি পৃথক বাক্যে থাকে, তাদের দু'টিতেই সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে। তুলনাবাচক শব্দ থাকে না, এবং পৃথক ভাবে বিন্যস্ত দু'টি বিষয়ে সাদৃশ্য বর্ণনা-কালে সাধারণ ধর্ম এক হয়। যেমন,—

(অ) "একটি মেয়ে চলে গেছে জগৎ হ'তে নৈরাশে
একটি মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজ শাপের নিঃশ্বাসে।" —সত্যেন্দ্রনাথ

(আ) "মোগল শিখের রণে
মরণ আলিঙ্গনে,
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
দুইজনা দুইজনে।
দংশনক্ষত বিহঙ্গশ্যেন যুঝে ভুজঙ্গ সনে।" —রবীন্দ্রনাথ

॥ নিদর্শনা ॥

যখন দু'টি বস্তু বা বিষয়ের সম্ভব বা অসম্ভব সম্বন্ধে উপমান-উপমেয়ের ভাব ব্যঞ্জনাময় হয়, তখন তাকে নিদর্শনা অলংকার বলে। যেমন,—

(অ) "অবরণ্যে বরি
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।" — মধুসূদন

(আ) "আলোক যেখানে অধিক ফুটেছে, সেখানে দুখের বান।" —মোহিতলাল

॥ দৃষ্টান্ত ॥

উপমান-উপমেয় যখন পাশাপাশি দু'টি পৃথক বাক্যে থাকে, উপমান-উপমেয় ও তাদের সাধারণ ধর্মের যদি বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাব থাকে এবং এক্ষেত্রে যদি তুলনামূলক শব্দ ব্যবহৃত না হয়, তবে দৃষ্টান্ত অলংকার হয়। উপমান-উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন হ'লেও যখন তাদের মধ্যে তুলনা করা হয়, তখন তাকে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাব বলে। যেমন,—

(অ) "ছোট শিশু যদি উঠিতে না পারে মায়ের কোলে,
নুয়ে প'ড়ে মাতা চুমা দিয়ে তারে বক্ষে তোলে।
সিন্ধু যদি বা কল্লোল তুলি' ছুঁতে না পারে,
নামি দিগন্তে দেয় পরশন গগন তা'রে।" —কালিদাস রায়

উপমেয়—শিশু ও মাতা, উপমেয়—যথাক্রমে সিন্ধু ও গগন; এখানে উপমান-উপমেয় দু'টি পৃথক বাক্যে পাশাপাশি আছে। উপমান-উপমেয়ের মধ্যে সাধারণ ধর্ম বিভিন্ন। তুলনাবাচক শব্দের ব্যবহার নেই। অথচ সাদৃশ্য সৃষ্টি ক'রে কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হ'য়েছে।

(আ) "গঙ্গা আর রামায়ণ কোন্ কীর্তি বঙ্গে বরণীয় ?
আকাশের চন্দ্র সূর্য, কারে রাখি কারে দিব ছাড়ি ?" —যতীন্দ্রমোহন

(ই) "অমিতা : তোমার কিছু ক্ষতি নেই মোরে যদি দাও
এতটুকু ভালবাসা.........
সমুদ্র কি রিক্ত হয়ে যাবে—আমি যদি একমুঠো ফেনা নিয়ে যাই ?"
—অজিত দত্ত

॥ সমাসোক্তি ॥

উপমানের ব্যবহার উপমেয়ের উপর আরোপ ক'রলে সেক্ষেত্রে সমাসোক্তি অলংকার হয়। সমাসোক্তি অলংকার চেতন বা অচেতনযুক্ত উপমেয়ের উপর অচেতন বা চেতনাযুক্ত উপমানের ব্যবহার আরোপিত হয়। এক্ষেত্রে উপমানের উল্লেখ থাকে না। যেমন—

(অ) "শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।" —নজরুল

(আ) "এমনি সাঁজে আমার প্রিয়া
যেতো ছোট কলসীখানি কোমল তাহার বক্ষে নিয়া ;
সোহাগে জল উথলে উঠি বক্ষে তাহার পড়ত লুটি।" —কুমুদরঞ্জন

(ই) "সুন্দরী,
সুন্দর তোমার দেহ গণ্ডূষে লইব পান করি।" —বুদ্ধদেব বসু

॥ ব্যতিরেক ॥

উপমেয়কে উপমানের চেয়ে ভালো বা মন্দ করে দেখানোর মধ্য দিয়ে কাব্য-সৌন্দর্য প্রকাশিত হ'লে ব্যতিরেক অলংকার হয়। যেমন,—

(অ) "এই দুটি
নবনী নিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়েছে ধরা।" —রবীন্দ্রনাথ

(আ) "হাতের দান হাতে হাতেই চুকিয়ে দাও, নইলে শুকিয়ে যাবে ; হৃদয়ের দান যত অপেক্ষা করবে তত তার দাম বাড়বে।" —রবীন্দ্রনাথ

॥ অতিশয়োক্তি ॥

উপমেয়ের উল্লেখ না ক'রে উপমানকে উপমেয়রূপে গ্রহণ ক'রে যদি অভেদ বোঝানো হয়, এবং উপমেয় উপমানের সাদৃশ্য রচনা ক'রতে গিয়ে কবি যদি সম্ভব-সীমাকে অতিক্রম ক'রে কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন, তখন অতিশয়োক্তি অলংকার হয়। যেমন,—

(অ) "আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যা তারা ওঠা।
মিথ্যা হ'ত গগনে ফুল ফোটা।" —রবীন্দ্রনাথ

(আ) "বক্ষের নিচোল বাস যায় গড়াগড়ি,
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।" —রবীন্দ্রনাথ

(ই) "হাসি যে ভাঙিয়া গেল সহস্র রঙীন ফুলে ফুলে
ফুটিল রঙিন ফুল কণ্ঠে আর কোমল কপোলে।" —বুদ্ধদেব বসু

বিরোধমূলক অলংকার ঃ

॥ বিরোধাভাস ॥

দু'টি বিষয়কে যখন বাইরে থেকে পরস্পর-বিরোধী মনে হয়, কিন্তু ব্যঞ্জনাময় অর্থ প্রকাশ পেলে যখন সে বিরোধের অবসান হয়, তখন তাকে বিরোধাভাস অলংকার বলে। যেমন,—

(অ) "এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥" —রবীন্দ্রনাথ

(আ) "করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।" —রবীন্দ্রনাথ

(ই) "কণ্টক সম বুকে ফোটে সখি,
কোমল কুসুম মালা।
গগনের শশী অনল বরষি
বাড়ায় শুধুই জ্বালা।"

॥ বিভাবনা ॥

যে অলংকারে কারণ ছাড়া কার্য ঘটিয়ে শিল্প-সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়, তাকে বিভাবনা বলে। যেমন,—

(অ) "বদন থাকিতে না পারে বলিতে
তেঞি সে অবলা নাম।" —বৈষ্ণব পদাবলী

(আ) "শ্রম বিনা কটি ক্ষীণ, ভয় বিনা নয়ন চঞ্চল,
অভূষণে শোভে দেহ, এ যে নব-যৌবনের ফল।"

॥ বিশেষোক্তি ॥

বিশেষোক্তি অলংকারে কারণ থাকা সত্ত্বেও কার্যের অভাব ঘটে। যেমন,—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।" —বিদ্যাপতি

॥ অসঙ্গতি ॥

অসঙ্গতি অলংকারে কার্য ও কারণ পৃথক্ ভাবে থাকে। যেমন,—

"আমি কাঁদি—সেত কাঁদতেই হবে জানি—
তুমি কেন ব্যথা পাও ?
কেঁপে ওঠে কেন দুর্বল এই হিয়া—
তুমি যবে চলে যাও !"

॥ বিষম ॥

কারণ থেকে যদি ঈপ্সিত ফললাভ না ক'রে অবাঞ্ছিত ফল লাভ হয়, কার্য-কারণের মধ্যে যদি বৈষম্য থাকে, যদি দু'টি অসম্ভব ঘটনার মিলন ঘটে, তবে বিষম অলংকার হয়। যেমন,—

(অ) "বন্ধন চাহে না কেহ, মুক্তি চায় সবে—
ভুজ বন্ধনের মাঝে কিন্তু তবু হায়
কে না চায় ধরা দিতে ?"

(আ) "অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।"

(ই) "আলো লাগি আকুল যখন—আঁধার এলো ঘিরে ;
শীতের রাতে আচম্‌কা ঝড় নিবায় প্রদীপটিরে !
তোমায় পাবো যখন ভাবি তখন তুমি দূরে,
সমুখ পথে চলতে গিয়ে কেবল মরি ঘুরে।"

শৃংখলামূলক অলংকার :

॥ একাবলী ॥

একাবলীতে প্রতিটি পরবর্তী শব্দ প্রতিটি পূর্ববর্তী শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন,—

(অ) "গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি
সুন্দর ধরাতল।" —যতীন্দ্রমোহন

(আ) "তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল, তাঁর চিত্র বর্ণবহুল।" —বুদ্ধদেব বসু

॥ কারণ-মালা ॥

কোন একটি কারণের কার্য যখন কোন অন্য কার্যের কারণরূপে দেখা দেয়, তখন কারণ-মালা অলংকার হয়। যেমন,—"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন।"

॥ সার ॥

বক্তব্য বিষয়ের ক্রমশঃ উৎকর্ষ-সৃষ্টি ব্যঞ্জনাময় হ'লে সার অলংকার হয়। যেমন,—

(অ) "অন্যান্য পশুর চেয়ে সিংহের কটি, সিংহের চেয়ে নারীর কটি, নারীর মধ্যে তন্বীর কটি ক্ষীণ।"

(আ) "জীবনে জাগে উৎকণ্ঠা, সে উৎকণ্ঠা জাগায় অভিমান, অভিমান বয়ে আনে দু'চোখে জল।"

ন্যায়মূলক অলংকার ঃ

॥ অপ্রস্তুত প্রশংসা ॥

অপ্রাসঙ্গিক (যে বিষয় বর্ণনীয় নয়) থেকে প্রকাশের মাধ্যমে যদি বর্ণনীয় বিষয়ের বিশেষ বোধ জন্মায়, তখন অপ্রস্তুত প্রশংসা অলংকার হয়। এক্ষেত্রে অপ্রস্তুত থেকে প্রস্তুতে প্রতীতি ব্যঞ্জনাময় হয়। যেমন,—

(অ) "কুকুরের কাজ কুকুরে ক'রেছে
কামড় দিয়েছে পায়,
তা বলে কুকুরে কামড়ানো কিরে
মানুষের শোভা পায় !" —সত্যেন্দ্রনাথ

(আ) "কিন্তু ভেবে দেখি যদি ভয় হয় মনে !
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ, নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন বদনে সবে তার সমাগমে।"

॥ অর্থান্তরন্যাস ॥

সামান্য বক্তব্যের (*General Statement*) দ্বারা বিশেষ বক্তব্যের (*Particular Statement*), বিশেষের দ্বারা সামান্যের, কার্যের (*effect*) দ্বারা কারণের (*cause*) এবং কারণের দ্বারা কার্যের সমর্থন হ'লে তাকে অর্থান্তরন্যাস বলে। সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্য, কার্যের দ্বারা কারণ, কারণের দ্বারা কার্য সমর্থিত হ'য়ে একটি বস্তুকে অপ্রস্তুতের মত কীর্তন বা বর্ণনা ক'রলে যদি কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, তখন তাকে অর্থান্তরন্যাস অলংকার বলে। যেমন,—

(অ) 'এ জগতে হায়, সেই বেশী চায়, আছে যার ভুরি ভুরি,
রাজার হস্ত, করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।" —রবীন্দ্রনাথ

(আ) 'সবই যায়, কিছুই থাকে না; থাকে শুধু কীর্তি,—কালিদাস গিয়েছেন, শকুন্তলা আছে।" —চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

(ই) "কলঙ্ক কখনই ঘুচবে না, কারুর কখনই ঘোচে নি; রাজা যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যাবাদী বলে।" —গিরিশচন্দ্র

॥ কাব্যলিঙ্গ ॥

কোন বাক্য বা পদের মধ্যেকার অর্থকে ব্যঞ্জনা দ্বারা কোন বর্ণনীয় বিষয়ের কারণ-রূপে যখন দেখানো হয়, তখন কাব্যলিঙ্গ অলংকার হয়। একে হেতু অলংকারও বলে। যেমন,—

(অ) "গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে। এ সংসারে যেথা যাও, সেথা থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম ……।" —রবীন্দ্রনাথ

(আ) 'কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা রূপিনী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে ?" —মধুসূদন

॥ আক্ষেপ ॥

কোন কথা ব্যক্ত ক'রবার অভিপ্রায় এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে তার নিষেধাভাস হ'লে আক্ষেপ অলংকার হয়। যেমন,—

"ধূলায় সোনা ফলিয়ে দিছি সাগর পারের দ্বীপগুলোতে ;
চৌকী দিছি শংহায়ে আর মগের দেশে দিইছি মাথা ;
তিব্বতেরও সন্ধিসুলুক—যাক্ সে কথা তুলব না তা।" —সত্যেন্দ্রনাথ

॥ প্রতীক ॥

উপমান যেখানে উপমেয়রূপে কল্পিত হয়, বা, উপমেয় নিজের প্রাধান্যে উপমানকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন প্রতীক অলংকার হয়। যেমন,—

(অ) "মায়ের মুখের হাসির মত কমল-কলি উঠ্‌ল ফুটে।" —গোলাম মোস্তাফা
(আ) ''তোমার চোখের মত উছলিবে কাজল-সরসী।" —অজিত দত্ত
(ই) ''প্রভাত বেলায় হেলাভরে করে অরুণ কিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেন্ড্রন গুচ্ছ।" —রবীন্দ্রনাথ

গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূলক অলংকার ঃ

॥ ব্যাজস্তুতি ॥

নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা যখন বাক্যে প্রকাশিত হ'য়ে কাব্য-সৌন্দর্য লাভ করে, তখন ব্যাজস্তুতি অলংকার হয়। যেমন—

(অ) ''অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।" —ভারতচন্দ্র
—এখানে নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা করা হ'য়েছে।

(আ) "কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ।" —মধুসূদন
— এখানে প্রশংসার ছলে নিন্দা করা হ'য়েছে।

॥ স্বভাবোক্তি ॥

বস্তুর স্বভাবকে যখন সূক্ষ্ম, সুন্দর ও চমৎকারভাবে ব্যঞ্জনাময় ক'রে প্রকাশ করা হয়, তখন স্বভাবোক্তি অলংকার হয়। যেমন,—

(অ) "কপোত দম্পতি
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘনচঞ্চু চুম্বনের অবসর কালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।" —রবীন্দ্রনাথ

অনুশীলনী

১। কবিতায় অলঙ্কার ব্যবহার করা হয় কেন? কি উপায়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মনে অলঙ্কারবোধ সৃষ্টি করা যায়? কবিতা-পাঠনার নির্দিষ্ট সময় ছাড়া বিদ্যালয়ে আর কিরূপ কর্মতালিকা প্রবর্তন করিলে এই কাজটি সরস এবং ফলপ্রসূ হইতে পারে? (কলি. বিশ্ব., বি এড ১৯৭০)

২। উদাহরণ সহযোগে শব্দালঙ্কার ও অর্থালংকারের পার্থক্য বুঝাইয়া দিন। দৃষ্টান্তসহ নিম্নের যে কোনও তিনটি অলঙ্কারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুনঃ যমক, লুপ্তোপমা, সাঙ্গরূপক, সমাসোক্তি নিদর্শনা।
(কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭১)

৩। অলঙ্কার কি কাব্যের পক্ষে অপরিহার্য? উদাহরণসহ নিম্নের যে কোনও তিনটি অলঙ্কারের প্রকৃতি আলোচনা করুন:—শ্লেষ, পূর্ণোপমা, ছেকানুপ্রাস, অর্থান্তরন্যাস, দৃষ্টান্ত।
(কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭২)

৪। কবিতা পড়ানোয় ছাত্রদের মনে অলঙ্কারবোধ কিভাবে জাগানো যায়, তাহার বিস্তৃত অলোচনা করুন।
(বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৩)

৫। কোনও উপযোগী উদাহরণের সাহায্যে দেখাইতে হইবে, উপমা, রূপক, উৎপেক্ষা, অপহ্নুতি ও অতিশয়োক্তি মূলতঃ একই অলঙ্কার। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে মূল উদাহরণের শব্দমালার ঈষৎ পরিবর্তন চলিবে।
(বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৬৬)

৬। নিম্নলিখিত অলঙ্কারগুলির উদাহরণ সহযোগে বুঝাইয়া দাও:—

[ক] (১) অনুপ্রাস, (২) যমক, (৩) শ্লেষ, (৪) উপমা, (৫) অতিশয়োক্তি, (৬) ব্যাজস্তুতি।
(বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৬৮)

[খ] শ্লেষ, ব্যাজস্তুতি। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৫)

৭। অলঙ্কার কাহাকে বলে? শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের পার্থক্য কি? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিন।
(কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৫)

৮। শব্দালঙ্কার ও অর্থলঙ্কারের মধ্যে পার্থক্য কি? দুইটি শব্দালঙ্কার ও দুইটি অর্থালঙ্কারের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিন যে, অলঙ্কার কাব্যের পক্ষে অপরিহার্য।
(উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বি. টি. ১৯৬৯)

৯। দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করুন (যে কোনও তিনটি):—
ধ্বন্যুক্তি অলঙ্কার, যমক, সাঙ্গ রূপক, নিদর্শনা, সমাসোক্তি। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৩)

১০। দৃষ্টান্ত সহযোগে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন:—
শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের সংজ্ঞা ও পার্থক্য।

১১। ভাষায় অলঙ্কার ব্যবহার করা হয় কেন? বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণীর অলঙ্কারের উদাহরণসহ অলোচনা করুন।
(কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এড. ১৯৭২)

১২। বিদ্যালয়-শিক্ষার স্তরে অর্থালঙ্কার পাঠের স্থান ও গুরুত্ব নির্ণয়ে আপনার যুক্তিপূর্ণ অভিমত লিপিবদ্ধ করুন।
(কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৬)

১৩। উদাহরণ সহযোগে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের পার্থক্য বুঝাইয়া দিন। দৃষ্টান্ত সহকারে নিম্নের যে কোন চারটি অলঙ্কারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন:—
শ্লেষ, যমক, রূপক, সমাসোক্তি, ব্যতিরেক, অনুপ্রাস। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৮)

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে বাংলাভাষা

মনের ভাবপ্রকাশের বাহন হ'ল ভাষা। ভাষা মানুষের সচেতন মনের বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি। কণ্ঠোদীর্ণ বাঙ্ময় ধ্বনিসমষ্টি যখন মনের ভাব প্রকাশ ক'রতে সক্ষম হয়, তখন তাকে বলে ভাষা। ভাষা আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে। ভাষার মাধ্যমে ভাবপ্রকাশ যখন শিল্পকলামণ্ডিত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তা সাহিত্যে পরিণত হয়। ভাষার মাধ্যমে সভ্যতাসংস্কৃতির প্রসার হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন হয়। প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীতে বহু ভাষা সৃষ্ট হ'য়েছে। সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের পথে বহু ভাষা বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। বহু জাতি, বহু ধর্ম ও বহু ভাষার মিলন-ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ। উপমহাদেশপ্রতিম এই ভারতবর্ষে বহু ভাষা প্রচলিত আছে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদম সুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে মোট ৮৪৫টি ভাষা প্রচলিত আছে; তার মধ্যে প্রায় ৭২৫টিতে লোকসংখ্যা খুবই কম। প্রায় ৬৩টি বিদেশী ভাষা এদেশে প্রচলিত আছে।

ভাষা

পৃথিবীতে অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে। ভাষা বিজ্ঞানীগণ সেগুলিকে ১০টি ভাষা-গোষ্ঠীতে (*Language group*) বিভক্ত ক'রেছেন। সেগুলি হল,—(১) হ্যামেটিক, (২) ইন্দো-ইউরোপীয়, (৩) অষ্টিক, (৪) সেমেটিক, (৫) ককেশীয়, (৬) দ্রাবিড়, (৭) চীনা-তিব্বতীয়, (৮) এস্কিমোদের ভাষা, (৯) মংগোলীয়, (১০) বান্টু। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ চারটি ভাষাগোষ্ঠী প্রচলিত আছে। সেগুলি হ'ল ;—

পৃথিবী ও ভারতের প্রধান ভাষা-গোষ্ঠী

॥ এক ॥ অস্টিক ভাষা
॥ দুই ॥ দ্রাবিড় ভাষা
॥ তিন ॥ ভারতীয় আর্যভাষা
॥ চার ॥ ভোট-চীন ভাষা।

নব্য-প্রস্তর যুগে অষ্টিক গোষ্ঠীর মানুষ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে মেসোপটেমিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ক্রমে ক্রমে তারা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। আর্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাভূত হ'য়ে তারা বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে পালিয়ে যায়। আজও **অস্টিক ভাষা** ভারতবর্ষে প্রচলিত। কোল ও মুণ্ডা শ্রেণীর ভাষা (যেমন—সাঁওতাল, হো, শবর, মণ্ডারী প্রভৃতি), নিকোবর শ্রেণীর ভাষা (যেমন,—বর্মা, মালয় ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মোনখ্‌ম ভাষা), খাসি শ্রেণীর ভাষা (যেমন,—আসামের খাসিয়া ভাষা) প্রভৃতি অষ্টিক গোষ্ঠীর ভাষা। প্রাচীন কাল থেকে এই ভাষা এদেশে প্রচলিত থাকলেও এই ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য-সৃষ্টি আজও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে আসে নি। মধ্য

অষ্টিক ভাষা

প্রদেশে ও ছোট নাগপুরের আদিম অধিবাসীরা এই ভাষা ব্যবহার করেন। ভারতবর্ষের প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ এই ভাষা ব্যবহার করেন।

ভূমধ্যসাগরের আর এক ভাষা-গোষ্ঠীর মানুষ অষ্টিক গোষ্ঠীর পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তারা হল দ্রাবিড়। দক্ষিণ ভারতে এই ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম প্রভৃতি ভাষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রধান ভাষা। **দ্রাবিড় ভাষার** কতকগুলি উপভাষা আছে। সেগুলি হ'ল,—তুলু, কোটা, ওঁরাও, গোণ্ডু, টোডা, কোজগু প্রভৃতি। দ্রাবিড় ভাষার মাধ্যমে বহু উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হ'য়েছে। সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট প্রভাব দ্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠীর উপর পড়ছে। ভারতবর্ষের ¼ অংশ লোক এই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনে দ্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠীর যথেষ্ট ভূমিকা আছে।

দ্রাবিড় ভাষা

দ্রাবিড়ের পর আর্যরা এদেশে এসে **আর্যভাষা** প্রচলন করেন। আর্যদের প্রধান ভাষা ছিল বৈদিক ভাষা, তা থেকে ক্রমশঃ সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হয়। আর্যভাষা ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভূ'ত। আর্যভাষা পরবর্তী কালে অনেকগুলি আধুনিক ভারতীয় ভাষার সৃষ্টি ক'রেছে। সেগুলি হ'ল,—পূর্ব ভারতের বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী ; উত্তর ভারতের কাশ্মীরী ; মধ্য ভারতের হিন্দী ; দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের গুজরাটী ও মারাঠী। এদেশের বহু লোক আর্যভাষা ব্যবহার করেন।

আর্যভাষা

আর্যদের পর মঙ্গোল জাতীয় লোকেরা আমাদের দেশে আসে। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে, তিব্বতে ও পূর্ব ভারতে এরা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে। এদের ভাষা **ভোট-চীন ভাষা** ব'লে খ্যাত। মণিপুরের মণিপুরী, নেপালের নেওয়ারী, তিব্বতের ভোট, আসামের লুসাই প্রভৃতি হ'ল এই গোষ্ঠীর ভাষা। এই ভাষাতেও উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি খুব বেশী হয় নি। এদেশের প্রায় ৬০ লক্ষ লোক ভোট-চীন ভাষা ব্যবহার করে।

ভোট-চীন ভাষা

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হিন্দীভাষা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা (*Federal Language*) হবে ব'লে আমাদের সংবিধানে নির্দেশিত আছে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজী প্রধান রাষ্ট্রভাষা ও হিন্দী দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রচলিত থাকার কথা। কিন্তু ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দেও তা সম্ভব হয় নি। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় জাতীয় সংহতি রক্ষা ক'রবার জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এদেশে সে ধরনের কোন স্বীকৃত ভাষা নেই। তাই ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজীকে প্রথম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হ'য়েছে। এই সময়ের মধ্যে হিন্দীকে প্রচলিত ক'রবার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা অনেক হওয়া সত্ত্বেও তা প্রধানতঃ ব্যর্থ হ'য়েছে। তাই ইংরেজীকে এখনও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গণ্য করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান ভাষাই হ'ল ইংরেজী।

রাষ্ট্রভাষা

আঞ্চলিক ভাষা

কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে ও রাজ্যে সরকারী কাজকর্ম চালানোর জন্য ও যোগাযোগের জন্য ১৪টি ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা (*Regional Language*) হিসাবে স্বীকার করা হ'য়েছে এবং এর জন্য রাজ্যে সরকারী ভাষা-সংক্রান্ত বিল (*Official Language Bill*) পাশ করা হ'য়েছে। অন্যান্য ভাষাগুলি স্থানীয় কথ্য ভাষা হিসেবে প্রচলিত আছে। এই ১৪টি আঞ্চলিক ভাষা ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি হ'ল,—

আঞ্চলিক ভাষা	রাজ্য
১। হিন্দী ভাষা	বিহার, রাজস্থান, দিল্লী, পূর্ব-পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্য-প্রদেশের অংশ
২। অসমীয় ভাষা	আসাম
৩। মালয়ালাম ভাষা	কেরালা
৪। গুজরাটী ভাষা	মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের অংশ
৫। বাংলা	পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের (কাছাড় অংশ)
৬। উর্দু ভাষা	কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশের অংশ
৭। ওড়িয়া ভাষা	উড়িষ্যা
৮। তামিল ভাষা	তামিলনাড়ু
৯। তেলেগু ভাষা	অন্ধ্র
১০। কাশ্মীরী ভাষা	কাশ্মীর
১১। কান্নাড় ভাষা	মহীশূর
১২। মারাঠী ভাষা	মহারাষ্ট্র, হায়দরাবাদ, গোয়া, দমন, দিউ, মধ্যপ্রদেশের অংশ
১৩। পাঞ্জাবী ভাষা	পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও দিল্লীর অংশ
১৪। সংস্কৃত ভাষা	শিক্ষিত মহল

এই ১৪টি ভাষার মধ্যে আর্য-গোষ্ঠীর ভাষা আছে ৯টি। সেগুলি হ'ল,—বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী, গুজরাটী ও মারাঠী। দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ৪টি ভাষা এই ১৪টি আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে আছে,—যেমন, তামিল, তেলেগু, কান্নাড় ও মালয়ালাম। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজী ভাষা স্থান পেয়েছে ও ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে সংস্কৃত ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সমস্ত শিক্ষাবিদ্‌ই মনে করেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা উচিত। তাতে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষার সংখ্যা এত বেশী যে, সমস্ত ভাষাগুলির মাধ্যমে শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়। মাতৃভাষার

মাধ্যমে শিক্ষাদান ক'রলে রাষ্ট্রভাষা হিন্দী অবহেলিত হয়, আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীরও যথাযথ অনুশীলন হয় না। উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষাকে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। ইংরেজী ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আছে। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার সর্বোত্তম বিকাশ হ'য়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উচ্চ-পর্যায়ের পুস্তকগুলি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই রচিত। ভারতীর বিভিন্ন ভাষায় সে ধরনের পুস্তক নেই। শুধু তাই নয়,—ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার পরিভাষারও যথেষ্ট অভাব আছে। যার ফলে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাগুলির মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার পুস্তক-রচনার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীর বয়স, বুদ্ধি, মান ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার বাহনরূপে বিভিন্ন ভাষাকে স্বীকার করা হ'য়েছে। এ ব্যাপারে প্রচলিত ব্যবস্থা হ'ল—

ভাষা ও শিক্ষার বাহন

। **এক** ॥ প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হবে।

॥ **দুই** ॥ মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন থাকবে। কিন্তু তাছাড়াও শিক্ষার্থীদের ইংরেজী ভাষা শিখতে হবে।

। **তিন** ॥ বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে মাতৃভাষা অথবা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহন ক'রতে হবে।

১৪টি ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে স্বীকার ক'রে নেওয়ার ফলে যে সমস্ত ভাষায় লোকসংখ্যা অল্প, তাদের অসুবিধা হবে। সেজন্য স্থির করা হ'য়েছে যে,—

॥ এক ॥ যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা আঞ্চলিক ভাষা অপেক্ষা ভিন্ন, তাদের সংখ্যা যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪০% হয়, তবে সে ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন পৃথক্ শিক্ষক রাখতে হবে।

॥ **দুই** ॥ এই সংখ্যা যদি ৪০% এর বেশী হয়, তবে তাদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় স্থাপন ক'রতে হবে।

॥ **তিন** ॥ সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভাষায় পুস্তক রচনা ক'রতে হবে।

কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা-মাধ্যম নিয়ে যে সমস্যা, তার সমাধান এখনও হয় নি। বিষয়টি এখনও বহু বিতর্কিত।

ভারতবর্ষে ভাষার সংখ্যাধিক্য বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি ক'রেছে। সরকার হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করবার পক্ষে। হিন্দী ভাষা যদি সমৃদ্ধ ভাষা হ'ত, তবে সমস্যার সহজ সমাধান হত। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে থাকা সত্ত্বেও হিন্দী ভাষার মানোন্নয়ন ও প্রসার যথাযথভাবে সম্ভবপর হয় নি। তাই ভাষাকে নিয়ে মতপার্থক্য আছে, বিভিন্ন আন্দোলনও হ'য়ে গেছে। এই ভাষা-আন্দোলন বিভিন্ন সময় সংকীর্ণতার পথ ধ'রে চলেছে, যার পিছনে কাজ ক'রছে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র। আসাম ও উড়িষ্যা থেকে বাংলা-ভাষাভাষীদের অত্যাচার ও বিতাড়নের মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে হিন্দীবিরোধী আন্দোলন রক্তক্ষয়ী-সংগ্রামে পরিণত হ'য়েছে।

ভাষা-আন্দোলন ও তার ফলশ্রুতি

হিন্দী ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে ভারতের অধিকাংশ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অযৌক্তিক সরকারী প্রচেষ্টা ও অনমনীয় মনোভাব, ভাষা-সংক্রান্ত গোঁড়ামি, সংকীর্ণ মনোভাব ও প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত এই আন্দোলনকে নানা পথে চলতে সহায্য ক'রেছে। আসামে ও মেঘালয়ে নেপালী ভাষা এখনও স্বীকৃতি পায় নি। আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে সরকার হিন্দীর সঙ্গে ইংরাজীকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা স্বীকৃতি ও মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে ভাষা-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এখনও সম্ভবপর হয় নি এবং এ নিয়ে বিতর্ক ও মত-পার্থ্যকেরও সীমা নেই।

বাংলা ভাষা

ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষারও দাবী আছে। ইংরেজী ও সংস্কৃত ছাড়া ভারতে প্রচলিত অন্যান্য ভাষাগুলি থেকে বাংলা ভাষা সাহিত্য-সম্পদে অনেক বেশী সমৃদ্ধ। ভাষার প্রাণশক্তির দিক্ থেকেও ইংরেজী ভাষার পরে বাংলা ভাষার স্থান। বিশ্ব-সাহিত্যের আসরেও বাংলা ভাষা স্বীকৃত হ'য়েছে। সমগ্র এশিয়া মহাদেশের মধ্যেও বাংলা ভাষাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ব'ললে অত্যুক্তি হয় না। ভারতে যতগুলি আঞ্চলিক ভাষা আছে, তার মধ্যে বাংলা ভাষা-ভাষীর সংখ্যাই বেশী (বাংলা দেশ সমেত)। বিহার, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অন্যান্য রাজ্যগুলিতে বাংলা ভাষা-ভাষীদের সংখ্যা প্রায় ৭।৮ কোটি। ভাষা-ব্যবহারের সংখ্যাতত্ত্বের দিক্ থেকে পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান হল অষ্টম,—(১) উত্তর-চীন, (২) ইংরাজী, (৩) রুশ, (৪) জার্মান, (৫) জাপানী, (৬) স্পেনীয় ভাষা, (৭) ইন্দোনেশীয়, (৮) বাংলা। তাই ভারতের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলা ভাষাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হিন্দী ভাষা

ভরতবর্ষের প্রায় ৬।৭ কোটি মানুষের মাতৃভাষা হ'ল হিন্দী। আরও কিছু লোক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে হিন্দী ভাষাকে ব্যবহার করে। সব মিলিয়ে হিন্দী ভাষা-ভাষীর সংখ্যা প্রায় ১৮।২০ কোটি। হিন্দী ভাষায় সবচেয়ে বেশী লোক কথা বলে ব'লে ভাষা-কমিশনের অধিকাংশ সদস্য হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ ক'রবার সুপারিশ ক'রেছেন। কিন্তু ভাষা-সম্পদে হিন্দী ভাষা সমৃদ্ধ নয়। হিন্দী ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি (*Inherent strength*) খুব দুর্বল। হিন্দী ভাষার সাহিত্য সম্পদও খুব বেশী নয়। বাংলা, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি ভাষাই ভাষা-সম্পদে হিন্দীর তুলনায় অনেক বেশী সমৃদ্ধ। তাই সারা ভারতের সমস্ত অধিবাসীর পক্ষে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

শিক্ষিত মানুষের যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ইংরেজী ভাষা খুবই কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অনেকে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা ক'রবার পক্ষে আছেন। কিন্তু সংস্কৃত একটি সুপ্ত ভাষা। এই ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় কিনা, সে প্রশ্ন বিতর্ক-মূলক। তাহ'লে ভারতের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা-সমাধানের কি কোন পথ নেই ? ভারতের

একাধিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিলে ক্ষতি কি? পৃথিবীর অনেকগুলি দেশে একাধিক রাষ্ট্রভাষাকে স্বীকার করা হ'য়েছে। ভারতবর্ষের পূর্ব-ভারতে বাংলা ভাষা মধ্য ও উত্তর ভারতে হিন্দী ভাষা, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে মারাঠী ভাষা ও দক্ষিণ ভারতে তামিল ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ ক'রলে অসুবিধা কোথায়? খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ৬০০ অব্দে ভারতবর্ষে প্রধান ৪টি ভাষাগোষ্ঠী ছিল—(১) প্রাচ্য বা পূর্বী অঞ্চলের উপভাষা, (২) মধ্য দেশীয় উপভাষা, (৩) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের উপভাষা, (৪). দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উপভাষা। পূর্বী অঞ্চলের উপভাষা মাগধী প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে বাংলা, উড়িষ্যা, অসমিয়া, ভোজপুরী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষায় পরিণত হ'য়েছে। মধ্য দেশীয় উপভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে আধুনিক হিন্দী ভাষার সৃষ্টি ক'রেছে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের উপভাষা হ'তে সিন্ধী ও পাঞ্জাবী ভাষার সৃষ্টি হ'য়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম উপভাষা থেকে মারাঠী ভাষা জন্ম নিয়েছে। কাজেই **আঞ্চলিক ভিত্তিতে পূর্ব-ভারতের জন্য বাংলা ভাষা, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের জন্য মারাঠী ভাষা, উত্তর ও মধ্য ভারতের জন্য হিন্দী ভাষা এবং দক্ষিণ ভারতের জন্য দ্রাবীড় গোষ্ঠীর তামিল ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিলে সমস্যার সমাধান হতে পারে।** এই ৪টি আঞ্চলিক ভাষা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ভাষা। কাজেই এই চারটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ ক'রে সরকারী ক্ষেত্রে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে গ্রহণ ক'রতে বাধা কোথায়?

বাংলা, হিন্দী, মারাঠী ও তামিল, এই চারটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান

অষ্টম অধ্যায়

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের অবদান

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ,—রামমোহন ও বিদ্যাসাগর

সমাজ সংস্কারক হিসেবে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা দেশে নবযুগের প্রবর্তক। সতীদাহ-প্রথা নিবারণ, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ, বহু বিবাহ রদ, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, শিক্ষার বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ইত্যাদি ক্ষেত্রে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে নবযুগের (রেনেসাঁ) প্রবর্তনে তাঁদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশেও রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের অবদান কম নয়। বাংলা গদ্যকে স্বনির্ভর আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে এঁরা সাহায্য ক'রেছিলেন। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আলোচনায় তাই রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রতে হয়। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের অবদান সম্বন্ধে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ রামমোহন রায় ॥
(১৭৭৪-১৮৩৩)

গদ্য রচনায় রামমোহনের কৃতিত্ব

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার পর বাংলা গদ্যের যাত্রা শুরু। উইলিয়াম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু প্রভৃতি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবর্গ ভাল বাংলা লিখতেন। কিন্তু তাঁদের হাতে বাংলা গদ্য পাঠ্য-পুস্তকের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। রামমোহন রায় বাংলা গদ্য সাহিত্যকে পাঠ্যপুস্তকের বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে তাঁকে স্বকীয় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। সাধারণ ভাষায় স্পষ্ট ক'রে তিনি বাংলা গদ্য রচনা ক'রেছিলেন। যুক্তি-বিন্যাস ও বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন; তিনি ছিলেন বাংলা গদ্যের সার্থক শিল্পী। সংস্কৃতের ছায়া থেকে বাংলা গদ্যকে তিনি সাধারণের কাছে স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত ক'রেছিলেন। সংস্কৃত বাদ দিয়ে তিনি সাধারণের বোধ্য ভাষায় বেদান্ত ও ধর্মীয় চিন্তাধারাকে যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা ক'রেছিলেন। তাঁর গদ্য-রচনায় মাধুর্য না থাকলেও কার্যকারিতা ছিল। রামমোহন ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। অনেকগুলি ভাষা তাঁর আয়ত্ত ছিল। তাই যুক্তি-নির্ভর গদ্য-রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল। তিনি ছিলেন বাংলা গদ্যের সার্থক পথিকৃৎ। কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন,—"দেওয়ানজী জলের মত বাংলা লিখিতেন"।

রাজা রামমোহন রায়ের গদ্য-রচনাগুলি হ'ল,—

বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫):—ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও ধর্মীয় চিন্তাধারার ব্যাখ্যা রামমোহন

রায়ের গদ্য রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। বেদান্তগ্রন্থে রামমোহন রায় ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ক'রেছেন।

বেদান্তসার (১৮১৫):—এই গ্রন্থে বিভিন্ন উপনিষদের বিভিন্ন সূত্র উদ্ধৃত ক'রে তা ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে। ব্রহ্ম যে অবাঙ্‌মনসগোচর, জীবের মধ্যেই তাঁর অবস্থিতি, এ-কথা বেদান্তসার গ্রন্থে উপস্থাপিত করা হ'য়েছে।

পঞ্চোপনিষৎ (১৮১৬-১৮১৯):—১০খানি উপনিষদের অনুবাদ ক'রবার ইচ্ছা রামমোহনের ছিল। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত পাঁচখানি উপনিষদের অনুবাদ ক'রেছেন। সেগুলি হ'ল—তলবকার উপনিষৎ (১৮১৬), ঈশোপনিষৎ (১৮১৬), কঠোপনিষৎ (১৮১৭), মাণ্ডূক্যোপনিষৎ (১৮১৭), মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৯)। রামমোহনের মতে উপনিষৎ হ'ল ব্রহ্ম বিষয়ের বিদ্যা; এই বিদ্যার সাহায্যে ব্রহ্মকে পাওয়া যায়।

ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭):—রামমোহনের ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক রচনা 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসারের' বিরুদ্ধে রক্ষণশীল মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রতিবাদ ক'রে 'বেদান্তচন্দ্রিকা' গ্রন্থ রচনা করেন। রামমোহন ছিলেন নিরাকার ব্রহ্মের সমর্থক। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সাকার উপাসনার কথা 'বেদান্তচন্দ্রিকা'য় প্রকাশ করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের লেখায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ আক্রমণ ছিল। 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র উত্তরে রামমোহন ৩৪ পৃষ্ঠার একখানি বই রচনা ক'রলেন, তার মধ্যেও শ্লেষাত্মক ভাষা ছিল। বইটি হ'ল 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার'। রামমোহন যুক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের প্রতিটি মত খণ্ডন ক'রেছেন।

গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮):—ঈশ্বর সাকার না নিরাকার, এই প্রশ্নে রামমোহনের পরবর্তী রচনা হ'ল 'গোস্বামীর সহিত বিচার'। গোস্বামী ছিলেন খুব সম্ভব রামগোপাল শর্মা। এই পুস্তকেও রামমোহন যুক্তি-বিন্যাসের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য পরিবেশন ক'রেছেন।

সহমরণ-বিষয়ক প্রবর্তক-নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮):—সহমরণের উপরে লেখা এটি রামমোহনের প্রথম পুস্তক। এখানে প্রবর্তক সহমরণের স্বপক্ষে ও নিবর্তক সহমরণের বিপক্ষে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বিতর্ক ও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হ'য়েছে; দু'পক্ষেই শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন উক্তি ও যুক্তি উপস্থাপিত করা আছে। তবে নিবর্তকের বক্তব্যে লেখকের মতাদর্শ প্রতিফলিত, বক্তব্যের ধারও জোরালো।

প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯):—এটিও সহমরণের উপর লেখা। এখানেও প্রবর্তকের মুখে সহমরণের পক্ষে, নিবর্তকের মুখে সহমরণের বিপক্ষে যুক্তিতর্কের বিন্যাস আছে। কাশীনাথ তর্কবাগীশের লেখা 'বিধায়ক নিষেধক সম্পদে'র উত্তরে রামমোহন রায় এই পুস্তকটি রচনা করেছিলেন।

গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮):—ঈশ্বর-তত্ত্বের নিরাকার রূপের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও বর্ণনা ক'রিতে গিয়ে রামমোহন 'গায়ত্রীর অর্থ' প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর লেখা 'গায়ত্রীর অর্থ' প্রকাশিত হয়।

আত্মানাত্মবিবেক (১৮১৯)ঃ—মূল পুস্তকটি শংকরাচার্যের প্রণীত। রামমোহন রায় এটিকে অনুবাদ ক'রে মূল গ্রন্থের সঙ্গে প্রকাশ করেন।

কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮১৯)ঃ—রামমোহন রায় বেদ ও উপনিষদের ভুল ব্যাখ্যা ক'রেছিলেন ব'লে কবিতাকার অভিযোগ ক'রেছিলেন। এই কবিতাকার কে—তা জানা যায় নি। রামমোহন রায়কে কবিতাকার তীব্র ভাষায় আক্রমণ ক'রেছিলেন। রামমোহন রায়ও প্রতি-আক্রমণ ক'রে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত ক'রেছেন।

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০)ঃ—সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর মতে সকলের ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার নেই। রামমোহন রায় এখানে বিভিন্ন যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রতিপন্ন ক'রেছেন যে, সকলেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ ক'রতে পারেন।

ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১)ঃ—হিন্দুধর্মের শাস্ত্ররাশির বিরুদ্ধে লেখা একখানি রচনা 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয়। রামমোহন তার প্রতিবাদ জানিয়ে পত্র লেখেন। কিন্তু তা প্রকাশিত হয় নি। রামমোহন তখন 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২)ঃ—কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ছদ্মনামে যে চারটি প্রশ্ন রেখেছিলেন, এই পুস্তকে রামমোহন তার উত্তর দিয়েছেন।

প্রার্থনা পত্র (১৮২৩)ঃ—এটি রামমোহন রায়ের ছোট একটি পত্র। এখানে তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা ব'লেছেন।

পাদরি ও শিষ্য সংবাদ (১৮২৩)ঃ—এক পাদরী ও তাঁর শিষ্যের কল্পিত কাহিনী অবলম্বনে এই পুস্তিকা লেখা। পাদরীদের প্রচারিত ঈশ্বর-তত্ত্বের অসারতা তিনি এখানে সরস ক'রে উপস্থাপিত ক'রেছেন।

পথ্য প্রদান (১৮২৩)ঃ—চারি প্রশ্নের উত্তরের প্রত্যুত্তরে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'পাষণ্ড পীড়ন' রচনা করেন। প্রতিবাদে রামমোহন রায় 'পথ্য প্রদান' প্রকাশ করেন। এটি রামমোহনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার-গ্রন্থ। যুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে রামমোহন এখানে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত ক'রেছেন।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (১৮২৬)ঃ—ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সম্বন্ধে এখানে ক্ষুদ্রাকারে আলোচনা করা হয়েছে।

বজ্রসূচী (১৮২৭)ঃ—মৃত্যুঞ্জয় আচার্যের 'ব্রহ্মসূচী' গ্রন্থের মূলসহ অনুবাদ রামমোহন প্রকাশ করেন।

গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানং (১৮২৭)ঃ—বেদপাঠ ছাড়াও গায়ত্রীর জপ দ্বারাও যে ব্রহ্মের উপাসনা হয়, সে কথা এখানে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

ব্রহ্মোপাসনা (১৮২৮)ঃ—এটি একটি ক্ষুদ্র পত্র। এখানে প্রকৃত ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে।

ব্রহ্মসংগীত (১৮২৮)ঃ—ব্রহ্মসংগীতগুলির মধ্যে রামমোহনের ভক্তিভাবের আকুতি ও অনুভূতি প্রতিফলিত হ'য়েছে।

অনুষ্ঠান (১৮২৯) ঃ—এখানে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করা হ'য়েছে।

সহমরণ বিষয় (১৮২৯) ঃ—সহমরণের বিধি যে শাস্ত্রে নেই, একথা এখানে বিচার করা হ'য়েছে।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩) ঃ—১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন ইংরাজীতে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। পরে বাংলা ব্যাকরণ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি ইংরেজী ব্যাকরণের অনুবাদ নয়। এর ভাষা খুবই সহজ ও সরল। এই গ্রন্থের মধ্যেই রামমোহনের ভাষাগত দক্ষতা সর্বাধিক প্রকাশ পেয়েছে। ১২টি অধ্যায়ে বাংলা ব্যাকরণের প্রায় সব দিকই আলোচনা করা হ'য়েছে।

রামমোহনের গদ্য রচনার মূল্যায়ন

রামমোহন ছিলেন বাংলা গদ্যের সার্থক শিল্পী। তিনিই বাংলা গদ্য সাহিত্যকে পাঠ্যপুস্তকের বন্ধনদশা থেকে মুক্ত করেন। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ক'রতে তিনিই বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে পথ প্রদর্শন করেন। তবে রামমোহনকে বাংলা গদ্যের প্রবর্তক বলা যায় না। তাঁর আগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবর্গ বাংলা গদ্যে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়াম কেরী ও রামরাম বসুর গদ্য অনেক বেশী সহজ, সুবোধ্য ও শক্তিশালী ছিল। রামমোহনের রচনায় সাহিত্যগুণও খুব বেশী ছিল না। সামাজিক বিষয় বর্ণনায় রামমোহনের লেখা অনেক সহজ ও সাবলীল। রামমোহনের রচনায় যথাস্থানে ছেদের ব্যবহার নেই। তাঁর রচনায় অনেক অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগও আছে। তা সত্ত্বেও বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বিকাশে রামমোহনের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের যে শক্ত বনিয়াদ তিনি রচনা ক'রেছিলেন, তার উপর দাঁড়িয়ে পরবর্তী কালের লেখকগণ গদ্যরচনা ও কথাসাহিত্যের প্রাসাদ গ'ড়েছেন।

॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥
(১৮২০-১৮৯১)

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি উল্লেখযোগ্য নাম। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা গদ্যের 'প্রথম যথার্থ শিল্পী' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, বিরাট ব্যক্তিত্ব ও সংবেদনশীল হৃদয়ধর্ম রচনাগুলিকে সাহিত্য হিসেবে সমৃদ্ধ ক'রেছে। কিন্তু এদেশে তিনি সমাজ-সংস্কারক হিসেবেও স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। বিধবাবিবাহ-প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয়-স্থাপন প্রভৃতি কাজে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম নিয়োজিত ক'রেছিলেন। তার ফলে বাংলা দেশে এক নবজাগরণের (রেনেসাঁ) সূত্রপাত হ'য়েছিল। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে তিনি স্বীয় সংকল্পকে রূপদান ক'রতেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রতে হয়।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে এক বিস্ময়কর আবির্ভাব। ব্যক্তিত্বের যে সৌধচূড়ায় তিনি আসীন ছিলেন, সাধারণ বাঙালীর পক্ষে তা স্পর্শ করাও ধৃষ্টতার নামান্তর ছিল। তাঁর মধ্যে ছিল সমাজ-সংস্কারের দুর্নিবার আগ্রহ। তাই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়েও তিনি এই ভূমিকা অনুযায়ী কাজ করতেন। বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে সমাজ-বিপ্লব সৃষ্টি করেন; তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন তৎকালীন বঙ্গ সমাজ ক'রতে পারে নি। **ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায় উনিশ শতকে এদেশে রেনেঁসার গোড়াপত্তন করেন। সেই পথরেখা ধরেই বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কার সম্ভব ক'রেছিলেন।** তাঁর একক প্রয়াসেই বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন এবং স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার সম্ভব হয়েছে। মানবপ্রেমিক ও দেশপ্রেমিক বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন বাঙালী জাতিকে সংস্কারমুক্ত ক'রে বিশ্বসভায় স্থান দিতে,—রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান হয়েও বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারের পথে তাই অগ্রসর হ'য়েছিলেন। মানবপ্রীতিই তাঁর লক্ষ্য ছিল, ধর্মসংস্কার বা আধ্যাত্মিকতা নয়। বাংলাদেশে সমাজ-সংস্কারক হিসেবেও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা তাই গৌরবোজ্জ্বল।

সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগর

ঐহিক জীবনকে বিদ্যাসাগর তুচ্ছ ক'রে দেখেন নি। উনিশ শতকের *positivism* (ইতিবাদ)-এর সঙ্গে তাঁর মতৈক্য দেখা যায়। শাস্ত্রকে তিনি বাস্তব জীবনের পটভূমিকায় এনে দেখেছেন। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ নানাভাবে তাঁর বিরোধিতা ক'রেছে। কিন্তু আজ বিশ শতকের শেষার্ধে দাঁড়িয়ে আমরা তাঁর কীর্তির মাহাত্ম্য উপলব্ধি ক'রতে পারছি।

বিদ্যাসাগরের মতবাদ

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪৪ বৎসর বিদ্যাসাগর বহু গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে অনুবাদ-গ্রন্থের সংখ্যাই বেশী।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে **'বেতালপঞ্চবিংশতি'** প্রকাশিত হয়। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' গ্রন্থের অনুবাদ ক'রে তিনি **'শকুন্তলা'** (১৮৫৪) প্রকাশিত করেন। ভবভূতির 'উত্তরচরিতে'র প্রথম দু'টি অংক, এবং বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ভাবানুবাদ ক'রে তিনি **'সীতার বনবাস'** (১৮৬০) রচনা করেন।

সংস্কৃত থেকে অনুবাদ

ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদেও বিদ্যাসাগর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। *'History of Bengali'*-র অনুবাদ ক'রে তিনি **'বাংলার ইতিহাস'** (১৮৪৮) রচনা করেন। চেম্বার্সের *Biographies*-এর অনুবাদে তিনি **'জীবনচরিত'** (১৮০৯) এবং *Rudiment of Knowledge*-এর অনুবাদে **'বোধোদয়'** (১৮৫১) রচনা করেন। এছাড়াও বিদ্যাসাগর ঈশপের গল্প এবং শেক্সপীয়ারের কয়েকটি নাটকের অনুবাদ করেন। শেক্সপীয়ারের *'Comedy of Errors'*-এর অনুবাদ ক'রে বিদ্যাসাগর **'ভ্রান্তিবিলাস'** (১৮৬৯) রচনা করেন। অনুবাদ যে সাহিত্যকে উচ্চতর মানের অধিকারী ক'রে তোলে, একথা

ইংরেজী থেকে অনুবাদ

বিদ্যাসাগর জানতেন। তাই তাঁর মৌলিক প্রতিভা অনুবাদকের কার্যে নিয়োগ ক'রে তিনি বাংলা সাহিত্যকে উন্নীত ক'রবার প্রয়াস ক'রেছিলেন।

মৌলিক রচনা

বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনার মধ্যে **'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব'** (১৮৫৩), **দুই খণ্ড 'বিধবা-বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'** (১৮৫৫), **'বিদ্যাসাগর চরিত'** (১৮৯১), **'প্রভাবতী সম্ভাষণ'** (১৮৬৩), **দুইখণ্ড 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'** (১৮৭১, ১৮৭৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'বিদ্যাসাগর চরিত' গ্রন্থে তিনি অতি সুন্দরভাবে আত্মজীবনী বর্ণনা ক'রেছেন। রচনাগুলির মধ্যে তাঁর অসাধারণ সাহিত্যরস-চেতনা, প্রখর শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রকাশ হ'য়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছে তাঁর সামাজিক ও মানসিক চেতনা ;—বিচার-বিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতা।

প্রতিপক্ষকে কঠিন আঘাত ক'রবার জন্য বিদ্যাসাগর ছদ্মনামে কয়েকখানি প্রহসন প্রকাশ করেন। এগুলির মধ্যে **'অতি অল্প হইল'** (১৮৭৩) **'ব্রজবিলাস', 'রত্নপরীক্ষা'** প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলিতে উচ্চাঙ্গের রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের অন্যান্য রচনার মধ্যে **'মহাভারতের উপক্রমণিকা পর্ব** (১৮৬০), **'কথামালা'** (১৮৪৮), **'চরিতাবলী'** (১৮৫৬), **আখ্যানমঞ্জরী'** (১৮৬৩) প্রভৃতি প্রধান।

বিদ্যাসাগরের রচনারীতি

বিদ্যাসাগরের রচনারীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন, "বিদ্যাসাগর গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাঁহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগে সর্বপ্রথমে তাঁহাকে দিতে হয়।" সীতার বনবাসে,—"এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি! এই গিরির শিখরদেশে আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধর-মণ্ডলীর সহযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত ; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সততস্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।" বর্ণনাটি ভাষার মাধুর্যে, শব্দ-ঝংকারে মনের মধ্যে যেন অস্পষ্ট কুহেলী-ঘেরা স্বপ্ন-রাজ্যের সৃষ্টি করে। বাংলা গদ্য-রচনায় বিদ্যাসাগরের নাম স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

উপসংহার

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক শিল্পী ; বাংলা গদ্যকে তিনি বাল্য হ'তে কৈশোরে উপনীত করেন, তাঁর হাতেই বাংলা গদ্য সাবলীলতা পায়। বাংলা গদ্যে যতিচিহ্ন বিন্যাসের পদ্ধতি তিনিই সার্থকভাবে প্রচলিত করেন। বিদ্যাসাগরের স্বভাব-সিদ্ধ শিল্প-চেতনা বাংলা গদ্যে সুললিত ছন্দ-সুষমার প্রবর্তন ক'রেছে। রাইমণি, বিদ্যাসাগরের মাতা ও পিতামহীর

প্রভাবে তাঁর নারী চরিত্রগুলি কল্যাণী মূর্তিতে আবির্ভূতা। কি সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধে, কি অনুবাদ-সাহিত্যে, কী স্বাধীন গদ্য-রচনায়—সর্ব ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

অনুশীলনী

১। বাংলা গদ্যের বিকাশে বিদ্যাসাগরের দান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
(কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৮)

২। নীচের প্রশ্নের উত্তর প্রবন্ধ আকারে লিখুন:—

(ক) বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে বিদ্যাসাগরের দান। (কলি. বিশ্ব., বি. টি, ১৯৭০)

(খ) বাংলা গদ্যের বিকাশ (রামমোহন রায় হইতে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত)।
(কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭২)

(গ) বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বিকাশে বিদ্যাসাগরের দান। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৫)

৩। "বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী।"—এই উক্তিটির সার্থকতা প্রতিপন্ন করুন।
(কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৭)

———

নবম অধ্যায়

মধুসূদন দত্তের সাহিত্যকীর্তি

যুগচেতনা ও মধুসূদনের সাহিত্যচেতনা

"কবি ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বরগুপ্ত এবং ঈশ্বরগুপ্ত হইতে রঙ্গলাল পর্যন্ত বাংলা কাব্য-প্রবাহ যেন কুল কুল রবে গ্রাম-জনপদের মধ্য দিয়া গ্রাম-জনপদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার ধারা বহন করিয়া চঞ্চলা তটিনীর ন্যায় চলিয়া আসিতেছিল। সহসা এই ধারা আসিয়া মধুসূদনের মহাকাব্যের অমৃত সমুদ্রের অকূলতার মধ্যে মিশিয়া গেল।" মঙ্গলকাব্যের যুগের অবসান হ'য়ে ব্যক্তি-নির্ভর গোষ্ঠী-চেতনা জাতীয় চেতনার মধ্যে মিশে গেল। সমাজ ও জীবনের নতুন ভাবাদর্শ সাহিত্যের মধ্যে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হ'ল। মধুসূদনের কাব্যে তাই আমরা শুনি সমুদ্রের ভৈরব-কল্লোল, আকাশের বজ্র-গর্জন। মাঝে মাঝে রোমান্টিক কবি-ভাবনার বিদ্যুৎ-প্রকাশে কবির কাব্য-ভাবনার দীপ্তি তাঁর কাব্যকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছে। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের মরা গাঙে ভরা জোয়ার এনেছেন; প্রাণ-বন্যায় বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন প্লাবিত হ'য়েছে। কবি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যেই আমরা সর্বপ্রথম বস্তুনিষ্ঠ চেতনার প্রকাশ দেখি। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের চরম পর্যায়ে মধুসূদন দত্ত তাঁর কাব্যে এই বস্তুনিষ্ঠ চেতনার সার্থক প্রতিফলন ক'রেছেন। তাঁর কাব্যে তাই বস্তুবাদ ও মানবতাবাদের চরম বিকাশ দেখা যায়। কবির রোমান্টিক অনুভূতি, ভাবদগ্ধ চেতনা, বেদনাবিধুর জীবনচেতনা, বিদগ্ধ অনুভূতি, প্রখর পাণ্ডিত্য, অসামান্য ব্যক্তিত্ব, ভাষার বর্ণাঢ্য বিন্যাস ইত্যাদি তাঁর রচনাবলীকে সমৃদ্ধিশালী ও সাহিত্য-গুণান্বিত ক'রেছে।

রেনেসাঁ ও মধুসূদনের সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দী হ'ল এদেশে নবজাগরণের (রেনেসাঁ) কাল। পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তাভাবনার যে প্রবল ঢেউ এদেশের রক্ষণশীল সমাজ-ব্যবস্থাকে চরম আঘাত দিয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি হ'ল উনবিংশ শতাব্দীর এই নবজাগরণ। রেনেসাঁকে *Michelet* বলেছেন, '*The discovery by man of himself and his world.*" ইউরোপের রেনেসাঁর ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রলেও দেখা যায় যে, সেখানেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বদেশ-চেতনার সূত্রপাত হ'য়েছিল। গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে মানুষ মধ্য-যুগীয় সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারার শৃংখল হ'তে মুক্তিলাভ ক'রল,—নিজের কাছে নিজের ভূমিকা জানতে পারল। ভূগোলে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে ইউরোপে নতুনতর আবিষ্কার ও চিন্তাধারার বিকাশ ঘটল। এইভাবে রেনেসাঁর মধ্যে মানুষ নতুন ক'রে জানতে পারল পুরাতনকে। গ্রীক সাহিত্যে দেখা গেল, মানুষ দেবতার সঙ্গে সমভূমিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ক'রছে। আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার প্রভাবে পুরাতন ভাবনা নতুন পথে পরিবর্তনের দিকে মোড় নিল।

শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা গেল বিরাট পরিবর্তন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদ ও বস্তুতান্ত্রিকতার প্রভাবে এই নবজাগরণ সমৃদ্ধ হ'ল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—৭৩) এদেশে নবজাগরণের যুগের কবি। তাঁর সাহিত্য-চেতনাও এই রেনেসাঁর প্রভাবে সমৃদ্ধিশালী হ'য়েছে। মানব মহিমা তাই মধুসূদনের সাহিত্যের মৌল উপাদান। *Taine* বলেন যে, ব্যক্তিত্বের মূলে আছে তিনটি উপাদান,—*The Race, the Milien, the Moment*। মধুসূদনের কাব্য-সাহিত্যের সম্ভাবনা ও স্বাতন্ত্র্যের মূলেও এই তিনটি উপাদান ছিল। তাঁর কাব্য-সাহিত্য তাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের রশ্মিধারায় সমুজ্জ্বল। নারী-মহিমার যথাযথ প্রকাশ হ'ল রেনেসাঁর আর একটি লক্ষণ। মধুসূদনের কাব্যেও নারী-মহিমা নতুনতর ভাবাদর্শে আলোকিত হ'য়েছিল। মধুসূদনের প্রমীলা, জনা প্রভৃতি সার্থক "*Renaissance woman*"। পুরুষের ভূমিকা বীরত্বের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি ও আত্মসাহসের মধ্যে ;—নারীর মহিমা 'প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী' থাকায় ও স্বামীর সহগমনে। কবি তাঁর সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় উপাদানের সংমিশ্রণ ক'রেছেন। যুগ-পরিবেশের মধ্যে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হ'য়েছে। দেশীয় শিল্প-সাহিত্য-দর্শনকে তিনি পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার আলোকে সমৃদ্ধ ক'রেছেন।

ব্যক্তিত্বের মহিমা প্রকাশ

রেনেসাঁর চিন্তাধারা দেবনির্ভরতাকে মেনে নিতে চায় না,—মানুষকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চায়। নিয়তি-তাড়িত মানুষ আপন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ ক'রবে, রেনেসাঁর এই বিধান আমরা রাবণ-চরিত্রে দেখতে পাই। মধুসূদন রাবণ ও মেঘনাদের মধ্যে আপনার জীবনের প্রতীক খুঁজে পেয়েছেন। মধুসূদন তাঁর সাহিত্যের মধ্যে ব্যক্তিত্বের মহিমার মূল্যবোধ পরিবর্তিত ক'রেছেন। তাঁর কাব্যে রামচন্দ্র বড় ক'রে স্থান পায় নি। দেবনিন্দিত অসুরকুলকেই তিনি তাঁর কাব্যের নায়কে মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি নিজেই এ বিষয়ে ব'লেছেন,—"*I despise Ram and his rabble.*"

জীবনদর্শন

রেনেসাঁ যুগের চিন্তাধারা মধুসূদনের কাব্য-সাহিত্যে প্রতিফলিত হ'য়েছে। *Rationalism* বা যুক্তিবাদ আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ। সে যুগের চিন্তাধারার রেনেসাঁ-আক্রান্ত বিপ্লবের এই যুক্তিবাদের দু'টি দিক ছিল,—বুদ্ধিগত ও আবেগগত। বুদ্ধিগত দিক থেকে দেখা যায় যে, দেবী-মহিমায় অনাস্থা ও যুক্তির আলোকে সত্যকে যাচাই করা। আবেগগত দিক থেকে দেখা যায় যে,—মানবতাবোধ, নারী-মহিমাবোধ, দেশপ্রেম ও জীবন সম্পর্কে ইহমুখী অনুরাগ (*This worldliness*)। এ সবের মূলে ছিল গ্রীক সাহিত্যে মধুসূদনের পাণ্ডিত্য। গ্রীক সাহিত্য-দর্শনই ইউরোপের রেনেসাঁর পথপ্রদর্শন ক'রেছিল। মধুসূদন নিজের জীবনের মধ্যেই ইউরোপের রেনেসাঁর ফসল ফলিয়ে-ছিলেন। এর মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে মধুসূদনের জীবনদর্শন। তাঁর *Rationalism*-কে ধিক্কার দিয়ে অনেকে ব'লেছেন যে, তিনি আমাদের ঐতিহ্যবোধকে আঘাত ক'রেছেন। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, মঙ্গলকাব্যের কবিরাও দেব-

মহিমা যথাযথভাবে রক্ষা করেন নি। মধুসূদন বলেছেন, *"I love the mythology of my ancestors."* গ্রীক সাহিত্যের প্রভাবে মধুসূদনের দেবচরিত্রে অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হ'য়েছে কবির বলিষ্ঠ জীবনদর্শন, মানবতাবোধ ও যুক্তিনির্ভর বিদগ্ধ মননশীলতা।

ইংরেজী শিখে পুরো সাহেব হবেন, বিলাত যাবেন এবং ইংরেজী সাহিত্যে বড় কবি হবেন, এই ছিল মধুসূদনের জীবনের স্বপ্ন। কিন্তু তাঁর জীবনের স্বপ্ন সফল হয়নি। গ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ ক'রে তিনি বিলাতও গিয়েছিলেন, ইংরেজীতে কাব্যও রচনা ক'রেছিলেন। কিন্তু অমিতব্যয় এবং খামখেয়ালিপনা তাঁর জীবনে বেদনা-বিক্ষুব্ধ এক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি ক'রেছিল। মধুসূদন তাঁর কাব্যে গুরু-রূপে নির্বাচিত করেছিলেন মহাকবিদের। মাদ্রাজে থাকাকালীন তিনি গ্রীকভাষা অধ্যয়ন করেন এবং হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ওভিদ প্রভৃতির কাব্যধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। ইংরেজ কবি মিল্টন মধুসূদনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ক'রেছিল। তাঁর প্রভাবে কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন মধুসূদনের এক অমর কীর্তি। *Satan* মিল্টনের *Paradise Lost* কাব্যের নায়ক। এই ভাবধারার প্রতিও মধুসূদন বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলেন। তাই তাঁর কাব্যে দেবনিন্দিত অসুরকুলই নায়কের মর্যাদা লাভ ক'রেছে। ভারতীয় কবিদের মধ্যেও মধুসূদন মহাকবি বেদব্যাস ও বাল্মীকিকে গুরুপদে বরন ক'রেছিলেন। গ্রীক নাটকের আদর্শে মধুসূদন কয়েকটি নাটক রচনা করেন। কবি-জীবনের বহু ঘটনা ও ও অভিজ্ঞতা তাঁর রচিত কাব্য নাটকে প্রতিফলিত হ'য়েছে।

কবিজীবন ও সাহিত্য

মধুসূদনের কাব্যসৃষ্টি ঃ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিভিন্ন ধরনের কতকগুলি কাব্য রচনা ক'রেছেন। একে একে সেগুলি আলোচনা করা যেতে পারে ;—

॥ Captive Lady, Vision of the Past ॥

ইংরেজী সাহিত্যে উন্নত কাব্য সৃষ্টি ক'রে মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য জগতের কবিকুলের মধ্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে চেয়েছিলেন। ১৮৪৯ গ্রীষ্টাব্দে *The Captive Lady* ও *Visions of the Past* প্রকাশিত হয়। মাদ্রাজে থাকাকালীন কবি এই কাব্য দু'টি রচনা করেন। কাব্য দু'টি সাহিত্যরসিকদের স্বীকৃতিও পেয়েছিল। এই কাব্য-প্রকাশের পরই তাঁর প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মহাত্মা বেথুনের পরামর্শে কবি বাংলা কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন। বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলার জন্য তিনি গ্রীক-লাতীন প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। কবি তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাকের কাছে লিখেছেন,—*"As I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?"*

॥ তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য ॥

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য' মধুসূদনের প্রথম বাংলা কাব্য। মহাভারতের সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী অবলম্বন ক'রে তিনি এই রোমান্টিক আখ্যান-কাব্যটি রচনা করেন। দেবদ্রোহী সুন্দ-উপসুন্দকে বিনাশের জন্যই বিশ্বকর্মা তিলে তিলে সৌন্দর্য চয়ন ক'রে তিলোত্তমা সৃষ্টি ক'রেছিলেন। মধুসূদনও তিলে তিলে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে তাঁর 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য সৃষ্টি করেন। তিলোত্তমা চরিত্র-সৃষ্টিতে মধুসূদন আপন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই কাব্যটি আকারে মহাকাব্যিক বা *epicling* হ'লেও এতে মাঝে মাঝে গীতিকবিতার ঝংকার শোনা যায়। আকস্মিকভাবে কাব্যটির পরিসমাপ্তি হ'য়েছে। কবি তিলোত্তমার রূপসী প্রতিমাকে গড়েই বিসর্জন দিয়েছেন,—তিলোত্তমা তাই কাব্যের উপেক্ষিতা। আভিধানিক শব্দের বাহুল্যহীনতা ও রচনারীতির আয়োজনহীন সরলতা কাব্যটিতে অপরূপ অকৃত্রিমতার শ্রী সৃষ্টি ক'রেছে।

॥ মেঘনাদবধ-কাব্য ॥

মধুসূদনের মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ-কাব্য' ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে কোন কাব্যকে যদি মহাকাব্যের গৌরব দিতে হয়, তবে সে গৌরব 'মেঘনাদ-বধ-কাব্যের'ই প্রাপ্য। রামায়ণের কাহিনীর পটভূমিকায় মধুসূদনের এই মহাকাব্য রচিত। এই কাব্যে তাঁর প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ঘটেছে। মধুসূদনের অন্তরের সমস্ত স্নেহ বর্ষিত হ'য়েছে মেঘনাদের প্রতি। তাই স্থানে স্থানে তিনি রামচন্দ্রের প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। লক্ষ্মণ-চরিত্রেও দুর্বলতা প্রকট হ'য়ে উঠেছে। গ্রীক ট্রাজেডির সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে মেঘনাদবধ-কাব্যে। চরিত্র-সৃষ্টিতে গ্রীক সাহিত্যের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। পতির অনুগামিনী প্রমীলার মুখে যখন আমরা শুনি,—

> "কি কহিলি, বাসন্তী ? পর্বতগৃহ ছাড়ি
> বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
> কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?"

তখন এই চরিত্রে ভারতীয় নারীর শঙ্কিত হৃদয়ের পরিবর্তে গ্রীক ললনার শৌর্যবীর্যই অধিকতর পরিস্ফুট হয়। প্রমিলা চরিত্রে রেনেসাঁর মহিমাও প্রকাশিত হ'য়েছে।

জগতের অন্তরালে এক স্বেচ্ছাচারী নির্মম নিয়তি কাজ ক'রে চলেছে। জগৎকে ইচ্ছামত ভেঙে-চুরেই তার পৈশাচিক আনন্দ। উপদ্রুত, উৎপীড়িত নরনারী আকুল ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে তুললেও নিয়তির অত্যাচারের পরিসমাপ্তি নেই। বিরাট পুরুষ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংগ্রামে অসহায়ের মত ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। যখন দেখি রাবণ বিলাপ ক'রছে,—

> "সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
> লভিতে কি এই ফল ?"

তখন মনে হয়, শত দুঃখে দীর্ণ মানবাত্মার ক্রন্দন যেন আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে তুলেছে। রাবণ-চরিত্রের হাহাকার কাব্যের মধ্যে এক অপূর্ব করুণ রসের প্লাবন এনে দিয়েছে।

কাব্যের প্রারম্ভে কবি বীররসে মহাকাব্য-রচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,—

"গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত।"

কিন্তু কবির অজ্ঞাতসারে সেই বীররস করুণ রসের প্লাবনে ভেসে গেছে। পুত্রের চিতাপার্শ্বে প্রমীলাকে দেখে রাবণ হাহাকার ক'রে ব'লেছেন,—

"কি পাপে লিখিল
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"

কবিজীবনের মর্মন্তুদ হাহাকার ও বেদনার্ত হৃদয়ের করুণ আর্তি যেন মেঘনাদ ও রাবণ-চরিত্রের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ ক'রেছে।

কবি ৯টি সর্গে মহাকাব্যটি সমাপ্ত ক'রেছেন। কাব্য-রচনায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য রীতির সংমিশ্রণ হ'য়েছে। বিষয়বস্তু-উপস্থাপনে ও চরিত্র-চিত্রণেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য রীতির মিশ্রণ দেখা যায়। আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যটি রচিত। কাব্যের ভাষা ও বর্ণনা ওজস্বিতায় ভরা। কাব্যের মধ্যে বহু আভিধানিক অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার আছে। কাব্যের নায়ক কে? মেঘনাদ, না রাবণ? অনেকে বলেন, কাব্যটি দ্বি-নায়কত্বের লক্ষণ-যুক্ত। এই কাব্যটি প্রকাশিত হ'লে বাংলাদেশে তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত হ'য়েছিল। অনেকে কাব্যটিকে 'ছুছুন্দরীবধ-কাব্য' ব'লেও ব্যঙ্গ ক'রেছেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সার্থক ফলশ্রুতি হ'ল এই মহাকাব্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—"কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙ্গিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে, স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙ্গিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে।" বস্তুতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে 'মেঘনাদবধ-কাব্য' এক স্বতন্ত্র পথের পথিকৃৎ।

॥ ব্রজাঙ্গনা-কাব্য ॥

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'মেঘনাদবধ-কাব্য' রচনার সময়ই কবি বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনাতে কবি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এটি '*ode*'-জাতীয় গীতি-কবিতার কাব্যগ্রন্থ। কৃষ্ণ-বিরহিতা শ্রীরাধার হৃদয়ের আকুল আর্তি মধুসূদন কাব্যের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ ক'রেছেন। বৈষ্ণব পদাবলী মানব রসে নিষিক্ত। সেই কারণেই কবি বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। বৈষ্ণবদর্শন ও বৈষ্ণবতত্ত্ব নিয়ে তিনি চিন্তা-ভাবনা করেন নি। শ্রীরাধাকে তিনি তত্ত্ব-দর্শনের জটিলতা থেকে মুক্তি দিয়ে মানব

জীবনের প্রাঙ্গণতলে উপস্থাপিত ক'রেছেন। রাধার চরিত্র-চিত্রণে কবি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রেছেন।

॥ বীরাঙ্গনা-কাব্য ॥

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বীরাঙ্গনা-কাব্য' মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যটি রচিত। এটি পত্র-কাব্য। কবি ওভিদের (*Ovid*) অনুকরণে মধুসূদন এই কাব্য রচনা করেন। ওভিদের *Heroic Epitstes*-এ ২১খানি পত্র আছে। মধুসূদনেরও ইচ্ছা ছিল বীরাঙ্গনা-কাব্যে ২১খানি পত্র সংযোজন ক'রবেন। কিন্তু ১১খানি সম্পূর্ণ ও কতকগুলি অসম্পূর্ণ পত্র-কাব্য বীরাঙ্গনায় স্থান পেয়েছে। তবুও বীরাঙ্গনার কাব্যগুণ খর্ব হয় নি। বীরাঙ্গনার ভাষা সরল, ভাব আবেগময়, ছন্দ নিরর্গল। মহাকাব্যের অন্তরালবর্তিনীরা যেন এখানে অবগুণ্ঠন মেলে আপনাকে প্রকাশ ক'রেছে। পত্রগুলির মধ্যে পৌরাণিক সংস্কারের মোহ নেই, আছে যুক্তিনিষ্ঠা। কাব্যের নায়িকারা ব্যক্তিগত চিত্রবিশিষ্ট। নারীচরিত্র-বর্ণনায় কবি তাঁর লিরিক (*Lyric*) ক্ষমতাটুকু উজাড় ক'রে দিয়েছেন। কাব্যের মধ্যে নাটকীয়তাও প্রকট। এই কাব্যকে ভণিতা-কাব্য বা *dramatic monologue* বলা যেতে পারে। 'নীল-ধ্বজের প্রতি জনা', 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী', 'সোমের প্রতি তারা' প্রভৃতি পত্রে কবির মৌলিক সৃষ্টির প্রয়াস না থাকলেও বিশিষ্টতার পরিচয় আছে।

॥ চতুর্দশপদী কবিতাবলী ॥

মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য সনেটের অনুকরণে বাংলায় 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই মধুসূদন সনেট লিখবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' লেখা হয়। বিদেশে থেকে ঘরছাড়া কবির মর্মবেদনা অকপটভাবে সনেটগুলিতে প্রতিফলিত হ'য়েছে। বাংলা সাহিত্যে সনেট রচনা মধুসূদনের বিশিষ্ট রচনা। কবি এই সনেটগুলির মধ্যেই নিজেকে সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত ক'রেছেন। "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই কবিতাগুলির মধ্যে কবি যতটা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তেমন আর কোথাও নয়। সনেটে নবীন কবিতায় মধুসূদনের সফলতম সৃষ্টি।" মধুসূদন কয়েকটি সনেটেই পেত্রার্কীয় রীতির অনুসরণ ক'রেছেন; আবার শেক্সপীয়ারের রীতি অনুসরণ ক'রেও তিনি কয়েকটি সনেট রচনা ক'রেছেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন,—"মধুসূদন সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল এই চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে। নিগড়হীন মুক্ত কবিতা এখানে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। তাহার কারণ বাংলাভাষার প্রাণ-ধর্মের সহিত এতদিনে তাঁহার নিবিড়তম পরিচয় ঘটিয়াছে।" 'বঙ্গভাষা', 'কাশীরাম দাস', 'কপোতাক্ষ নদ', 'মহাভারত', 'সীতাদেবী' প্রভৃতি হ'ল বাংলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট সনেট। মধুসূদনের সৃজনী-প্রতিভা স্বল্পকাল স্থায়ী ছিল। প্রদীপ নিভে যাওয়ার পূর্বে যেমন শেষ তৈল-বিন্দুটি আকর্ষণ ক'রে শিখাটি দপ্‌ ক'রে জলে ওঠে,

মধুসূদনও তেমনি কবিজীবনের শেষ লগ্নে হৃদয়ের সমস্ত রস নিঙ্‌ড়ে এই কবিতা কয়টি উপহার দিয়েছেন। মন্থন-ক্লান্ত সমুদ্রের অন্তর আলোড়িত ক'রেও এই কয়টি ক্ষুদ্র মুক্তা ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া গেল না।

॥ অন্যান্য কবিতা ॥

মধুসূদন দত্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আরও কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। এর মধ্যে অধিকাংশই করমায়েসী রচনা। 'আত্মবিলাপ', 'বঙ্গভূমির প্রতি' প্রভৃতি কবিতা এগুলির মধ্যে প্রধান।

মধুসূদনের নাটক ঃ

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও মধুসূদনের অবদান কম নয়। মধুসূদন হ'লেন বাংলা নাটকের প্রথম শক্তিশালী নাট্যকার। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনায় মধুসূদন ব'লেছেন,—

"অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে, বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

বাংলা নাটকের দুরবস্থা ও যাত্রাগানের আদিরসের কদর্যতা দেখে মধুসূদন বাংলা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের মঞ্চ-সাফল্য দেখেও মধুসূদন নাট্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন। নাট্য-রচনায় মধুসূদন গ্রীক নাট্যাদর্শ ও ট্রাজেডির অনুকরণ করেন। তাঁর বিভিন্ন নাটক সম্বন্ধে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ শর্মিষ্ঠা ॥

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক নাটক। এর আগের নাটকগুলির *Plot* সুপরিকল্পিত ছিল না,—কতকগুলি দৃশ্যকে অসংলগ্নভাবে উপস্থাপিত করা হ'ত। বাংলা নাটকের আদর্শ খুঁজতে গিয়ে মধুসূদন কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। মহাভারতের আদিপর্ব থেকে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের কাহিনী গ্রহণ করা হ'য়েছিল, কিন্তু এর উপর কালিদাসের নাটকের প্রভাব আছে। যযাতি-শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর কাহিনী নিয়ে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচিত। তবে ঘটনা-সংস্থানের ক্ষেত্রে মধুসূদন মহাভারতের কাহিনীকে অনেকখানি পরিবর্তিত ক'রেছেন। 'শর্মিষ্ঠা' নাটক প্রায় গোটাটাই গদ্যে লেখা, কয়েকটি গানও আছে। বিদূষকের চরিত্রে সংস্কৃত নাটকে প্রভাব আছে। নাটকে *Plot*-এর গতি শ্লথ। সমস্ত ঘটনাকে মঞ্চে উপস্থাপিত না ক'রে সংলাপের মধ্য দিয়ে বলা হ'য়েছে। 'শর্মিষ্ঠা' নাটক মঞ্চ-সাফল্য অর্জন ক'রেছিল।

॥ পদ্মাবতী ॥

'পদ্মাবতী' নাটকের পরিকল্পনা হ'য়েছে গ্রীক পুরাণের একটি আখ্যায়িকা

অবলম্বনে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটক প্রকাশিত হয়। নাটকটি পুরোপুরি গল্পসর্বস্ব। নাটকের ভাষা প্রধানত গদ্য, মাঝে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার আছে। চরিত্র-চিত্রণে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নেই। নাটকের উপর সংস্কৃত নাটকের প্রভাব আছে। বিদূষক চরিত্র, স্বপ্নের দৃশ্য, চিত্র-দর্শন প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের প্রভাবের ফলশ্রুতি। ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীকে নিয়ে রতি, শচী ও মুরজার দ্বন্দ্ব ও তার মাঝে নায়ক-নায়িকার রোমান্টিক প্রণয় নাটকের কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত ক'রেছে। কাহিনীতে রূপকথার প্রভাব আছে, নাটকে কয়েকটি গানও আছে।

॥ কৃষ্ণকুমারী নাটক ॥

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র একমাসে (৬।৮।৬০ থেকে ৭।৯।৬০) লেখা; মধুসূদনের পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলির মধ্যে এটিই সর্বোৎকৃষ্ট, সমকালীন নাটকগুলির মধ্যেও উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস অবলম্বনে লেখা এটিই বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম নাটক। রাজস্থানের ইতিহাসকে কেন্দ্র ক'রে নাটকটির ঘটনা বিন্যাস করা হ'য়েছে, *Plot* নাটকের উপযোগী ক'রে বিন্যাস করা হ'য়েছে। দ্রুতগতি এই নাটকে পরিণতিও স্বাভাবিক। ঘটনাবিন্যাসে অসংলগ্নতা নেই, রোমান্সের প্রাধান্যও নেই। গ্রীক ট্রাজেডির আদর্শে লিখিত 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলায় প্রথম ট্রাজেডি। নাটকে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব আছে। গদ্যে লেখা 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কয়েকটি গান আছে। নিয়তি ঘটনাস্রোত নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেছে। ভীমসিংহ সার্থক চরিত্র, নায়িকা কৃষ্ণকুমারী ব্যর্থ চরিত্রসৃষ্টি। নাটকে অপ্রধান চরিত্রগুলি স্বাভাবিক। নাট্যকারের স্বদেশপ্রেম নাটকটিতে প্রতিফলিত হ'য়েছে। স্বগতোক্তি ও অশরীরী পদ্মিনীর আবির্ভাব নাট্যরসকে তরল ক'রেছে। সব মিলিয়ে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' মধুসূদনের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

॥ মায়াকানন ॥

সাহিত্য-রচনার শেষ পর্যায়ে যখন মধুসূদনের 'মায়াকানন' লেখা শেষ হয়, তখন লেখকের প্রতিভা প্রায় নিঃশেষ হ'য়ে এসেছে, জীবনদীপও প্রায় নিভে এসেছে। দীর্ঘকাল বিরত থাকার পর কতকটা বাধ্য হ'য়েই মধুসূদন 'মায়াকানন' রচনা করেন। নাটকটি সংশোধনের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু লেখকের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। তা সত্ত্বেও 'মায়াকানন' নাটককে যতখানি অবহেলা করা হয়, নাটকটি ততখানি নিকৃষ্ট রচনা নয়। নাট্যকারের জীবনের আত্মগ্লানি নাটকটিতে প্রকাশিত হ'য়েছে। 'মায়াকানন' বিয়োগান্ত রচনা। নায়িকা ইন্দুমতী মধুসূদনের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ নায়িকা। নায়ক অজয়ের মধ্যে লেখকের মর্মবেদনা প্রকাশিত।

॥ 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ॥

'শর্মিষ্ঠা' নাটক লিখবার ঠিক পরেই মধুসূদন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দু'খানি সার্থক প্রহসন রচনা করেন। এই দু'টি প্রহসন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে মধুসূদন ইংরেজী শিক্ষিত নব্য যুবক সম্প্রদায়ের অনাচার

ও উচ্ছৃঙ্খলতা তুলে ধ'রেছেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে মধুসূদন ধর্মপ্রবণ ধনী সম্প্রদায়ের গোপন লাম্পট্য তুলে ধ'রেছেন। বাংলা প্রহসন হিসেবে এই দু'টি মধুসূদনের সার্থক রচনা। প্রহসন দু'টির ভাষা কথ্য,—সহজ ও সরল। সাহিত্যের বিচারেও এ দু'টি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

কাব্য, নাটক ছাড়াও মধুসূদন শেষ বয়সে 'হেক্টর-বধ' নামে গদ্যে একটি রচনা সম্পূর্ণ ক'রেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যগুণের বিচারে তা রসোত্তীর্ণ হ'তে পারে নি। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। তিনি বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন করেন। বাংলা নাটকে তিনি জোয়ার আনেন। বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের তিনিই প্রথম স্রষ্টা, বাংলা নাটকে ট্রাজেডিরও তিনি প্রথম প্রবক্তা। প্রহসন-রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর নাটকে ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র-সৃষ্টি খুবই উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ-কাব্য' এ যুগের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। পাণ্ডিত্য, ওজস্বিতা, জীবনচেতনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে 'মেঘনাদবধ-কাব্য' সার্থক সৃষ্টি। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা'ও সার্থক সৃষ্টি। বাংলা কাব্যে সনেটের প্রবর্তনেও মধুসূদনের অবদান অনস্বীকার্য। যে কয়জন লেখক তাঁদের অমর লেখনী চালনায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রেছেন, মধুসূদন নিশ্চয়ই তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর কাব্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁর চিন্তাভাবনা সার্থকভাবে প্রতিফলিত হ'য়েছে।

মধুসূদনের সাহিত্যের মূল্যায়ন

অনুশীলনী

১। মহাকাব্য রচয়িতারূপে মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৭)

২। বাংলা কাব্যে মধুসূদনের দান সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৯)

৩। নিম্নের বিষয় সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন—

(ক) মহাকাব্য রচয়িতা শ্রীমধুসূদন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৭১)

(খ) নাটক রচনায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৩)

(গ) মহাকবি মধুসূদন। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৫)

(ঘ) বাংলা মহাকাব্যে মধুসূদন। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৮)

৪। মাইকেল মধুসূদনের প্রভাব পরবর্তী কোন্ কোন্ কবির উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছে, উদাহরণ সহ আলোচনা করুন। (উত্তরবঙ্গ বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৮)

৫। বাংলা কাব্যে মধুসূদনের দান সম্পর্কে আলোচনা করুন। (উত্তরবঙ্গ বিশ্ব., বি. টি. ১৯৭০)

৬। বাংলা নাটকের বিকাশে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান সম্পর্কে একটি ছোট প্রবন্ধ রচনা করুন। (P. G., B. T. 1975)

———

দশম অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূচনা হয়। তারপর থেকেই ধাপে ধাপে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধি। উইলিয়াম কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রভৃতির প্রচেষ্টায় গদ্য-সাহিত্যের যে সূচনা হ'য়েছিল, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের অবদানে তা সমৃদ্ধ হয়। বাংলাদেশে সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে তখন নবজাগরণের (রেনেসাঁ) জোয়ার। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শে এদেশে তখন রেনেসাঁ'র পর্যায়। বাংলা সাহিত্যও তখন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের স্পর্শে সমৃদ্ধিশালী হয়। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অপূর্ব প্রতিভা ও কালজয়ী লেখনী নিয়ে আবির্ভূত হন। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে তিনিই আনেন মহা যৌবনের প্রবল প্লাবন। তার আগেই বাংলা উপন্যাসের সূত্রপাত হ'য়েছিল, কিন্তু তখনও তা সর্বতোভাবে অপরিণত অবস্থায় ছিল। কথাশিল্পের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি বঙ্কিমচন্দ্রের জলসিঞ্চনে পত্রপুষ্পশোভিত বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হয়। পর পর কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস লিখে তিনি বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন এবং সাহিত্যের এই শাখাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র হ'লেন বাংলা গদ্যের সার্থক শিল্পী।

বাংলা গদ্য সাহিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্র

প্রাক্-বঙ্কিম-যুগের সাহিত্য আলোচনা ক'রলে আমরা বুঝতে পারবো, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে কিভাবে বাল্যকাল থেকে একেবারে যৌবনে উন্নীত ক'রেছেন। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব তাই একটি বিস্ময়কর ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন,—"কোথায় গেল সেই 'গোলেবকাওলে' বিজয়বসন্ত, সেই বালক-ভুলানো ছড়া ; কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আনন্দ, এত সঙ্গীত! বঙ্গভাষা যেন প্রথম বর্ষার মেঘ-সমাগমের মত 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনির', এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব বাহিনী এবং পশ্চিম বাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবন-বেগে চলিতে লাগিল।" রবীন্দ্রনাথ প্রাক্ বঙ্কিম-যুগের সাহিত্যের আসরে বঙ্কিমের আবির্ভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে ব'লেছেন, -- "পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম। এই দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া এক মুহূর্তে তাহা বুঝিতে পারিলাম।" বঙ্গসাহিত্যের এই সব্যসাচী সাহিত্যকে একদিক্ থেকে আবর্জনা মুক্ত ক'রেছেন এবং অন্য দিক্ থেকে নতুন রচনায় সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছেন। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব তাই একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব

বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন, তখন বাংলা সাহিত্যে কবি ঈশ্বর গুপ্ত একটি বিশেষ আসনের অধিকারী ছিলেন। তখন অনেকেই গুপ্তকবির শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে সাহিত্য ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ক'রেছিলেন। তাঁর কাব্যেই রেনেসাঁর বস্তুনিষ্ঠতা প্রথম দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রও ঈশ্বর গুপ্তের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ হল,—'ললিতা ও মানস'। এই কাব্যে গুপ্তকবির প্রভাব দেখা যায়। তবে কাব্য হিসেবে এটি বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক সৃষ্টি নয়।

ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা একদিকে বিদ্যাসাগরী সংস্কৃত-ঘেঁষা পণ্ডিতী ভাষা এবং অন্যদিকে গ্রাম্য শব্দ-কণ্টকিত 'আলালী' ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চলে আসছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার সরলতা সম্পাদনা করেন। তাঁর পূর্বে সংস্কৃতানুসারী পণ্ডিতেরা মনে ক'রতেন যে, কঠিন শব্দ ব্যবহারের দ্বারা ভাষা ও রচনার মূল্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তার ফলে তাঁদের রচনা সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য হ'য়ে থাকত। বঙ্কিমচন্দ্র ব'ললেন,—সাহিত্য সকলের জন্য; যে সাহিত্য সকলেই বুঝতে পারে সেই সাহিত্যই শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাসাগরী ও আলালী ভাষার পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্যতা পরিহার ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র সহজ, সরল, স্বাভাবিক ও সাবলীল ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি ক'রলেন।

ভাষার সরলতা সম্পাদন

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগপরিবেশ তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত ক'রছে। তাই বঙ্কিম-সাহিত্যকে জানতে হ'লে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ-পরিবেশকে জানা প্রয়োজন। তখন বাঙালীর চিন্তা ও কর্মের জগতে এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হ'য়েছে। ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হওয়ার পর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে বাঙালী সমাজ যুক্তির আলোকে ঘটনা দেখতে শিখেছে। আচার-অনুষ্ঠানের সংকীর্ণতার বাইরে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বাঙালী আপনাকে প্রকাশিত করবার প্রয়াস পেয়েছে। তখন অন্ধ লোকাচার মূঢ় ভারতবাসীকে গ্রাস করে রেখেছিল। সেই যুগে এসে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সংস্কার-মুক্তির আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছেন। আত্মবিস্মৃত জাতিকে তিনি শুনিয়েছেন জাগৃতির বাণী। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকীয় চিন্তাধারার বিপ্লবে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা জনজাগরণের আহ্বান এনেছে। ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে আমরা যখন বাইরের বৃহত্তর জগতের কথা ভু'লে ছিলাম, জাতীয় জীবনের সেই দুর্দিনে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের কাছে বৃহত্তর পৃথিবীর আহ্বান এনে দিয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা আমাদের দেশে আধুনিক যুগের সূচনা ক'রেছে এবং সেই আধুনিক যুগের পুরোভাগে আমরা দেখতে পাই উনিশ শতাব্দীর রেনেসাঁর পুরোহিত বঙ্কিমচন্দ্রকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের জাতীয় জীবন ও সমাজচেতনা সার্থকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত হ'য়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগপরিবেশ

বঙ্কিমচন্দ্র হ'লেন বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক শিল্পী। উপন্যাস রচনায় তিনি বাংলা সাহিত্যকে নতুন পথের সন্ধান দেন। স্কটের মত তিনিও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হ'য়েও তিনি একথা বিস্মৃত হন নি যে,—তাঁর লক্ষ্য ইতিহাস বর্ণনা নয়, উপন্যাস রচনা। তাই ইতিহাসের দাবিকে মানতে গিয়ে তিনি উপন্যাসের দাবিকে অস্বীকার করেন নি। তিনি ইতিহাসের পটভূমিকায় তাঁর উপন্যাসকে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। ইতিহাস ও উপন্যাসের দুই বিপরীত মেরু তিনি মিলিয়ে দিতে পেরেছেন কাহিনীর অপূর্ব গ্রন্থনায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের মৃত চরিত্রে প্রাণসঞ্চার ক'রেছেন। ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীর সাজ-সজ্জা খুলে তিনি তাদের মানবীয় সত্তাকে প্রকাশ ক'রেছেন। ঘটনার ঘনঘটায় চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে তিনি আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেন নি। ইতিহাসের ঘটনাসংকুল আবর্তের মধ্যেও চরিত্রগুলি আপন বিশিষ্টতা বজায় রেখেছে এবং তাদের ব্যক্তি-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনায় কখনও-বা বিহ্বল হ'য়ে পড়েছে,—আবার কখনও-বা বেদনাদীর্ণ হৃদয়ের হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব, ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে তিনি উপন্যাসের কল্পনা ও রোমান্টিক কাহিনীকে অপূর্বভাবে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন। তাই উপন্যাসের সার্থক রূপকল্প, রচনারীতি ও শিল্পসৌন্দর্য তাঁর লেখার মধ্যে প্রতিভাত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস

সামাজিক জটিলতা বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে সার্থকভাবেই ধরা পড়েছে। তাঁর সামাজিক উপন্যাসে সমাজই সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভাঙ্গনের মুখে এসে যখন সমাজ ও সামাজিক নীতির মূল্যবোধ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়েছে, তখন সামাজিক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে মনে হ'য়েছে সমাজকে সর্বতোভাবে রক্ষা করাই লেখক হিসেবে তাঁর একমাত্র কর্তব্য। তাই সমাজের অনুশাসনকে তিনি অভ্রান্ত ব'লে মনে ক'রেছিলেন। সমালোচকের ভাষায়, উপন্যাস রচনায় "ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের হাত হইতে সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিম লেখনী কাড়িয়া লইয়াছিলেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সমাজের দাবি, নীতির দাবিই বড় হ'য়ে উঠেছে। তাই নীতির দাবি রক্ষা ক'রতে গিয়ে তিনি শিল্পের দাবিকে অনেক ক্ষেত্রেই অস্বীকার ক'রেছেন। মানুষের হৃদয় যে নীতির শাসন মেনে চলে না হৃদয়েরও যে একটা দাবি আছে, বঙ্কিমচন্দ্র সেকথা স্বীকার ক'রতে চান নি। সমাজকে, সামাজিক মূল্যবোধকে বঙ্কিমচন্দ্র ভাঙ্গনের হাত'থেকে রক্ষা ক'রতে চেয়েছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে, বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনে, সতীদাহপ্রথা-নিবারণে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রসারে নারী-পুরুষের সমাজ-জীবনে যখন জটিলতা ঘনীভূত হ'য়েছে, সেই যুগ-পরিবেশেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সামাজিক উপন্যাস রচনা ক'রেছেন। রোহিণী ও কুন্দনন্দিনী বিধবা হ'য়েও মানবিক প্রেম-ভালবাসার দ্বন্দ্বে মুখর হ'য়েছে। কিন্তু সামাজিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস

উপন্যাসে সমাজনীতির যূপকাষ্ঠে রোহিণী ও কুন্দনন্দিনীকে হত্যা ক'রেছে। সমাজচেতনা ও নীতির শাসনই তখন লেখককে প্রভাবান্বিত ক'রেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রোমান্স রস

বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসই রোমান্স-প্রধান। রোমান্সই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সবচেয়ে প্রধান গুণ,—নরনারীর প্রেম ও প্রণয়ের দ্বন্দ্বই তাঁর উপন্যাসের অবলম্বন। নায়ক নায়িকার নির্দ্বন্দ্ব প্রেমে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী উপন্যাসের রোমান্স বিশুদ্ধ ও রসপ্রধান। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ও চন্দ্রশেখর প্রভৃতি উপন্যাসে নীতিপ্রধান গার্হস্থ্য রোমান্স বেশ জমে উঠেছে। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাসে দেশপ্রেম ও জনকল্যাণের পটভূমিকায় অধ্যাত্ম-রোমান্স শিল্পশ্রী মণ্ডিত হয়েছে। রোমান্স রস তাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-রচনা

গদ্য-রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে গদ্য-রচনা বলিষ্ঠরূপ লাভ ক'রেছে। উপন্যাস ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের আরও কয়েকটি সার্থক গদ্য-রচনা আছে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক রস-রচনা। প্রবন্ধ-সাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। বিবিধ প্রবন্ধে তিনি সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাস, প্রকৃতিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ক'রেছেন। 'লোকরহস্য' বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম-দর্শন সুন্দরভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে। সার্থক প্রবন্ধ রচনাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-রচনাগুলিকে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে,—

॥ Rajmohan's Wife ॥

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম একটি ইংরেজী উপন্যাস উপহার দেন। সেটি হ'ল *Rajmohan's Wife* (১৮৬২)। কিন্তু মধুসূদনের *The Captive Ladie* ও *Visions of the Past*-এর মত বঙ্কিমের এই রচনাও আজ বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত। এরপর মাতৃভাষাতে সাহিত্য-সৃষ্টি ক'রতে বঙ্কিমচন্দ্র উৎসাহী হলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রথম বাঙালী গ্রাজুয়েট। তখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বাংলাভাষাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। খ্যাতির লোভে তখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই ইংরেজী সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। কিন্তু সেই পথ পরিত্যাগ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই বাংলাভাষায় সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন।

॥ দুর্গেশনন্দিনী ॥

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) সর্বপ্রথম ঔপন্যাসিকত্বের দাবি ক'রতে পারে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাব উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনীটি ইতিহাসের আধারে রক্ষিত। ইতিহাসের মধ্য দিয়েই তিনি রোমান্স সৃষ্টি ক'রেছেন। ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। স্কটের 'আইভ্যান হো' উপন্যাসটির ছায়া 'দুর্গেশনন্দিনী'তে প'ড়েছে বলে অনেকে মনে করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই অভিযোগ অস্বীকার ক'রেছেন। এই

উপন্যাসের মধ্যেই বঙ্কিম-প্রতিভার প্রথম প্রকাশ ঘটে। এই উপন্যাসের মধ্যেই বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের সার্থক গুণ প্রথম সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। দুর্গেশনন্দিনী-তেই বাঙালী পাঠক রোমান্সের আস্বাদ প্রথম লাভ করেছে। গড় মান্দারনের পথিক যে পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে দুর্যোগের মধ্য দিয়ে অশ্বারোহণে এল, সেই পথ দিয়ে বাংলা সাহিত্যে রোমান্স প্রবেশ ক'রেছে। নানা কারণে 'দুর্গেশ-নন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক ও গুরুত্বপূর্ণ রচনা।

॥ কপালকুণ্ডলা ॥

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের এক অপূর্ব সৃষ্টি। রোমান্সের ছায়াচ্ছন্ন অস্পষ্ট কুহেলী-ঘেরা পথ দিয়ে চলতে শুরু ক'রে অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের রাজপথে এসে উপনীত হলেন। কাহিনীর অনেকটা অংশকে রোমান্স আচ্ছন্ন ক'রে রাখলেও ঔপন্যাসিকত্ব বিনষ্ট হয়নি। সমুদ্রতীরে নির্জন প্রকৃতির কোলে প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলা রোমান্স-জগতের চরিত্র। তার সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়েদের সাদৃশ্য অতি অল্প। সেই নির্জন সমুদ্রসৈকত-চারিণী, অরণ্য-নিবাসিনী কপালকুণ্ডলার সঙ্গে সপ্তগ্রাম-নিবাসী নবকুমারের প্রণয় এবং বিবাহের কাহিনীই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কিন্তু কপালকুণ্ডলার জীবনে আরণ্য প্রকৃতিই বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। সংসারের বন্ধন তাকে দৃঢ় ক'রে বাঁধতে পারে নি। অকূল সমুদ্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাই সে আপন জীবনের শোচনীয় অবসান ঘটাল। সংসারের সকল বিরোধের মীমাংসার জন্য এই পথই সে বেছে নিয়েছে। পারিপার্শ্বিক সম্পর্কের বন্ধন তাকে আবদ্ধ করতে পারে নি,—সে বন্ধন শিথিল হ'য়ে খুলে পড়েছে। সংসারে অনুপ্রবেশের পর কোন এক অজ্ঞাত বাধা তাকে বারংবার আঘাত ক'রেছে। বন-কুসুমের সৌন্দর্য সংসারের উষ্ণ পরিবেশে ম্লান হয়ে পড়েছে। হিংসা ও সন্দেহের প্রখর কিরণ তার সরস সৌন্দর্যকে মলিন ক'রে তুলেছে। চরিত্রচিত্রণ, ঘটনা-সংস্থান, পরিণতি প্রভৃতি সবদিক থেকেই এই উপন্যাসে বঙ্কিম-প্রতিভার সার্থক বিকাশ ঘটেছে। অনেকে 'কপালকুণ্ডলা'কেই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে অভিহিত ক'রেছেন। রোমন্সের প্রখর প্রভাবে 'কপালকুণ্ডলা' সত্যই বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক সৃষ্টি।

॥ মৃণালিনী ॥

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' রচিত হয়। পূর্ববর্তী দু'খানি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে লোকোত্তর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, 'মৃণালিনী'তে তার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে কাহিনী অত্যন্ত শ্লথ, চরিত্রগুলিও যথাযথভাবে বিকশিত হয় নি। অনিবার্য ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই উপন্যাস সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের কাহিনীতে আমরা অদৃষ্টের সেই অদৃশ্য সংকেত বা ঘটনার প্রলয়ংকর বিপর্যয়ের কোনও সন্ধান পাই না। মুসলমানদের দ্বারা বঙ্গ-বিজয়ের কাহিনীর ঐতিহাসিক

পটভূমিকায় উপন্যাসটির ঘটনা সংস্থাপিত করা হয়েছে। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী অনেকটা দুর্বল। ইতিহাসের পটভূমি বা রোমান্সের দীপ্তি উপন্যাসের কাহিনীকে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারে নি। 'মৃণালিনী' তাই বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্বল সৃষ্টি।

॥ ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী ॥

এই তিনখানি রচনা ঠিক উপন্যাস পর্যায়ে পড়ে না। এগুলি বড় গল্প। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ইন্দিরা' প্রথম বড় গল্প ছিল। পরে পঞ্চম সংস্করণে একে পরিবর্ধিত করা হয়। 'ইন্দিরা'র পরিবর্ধিত সংস্করণে শিল্পের উন্নতি নেই। কাহিনীর জটিলতা 'ইন্দিরা'র ঘটনাস্রোতকে গতিহীন করেছে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'যুগলাঙ্গুরীয়' বর্ণনা-সর্বস্ব এ্যাডভেঞ্চার জাতীয় বড় গল্প। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'রাধারাণী'ও বড় গল্প, সাধারণ প্রেমের গল্প,– রচনায় কোন বিশেষত্ব নেই। গল্প-রসই এই তিনটি রচনার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

॥ চন্দ্রশেখর ॥

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাহিনীর পরিণতিতে ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় না। ইতিহাসকে উপন্যাস-রচনার পটভূমি হিসেবে গ্রহণ ক'রলেও ইতিহাসের কাঠামোর উপর একটি সামাজিক কাহিনী গড়ে উঠেছে বলে মনে হয়। ইতিহাকে যেন জোর করে টেনে আনা হয়েছে। প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রেম ও তার পরিণতিকে বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ইতিহাসের আধারে বিবৃত করেছেন। রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী হিসাবে প্রতাপ-শৈবলিনীর কাহিনী পাঠকচিত্তে গভীর রেখাপাত করে। ইতিহাসের সঙ্গে কাহিনীর সংযোগহীনতায় রোমান্সের পথ প্রশস্ত হয়েছে। প্রতাপ, শৈবালিনী ও চন্দ্রশেখরের চরিত্র-সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতাপের চরিত্রই এই উপন্যাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রতাপ-শৈবালিনীর বাল্য-প্রণয়নই উপন্যাসের মূল কেন্দ্র। কিন্তু পরবর্তীকালে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবালিনীর বিবাহ হয়। চন্দ্রশেখরেরজীবনে শৈবালিনীর জন্য অপেক্ষা ছিল না। সে ছিল শান্ত, বিবেচক, ধীর, স্থির, পণ্ডিত; কিন্তু শৈবালিনী ছিল চঞ্চলা। সদা-অন্যমনস্ক চন্দ্রশেখরের পক্ষে শৈবালিনীর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার মত অবকাশ ছিল না। এই পথেই শৈবালিনীর মনে পূর্ব প্রণয়ীর স্মৃতিমধুর চিত্র ভেসে উঠে। অবশেষে দেহ ও মনের চূড়ান্ত পীড়নের মধ্য দিয়ে শৈবালিনী আবার চন্দ্র-শেখরের কাছে ফিরে আসে। প্রতাপের ত্যাগ ও চরিত্রবল প্রদর্শন করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধকেইপ্রতিষ্ঠিতকরেছেন। দেহ ও মনের পীড়নের মধ্য দিয়ে পরপুরুষের প্রতি আসক্ত শৈবালিনীর প্রায়শ্চিত্ত-সংঘটনের পিছনেও সমাজসংকারক বঙ্কিমচন্দ্র কাজ করেছেন। উপন্যাসে দলনী বেগমের উপকাহিনীর প্রাসঙ্গিকতায় ও ঘটনা-বিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকুশলতার স্বাক্ষর বহন করে। প্রেমের ত্রিভুজ দ্বন্দ্বে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' এক মহৎ সৃষ্টি।

॥ রাজসিংহ ॥

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রাজসিংহ' বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। বহুবিস্তৃত ঐতিহাসিক ঘটনাস্রোতের উপর উপন্যাসের মূল কাহিনীটি বিন্যস্ত হয়েছে। ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রের ভিড়ে উপন্যাসের মূল সুরটি কোথাও হারিয়ে যায় নি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'রাজসিংহ উপন্যাসে ঐতিহাসিক অংশেরই প্রাধান্য বেশী। ইতিহাস এখানে পারিবারিক জীবনের সঙ্গে নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসে ইতিহাস কেবলমাত্র একটা সুদূর দিগন্ত-রেখার ন্যায় পারিবারিক জীবনকে বেষ্টন করেছে ; উপন্যাসের স্বাধীনতার গৌরবকে বিশেষ ক্ষুণ্ণ করে নি। রাজসিংহে ইতিহাস তার উদাসীন দূরত্ব ত্যাগ ক'রে একেবারে অতি সন্নিহিত হয়ে পড়েছে ও পারিবারিক জীবনকে প্রায় আলিঙ্গন করেছে,—ইতিহাসের নাগপাশ বন্ধনের মধ্যে মানব হৃদয়ের সর্বাপেক্ষা স্বাধীন স্ফুরণ হয়েছে 'মবারক ও জেবউন্নিসার প্রণয়কাহিনী'তে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের বন্ধন কাটিয়ে উঠে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন ; মবারক রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে ঘূর্ণিত হয়েছে সত্য, কিন্তু সে এখনও ইতিহাসের প্রবাহে আপনাকে নিশ্চেষ্ট ও নির্জীব্য করে ভাসিয়ে দেয় নি ;—তার স্বাধীন মনোবৃত্তিই তার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, নির্মলকুমারীও একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র-সৃষ্টি। নায়িকা চঞ্চলকুমারীর চরিত্র যথাযথ বিকশিত হয় নি। জেবউন্নিসার মধ্যে বাদশাহজাদীর আবরণ ভেদ ক'রে বেরিয়ে এসেছে এক বিরহ-ব্যথাবিদীর্ণ নারীহৃদয়। তার সকল অহংকার সেই নারীহৃদয়ের কাছে বারে বারে পরাজয় স্বীকার করেছে। সব মিলিয়ে 'রাজসিংহ' তাই বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উন্নত সৃষ্টি।

॥ আনন্দমঠ ॥

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমের দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক উপন্যাস 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয়। উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহকে কেন্দ্র ক'রে এই উপন্যাসটি রচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ ও ধর্মবোধের মিলন ঘটেছে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে। জাতিকে তিনি 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। উপন্যাসের সন্তানদের মধ্যে স্বাদেশিক বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সত্যানন্দ, জীবানন্দ, হীরানন্দ প্রভৃতি চরিত্রগুলি জীবন্ত হ'লেও ঘটনার মধ্যে বাস্তবতবোধের অভাব আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে আদর্শলোকে প্রবেশ করেছেন। ভবানন্দ ও শান্তি চরিত্রে মানবতাবোধের পরিচয় আছে। 'আনন্দমঠে'র মধ্যে অনেক অসংগতি ও আতিশয্য আছে সত্য, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের পটভূমিকায় উপন্যাসটিকে বিচার করলে আমাদের কাছে তা অবান্তর মনে হবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' যে আমাদের স্বদেশ-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, একথা অনস্বীকার্য। 'আনন্দমঠ' বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস।

॥ দেবী চৌধুরাণী ॥

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদ আরও সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নানাপ্রকার ঘটনার মধ্য দিয়ে একটি অতি সাধারণ কিশোরী কিভাবে দেশবিখ্যাত দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হ'ল,—এই উপন্যাসে সে কথাই বিবৃত হয়েছে। কাহিনীতে রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ ঘটলেও বাস্তবতার অভাব খুব বেশী করে লক্ষ্য করা যায়। পারিবারিক অংশের বর্ণনায় বাস্তবতা রক্ষিত হয়েছে।

॥ সীতারাম ॥

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অরাজক রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ উপন্যাসটির মূলকেন্দ্র। সীতারাম বলিষ্ঠ চরিত্র,– দোষে-গুণে মিশ্রিত মানুষ। শ্রী ও জয়ন্তী চরিত্র অবাস্তব। লেখকের অবহেলার সুষ্ঠু পরিচয় 'সীতারাম' উপন্যাসে পাওয়া যায়। 'সীতারাম' তাই বঙ্কিম-প্রতিভার সার্থক পরিচয় বহন করে না।

॥ বিষবৃক্ষ ॥

'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'র পর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্থ উপন্যাস। 'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক সামাজিক উপন্যাস। সমসাময়িক কালের সমাজ-জীবনের এত বিশ্বস্ত ও জীবন্ত চিত্র,– মানুষের অন্তরের নিরাবরণ আলেখ্য এত সুনিপুণভাবে এর পূর্বে কোন উপন্যাসে প্রকাশিত হয় নি। নগেন্দ্রনাথ পত্নী সূর্যমুখীর প্রেমে পরিতৃপ্ত থেকেও কুন্দনন্দিনীর প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারেন নি। কুন্দনন্দিনীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু এই বিবাহিত জীবনের ক্লেশ ও গুরুভার বহন করতে না পেরে কুন্দনন্দিনী বিষপানে আত্মহত্যা করে। কাহিনীর শেষে সূর্যমুখী এবং নগেন্দ্রনাথের মিলনকে দাম্পত্যজীবনে এক কালরাত্রির অবসানে নতুন প্রভাতের সূচনারূপে দেখানোর জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চেষ্টা করেছেন। ঘরে ঘরে এই বিষবৃক্ষ যে কি বিষময় ফল প্রসব করতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক ক'রে দেওয়ার জন্যই লেখক যেন পাঠকসমাজকে উপদেশ দিয়েছেন। হীরামালিনীর উপকাহিনী সার্থকতা-মণ্ডিত হয়েছে, তবে উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবোধ, আদর্শ ও সামাজিকতা প্রকট হয়েছে; সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্র যেন এখানে স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন। 'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের বহুপঠিত ও বহু-আলোচিত জনপ্রিয় উপন্যাস।

॥ কৃষ্ণকান্তের উইল ॥

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। রূপজ মোহ যে কিভাবে একটি পরিবারকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে আকর্ষণ করতে পারে, তারই বর্ণনা পাই

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে। উপন্যাসটির চতুর্থ সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীর আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-সংরক্ষণশীলদের পত্রিকা-প্রচার ও নবজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলে বঙ্কিমমানসের বিবর্তন এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। সচ্চরিত্র ও পত্নীপ্রেমে পরিতৃপ্ত গোবিন্দলাল মানবিক দুর্বলতাবশতঃই রোহিণীর প্রতি করুণা অনুভব করে। কিন্তু এই করুণার রন্ধ্র-পথেই সর্বনাশের বীজ উপ্ত হয়। তাই ব্যাপিকা ও মোহিনী রোহিণীর আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে না পেরে গোবিন্দলাল তার প্রতি আসক্ত হন। অবশেষে রোহিণীকে হত্যা ক'রে তিনি ভ্রমরের মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হন। এখানেও ঈশ্বরে মনোনিবেশের মাধ্যমে গোবিন্দলালের আত্মিক উন্নতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র তার দুষ্কৃতি থেকে মুক্তিলাভের পথ করে দিয়েছেন। কিন্তু সামাজিক আদর্শ এবং নীতির মূল্যবোধের প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পসত্তাকে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ করেছে। রোহিণীর হত্যা-কাহিনীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে দেখা দেয় নি। 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর মধ্য দিয়েও তার সতীত্বের মহিমাকেই বিজয়িনী ক'রে তোলবার চেষ্টাকৃত প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাই এখানে সমাজের নীতির দাবিকে রক্ষা ক'রতে গিয়ে লেখক বাস্তব জীবনের দাবিকে অস্বীকার করেছেন এবং শিল্পের দাবিকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

॥ রজনী ॥

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাস হিসেবে সার্থকতা অর্জন ক'রলেও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। শচীশ ও রজনীর রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী। প্রণয়মধুর অথচ বেদনাবিধুর একটা মৃদু স্বর সর্বদাই কাহিনীতে ঝংকৃত হয়েছে। রজনী-চরিত্রের মধ্যে লিটনের রচিত ***"The last day of Pompaeie"*** কাহিনীর লিডিয়া ফুলওয়ালীর চরিত্রের ছায়াপাত ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। 'রজনী' বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম বিশিষ্ট সৃষ্টি।

॥ কমলাকান্তের দপ্তর ॥

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রকাশিত হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর' এক অভিনব স্বাদের গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইংরেজীতে যাকে *Personal essay* বা রম্যরচনা বলা হয় 'কমলাকান্তের দপ্তর' সেইজাতীয় রচনা। গ্রন্থখানিতে ***'Confessions of an English Opium Eater'*** এবং ***'Pickwicks Papers'***-এর বিষয়গত ও আংগিকগত সাদৃশ্য আছে। লেখকের ব্যক্তিত্বময় চিন্তাধারা, ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা, তীব্র ব্যঙ্গ, বিদগ্ধ মননশীলতা, শিল্প-নৈপুণ্য, বর্ণনার বৈচিত্র্য, বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিবিন্যাস প্রভৃতি প্রশংসার দাবি রাখে। বক্তব্যের উপস্থাপন কৌশল ও পরিবেশন-নৈপুণ্যে 'কমলাকান্তের দপ্তর' এক সার্থক সাহিত্যসৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

॥ **মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত** ॥

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যঙ্গ গল্পটি প্রকাশিত হয়। তবে এই গ্রন্থের মধ্যে বঙ্কিম-প্রতিভার বিশিষ্টতার স্বাক্ষর নেই।

॥ **প্রবন্ধ** ॥

বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের **'বিজ্ঞান-রহস্য'** প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান-বিষয়ক ৯টি প্রবন্ধ আছে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের **'লোকরহস্য'** প্রকাশিত হয়। ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজে মিলের হিতবাদ ও কাঁতের মানবতাবাদ বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল। এর প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি হল ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে **'বঙ্গদেশীয় কৃষক'** ও ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত **'সাম্য'** নামক দুটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। দুইখণ্ড **'বিবিধ প্রবন্ধ'** (১৮৮[illegible] ও ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ) বঙ্কিমচন্দ্রের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রচনার সংকলন। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যঙ্গকৌতুক প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। ফলে, এই গ্রন্থে সমকালীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্যে 'বিবিধ প্রবন্ধ' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রৌঢ় বয়সে লিখিত **'কৃষ্ণচরিত্র'** (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) ও **'ধর্মতত্ত্ব'** (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মদর্শন। শিক্ষিত বাঙালী সমাজের উপযোগী করে কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে। কাঁতের মানবতাবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়ে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে কৃষ্ণচরিত্রকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক'রেছেন। ফলে কৃষ্ণচরিত্র থেকে বৃন্দাবনলীলা বাদ পড়েছে, 'ধর্মতত্ত্বে' গুরুশিষ্যের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আলোকে হিন্দুধর্মকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বঙ্কিম সাহিত্যের মূল্যায়ন

বাংলা উপন্যাসে ও প্রবন্ধ-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণত্বের দাবিদার। তাঁর উপন্যাসে মহাকাব্যসুলভ ব্যাপ্তি ও বিশালতার সন্ধান পাওয়া যায়। জীবন-সম্পর্কে গভীর দৃষ্টি, চরিত্র-চিত্রণ ও কাহিনীর গ্রন্থনানৈপুণ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হিন্দু সমাজের আদর্শকে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি অভ্রান্ত ব'লে গ্রহণ করেছেন এবং এই আদর্শকে উপন্যাসে প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়াসের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর উপন্যাসে শিল্পমূল্য হারিয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের কুশ্রী বীভৎসতাকে বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছেন মহত্তর আদর্শের আলোকে উজ্জ্বল করে তুলতে। তাই বঙ্কিম সাহিত্যে জীবনের প্রয়োজনকে হৃদয়ের দাবিকে অনেক ক্ষেত্রেই নির্মমভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। বাস্তব জীবনের নগ্নতাকে তিনি চেয়েছেন আদর্শায়িত (*Idealised*) ক'রে তুলতে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে হিন্দুধর্ম ও সনাতন সমাজ-রক্ষার যে আন্দোলন চলেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তাই সামাজিক ন্যায়নীতির প্রতি অন্ধবিশ্বাস এবং জীবন সম্পর্কিত আদর্শ তাঁর উপন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সমাসাময়িক

যুগের দাবিকে মানতে গিয়ে তিনি যদি সংরক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়ে থাকেন, তবুও বাংলা উপন্যাসের ধারায় তাঁর আসন অক্ষয় হয়ে থাকবে। পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও বিদেশী চিন্তাধারাও তাঁর উপন্যাসে কিছু কিছু প্রতিফলিত হয়েছে, সমসাময়িক সমাজ-জীবনের ছায়াচিত্রও তাঁর উপন্যাসে ধরা পড়েছে। ইতিহাসের কাহিনী, সমাজের চিত্র, রোমান্সের আতিশয্য, চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনাবিন্যাস, স্বাজাত্যবোধ, সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শ, নীতিবোধ তাঁর উপন্যাসকে বলিষ্ঠ রূপ দিয়েছে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসেও বঙ্কিমচন্দ্র এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলির মননশীলতা, যুক্তি-বিন্যাস, বিচার-বিশ্লেষণ, ভাষা-ব্যবহার ও শিল্পরীতিতে সমুন্নত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাংলা রম্যরচনার প্রথম নিদর্শন। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে,– বিশেষ ক'রে উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান তাই অনস্বীকার্য।

॥ অনুশীলনী ॥

১। আধুনিক বাংলা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে কতখানি ঋণী প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৬)

২। বাংলা গদ্যের বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের দান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (কলি. বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৮)

৩। নিম্নের বিষয় সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন—

(ক) ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭১)

(খ) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৩)

(গ) ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র (কলি. বিশ্ব, বি. এড. ১৯৭৫)

(ঘ) ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৭)

একাদশ অধ্যায়

গিরিশচন্দ্রের নাটক

নাটক হোল দৃশ্যকাব্য। একদল দর্শকের সামনে মঞ্চের মধ্যে কিছু ব্যক্তি যখন অভিনয়ের মাধ্যমে সংলাপ বিনিময় ক'রে কোন একটি কাহিনীকে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়, তখন তাকে নাটক বলে। নাটক একটি যৌথ শিল্প। চলমান জীবনে কত ঘটনাই-না ঘটে। জাতির জীবনের এই অখণ্ড ঘটনাপ্রবাহের দ্রষ্টা হলেন নাট্যকার ; তিনি জীবনের পটভূমিতে নাটক রচনা করেন।

নাটক

কুশীলব বা অভিনেতাগণ সেই নাটককে অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে জীবন্ত করে তুলেন ;—তখন দর্শক সাধারণ সেই নাটকের আস্বাদন করেন। সার্থক নাটক তখনই সৃষ্টি হয় যখন নাট্যকার, অভিনেতা ও দর্শকবৃন্দ শিল্পের স্বার্থে আপন আপন দায়িত্ব যথাযথ পালন করেন। নাটকের ক্ষেত্রে তাই যৌথ ভূমিকার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লেবেডক নামে এক রুশ পরিব্রাজক এদেশে বাংলাভাষায় প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করান। তার পূর্বে যাত্রা, কথকথা ইত্যাদির মধ্যে নাটক ভ্রূণ অবস্থায় ছিল। তারপর ধীরে ধীরে বাংলা নাটক একটি স্বতন্ত্র শিল্প-রীতি হিসেবে বিকশিত হতে লাগলো। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ শাখা হ'ল নাটক। কিন্তু কোন নাটক সাহিত্যগত দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ হলে চলবে না, সমবেত প্রযোজনায় তার মঞ্চ-সাফল্য চাই। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন নাট্যকার অনেক উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেছেন, আবার অনেক নাট্যনির্দেশক, মঞ্চ-পরিচালক, আলোক-নিয়ন্ত্রক, সংগীত-পরিচালক এবং সর্বশেষে শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সার্থক যৌথ অভিনয়ে বাংলা নাটক তার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের স্তর অতিক্রম করে আজ পরিণত অবস্থায়

বাংলা নাটক

এসেছে। বাংলা নাটকের উপর যেমন বিভিন্ন সংস্কৃত নাটকের প্রভাব এসেছে, তেমনি পাশ্চাত্ত্য রীতিও বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করেছে। মধুসূদন, দীনবন্ধু যে বাংলা নাটককে বাল্যের স্তর অতিক্রম করে কৈশোরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সেই বাংলা নাটককে যৌবনে বিস্তৃত ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটককে আরও টেনে নিয়ে গেছেন। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তাঁর সর্বতোমুখী নাট্যপ্রতিভা দিয়ে বাংলা নাটককে জনপ্রিয়তার স্বর্ণদ্বারে পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র ঘোষের বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ বাংলা নাটকে গিরিশচন্দ্রের অবদান ॥

বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশে চতুরঙ্গ প্রতিভার অধিকারী হয়ে গিরিশচন্দ্র স্বমহিমায়

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে বিশেষ পর্যায়ে তাঁর চারটি অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য –

নাট্যকার

॥ **এক** ॥ তিনি নিজে সেযুগের একজন শ্রেষ্ঠ **নাট্যকার** ছিলেন। তাঁর রচিত ৭৫ খানি নাটক ও ৪টি অসমাপ্ত নাটক আছে। এই নাটক-গুলির মধ্যে অনেকগুলিই সার্থক নাটক এবং একসময় এগুলি বাংলা রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিল।

অভিনেতা

॥ **দুই** ॥ গিরিশচন্দ্র নিজে ছিলেন একজন উঁচুদরের **অভিনেতা**। বাংলা রঙ্গালয় দীর্ঘদিন তাঁর সার্থক অভিনয়ে ধন্য হয়েছে। তখনকার দর্শক সমাজও তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

নাট্যনির্দেশক ও নাট্যগুরু

॥ **তিন** ॥ গিরিশচন্দ্র ছিলেন তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ **নাট্যনির্দেশক**। বহু নাটকে তিনি তাঁর নাট্যজ্ঞানের প্রয়োগে যৌথ শিল্পচেতনাকে ঘন সন্নিবদ্ধ করে দর্শকসাধারণকে উপহার দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, –তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যগুরু এবং তৎকালীন বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রী তাঁর কাছ থেকে সার্থক অভিনয়ের বিভিন্ন পাঠ গ্রহণ ক'রে নিজেদের উঁচুদরের অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গিরিশ-চন্দ্রকে ঘিরে একদল নাট্যগোষ্ঠী শিল্পচেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠেছিল।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা

॥ **চার** ॥ গিরিশচন্দ্র বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। গিরিশচন্দ্র এই জাতীয় **রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা** করেন। তারপর নাট্যরচনা, অভিনয়, নাট্যশিক্ষা ও নাট্য নির্দেশনার মাধ্যমে তিনিই সাধারণ রঙ্গালয়কে জনপ্রিয় করে তোলেন।

॥ গিরিশচন্দ্রের নাটক ॥

গিরিশচন্দ্র মোট ৭৯টি নাটক রচনা করেন, তার মধ্যে ৭৫টি নাটক সমাপ্ত এবং ৪টি অসমাপ্ত নাটক আছে। এই ৭৯টি নাটকের মধ্যে প্রহসনও আছে তাঁর রচিত ৭৯টি নাটক হোল,—

১। আগমনী
২। অকাল বোধন
৩। মায়াতরু
৪। দোললীলা
৫। আলাদিন
৬। মোহিনীপ্রতিমা
৭। সীতার বনবাস
৮। রাবণ-বধ
৯। আনন্দ রহো
১০। সীতার বিবাহ
১১। অভিমন্যু বধ
১২। ব্রজবিহার
১৩। নলদময়ন্তী
১৪। সীতাহরণ
১৫। দক্ষযজ্ঞ
১৬। ধ্রুবচরিত্র

১৭। রামের বনবাস
১৮। ভোটমঙ্গল
১৯। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
২০। চৈতন্যলীলা
২১। কমলে কামিনী
২২। নিমাই সন্ন্যাস
২৩। বৃষকেতু
২৪। শ্রীবৎসচিন্তা
২৫। হীরার ফুল
২৬। প্রহ্লাদচরিত্র
২৭। বিল্বমঙ্গল
২৮। প্রভাসযজ্ঞ
২৯। বুদ্ধদেব চরিত
৩০। পূর্ণচন্দ্র
৩১। বেল্লিক বাজার
৩২। রূপ সনাতন
৩৩। প্রফুল্ল
৩৪। বিপদ
৩৫। নসিরাম
৩৬। মলিনা-বিকাশ
৩৭। চণ্ড
৩৮। হারানিধি
৩৯। মলিন মালা
৪০। আবু হোসেন
৪১। জনা
৪২। মহাপূজা
৪৩। মুকুল মুঞ্জরা
৪৪। ম্যাকবেথ
৪৫। স্বপ্নের ফুল
৪৬। সপ্তমীতে বিসর্জন
৪৭। কালাপাহাড়
৪৮। হীরক জুবিলী
৪৯। সভ্যতার পাণ্ডা
৫০। পাঁচকনে
৫১। ফণির মণি
৫২। অশ্রুধারা
৫৩। পাণ্ডবগৌরব
৫৪। মায়াবসান
৫৫। পারস্য প্রসূন
৫৬। নন্দদুলাল
৫৭। মণিহরণ
৫৮। দেল সার
৫৯। বলিদান
৬০। সৎনাম
৬১। হরগৌরী
৬২। মনের মত
৬৩। ভ্রান্তি
৬৪। অভিশাপ
৬৫। আয়না
৬৬। শাস্তি
৬৭। মীরকাসিম
৬৮। সিরাজদ্দৌল্লা
৬৯। বাসর
৭০। য্যায়সা-কা-ত্যায়সা
৭১। অশোক
৭২। শঙ্করাচার্য
৭৩। তপোবন
৭৪। ছত্রপতি শিবাজী
৭৫। শাস্তি কি শান্তি
৭৬। গৃহলক্ষ্মী (অসমাপ্ত)
৭৭। সাধের বৌ (অসমাপ্ত)
৭৮। মিলন কানন (অসমাপ্ত)
৭৯। রাণা প্রতাপ (অসমাপ্ত)

গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির রচনা ও প্রকাশনার সঠিক খ্রীষ্টাব্দ জানা যায় না। কারণ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অভিনয়ের জন্য রচিত হোত। কিন্তু

মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হলে সেই নাটকের অভিনয় করে কেউ ব্যবসায়ের ক্ষতি করতে পারে বলে নাটকগুলি সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রিত হয়ে জনসাধারণের জন্য প্রকাশিত হোত না। এগুলি নাটক-রচনার অনেক পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

॥ গিরিশচন্দ্রের নাটকের শ্রেণীবিভাগ ॥

বিষয়বস্তু অনুযায়ী গিরিশচন্দ্রের ৭৯টি নাটকের নিম্নলিখিত ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ;—

॥ এক ॥ **ধর্মীয় নাটক**

॥ দুই ॥ **সামাজিক নাটক**

॥ তিন ॥ **ঐতিহাসিক নাটক**

॥ চার ॥ **প্রহসন**

একে একে গিরিশচন্দ্রের উল্লিখিত চার শ্রেণীর নাটকের পর্যালোচনা করা যেতে পারে ;—

॥ এক। ধর্মীয় নাটক ॥

গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির মধ্যে ধর্মীয় নাটকই প্রধান,- সংখ্যার বিচারেও ধর্মীয় নাটকের প্রাধান্য। পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক সমস্ত নাটক ধর্মীয় নাটকের মধ্যে পড়ে। গিরিশচন্দ্রের রচিত প্রধান প্রধান ধর্মীয় নাটকগুলি হোল,—**জনা, রাবণবধ, পাণ্ডবগৌরব, বিল্বমঙ্গল, ধ্রুবচরিত্র** প্রভৃতি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাবে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের জীবনে যে ধর্মীয় চেতনার প্রতিফলন হয়েছিল, তার ছায়া এসে পড়েছে তাঁর ধর্মীয় নাটকগুলির মধ্যে। গিরিশচন্দ্রের ধর্মীয় নাটকগুলির মধ্যে প্রধান হোল **'জনা'** (১৮৯৩ খ্রীঃ)। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের জনা পত্রিকার রূপাদর্শে গিরিশচন্দ্র 'জনা' নাটকের পরিকল্পনা করেছেন। জনা চরিত্রের মধ্যে বীরত্বের উপাদান দিয়ে *Tragedy* সৃষ্টির যে সম্ভাবনা ছিল, তা ভক্তিরসের প্লাবনে ভেসে গেছে। ফলে নাটকীয় গতি (*action*) অনেক শ্লথ হয়ে পড়েছে। **'রাবণবধ'** নাটকে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র প্রভাব আছে। মধুসূদনের রাবণ ছিল কবির *'grand fellow'* এবং রামচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের কবি ঘৃণার চোখে দেখেছেন। গিরিশচন্দ্র রামচন্দ্রকে ভগবানের মহিমা সমন্বিত করে অংকন করলেও রাবণকে তিনি বীররূপে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। **'পাণ্ডব গৌরব'** (১৮৯৯ খ্রীঃ) নাটকে শিল্প-আঙ্গিক ও নাটকীয় সংঘাত ভক্তিরসের আতিশয্যে চাপা পড়ে গেছে। ভক্তিরসাশ্রিত **'বিল্বমঙ্গল'** (১৮৮৬ খ্রীঃ) নাটকে প্রচলিত প্রেমকাহিনীকেও কবি ভক্তিমিশ্রিত করে পরিবেশন করেছেন। ধর্মীয় নাটকগুলির মধ্যে নাট্যকারের ধর্মভাব, ধর্মীয় চেতনা ও ভক্তগণের হৃদয়-আকুতি সিদ্ধরসের কাব্য-সুষমা লাভ করেছে।

গিরিশচন্দ্রের ধর্মীয় নাটক

॥ দুই। সামাজিক নাটক ॥

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের মধ্যে পারিবারিক ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে। **প্রফুল্ল** (১৮৯১ খ্রীঃ), **মায়াবসান** (১৮৯৭ খ্রীঃ), **বলিদান** (১৯০৫ খ্রীঃ) প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ পারিবারিক ও সামাজিক নাটক। এই শ্রেণীর নাটকে ভক্তিরসের বন্যা নেই। শেক্সপীয়রীয় আঙ্গিকে এই শ্রেণীর নাটকে পঞ্চাঙ্কের মাধ্যমে নাটকীয় গতি নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। নাটকীয় গতির উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে নাটকীয় সংঘাত গড়ে তোলা হয়েছে। এই সব নাটকে শেক্সপীয়ারের নাটকের মত হত্যা-ষড়যন্ত্র-মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনার প্রাধান্য আছে। কিন্তু জীবনের সার্থক প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করতে পারলে এই জাতীয় সামাজিক নাটকগুলি আর্টের বিচারে উৎরে যেত। 'প্রফুল্ল' গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক, —এক সময় এই নাটকের অভিনয় জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্র-হত্যা-প্রবঞ্চনা ইত্যাদির মাধ্যমে 'প্রফুল্ল' নাটকের সংঘাত ও গতি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। স্নেহান্ধ বড় ভাই যোগেশ, আদর্শবাদী ছোট ভাই সুরেশ, প্রফুল্ল-মা-বৌদি প্রভৃতির স্নেহ-প্রবণতা সত্ত্বেও মেজভাই রমেশের পৈশাচিক ষড়যন্ত্র ও হত্যালীলায় পরিবারের 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'। ষড়যন্ত্রের এই নাটকীয় কাহিনী এবং ভয়াবহ ঘটনা-স্রোতের জটিলতা নাটকটির শিল্পগুণ ক্ষুণ্ণ করেছে। 'মায়াবসান' ও 'বলিদান' ইত্যাদি নাটকেও একই শিল্পশৈলী অনুসৃত হয়েছে।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক

॥ তিন। ঐতিহাসিক নাটক ॥

গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি স্বদেশপ্রীতির উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। ১৯০৫-১৯১১ খ্রীঃ পর্যন্ত এদেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যে জোয়ার বয়েছিল, তার-ই ঢেউ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে আঘাত করেছিল। **'সিরাজদ্দৌলা', 'মিরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী'** প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক। ১৯১১ খ্রীঃ এই তিনটি নাটকের প্রকাশ ও অভিনয় ইংরেজ রাজশক্তির আদেশে বন্ধ হয়ে যায়। ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যেও নাট্যকার শেক্সপীয়ারের মত অলৌকিক ঘটনার কিছু সন্নিবেশ করেছেন।

গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটক

॥ চার। প্রহসন ॥

প্রচলিত ধারা অনুযায়ী গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি প্রহসন রচনা করেন। কিন্তু কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্য ছাড়া তাঁর প্রহসনগুলিতে নতুন কিছু নেই। 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা', 'বেল্লিক বাজার', 'ভোট মঙ্গল' প্রভৃতি তাঁর জনপ্রিয় প্রহসন।

প্রহসন

॥ গিরিশচন্দ্রের নাটকের বৈশিষ্ট্য ॥

বাংলা নাটকের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র একটি স্মরণযোগ্য নাম, নাট্য-রচনার সংখ্যাধিক্যেই তিনি বাংলা নাটকের ইতিহাসে নিজের যথাযোগ্য স্থানটি করে নিতে

পেরেছেন। বাংলা নাটককে দর্শক সমাজের সামনে জনপ্রিয় করে তুলতে তাঁর নিরলস প্রয়াস অনস্বীকার্য। ব্যক্তি গিরিশচন্দ্রের উপর ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিল। রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে তিনি ভক্ত গিরিশচন্দ্রে পরিণত হয়েছিলেন। ভক্ত গিরিশচন্দ্র নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের পথের অন্তরায় হিসাবে দাঁড়ায়,—কারণ তাঁর ধর্মীয় নাটকগুলিতে ভক্তিরসের প্লাবন নাটকীয় সংঘাতকে অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে,—এবং বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের জোয়ারে গিরিশচন্দ্রের মধ্যে জাতি-প্রীতি ও স্বাদেশিকতা গড়ে উঠেছিল। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে এই জাতীয়তাবোধ বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। শেক্সপীয়ারের নাটকের আঙ্গিকে গিরিশচন্দ্র তাঁর নাট্য-রীতি গড়ে তুলেছেন। তাই তাঁর নাটকে হত্যা, ষড়যন্ত্র, অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃত নাটক ও যাত্রার প্রভাবে তাঁর নাটকের বিদূষক চরিত্রগুলি গড়ে উঠেছে। নাট্যরচনার স্বার্থে তিনি একটি নতুন ছন্দের প্রবর্তন করেন, এই ছন্দ 'গৈরিশ ছন্দ' বলে পরিচিত। গিরিশচন্দ্রের মনোধর্মের স্পর্শকাতর আবেগাতিশয্য, উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগের প্রাবল্য নাটকগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। নাটকের বিচারে গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টি উঁচু দরের শিল্পসৃষ্টি নয়। কিন্তু নাট্য-রচনার সংখ্যাধিক্যে, উচ্ছ্বাসপ্রবণ অভিনয়ে, বৈজ্ঞানিক নাট্য-শিক্ষায়, জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় ও নট-গোষ্ঠীর নেতৃত্বে গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর নাট্য-রচনার কৃতিত্ব নাট্যরসের পূর্ণাঙ্গ-স্ফুরণে নয়,—সার্থক মঞ্চাভিনয়ে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকের সমালোচনা

অনুশীলনী

১। নিম্নে উল্লিখিত যে কোন একজন নাট্যকারের নাটক রচনার গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করুন :—
গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭০)

২। নিম্নের বিষয় অবলম্বনে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করুন :—
(ক) বাংলা নাটকে গিরিশচন্দ্র (কলি. বিশ্ব., বি. এড ১৯৭৪)
(খ) মহাকবি গিরিশচন্দ্রের নাট্য-রচনার মূল্যায়ন। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৭)

দ্বাদশ অধ্যায়

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল

বাংলা সাহিত্যে কবি ও নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলা সাহিত্যে ডি. এল. রায়ের প্রথম প্রতিষ্ঠা 'হাসির গানের রাজা' হিসাবে ; কিন্তু বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশে তাঁর অবদান অবহেলার যোগ্য নয়। বাংলা নাটকের যৌবন মুক্তির লগ্নে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পূর্ণ প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য নাট্য-রীতির অনুকরণে এবং শেক্সপীয়রীয় আঙ্গিকের অনুসরণে এই যুগে স্বদেশপ্রীতির উপর কেন্দ্র ক'রে যে কয়জন নাট্যকার বাংলা নাটককে দুর্বার গতি দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডি. এল. রায় অন্যতম। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির অভিনয় সে যুগের জনচিত্ত জয় করেছিল, কেবল মাত্র *reading drama* হিসাবেও তাঁর নাটকগুলির শিল্পকর্ম উৎকর্ষতার দাবী রাখে। তাঁর নাটকগুলি নিয়ে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে।

বাংলা নাটকে ডি এল. রায়

'হাসির গানে'র কবি বাংলা নাটকে আত্মপ্রকাশ করেন তাঁর প্রহসনগুলির মাধ্যমে। তাঁর রচিত বিভিন্ন **প্রহসন** উৎকৃষ্ট ধরনের শিল্পসৃষ্টি। এই সমস্ত প্রহসনগুলির মধ্য দিয়ে নাট্যকার হাস্যরসের কৌতুকোজ্জ্বল আলোতে সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন মেকি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুতীব্র কশাঘাত হেনেছেন। তাঁর রচিত প্রথম প্রহসন '**কল্কি অবতার**'-এ (১৮৯৫ খ্রীঃ) বিলাত-ফেরত, ব্রাহ্ম, নব্য-হিন্দু, গোঁড়া এবং পণ্ডিত -এই পাঁচ শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে তিনি পঞ্চবানের আঘাত হেনেছেন। আগাগোড়া ভাঙা মিত্রাক্ষরে রচিত এই প্রহসনে ব্যঙ্গের ঝাঁঝ ও রসের ব্যঞ্জনা কাব্যধর্মিতা লাভ করেছে। দ্বিতীয় প্রহসন '**বিরহ**'তে (১৮৯৭ খ্রীঃ) নাট্যকার ও ব্যঙ্গতাপহীন অনাবিল হাসির স্নিগ্ধ ফল্গুধারা অফুরন্ত ধারায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। '**ত্র্যহস্পর্শ**' (১৯০০ খ্রীঃ) ও '**প্রায়শ্চিত্ত**' (১৯০২ খ্রীঃ) নাট্যকারের অপর দুটি প্রহসন-জাতীয় নাট্যসৃষ্টি। '**পুনর্জন্ম**' (১৯১১ খ্রীঃ) ডি. এল. রায়ের রচিত শ্রেষ্ঠ প্রহসন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্রতা কমিয়ে জীবনের কৌতুককর স্নিগ্ধ সহাস রূপটি তিনি এই প্রহসনে তুলে ধরেছেন। কৃপণ, অর্থগৃধ্নু যাদব চক্রবর্তীর পুনর্জন্মের অনাবিল হাস্যরস-সমৃদ্ধ কাব্যধর্মী প্রকাশ এই প্রহসনে নাট্যকার সার্থকভাবে সম্ভব করেছেন। '**আনন্দ বিদায়**' (১৯১২ খ্রীঃ) প্রহসনে কবির রবীন্দ্র-বিরোধিতার অবাঞ্ছিত বিদ্বেষরূপ নাট্যকারের শিল্পীমানসকে কলঙ্কিত করেছে।

বিভিন্ন প্রহসন

প্রহসন রচনার মাঝে দ্বিজেন্দ্রলাল গীতিধর্মী দু'খানি নাট্য-কাব্য রচনা করেন। সে দু'টি হোল,— '**সীতা**' (১৯০০ খ্রীঃ) ও '**পাষাণী**' (১৯০০ খ্রীঃ)। এই দু'টি রচনা *operc*-ধর্মী হ'লেও এখানে সংগীতের প্রাধান্য নেই। কবির গীতি-প্রবণতা বিশেষ করে 'সীতা' নাটকে চমৎকার-ভাবে উৎসারিত হয়েছে। সংলাপ-অংশে অপূর্ব ছন্দ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি ক'রে তিনি নাটক দু'টিকে গীতিকবিতার রসোত্তীর্ণ শিল্পে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নাট্যকাব্য ;— সীতা ও পাষাণী

ইতিহাসের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে সাহিত্য সৃষ্টি করে অনেক সাহিত্যিকই যথেষ্ট সুনাম ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও ঐতিহাসিক উপাদান দিয়ে অনেকগুলি সার্থক নাটক রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকের স্রষ্টা হিসাবে ডি এল. রায় সমধিক প্রসিদ্ধ। স্বদেশপ্রীতির উজ্জ্বল আলোতে ও কবিত্ব-শক্তির স্নিগ্ধ প্রকাশে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি কালজয়ী সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। ঐতিহাসিক উপাদানের সঙ্গে কবিসুলভ কল্পনার সার্থক সমন্বয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি সম্বন্ধে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে ;—

ঐতিহাসিক নাটক

'টড্'-এর রাজস্থান কাহিনী থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে লেখা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস হোল—**তারাবাই** (১৯০৩ খ্রীঃ)। অমিত্রাক্ষর পদ্যে লেখা এই নাট্য-সৃষ্টির মধ্যে কাব্যের স্বপ্নাচ্ছন্নতা থেকে গেছে। এই জাতীয় সংলাপ সুখশ্রাব্য ও কার্যকর হয় নি।

তারাবাই

'প্রতাপসিংহ' (১৯০৩ খ্রীঃ) দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক নাটক,—কিন্তু এটি গদ্যে লেখা। রাণা প্রতাপসিংহের দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম নাটকের মূল বিষয়বস্তু। গোটা কাহিনীটি ইতিহাসের উপাদান দিয়ে গড়া, — তবে কিছু কিছু স্থানে রোমান্টিক উপকাহিনীকে নাট্যকার কল্পনা করেছেন। শক্ত সিংহের প্রতি দৌলৎউন্নিসা ও মেহেরউন্নিসার প্রণয় রোমান্টিক কাব্য-সুষমা লাভ করেছে। 'দুর্গাদাস' (১৯০৬ খ্রীঃ) নাটকের মধ্যেও ঐতিহাসিক উপাদানগুলির অতিভারাক্রান্ততা লক্ষ্য করা যায়। ফলে, এ দু'টি ঐতিহাসিক নাটক দ্বিজেন্দ্রলালের সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত হতে পারে নি।

প্রতাপসিংহ ও দুর্গাদাস

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যশৈলীর পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়েছে তাঁর **'নূরজাহান'** (১৯০৮ খ্রীঃ) নাটকে। ঘটনা-প্রধান নাটকে মানব মনের অন্তঃসংঘাতমূলক শেক্সপীয়রীয় নাট্য-রীতিকে এই নাটকে সচেতনভাবে অনুকরণের প্রচেষ্টা হয়েছে। বহিরঙ্গ ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে অন্তঃসংঘাতের নাটকীয় রীতি দ্বিজেন্দ্রলালই সর্বপ্রথম বাংলা নাটকে প্রচলিত করেন। নূরজাহানের অন্তঃসংঘাতের মধ্যে নারী-হৃদয়ের পরস্পর-বিরোধী দু'টি বৃত্তির (প্রেমবাসনা ও উচ্চাশা) তীব্র সংঘাত রয়েছে। নূরজাহানের নারী-হৃদয়ের প্রেমবাসনা মেহেরউন্নিসার যৌবনের আরাধনা হয়ে শেরখাঁকে ভালবাসার পিপাসা নিয়ে বিকশিত হয়েছিল। আর তার উচ্চাশা সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বিজিগীষার অহঙ্কার তাকে 'রাক্ষসী' করে তুলেছিল। প্রথম বৃত্তিতে নারী কল্যাণী, লক্ষ্মী ;—আর দ্বিতীয় বৃত্তিতে সে রূপ-প্রমত্তা সর্বনাশী উর্বশী। শেরখাঁর সঙ্গে যখন বিবাহের সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, তখন সে পিতার নিষেধ অগ্রাহ্য করে মোঘল অন্তঃপুরে গিয়ে রূপের আগুনে যুবরাজ সেলিমকে পাগল করে। বাইরের যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি কাহিনী-বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে নূরজাহানের অন্তঃ-সংঘাতের এই নাট্যদ্বন্দ্ব 'নূরজাহান' নাটকের

নূরজাহান

প্রাণসম্পদ। এরই সঙ্গে আছে সাম্রাজ্ঞী রেবার দেবী মূর্তি ও নূরজাহান-কন্যা লয়লার কল্যাণী প্রেমিকা মূর্তি। নূরজাহানের তীব্র ব্যক্তিত্বও এই নাটকের অন্যতম বিশেষত্ব। তাই দু'জন স্বামীর জীবন্ত অস্তিত্ব সত্ত্বেও 'নূরজাহান' নাটক নায়কহীন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলালের '**মেবারপতন**' নাটক প্রকাশিত হয়। মেবারের ইতিহাসের মধ্যে স্বদেশপ্রীতির বহু উপাদান আছে। দেশের স্বাধীনতা-রক্ষায় আত্মত্যাগের সেই সুমহান যজ্ঞে মেবারের নারীদের অবদান কম ছিল না। মেবারপতন নাটকের বহিরঙ্গে উপস্থাপিত স্বদেশপ্রীতি ও যুদ্ধকাহিনীর অন্তরালে নাট্যকার কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী—এই তিনটি নারী-চরিত্রের পরিকল্পনা ক'রে তাদের মধ্যে যথাক্রমে দাম্পত্যপ্রেম (কল্যাণী), দেশপ্রেম (সত্যবতী) ও বিশ্বপ্রেমের (মানসী) মূর্ত বিগ্রহ গড়ে তুলেছেন। মেবারপতন নাটকে যুদ্ধের উদ্দামতার মধ্যে না গিয়ে নাট্যকার যুদ্ধের বীভৎস ধ্বংসের চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং তার মধ্যে উল্লিখিত ত্রিবিধ প্রেমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। দাম্পত্যপ্রেম, দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মধ্যে বিশ্বপ্রেমই সর্বোৎকৃষ্ট ব'লে নাট্যকার তাঁর নিজস্ব মত দিয়েছেন।

মেবারপতন

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত '**সাজাহান**' দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি। নাটকটি অভিনয়ের ক্ষেত্রেও জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল। আবেগ-উদ্ভাসিত কাব্যধর্মিতাকে নাটকের মধ্যে সংঘাতময় রূপ দেওয়ার প্রবণতাই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাট্যকর্মের স্বাভাবিক রীতি। 'সাজাহান' নাটকের মধ্যে কবিত্ব ও নাট্যসংঘাত অপূর্ব সমন্বয় লাভ করেছে। নাটকের মধ্যে শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির মত বহিরঙ্গে ঘটনাবিস্তার, ক্রূরতার নগ্ন রূপ ; কিন্তু সেই সঙ্গে চরিত্রগুলির মধ্যে চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব। চরিত্রচিত্রণেও শেক্সপীয়ারের অনেক বিখ্যাত নায়ক-নায়িকার প্রতিচ্ছবি 'সাজাহান' নাটকের মধ্যে দেখা যায়। *Macbeth*-এর উচ্চাশা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে *Iago*-র ক্রূরতা মিলে মূর্ত বিগ্রহ হয়েছে ঔরংজীবের চরিত্র। সাজাহানের মধ্যে *King Lear*-এর ছায়া পড়েছে। বাৎসল্য, স্নেহ ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তিগুলির সঙ্গে পুত্রহন্তার প্রতি তীব্র আক্রোশ মিলে যে অন্তর্সংঘাত সৃষ্টি হয়ে সাজাহানের জীবনকে অসহায় করে তুলেছে, তারই কাব্যময় ও নাট্যসংঘাতময় রূপ এই চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে। পিতার প্রতি ভালবাসা ও অতন্দ্রসেবিকা জাহানারার চরিত্র-চিত্রণে *Cordelia*-এর কথা মনে পড়ে। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্সপীয়ারের *copy* করেন নি। সাজাহান নাটকের পটভূমি ভারতজোড়া এক প্রচণ্ড রাষ্ট্রবিপ্লবের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের মৃত্যুপ্রবাহের ঘটনারাজিকে সব সময় ঔরংজীব নিয়ন্ত্রিত করেছেন। কাজেই এই নাটকের নায়কত্বের দাবী তিনিই করতে পারেন। সাজাহান চরিত্রের মধ্যে নাটকীয়তা অপেক্ষা কবির আবেগ-উত্তপ্ত কাব্যরস-ই সমধিক উৎসারিত হয়েছে, তাই নাটকের প্রচণ্ড ঘটনাপ্রবাহে সাজাহান নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র। সাজাহান-চরিত্রে পিতা সাজাহান ও সম্রাট সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্ব অপূর্ব

সাজাহান

কাব্যশ্রী-মণ্ডিত হলেও নাট্যসংঘাতের জীবন্ত রূপ নিয়ে প্রতিভাত হতে পারে নি। সাজাহান নাটককে *Tragedy* বা *Comedy*—কোনটাই বলা যায় না। ঔরংজীবের চরম বিজয়-মুহূর্তে নাটকটি *Comedy* হতে পারতো, অথবা তিন নিহত পুত্রের জনক অসহায় সাজাহানের জীবনের পরিণাম স্বচ্ছন্দে *Tragic* হতে পারতো। কিন্তু এই নাটকের পরিণামে চির-অপরাধী পুত্র ঔরংজীবকে সাজাহান একবার মাত্র ক্ষমা-প্রার্থনাতেই ক্ষমা ক'রে চিরদিনের হৃদয়-যন্ত্রণাকে ভুলে এক মুহূর্তের সুখ-সম্ভোগের মধ্যে গিয়েছেন। তাই নাটকটি শেষ পর্যন্ত *Tragi-comedy*-তে পরিণতহয়েছে। এর মধ্যে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকাশ হলেও নাটকের গতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সাজাহান নাটকের ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ, হত্যা ইত্যাদির বীভৎসতার মধ্যে পিয়ারার প্রেমস্নিগ্ধ নারীত্ব, সোলেমান ও মহম্মদের পিতৃভক্তি, নাদিরার সর্বংসহ সতীত্ব, জাহানারার স্নিগ্ধ কোমলতা ও জহরৎ-এর প্রতিবিধিৎসা মানবিক রসের স্বচ্ছন্দ স্ফুরণে বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের পরের নাটক **'চন্দ্রগুপ্ত'** (১৯১১ খ্রীঃ) যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও শিল্পের বিচারে এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্প নয়। এই নাটকের কাহিনী-অংশেও নাট্যকার বিশ্বস্তভাবে ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যস্বাদী রোমান্টিক কল্পনার স্বপ্নমদিরতা নাটকটির আদ্যন্তে খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে কাব্যরসের স্নিগ্ধতায় নাটকীয় সংঘাত ঢাকা পড়ে গেছে। এই নাটক-রচনায় ডি. এল. রায়ের শিল্পী মানস যেন কিছুটা অবসাদগ্রস্ত। চন্দ্রগুপ্ত নাটকের নায়ক কে ? চন্দ্রগুপ্ত অবশ্যই নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু ঘটনাবিন্যাসে ও কাহিনী-নিয়ন্ত্রণে চাণক্যের প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব নাটকের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। চাণক্যের তীব্র ব্যক্তিত্বের কাছে চন্দ্রগুপ্তের রোমান্টিক চরিত্র নাট্য-সংঘাতের দিক্ থেকে অনেক খাটো বলে মনে হয়েছে। চাণক্য চরিত্রের তীব্র অন্তর্জ্বালা এই নাটকে চমৎকার নাটকীয়তা লাভ করেছে। মলয়রাজ চন্দ্রকেতু ও তার বোন ছায়ার কাহিনী, আন্টিগোনস-এর মাতৃসান্নিধ্য-লাভের উপাখ্যানে কবির অতীত স্বপ্নচারী রোমান্টিক ভাব-বিহ্বলতা নাটকীয় সংঘাতকে শিথিল করেছে। হেলেন ও ছায়া পরিণয়ের স্নিগ্ধ পরিবেশে নাট্য-কাহিনীর *Melo-dramatic* পরিসমাপ্তি ঘটেছে। চাণক্যের ভারতগড়ার কর্মযজ্ঞের পাশে চন্দ্রগুপ্ত, চন্দ্রকেতু, ছায়া, আন্টিগোনসের কাহিনী কাব্যিক রোমান্টিকতা-মণ্ডিত হয়েছে। এখানেই নাটকটির *Melodrama*।

চন্দ্রগুপ্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল আরও কতকগুলি নাটক রচনা করেন। **'সিংহলবিজয়'** (১৯১৫) নাটকে ইতিহাসকে আশ্রয় ক'রে রোমান্স রসকে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত কাহিনীর অনুসরণে তাঁর একটি 'নাট্যরঙ্গ' হোল **'সোরাব-রোস্তাম'** (১৯০৮ খ্রীঃ)। **'পরপারে'** (১৯১২ খ্রীঃ) তাঁর সামাজিক নাটক হ'লেও এর মধ্যে সমাজ ও জীবনের চিত্র খুব বেশী পাওয়া যায় না। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর দু'টি নাটক প্রকাশিত হয়,— **'বঙ্গনারী'** (১৯১৬ খ্রীঃ) সামাজিক নাটক এবং **'ভীষ্ম'** (১৯১৪ খ্রীঃ) পৌরাণিক

অন্যান্য নাটক

নাটক। কিন্তু এই নাটকগুলির মধ্যে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার স্পর্শ খুব বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যায় না।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-রচনার শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা নানাদিক্ দিয়ে হতে পারে। তিনি নিঃসন্দেহে বাংলা নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন। তাঁর মধ্যেকার কবিসত্ত্বা নাটকগুলির দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে অনেকাংশে শিথিল করেছে, তা সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি নাটকের মধ্যে চমৎকার কাব্য-রোমান্টিকতা লাভ করেছে। তাঁর অধিকাংশ নাটকে অনেকগুলি সুন্দর গান সন্নিবেশিত হয়েছে। নাটকের এই গান-গুলির ভিত্তিতে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি ও সংগীতের জগতে 'দ্বিজেন্দ্রগীতি' অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য লাভ ক'রে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনিই বাংলা নাটকে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য রীতিতে (শেক্সপীয়রীয়) চরিত্রগুলির মধ্যে অন্তঃসংঘাত সৃষ্টিতে পারদর্শিতা লাভ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে বিশেষ-ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ('আমার এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি।') স্বদেশপ্রীতি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ("সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ: দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়···।") মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রায় সব সময়ই নিজের কথা বলেছেন। তাই সমস্ত চরিত্রের সংলাপের মধ্যেই কাব্য-রোমান্টিকতা লক্ষ্য করা যায়। নাটক-রচনার পাশ্চাত্ত্য রীতিকে অনুসরণ করলেও তিনি সেই রীতিকে আত্মস্থ করেছিলেন। তাঁর শিল্পকর্ম তাই সৃষ্টি, কেবলমাত্র অনুকৃতি নয়। *Reading drama* হিসেবেও তাঁর নাটকগুলি উপভোগ্য হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-ভাবনা তাঁর প্রায় সমস্ত নাটকগুলির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর কবি-মানসিকতার সর্বব্যাপ্ত প্রেম-মানসী ('মেবারপতন') চরিত্রে বিশ্বপ্রেমের আকারে মূর্ত বিগ্রহ লাভ করেছে। প্রেমিক কবি ও জীবন-শিল্পী নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল 'নূরজাহান' নাটকে শারিয়ার কণ্ঠে সাজিয়ে দিয়েছেন নিজের প্রেম-আর্তির পূজারী আত্মার ভাব-বিহ্বল সংলাপ,—"আশ্চর্য! তোমাদের কি যুদ্ধ ভিন্ন কথা নেই? এ জগৎ কি একটা হত্যাশালা! ও সব ছেড়ে দেখ দেখি ভাই আকাশ কী নীল, ধরণী কি শ্যামল, শোন বিহঙ্গের কূজন, নদীর জলকলরব। প্রাণ দিয়ে অনুভব কর এই বিশ্বনিখিল।"

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য সমালোচনা

অনুশীলনী

১। নিম্নে উল্লিখিত যে-কোন একজন নাট্যকারের নাটক-রচনার গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করুন:
গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭০)

২। নিম্নের বিষয় সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।
(ক) নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭২)
(খ) বাংলা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৪)
(গ) দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-রচনার মূল্যায়ন (কলি. বিশ্ব., বি, এড. ১৯৭৬)
(ঘ) নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৮)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

গল্প শোনার বাসনা মানুষের চিরন্তন। মানুষ চিরকালই গল্প শুনতে ভালোবাসে। তাই রূপকথা, উপকথা, উপন্যাস ও ছোটগল্পের সৃষ্টি। অনেক কাব্য-কবিতার মধ্যেও গল্পরস খুবই উপভোগ্য। ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে আধুনিক সংযোজন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'লে বাংলা গদ্যের প্রচলন শুরু হয়। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, উইলিয়াম কেরী প্রভৃতির প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের সূত্রপাত হয়। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সেই গদ্যকে বাল্য থেকে কৈশোরে উন্নীত করেন। এরপর বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন শাখা সংযোজিত হয় ; -তা হ'ল কথাশিল্পের দু'টি শাখা, উপন্যাস ও ছোটগল্প। উপন্যাস ও ছোটগল্প পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে এ যুগের মানসিকতায় সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ-জীবনে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে, তারই অবশ্যম্ভাবী সাহিত্য-পরিণতি হল ছোটগল্প। নানান কাজের ঝামেলায় সময় আমাদের কম, অথচ সাহিত্য চাই। তাই স্বল্প সময়ে সাহিত্যানুশীলনের মাধ্যম হিসেবে দেখা দিল ছোটগল্প। ছোটগল্প তাই বর্তমানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস

ছোটগল্প কাকে বলে? ছোটগল্পের সংজ্ঞা কি? এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কেবল আয়তনে ছোট হলেই ছোটগল্প হয় না। ছোটগল্পের নিজস্ব একটি রূপ, প্রকৃতি, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আছে। সেই আলোতেই ছোটগল্পকে বিচার করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সোনার তরী"র 'বর্ষাসুন্দরী' কবিতায় ছোটগল্পের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তা হল,—

"ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো, ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ,
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে না হইল শেষ।"

জীবনের ছোট কোন অনুভূতি চিন্তাভাবনা নিয়েই ছোটগল্প। ছোটগল্পে বর্ণনার বাহুল্য না থাকায় এর গতি অপ্রতিরোধ্য ; শেষকালে পাঠকচিত্তকে একটি আঘাত বা *jerk* দেওয়া হয়। মোটামুটি এই হল ছোটগল্প। 'ওয়েবস্টার' অভিধানে ছোটগল্পের সংজ্ঞা উল্লিখিত আছে, – '*A short story usually presenting the crisis of a single problem.*" *Hudson* ছোটগল্পের

ছোটগল্পের সংজ্ঞা

সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন,—"*A short story must contain one and only one informing idea, and that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method.*" B. Matthews-এর মতে, "*The short story by its effect, a certain unity of impression which set it apart from other kinds of fiction*" বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পে বিশিষ্ট লেখক ও সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, 'ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (*impression*)-জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য কাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন ক'রে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।'

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ছোটগল্প

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না। সূর্যোদয়ে যেমন রাতের অন্ধকার বিদূরিত হ'য়ে সারা আকাশ ও পৃথিবীতে আলোর বন্যা নেমে আসে, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যের আসরও তেমনি কলরব-মুখরিত হয়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন বিরাট প্রতিভাধর পুরুষ। তাঁর বিরাট প্রতিভার স্পর্শ বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে পড়ে তাকে সমৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করেছে। মুখ্যতঃ কবি হলেও নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প রচনায়ও রবীন্দ্রনাথের অবদান কম নয়। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রতিষ্ঠা নামমাত্র ছিল। রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছোটগল্পকে শৈশব থেকে একেবারে যৌবনে নিয়ে আসেন। তাঁর শতাধিক ছোটগল্পগুলি রচনা, আঙ্গিক ও সাহিত্যগুণে বিশ্বসাহিত্যের অন্যান্য ভাষার ছোটগল্পের সমকক্ষ। **তিনখণ্ড 'গল্পগুচ্ছ,' 'সে', 'গল্পসল্প' ও 'তিনসঙ্গী' প্রভৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি পাওয়া যায়।** রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্পকার।

কবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি। কাব্য-প্রতিভাই রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক খ্যাতি ও স্বীকৃতি দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সর্বাত্মক কবি-প্রতিভার প্রকাশ তাঁর উপন্যাস, নাটক, চিঠিপত্র ও ছোটগল্পগুলির মধ্যেও প্রকট। অনেকে তাই এমন কথা বলে থাকেন যে, তিনি ছিলেন ভাববিলাসী—কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে তিনি রোমান্সের আকাশে ভেসে বেড়াতেন ; বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের বিশেষ যোগ নেই। এই সমালোচনা কবিচিত্তকে আলোড়িত করেছিল। এ ব্যাপারে আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য জবানবন্দী হিসাবে কবির বক্তব্য আছে তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে। সেখানে তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে বাস্তবের উপাদান খুঁজে বের করতে বলেছেন। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ছোটগল্পের মধ্যে বাস্তব ও সাধারণ মানুষের জীবনযুদ্ধ সহজভাবেই ধরা পড়েছে। জমিদারীর কাজে রবীন্দ্রনাথকে অনেকবার গ্রামাঞ্চলে যেতে হয়েছে। সেই সুযোগে গ্রাম্য জীবন, সাধারণ মানুষ ও বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর বহু ছোটগল্পের সৃষ্টি হয়েছে জীবনের অভিজ্ঞতার সূত্র ধ'রে। কবি রবীন্দ্রনাথ তাই সব সময় কল্পনার আকাশমার্গে বিচরণ করেন নি। ছোটগল্পগুলির ক্ষেত্রে তিনি জীবনের মর্তভূমিতে নেমে এসে বাস্তব জীবনের সার্থক রূপকে চিত্রায়িত করেছেন তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে।

অনেকগুলি ছোটগল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতার যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। 'একরাত্রি' গল্পের সঙ্গে 'পরশপাথর' ও 'আকাশের চাঁদ' এই দুটি কবিতার মিল আছে। 'জয়-পরাজয়' গল্পের সঙ্গে 'মানসসুন্দরী'র মিল আছে, 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের সঙ্গে 'যেতে নাহি দিব' কবিতার সংস্রব আছে, 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'স্বর্গ হইতে বিদায়' সমভাবাপন্ন। বাস্তবতার সঙ্গে যথাযথ যোগাযোগ থাকলেও বিভিন্ন ছোটগল্পের মধ্যেও তাঁর কবি-সত্তা কাজ করেছে। অনেকগুলি ছোটগল্পের কাব্যিক লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। অনেক ছোটগল্পের ভাষা কাব্যময়, বর্ণনা কাব্য-গুণান্বিত, চরিত্র-সৃষ্টি কাব্যিক গুণ-সম্পন্ন। এই ছোটগল্পগুলির মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রকাশিত করেছেন।

বিভিন্ন ছোটগল্পের কাব্যগুণ

প্রকৃতিপ্রেম ও নিসর্গ-চেতনা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান প্রাণ-সম্পদ। প্রকৃতিপ্রেম ও নিসর্গ-চেতনা রবীন্দ্রসাহিত্যকে একটি মধুর গৌরব দান করেছে। ছোটগল্পগুলির মধ্যেও তাঁর এই নিসর্গ-চেতনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কতকগুলি ছোটগল্প মানবজীবন ও প্রকৃতি-প্রেমের উপর ভিত্তি করে লেখা। যেমন 'ছুটি', 'শুভা', 'অতিথি' প্রভৃতি গল্প। ছোটগল্পের ফাঁকে ফাঁকে যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই তিনি প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। এই প্রকৃতি-বর্ণনা অনেক সময় কাব্যময়, গীতিধর্মী এবং চিত্রকল্প হয়েছে। কতকগুলি চরিত্র প্রকৃতিকে কেন্দ্র ক'রে সৃষ্ট। শুভা, ফটিক, মৃন্ময়ী, বলাই, রতন প্রভৃতির কাউকেই আমরা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না। নিসর্গ-চেতনা এইভাবে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকে সার্থক করে তুলেছে। প্রকৃতি এখানে গল্পের পটভূমিমাত্র নয়, গল্পের অন্যতম চরিত্রে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোটগল্পে গল্পরস সৃষ্টি ক'রতে প্রকৃতিকে সার্থকভাবে চিত্রিত করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-চেতনা ও তাঁর ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মধ্যে অনেকগুলি অতিপ্রাকৃতের রসাক্রান্ত। সাহিত্যের একটি উপাদান হিসাবে অতিপ্রাকৃতের (*Supernatural elements*) প্রতিষ্ঠা। এই জাতীয় রচনা ও লেখাগুলি পড়তে পড়তে রোমাঞ্চ লাগে, অথচ এই গল্প পাঠ করবার লোভ সংবরণ করাও যায় না। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মধ্যে অতি-প্রাকৃত ঠিক স্থান অধিকার করে নি। তাঁর কতকগুলি গল্পের সঙ্গে অতিপ্রাকৃত জড়িয়ে আছে। 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'কঙ্কাল', 'মণিহার', 'জীবিত ও মৃত', 'মাস্টার মশাই' প্রভৃতি ছোটগল্প অতিপ্রাকৃতের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু তাই বলে এগুলি খাটি অতিপ্রাকৃতিক ছোটগল্প নয়। 'ক্ষুধিত পাষাণ' রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির মধ্যে অপূর্ব সৃষ্টি। এই ছোটগল্পটির মধ্যে অতিপ্রাকৃত থাকলেও কখনই তা মুখ্য স্থান অধিকার করে নি। মিষ্টিক কল্পনার জগৎ 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অতিপ্রাকৃতকে দূরে সরিয়ে দিয়ে এক অপূর্ব জগৎ সৃষ্টি করেছে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পে অতিপ্রাকৃত

ঘটনা-বিন্যাস ও *plot*-এর গতি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির *plot* বা কাহিনী-বিন্যাসকে তিনটি ধারায় ভাগ করা যায়। একটি ধারার কাব্য বা গীতিধর্মিতার সঙ্গে কবির অনুভূতি মিশে গেছে। এই ধারার বিশিষ্ট গল্পগুলি হল. 'ক্ষুধিত পাষাণ'. 'নিশীথে', 'শুভা', 'শুভদৃষ্টি, 'একরাত্রি' প্রভৃতি। অপর একটি ধারায় কাহিনীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ;—বহু ক্ষেত্রে কাহিনী-স্রোত হঠাৎ দিক্ পরিবর্তন ক'রে চমৎকারিত্ব ও গল্পরস সৃষ্টি ক'রেছে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'অধ্যাপক', 'নষ্টনীড়' 'প্রায়শ্চিত্ত', 'কর্মফল', 'বিচারক' প্রভৃতি গল্প ঐ শ্রেণীতে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-বিন্যাসের অপর ধারায় চোখে পড়ে তাঁর শেষ জীবনের কতকগুলি গল্প। এই গল্পগুলি যেন কতকগুলি সূত্রের টীকাভাষ্য। লেখক এ সকল ক্ষেত্রে গল্পের মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে একটি সূত্রকে পূর্ব থেকে নির্ধারিত করে নেন। তারপর সেই সূত্রকে গল্পের মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও কাহিনী সহযোগে ব্যাখ্যা করা হয়। 'স্ত্রীর পত্র'. 'বোষ্টমী', 'অপরিচিতা' 'সংস্কার'. 'হালদার গোষ্ঠী', 'নামঞ্জুর', 'চোরাই ধন', 'বলাই' ইত্যাদি এই শ্রেণীর গল্প। ঘটনা-বিন্যাস, গতিময় কাহিনী, চরিত্র-চিত্রণ, কাব্যময় বর্ণনা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকে সার্থকতা-মণ্ডিত করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে কাহিনী-বিন্যাস

'সে' ও **'গল্পসল্প'** রূপকথা-ধর্মী . এবং সেইজন্যই ছোটদের জন্য লিখিত। তবুও গ্রন্থ দু'টির মধ্যে বয়স্কদের জন্যও গল্পরসের উপাদান আছে। রূপকথা যখন রূপকধর্মী হয়, তখন তা বড়দের জন্যই। 'গল্পসল্পে' প্রতিটি গল্পের সঙ্গে এক-একটি কবিতা আছে। 'সে' পুস্তকটি অদ্ভুত রসাশ্রিত কাহিনীর ধারা। 'গল্পসল্পে' লেখকের বাল্যস্মৃতি জাজ্জ্বল্যমান। **'তিনসঙ্গী'** রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনা। সেখানে আইডিয়ালিজ্‌মের (*Idealism*) সঙ্গে রিয়ালিজমের (*Realism*) একটা আপোষ রফা করা হয়েছে। চরিত্রগুলি সুপরিকল্পিত এবং ব্যক্তিত্বে সমুজ্জল। লেখকের তীব্র মননশীলতা, বক্তব্যের চমৎকার উপস্থাপন, যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার, বিদগ্ধ চেতনা ও ভাষার অপূর্ব শৈলী. লেখার অননুকরণীয় *style* 'তিন সঙ্গী'তে পরিলক্ষিত হয়। 'তিন সঙ্গী'র সোহিনী চরিত্র উল্লেখের দাবি রাখে. এই চরিত্রের তেজ যেন ঝক্ ঝক্ করছে।

সে, গল্পসল্প ও তিনসঙ্গী

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করেছিল। এই ছোটগল্পগুলি কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যের নয়, অনেকগুলি তো বিশ্ব-সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর রচনা। তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে আঙ্গিক, প্রথাপ্রকরণ. শিল্পচাতুর্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে। 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'নষ্টনীড়', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মেঘওরৌদ্র', 'শুভা', 'অতিথি'. 'দুরাশা', 'একরাত্রি', 'দালিয়া', 'মাল্যদান', 'কঙ্কাল', 'ল্যাবরেটরি', 'পোস্টমাস্টার', 'সমাপ্তি' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি প্রথম শ্রেণীর রচনা। ছোটগল্পের মধ্যে

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মূল্যায়ন

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কতগুলি চরিত্র প্রচণ্ড বিস্ময়, তীব্র আকর্ষণ ও রোমান্স-বিহ্বলতা সঞ্চারিত করে। রতন, ফটিক, বলাই, মিনি, চারুলতা, শুভা, মৃন্ময়ী, তারাপদ প্রভৃতি চরিত্রগুলি বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় হ'য়ে থাকবে। বর্ণনার চমৎকারিত্ব ও ভাষা-ব্যবহারের অপূর্বতায় বাংলা ছোটগল্পের ধারায় রবীন্দ্রনাথের অবদান চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। নিম্নের লেখকের ছোটগল্প রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন—রবীন্দ্রনাথ।
(কলি. বিশ্ব , বি. এড. ১৯৭০)

২। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অবদানের তুলনামূলক সমালোচনা করুন।
(উত্তরবঙ্গ বিশ্ব., বি. টি. ১৯৬৮)

৩। নিম্নের বিষয় সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন—
(ক) ছোটগল্প-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ। (কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭২)
(খ) বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের দান।
(কলি. বিশ্ব., বি. এড. ১৯৭৬)

চতুর্দশ অধ্যায়

মাধ্যমিক স্তরে বাংলাভাষার প্রচলিত পাঠ্যক্রমের পর্যালোচনা

শিক্ষাদান-কার্যে পাঠক্রম (*curriculum*) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত পাঠ্যক্রম ছাড়া শিক্ষাদান কার্য কখনই সুসম্পন্ন হতে পারে না। সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্যক্রম রচনার কাজটিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। মাতৃভাষা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলতে গেলে পাঠ্যক্রম রচনায় সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা পাঠ্যক্রমের মধ্যেই শিশু শিক্ষালাভ করবে, উপযুক্ত পাঠ্যক্রম ছাড়া তাই শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না। পাঠ্যক্রম রচনার কতকগুলি মূল নীতি আছে। ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও সেগুলিকে মেনে চলতে হবে। শিক্ষার মূল নীতি, লক্ষ্য ও আদর্শগুলি পাঠ্যক্রমের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। পাঠ্যক্রম নির্ধারণে শিক্ষার্থীদের রুচি ও সামর্থ্যের কথা মনে রাখতে হবে। পাঠ্যক্রম পুস্তক-সর্বস্ব, মুখস্থ-নির্ভর ও যান্ত্রিক হবে না। শিক্ষা জ্ঞানার্জনের জন্য, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ; মুখস্থ ক'রে পরীক্ষা পাশের জন্য নয়,—এই আদর্শ পাঠ্যক্রমের মধ্যে অনুসৃত হবে। পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, পর্যবেক্ষণ-শক্তি, অধ্যয়ন-স্পৃহা, অনুসন্ধিৎসা, শিল্প-চেতনা ও বিশ্লেষণ-শক্তি প্রভৃতিকে শক্তিশালী করতে সক্ষম হবে। পাঠ্যক্রম জানা থেকে অজানার দিকে (*known to unknown*) অগ্রসর হবে, সহজ থেকে কঠিন (*simple to complex*) হবে। পাঠ্যক্রমের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পূর্ণ মিল থাকবে। পাঠ্যক্রম প্রস্তুতের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তা শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় ও গ্রহণীয় হয়। পাঠ্যক্রম যেন বেশী পরিমাণে তথ্য বা তত্ত্ব-নির্ভর না হ'য়ে শিক্ষার্থীর জীবন ও আগ্রহের সঙ্গে যথাযথভাবে অম্বিত হয় ; তা না হলে শিক্ষাদান কার্যকর হবে না। শিশুর বর্তমান জীবনের সঙ্গে যদি শিক্ষণীয় বিষয়টি সম্পর্কিত হয়, তবেই শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও কৌতূহল থাকবে সবচেয়ে বেশী। পাঠ্যক্রমে যে বিস্তৃত কার্যসূচী থাকবে, শিক্ষার্থীরা তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করবে। পাঠ্যক্রম রচনার সময় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ও শিক্ষাদানের সক্রিয়তা-তত্ত্বের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

পাঠ্যক্রম রচনার সময় বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌দের মতামতের উপর গুরুত্ব দিতে হবে, বিভিন্ন শিক্ষক সংস্থার চিন্তাধারাকে গ্রহণ করতে হবে, জাতীয় শিক্ষা কমিশনের

সুপারিশগুলিকে কার্যকর করতে হবে। পাঠ্যক্রম রচনার মূল উদ্দেশ্য কি হবে এবং সেই নীতি আমাদের মাতৃভাষার পাঠ্যক্রম-রচনার (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯৭৪ থেকে গ্রাহ্য নব-প্রবর্তিত পাঠ্যসূচীতে) কতখানি কার্যকরী হয়েছে, তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুর ব্যক্তিত্বকে অবহেলা করা হ'লেও আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর ব্যক্তিত্বকে বিশেষ মূল্যবান ব'লে মনে করেন। তাই শিশুর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তা বিকাশের পক্ষে সহায়ক বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখেই পাঠ্যক্রম রচনা করা প্রয়োজন। শিশুর সামাজিকীকরণ হল শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। শিশু সমাজের জন্যই সমাজের মধ্যে গড়ে ওঠে। তাই শিশুর সামাজিক সত্তার বিকাশের অনুকূল এবং উপযোগী বিষয় পাঠ্যক্রমে না থাকলে শিক্ষার লক্ষ্য থেকে আমরা দূরে সরে আসবো। বর্তমান জগতের জটিল জীবন-যন্ত্রণার উপযোগী করে শিশুকে গড়ে তোলার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। সাহিত্যের পাঠ্যক্রম নির্ধারণে রচনা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে তার জীবনের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে হবে। সকল জটিলতার মধ্যে শিশু যেন তার পথটি খুঁজে নিতে পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। শিশুর কাছে সমাজের দাবি আছে। আজকের শিশু হবে আগামী দিনের সমাজের অংশীদার, কর্ণধার। তখন তাকে সমাজের গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে। সমাজ সম্পর্কে তাই তার মনে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সেজন্য শিশুর পারিবারিক এবং দলগত আচরণ-ধারা নিয়ন্ত্রণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সাহিত্যের ভূমিকা অতি বিস্তৃত ও বহুব্যাপক। সাহিত্যের আস্বাদন শিশুর মনে সহজে ও অতি দ্রুত সাড়া জাগাতে পারে। সাহিত্যের পাঠ্যক্রম রচনাকালে তাই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সাহিত্য-পুস্তকে সেইসব বিষয়ের প্রাধান্য থাকে, যেগুলি শিশুর ব্যক্তিসত্তার ও সমাজসত্তার যথাযথ বিকাশ-সাধনে সাহায্য করবে। আবেদনধর্মী ও সংবেদনশীল রচনার মধ্য দিয়ে শিশুর মনে সহজেই প্রভাব বিস্তার করা যেতে পারে।

শিশুর ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার বিকাশসাধন

শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও কৌতূহল বৃদ্ধি করা হবে পাঠ্যক্রম রচনার মূল উদ্দেশ্য। যাতে শিশুর উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, এই ধরনের বিষয় সাহিত্যের পুস্তকে স্থান ক'রে দিলে সাহিত্যের শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে। সাহিত্য-শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যই সব নয়, গৌণ উদ্দেশ্যকেও তুচ্ছ করা চলবে না। শিশুর ভাষা, সাহিত্য রসোপলব্ধি এবং ভাষার ব্যবহারের শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও সাহিত্যের আবেদনের একটি বৃহত্তর লক্ষ্য আছে। পাঠ্যক্রমে সেগুলিকেও স্থান ক'রে দিতে হবে। ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু উদ্ধার করবে, শিল্পসৌন্দর্য উপলব্ধি করবে, রসানুভূতি আস্বাদন করবে, ভাষা-ব্যবহারে দক্ষ হবে, নন্দন-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীল ও মননশীল ক্ষমতার বিকাশই ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের মূল কথা। পাঠ্যক্রমের মধ্যে তার সংস্থান থাকবে।

আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ শিশুদের মধ্যে প্রবল। সাহিত্য-পাঠে শিশু যেন তার আত্মপ্রতিষ্ঠায় সুযোগ লাভ করে। পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা করতে হবে। ব্যক্তিজীবনের সমস্যা সমাধানের এবং সমাজের সঙ্গে উপযোজনার ক্ষমতা অর্জনে পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে। সাহিত্যে বিমূর্ত বিষয়ের অবতারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নীচু পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে মূর্ত বিষয় শিক্ষা দিতে হবে। কৈশোরেই বিমূর্ত বিষয় গ্রহণ করবার ক্ষমতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্ট হয়। তাই কৈশোরে এসে বিমূর্ত বিষয় শিক্ষা দিতে হবে, এবং সেই অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের বিন্যাস করতে হবে। রসোপলব্ধি, শিল্পচেতনা, সৌন্দর্যসৃষ্টি, সাহিত্যানুরাগ, অনুভূতি, শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার প্রভৃতিকে ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্যক্রম রচনায় গুরুত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের চাহিদা, মানসিকতা, যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠ্যক্রমকে সুবিন্যস্ত করতে হবে।

ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্যক্রম রচনার মূল দৃষ্টিভঙ্গী

মাতৃভাষা সম্বন্ধে মুদালিয়ার কমিশনের বক্তব্য হ'ল,—*Learning the mother tongue does not imply merely the capacity to read and write it anyhow and a continuous education of the student's vocabulary. It is a most potent and comprehensive medium for the education of the student's entire personality. Through it a good teacher can train his pupils in clear thinking which is one of the most important objectives of education, and in lucid felicitous self expression, which besides being a great social gift is an essential quality for successful democratic citizenship, he can also build up literary appreciation and good taste and educate the emotions. Literature is a vehicle for training the character and including the right sense of values through the study of literary masterpieces and communion with the spirit of great writers. It also provides a useful insight into the mind and the culture of the past. But all these objectives can only be attained if the emphasis is placed on the right things—self expression in reading, writing and speech ; study and appreciation of literature as a mirror of life, reading of suitable general books of high quality with interest rather than concentration on text books, approach to literature as a source of joy and inspiration rather than a kill joy drill in grammar and vocabulary......the teacher can take up the teaching of the mother tongue in this spirit, it may well-raise the whole level and quality of education."* জাতীয় শিক্ষা-কমিশনের মাতৃভাষা শিক্ষাদান সম্বন্ধে এই বক্তব্যকে পাঠ্যক্রম রচনার সময় গুরুত্ব দিতে হবে।

মুদালিয়র কমিশন

আমাদের দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের যে পাঠ্যক্রম প্রচলিত আছে, তা প্রায় ক্ষেত্রেই ত্রুটিবহুল। পাঠ্যক্রম বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে নির্ধারিত হয় নাই। পাঠ্যক্রমের পরিপূরক হিসাবে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর আয়োজন নেই, শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা-নির্ভর। প্রচলিত পাঠ্যক্রমে পাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ নেই, সাহিত্যচর্চার অবকাশ নেই। রসানুভূতিকে বাদ দিয়ে বিষয়বস্তুর উপর অনাবশ্যক অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমের পরিধিও বিশাল,—শিক্ষার্থীদের মানসিকতার অনুপযুক্ত। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনেক কঠিন। সম্প্রতি নতুন পাঠ্যক্রমকে বৈজ্ঞানিক করে তোলবার জন্য প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেই প্রয়াস সুফল প্রসব করে নি।

প্রচলিত পাঠ্যক্রমের ত্রুটি

বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের প্রচলিত পাঠ্যক্রমে **কবিতা ও গদ্যাংশ** একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ ক'রে আছে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের সংকলন-গ্রন্থগুলিতে কবিতা ও গদ্যাংশ শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও আদর্শগুলি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় নি। সাহিত্যগুণ অপেক্ষা বিষয়বস্তু সেখানে অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। সংকলনগুলির অধিকাংশই উদ্দেশ্যমূলক,—নীতি শিক্ষাদান যার উদ্দেশ্য। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও সংকলিত 'কিশলয়' গ্রন্থ পাঠ্য হিসাবে প্রচলিত। নবম দশম শ্রেণীর জন্যও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নির্ধারিত 'পাঠসংকলন' (বিশ্বভারতী-প্রকাশিত) পাঠ্য হিসাবে প্রচলিত। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম—এই তিনটি শ্রেণীর সংকলন-গ্রন্থ বাজারে বিভিন্ন পুস্তক প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রকাশ করে থাকেন। তাঁরা অবশ্য এ বিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের *guide line* মেনে চলেন। এই সংকলনগুলির কোনটাতেই ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও আদর্শগুলি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় নি। গদ্যাংশ সংকলনের ক্ষেত্রে সাধুভাষার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষার্থীরা চলতি ভাষা ব্যবহার করে। পঞ্চম শ্রেণীর 'কিশলয়' গ্রন্থের সংকলনে কবিতা ও গদ্যাংশের সংকলন শতাধিক পৃষ্ঠার দীর্ঘায়তন পুস্তকের মধ্যে আছে। পৃষ্ঠাগুলির আয়তনও বড়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ষষ্ঠ শ্রেণীর নির্ধারিত সংকলন-গ্রন্থে (১৯৭৪) কমপক্ষে ২০টি গদ্যাংশ-কবিতাকে ছবি ও অনুশীলনী সহ ৬৮ পৃষ্ঠার মধ্যে সমাপ্ত করতে বলেছেন। ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন সংকলন-গ্রন্থে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গদ্যাংশ ও কবিতাকে সংকলন করতে বলা হয়েছে। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রকাশিত 'সাহিত্য চয়ন' (সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য) সার্থক সংকলন-গ্রন্থ। এই সমস্ত সংকলন-গ্রন্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পর্ষদ বিভিন্ন *guide line* দিয়ে দেন, সেই অনুযায়ী সংকলন করতে হয়। নবম দশম শ্রেণীর গদ্যাংশ ও কবিতা শিক্ষাদানের জন্য বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'পাঠসংকলন' গ্রন্থ নির্ধারিত হয়েছে। এই সংকলনটিতে কবিতা ও গদ্যের কালানুক্রমিক রচনা প্রকাশে ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয়েছে। কবিতাগুলি সুনির্বাচিত নয়। কবিতায় ধারাবাহিকতা রক্ষার চেষ্টা সার্থক হয় নি।

গদ্য ও কবিতার প্রচলিত পাঠ্যক্রম

যে কবিদের কবিতা এই সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে, তাঁদের কবিতা নির্বাচন-প্রসঙ্গে আরও একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখলে ভাল হ'ত। বিভিন্ন স্তরের কবি নির্বাচন-ক্ষেত্রেও বিশেষ সুবিচার করা হয় নি। কবি এবং কবিতা নির্বাচন ব্যাপারে প্রতিনিধিমূলক কবি অথবা তাঁদের প্রতিনিধিমূলক কবিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। 'কালবৈশাখী', 'হাট', 'ভারততীর্থ', 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' প্রভৃতি সুনির্বাচিত। 'আমরা', 'মা আমার' প্রভৃতি কবিতাগুলি কি এ-জাতীয় সংকলন-গ্রন্থে স্থান পাওয়ার যোগ্য ? পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকের সংকলনের দায়িত্ব একটি পুস্তক প্রতিষ্ঠানের উপর ছেড়ে দিলেন কেন ? পাঠসংকলনের গদ্য রচনাগুলিও সুসংকলিত নয়। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, কৌতূহল প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে গদ্যাংশগুলিকে নির্বাচিত করা হয় নি। গদ্য রচনাগুলি তাই শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিরক্তিকর ব'লে মনে হয়। পাঠসংকলনের নতুন সংস্করণও আমাদের প্রত্যাশা ব্যর্থ করেছে। নতুন সংস্করণেও পাঠ্য প্রবন্ধগুলি বৈচিত্র্যহীন ও নতুনত্বের স্বাদ-বর্জিত ;—বিষয়বস্তু ও রচনারীতি শিক্ষার্থীদের পক্ষে ক্লান্তিকর। কবিতাগুলির অধিকাংশই শিক্ষার্থীদের মনে কোন আবেদন জাগায় না। গদ্য ও কবিতা নির্বাচনের সময় কাব্যগুণ ও সাহিত্যোৎকর্ষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি।

ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্যক্রমে সব শ্রেণীর জন্যই **দ্রুতপঠনকে** অন্তর্ভূত করা হয়েছে। কিন্তু দ্রুতপঠনকে গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয় না। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম শ্রেণীর দ্রুতপঠনের পুস্তকগুলি যথাযথ নয়। দীর্ঘকাল ধরে একই গ্রন্থ দ্রুতপাঠ্য হিসাবে প্রচলিত থাকছে। গ্রন্থগুলির সামান্য অংশই বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণীতে দ্রুতপঠনের যে বই পড়তে হয়, তা কোনক্রমেই শিক্ষার্থীদের জন্য সুনির্বাচিত নয়। নির্দিষ্ট গ্রন্থগুলিও কঠিন। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীদের গ্রহণযোগ্য বই পাঠ্য করা উচিত। 'সংকল্প ও স্বদেশ' ও 'চরিতকথা' গ্রন্থ দু'টির অনেক অংশ বেশ কঠিন। 'রামায়ণী কথা' শিক্ষার্থীরা পড়বে কেন ? দ্রুতপঠন অংশে ভাবসম্প্রসারণ, ভাবসংক্ষেপ ইত্যাদি থাকবে কেন ? এই প্রসঙ্গে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন করতে হবে। দ্রুতপঠনের পুস্তকগুলির মধ্যে সাহিত্যগুণ থাকবে না কেন ? কোন্ যুক্তিতে শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি'র পরিবর্তে 'রাজর্ষি' পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় ? পাঠ্যক্রমে 'রামায়ণী কথা' অনুপ্রবেশ করে কিভাবে ? বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ থাকলে বাইবেল-কোরান আসে না কেন ? এক্ষেত্রে সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ রচনার উপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। দ্রুতপঠনকে আরও গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাদান করতে হবে।

দ্রুতপঠন

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে **অলংকার** অংশের সংযোজন যুক্তিযুক্ত হয়েছে। অলংকার সম্বন্ধে ধারণা থাকলে কাব্য কবিতার সৌন্দর্য উপলব্ধি করা সহজ হয়। অলংকারের নির্বাচিত অংশ গ্রহণ করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে কঠিন নয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের অলংকার অংশের সংযোজন তাই যথাযথ হয়েছে।

অলংকার

মাধ্যমিক শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষার পাঠ্যক্রমের অনুবাদের স্থান অল্প। অথচ ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবাদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে তাই অনুবাদকে পাঠ্যতালিকায় গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। অনুবাদ-চর্চার অভাবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ভাষায় বলিষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টির পরিচয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

অনুবাদ

বাংলা ভাষার পাঠ্যক্রম **রচনার** স্থানটি সুনির্দিষ্ট। কিন্তু রচনা-শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। **রচনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, রচনারীতির উপর ততখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। ফলে, শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল সাহিত্য-সৃষ্টির দিকে যায় না। ভাবসম্প্রসারণ ও ভাবার্থ-লিখনও** ভাষা-সাহিত্য শিক্ষার অনুকূল। পাঠ্যক্রমের মধ্যে এগুলি স্থান পেয়েছে। ভাব-সম্প্রসারণের মধ্যে শিক্ষার্থীদের বর্ণনাশক্তি, রচনা-কৌশল, উপস্থাপন-বৈশিষ্ট্য, কল্পনা-শক্তি ও মননশীলতা যথাযথভাবে বিকশিত হয়। সারসংক্ষেপ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মূল বিষয়টি বুঝতে শেখে এবং বিষয়টির মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় সহজ ও সংক্ষিপ্ত ক'রে লিখতে পারে। ভাষাশিক্ষায় তাই রচনা লেখা, ভাবসম্প্রসারণ, সারসংক্ষেপ, মর্মার্থ-লিখন ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ; কিন্তু বিদ্যালয়ে এগুলি শিক্ষা-দানের জন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পাওয়া যায় না। দ্রুতপঠন থেকে ভাবসম্প্রসারণ ও সারসংক্ষেপের প্রশ্ন কেন ? বিষয়গুলিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে হবে।

রচনা ও ভাবসম্প্রসারণ

বাংলা ভাষার পাঠ্যক্রমে **ব্যাকরণের** স্থানটি সুনির্দিষ্ট। প্রতি শ্রেণীতেই ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যাকরণের পাঠ্যক্রম বৈজ্ঞানিকভাবে নিধারিত হয় না। প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যেও অজস্র ভুল ও অবৈজ্ঞানিক *treatment* আছে। ব্যাকরণ শিক্ষাদানকে পৃথকভাবে না দেখে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে দেখতে হবে এবং সম্পূর্ণ আরোহী পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হবে। **পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ব্যাকরণের *Inductive treatment* থাকলে ভাল হয়।** পাঠ্যক্রমে *Text Book* থেকে সহজ সরল কতক-গুলি ব্যাকরণের প্রশ্ন করবার ব্যবস্থা আছে। ব্যাপারটি অযৌক্তিক। পাঠ্যক্রম থেকে অংশটি তুলে দিয়ে সে স্থানে অনুবাদকে স্থান ক'রে দেওয়া যেতে পারে।

ব্যাকরণ

বিদ্যালয়গুলিতে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্যক্রমে আরও কতকগুলি ত্রুটি আছে। সেগুলি হ'ল,—

(১) সহপাঠ্যক্রমিক সাহিত্যানুশীলনের সুযোগ নেই ;
(২) হাতের লেখার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না ;
(৩) শ্রুতলিখন যথাযথ স্থান পায় নি ;
(৪) পাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া হয় নি ;
(৫) বানান শিক্ষাদান যথাযথ গুরুত্ব পায় নি ;

(৬) কোন ক্ষেত্রেই সাহিত্যগুণ, রসোপলব্ধি, শিল্প-সৌন্দর্য, নন্দন-চেতনা ও রচনারীতি উপযুক্তভাবে স্বীকৃত হয় নি ;

(৭ পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের পক্ষে গুরুভার হয়েছে।

অবৈজ্ঞানিক, মনস্তত্ত্ব-বিরোধী এই পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষা ও সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে তাই ব্যর্থ হয়েছে। ভাষা-শিক্ষা পুস্তক-কেন্দ্রিক ও পরীক্ষা-শাসিত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাই ভাষাগত দক্ষতার দৈন্য দেখা যায়।

॥ নতুন পাঠ্যক্রমের পর্যালোচনা ॥

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলিত পাঠ্যক্রমের ব্যর্থতার কথা ব'লে *Higher Secondary System* বাতিল ক'রে আবার নতুন ভাবে দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে, সেখান থেকেই এই নতুন পাঠ্যক্রম আরম্ভ হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির বাংলাভাষা পঠন-পাঠনের পাঠ্যক্রমের ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষদ বিভিন্ন শ্রেণীতে বাংলা ভাষার নিম্নরূপ পাঠ্যক্রম ঘোষণা করেছেন।

ষষ্ঠ শ্রেণী : একটি পত্র—পূর্ণসংখ্যা—১০০

(লেখার অংশ - ৯০ ; মৌখিক—১০)

১। পাঠ্যগ্রন্থ	
(ক) গদ্যাংশ	২০
(খ) পদ্যাংশ	২০
২। ব্যাকরণ	২০
৩। পত্ররচনা ও অনুচ্ছেদ লিখন	১৫
৪। সহায়ক পাঠ	১৫
৫। মৌখিক	১০

সপ্তম শ্রেণী : একটি পত্র পূর্ণসংখ্যা ১০০

(লেখার অংশ—৯০ ; মৌখিক—১০)

১। পাঠ্যগ্রন্থ	
(ক) গদ্যাংশ	২০
(খ) পদ্যাংশ	২০
(গ) পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ	৫
২। ব্যাকরণ	২০
৩। প্রবন্ধ এবং পত্ররচনা বা গল্প-লিখন	২০ (১২+৮)
৪। সহায়ক পাঠ	১০
৫। মৌখিক	১০

অষ্টম শ্রেণী ঃ একটি পত্র, পূর্ণসংখ্যা ১০০
(লেখার অংশ—৯০ ; মৌখিক- ১০)

১।	পাঠ্যগ্রন্থ	
	(ক) গদ্যাংশ	২০
	(খ) পদ্যাংশ	২০
	(গ) পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ	৫
২।	ব্যাকরণ	১৫
৩।	প্রবন্ধ এবং পত্রলিখন/গল্পরচনা	২০ (১২+৮)
৪।	সহায়ক পাঠ	১০
৫।	মৌখিক	১০

নবম ও দশম শ্রেণী ঃ

॥ **প্রথম পত্র** ॥ (লেখার বিষয়- ৮০ ; মৌখিক- ২০)

১।	কাব্য পাঠ্যগ্রন্থ	২০
২।	প্রবন্ধ	২০
৩।	ইংরেজী থেকে বঙ্গানুবাদ	১০
৪।	ভাব সম্প্রসারণ/সারাংশ	১০
৫।	সহায়ক পাঠ (কাব্য)	২০
৬।	মৌখিক	২০

॥ **দ্বিতীয় পত্র** ॥ (লেখার বিষয়—৮০ ; মৌখিক—২০)

১।	(ক) গদ্য পাঠ্যগ্রন্থ	৩০
	(খ) গদ্যাংশের ব্যাকরণ	১০
২।	ব্যাকরণ	২৫
৩।	সহায়ক পাঠ (গদ্য)	১৫
৪।	মৌখিক	২০

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন

এই নতুন পাঠ্যক্রমের বিশদ পর্যালোচনা করা যেতে পারে। পুরাতন পাঠ্যক্রমের সঙ্গে নতুন এই পাঠ্যক্রমের মৌলিক পার্থক্য খুব বেশী নেই। ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে গঠিত একাদশ-শ্রেণীর বিদ্যালয়ের পরিবর্তে আবার নতুন ক'রে দশম শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রবর্তিত হয়েছে। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়-ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু কেন ব্যর্থ হ'ল ? তার জন্য পাঠ্যক্রম কি একমাত্র কারণ ? দেশজোড়া হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবকের জীবনের অনিশ্চয়তা শিক্ষাক্ষেত্রে হতাশা ও আগ্রহহীনতার সৃষ্টি করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বব্যাপক নৈরাজ্য বিরাজ করছে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী থেকে সংবিধান অনুসারে আমাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। ১০ বছরের মধ্যে (অর্থাৎ ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা

চালু করা হবে—এ নির্দেশ সংবিধানেই দেওয়া আছে। কিন্তু সেকাজটি সম্পন্ন করতে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হোল। শিক্ষা-সংকোচের সরকারী নীতি শিক্ষাক্ষেত্রে এক অস্বাভাবিক ও অস্থির অবস্থা ডেকে এনেছে। এদেশের কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রতিরক্ষাখাতে অধিকতর অর্থ ব্যয় করা হয়, এমনকি জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যও শিক্ষার তুলনায় বেশী অর্থ ব্যয় করা হয়। শিক্ষার প্রসার যে দেশের কৃষি, শিল্প ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সহায়ক শক্তি, সেকথা এখনও স্বীকার করা হয় নি। দেশের মানুষ সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক দিক্ থেকে এক অদ্ভুত অবস্থায় আছে। স্বাধীনতার ৩২ বছর পরেও এদেশে ৭০% মানুষ নিরক্ষর। এই সব সামগ্রিক অবস্থাই একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাগত ব্যর্থতার কারণ। একাদশ শ্রেণীর শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও যথাযথভাবে রূপায়িত করা হয় নি। সে সব দিকে যথাযথ লক্ষ্য না ক'রে, সমগ্র পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন না ক'রে, শিক্ষাক্ষেত্রে তুঘলকী পরিবর্তন করা হয়েছে। খাঁচার উন্নতি হলেই পাখির উন্নতি হয় না। যে সব শিক্ষার্থীদের উপর আগামী দিনে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তাদের জীবনের উপর এমন মারাত্মক *experiment* বিস্ময়জনক। তা সত্ত্বেও নতুন পাঠ্যক্রম পশ্চিমবাংলার শিক্ষাজগতে এসেছে। প্রতিবাদ হয়েছে, আন্দোলনও হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতগুলি অতিরিক্ত শিক্ষকের ভবিষ্যৎ কি হবে? নতুন পাঠ্যক্রম কি মূল সমস্যার সমাধান করতে পারবে? নতুন পাঠ্যক্রম কি শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও আদর্শগুলিকে সফল করে তুলতে পারবে? এসব প্রশ্নের উত্তর এখনই দেওয়া মুস্কিল। কিন্তু কিছু কি আন্দাজ করা যায় না?

ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য আনুমানিক ১০টি **গদ্য রচনা** গদ্যাংশ-পদ্যাংশের সংকলনে স্থান পাবে। গদ্যাংশের রচনাগুলির মধ্যে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, সমাজ-সংস্কারক ও মনীষীদের জীবন-কথা, বৈচিত্র্যমূলক সাহিত্যিক ও দেশাত্মবোধক রচনা, গল্প, উপাখ্যান, ভ্রমণ-কাহিনী, অভিযান ও আবিষ্কার প্রভৃতি থাকবে। রচনাগুলির মধ্যে ২টি রচনা চলিত ভাষায় হবে, বাকীগুলি হবে সাধু ভাষায়। **সপ্তম শ্রেণীতে**-ও গদ্যাংশ-পদ্যাংশের জন্য একটি মাত্র সংকলন-গ্রন্থ থাকবে। গদ্যাংশের মধ্যে থাকবে (ক) নানা সাহিত্যিক বিষয়, প্রাকৃতিক দৃশ্য, গল্প, স্মৃতিচারণ, ভ্রমণ-কাহিনী প্রমুখ রচনা, (খ) স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক বিষয় (দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির ও জাতীয় গৌরব-বিষয়ক রচনা), (গ) জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের জীবনবৃত্তান্ত ও সংগ্রামের কথা (সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মুখ্যতঃ উনবিংশ শতক হতে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সময়ের কথা), (ঘ) মহৎ জীবন-কথা (সর্বভারতীয় মহাপুরুষদের জীবনবৃত্তান্ত), (ঙ) একটি নাট্যাংশ। গদ্যের ভাষা প্রধানতঃ সাধুরীতির হবে, তিনটি রচনা চলিত ভাষার হবে। প্রসিদ্ধ লেখকবর্গের রচনা কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত হবে। রচনার দৈর্ঘ্য এমন হবে, যাতে দু'দিনে একটি গদ্যাংশ পাঠদান শেষ করা যায়। **অষ্টম শ্রেণীতে**-ও গদ্যাংশ-পদ্যাংশের জন্য একটিমাত্র পাঠ্য পুস্তক থাকবে। গদ্যাংশের বিষয়বস্তু সপ্তম

গদ্যাংশের পাঠ্যক্রম ও তার পর্যালোচনা

শ্রেণীর মতই থাকবে, কেবল জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের জীবনী ও সংগ্রামের কথা অংশে পলাশীর যুদ্ধ ও সিপাহী বিদ্রোহ থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত সময়-কাল বাঞ্ছনীয়। রচনার মান অবশ্য সপ্তম শ্রেণীর তুলনায় উচ্চতর হবে। **নবম-দশম শ্রেণীর** সংকলন-গ্রন্থ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকাশ করেছেন, তা থেকে পাঠ্য নির্ধারিত হবে। ঐ সংকলন-গ্রন্থের গদ্যাংশগুলিতে সাধুরীতির রচনাই প্রাধান্য পেয়েছে, প্রতি শ্রেণীতে ২।৩টি করে গদ্য রচনা চলিত-রীতির হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক জীবনে চলিত ভাষা ব্যবহার ক'রে থাকে। তাই গদ্যাংশের সংকলনে চলিত ভাষার প্রাধান্য থাকলে শিক্ষার্থীদের জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগসেতু স্থাপিত হ'ত। আধুনিক গদ্য-সাহিত্যে চলিত ভাষার অপ্রতিহত প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রোত্তর যুগের অধিকাংশ কথাসাহিত্যিক ও গদ্যশিল্পী চলিত-রীতিকেই অবলম্বন করেছেন। তাই সাধুরীতির গদ্যরচনা প্রধানতঃ প্রাচীন রচনাই হ'বে। বিষয়বস্তুর মধ্যে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির জীবনীর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এত বেশী ধর্ম যে, ধর্ম-নিরপেক্ষ এই দেশে কোন্ ধর্মের মনীষীকে বাদ দিয়ে কোন্ ধর্মের মনীষীকে গ্রহণ করা হবে? গদ্যরচনার মধ্যে দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা-আন্দোলনের কথা স্থান পেয়েছে। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সাহিত্যগুণ ও রচনারীতিই প্রধান স্থান পাবে। দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের শিক্ষাদান ক'রে সাহিত্য শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়? দেশের মানুষের এই অত্যাচার, অনাচার, শোষণ, বঞ্চনা ও নিষ্পেষণের যুগে সঠিক দেশপ্রেম কি? দেশকে ভালবাসা মানে তো দেশের মানুষকে ভালবাসা! দেশের মানুষকে শোষিত ও বঞ্চিত ক'রে দেশপ্রেম তো কথার ফানুস মাত্র। গদ্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ স্থান পায় নি। ষষ্ঠ শ্রেণীতে রূপকথা-জাতীয় রচনা স্থান পেতে পারতো। পাঠ্যক্রমে প্রকৃতি-বিষয়ক রচনাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া উচিত ছিল। গদ্য-শিক্ষাদানের এই নতুন পাঠ্যক্রমের কাছে নতুন ক'রে প্রত্যাশা করবার কিছুই নেই। বরং আরও সচেতনভাবে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এই পাঠ্যক্রমকে বিশেষ এক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করবার মত ক'রে প্রস্তুত করা হয়েছে। গদ্যাংশের পাঠ্যক্রম রচনায় সাহিত্যগুণ ও রচনারীতির উপেক্ষা সত্যই বিস্ময়কর।

কবিতার পাঠ্যক্রম ও তার পর্যালোচনা

কবিতা ও গদ্যাংশের জন্য সব শ্রেণীতেই একটি মাত্র সংকলন-গ্রন্থ থাকবে। ষষ্ঠ শ্রেণীর সংকলন-গ্রন্থে আনুমানিক ১০টি **পদ্যাংশ** থাকবে। পদ্যাংশের জন্য বিভিন্ন ভাব ও ছন্দের কবিতা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূ'ত হবে। এই পর্যায়ে বাংলা ও বাঙালীর কথার অর্থাৎ রাজ্যের ও জাতির কথার প্রাধান্য থাকা বাঞ্ছনীয়। সপ্তম শ্রেণীতে প্রসিদ্ধ কবিগণের বিভিন্ন ভাব ও ছন্দের কবিতা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূ'ত হবে, কবিতাগুলি কালানুক্রমিক হবে। অষ্টম শ্রেণীতে পদ্যাংশ ও কবিতার পাঠ্যক্রম সপ্তম শ্রেণীর অনুরূপ হবে। নবম-দশম সংকলন-গ্রন্থ মধ্যশিক্ষাপর্ষদ প্রকাশ করেছেন। কাব্য-কবিতার পাঠ্যক্রমের ব্যাপারে খুব বেশী কথা বলা হয় নি। ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে বাংলা ও বাঙালীর কথা অর্থাৎ রাজ্যের ও জাতির কথার প্রাধান্য থাকবে ব'লে বলা হয়েছে। কিন্তু

বাংলা ও বাঙালীর কথা বলতে গেলে তো সাধারণ মানুষের কথা বলতে হয়! এখানে শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, অর্ধাহার, অনাহার, দুঃখ, দারিদ্র্য ও ভয়াবহ বেকারীর কথা এসে পড়ে। শিক্ষার্থীদের সামনে জীবনের অবক্ষয় ও নেতিমূলক দিকগুলি তুলে ধরা কি ঠিক হবে? তা না ক'রে, অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনী ও শিল্পপতিদের কথা বলা যায়। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে তো বাঙালীর জাতীয় জীবনের সত্যিকার কথা ধরা পড়বে না! কবিতা ও পদ্যাংশের পাঠ্যক্রমের মধ্যে নতুন কি এসেছে? প্রচলিত পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন, অন্ততঃপক্ষে কবিতার ক্ষেত্রে, কি প্রয়োজনীয় ছিল? কি পরিবর্তন হয়েছে? এইভাবে দেখা যায় যে, কবিতা ও পদ্যাংশের পাঠ্যক্রমে মৌলিক কোন পরিবর্তন করা হয় নি।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষদ বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য **ব্যাকরণের** বিস্তৃত পাঠ্যক্রম দিয়েছেন। ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য ১০%, সপ্তম শ্রেণীর জন্য ২০% (ব্যাকরণ ১৫%+ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ৫%), অষ্টম শ্রেণীর জন্য ২০% (ব্যাকরণ ১৫%+পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ৫%), নবম ও দশম শ্রেণীর দ্বিতীয় পত্রের জন্য ৩৫% (ব্যাকরণ ২৫%+ গদ্যাংশের ব্যাকরণ ১০%) ব্যাকরণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আছে। বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ্যাংশের উপর ব্যাকরণের পাঠ্যক্রম বিতর্কমূলক বিষয়। গদ্য বা কবিতার মধ্যে ব্যাকরণ প্রবেশ করলে তার সাহিত্যগুণ বা শিল্পসৌন্দর্য অনুভূতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাকরণের জন্য যখন পৃথক্ পাঠ্যক্রম আছে, তখন পাঠ্যাংশের মধ্যে ব্যাকরণকে টেনে আনবার সার্থকতা কোথায়? পর্ষৎ বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাকরণের পৃথক্ পৃথক্ বিস্তৃত পাঠ্যক্রম ঘোষণা করেছেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ব্যাকরণের বিস্তৃত পাঠ্যক্রম ও পৃথক্ একটি ব্যাকরণ পুস্তক শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের মধ্যে হবে কি না, তাও ভেবে দেখতে হবে। ব্যাকরণের প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমের আয়তনও বিশাল। প্রদত্ত পাঠ্যক্রমটিকে সহজ থেকে জটিলতার পথে সাজানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয়েছে। ব্যাকরণের ক্ষেত্রে আরোহী পদ্ধতি ও ভাষাক্রম পদ্ধতিকে রক্ষা করা হয় নি। ব্যাকরণের প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমের সঙ্গে প্রচলিত পাঠ্যক্রমের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। তাই এই-জাতীয় সাধারণ পরিবর্তন পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে খুব বেশী জরুরী ছিল কি না, তাও ভেবে দেখতে হবে।

ব্যাকরণের প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমের পর্যালোচনা

বাংলাভাষার শিক্ষাদানের নতুন পাঠ্যক্রমের মধ্যে **দ্রুতপঠনকে** বিশেষ একটি স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণীতেই দ্রুতপঠন বা সহায়ক পাঠ নির্দিষ্ট আছে। **ষষ্ঠ শ্রেণীতে** সহায়ক পাঠের জন্য একখানি গদ্য বা কবিতার গ্রন্থ থাকবে,—যে-কোন একটি পড়ানো হবে। দ্রুতপঠনের এই পুস্তকটির মধ্যে বিষয়বস্তু হবে—ভারতে প্রচলিত ধর্ম, ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা, জাতীয় ভাবোদ্দীপক কাহিনী, নীতিকথা, মহাপুরুষদের জীবন-কথা প্রভৃতির একটি বা একাধিক বিষয়। **সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর** জন্য দ্রুতপঠনের একই রকম পাঠ্যসূচী ঘোষণা করা হয়েছে।

দ্রুতপঠনের প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমের পর্যালোচনা

এক্ষেত্রেও গদ্য বা কবিতার যে-কোন একটি গ্রন্থ সহায়ক পাঠ হিসাবে প্রচলিত হবে, গদ্যের ভাষা হবে সাধুরীতির। এই পর্যায়ে দ্রুতপঠনের বিষয় হবে—

(ক) ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ক রচনা (বেশভূষাদি, স্থাপত্য-ভাস্কর্যাদি, আতিথেয়তা-জীবসেবাদি ; **(খ)** ধর্ম-সমাজ-রাজনীতি প্রমুখ ক্ষেত্রে খ্যাতনামা ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মনীষীদের জীবন-বৃত্তান্ত, **(গ)** আত্মস্মৃতি ও ভ্রমণকাহিনী, **(ঘ** নানা সাহিত্যিক রচনা (পুরাণাদির গল্প ও চরিত্র, বাংলা মঙ্গলকাব্য ও গীতিকাব্যাদির কাহিনী ও চরিত্র)। এই বিষয়গুলির একটি বা একাধিক বিষয় অবলম্বনে একটি রচিত হবে। **নবম-দশম শ্রেণীর** জন্য পর্ষৎ একটিমাত্র শিক্ষাবর্ষের (১৯৭৪-৭৫) জন্য দ্রুতপঠনের পাঠ্যক্রম ঘোষণা করেছেন। সেগুলি হোল,—

গদ্য—১। জীবনস্মৃতি (নির্বাচিত অংশ)—রবীন্দ্রনাথ
২। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য—বিবেকানন্দ
৩। রামায়ণী কথা (নির্বাচিত অংশ)—দীনেশচন্দ্র সেন

পদ্য—১। কথা ও কাহিনী—রবীন্দ্রনাথ
২। কবিতা-সংকলন—বিশ্বভারতী

কবিতা-সংকলন থেকে একটি গদ্য ও একটি কবিতা পাঠ্য হবে। পর্ষৎ প্রয়োজন বোধ করলে উল্লিখিত গ্রন্থতালিকা বৃদ্ধি করতে পারবেন। দ্রুতপঠনের জন্য আখ্যান, ঘটনাবর্ণনা, ভাববস্তু ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ পরিচিতি শিক্ষা দেওয়া হবে। দ্রুতপঠনের গ্রন্থগুলির ক্ষেত্রে সাহিত্যগুণকে আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। ষষ্ঠ, সপ্তম অষ্টম শ্রেণীতে গদ্য অথবা পদ্য সহায়ক পাঠ হিসেবে থাকবে, দু'টিকেই রাখতে পারলে ভাল হ'ত। দ্রুতপঠনের বিষয়বস্তুব উপর অযথা অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দ্রুতপঠনের বিষয়বস্তুর মধ্যে ধর্ম, জাতীয় বা জাতীয়তা-বোধ, সংস্কৃতি ঐতিহ্য, মহাপুরুষদের জীবনকথা ইত্যাদিকে প্রাধান্য না দিলেই হ'ত, কারণ ওগুলি ইতিহাসের বিষয়বস্তু। দ্রুতপঠনের ক্ষেত্রে সাহিত্যগুণ, শিল্পোৎকর্ষ, বর্ণনাভঙ্গী, রচনারীতি প্রভৃতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করলে নতুন পাঠ্যক্রম সার্থক হ'তে পারত।

পর্ষৎ ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুচ্ছেদ রচনা ও অন্যান্য শ্রেণীর জন্য প্রবন্ধ রচনাকে পাঠ্যক্রমে সুনির্দিষ্ট স্থান দিয়েছেন। ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান প্রবন্ধ-রচনার জন্য যথেষ্ট নয় ব লে সেক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ রচনাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ লেথার জন্য অতি-পরিচিত বিষয়কে (যেমন — গরুর আকার, কাকের স্বভাব ইত্যাদি) গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। সপ্তম শ্রেণীতে প্রবন্ধ-রচনার বিধি ও কৌশল শিক্ষা দিতে হবে। জীবনী বর্ণনা ও তথ্যমূলক প্রবন্ধ রচনাকে পাঠ্যক্রমে স্থান দেওয়া হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর জন্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হবে আত্মকাহিনীমূলক, সমস্যামূলক,

অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ রচনার প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমের পর্যালোচনা

মানসিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সার্থক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হবে। শিক্ষাকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক শক্তি হিসেবে দেখতে হবে। শিক্ষা ছাড়া কৃষি, শিল্প ইত্যাদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই বিষয়ে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে এবং সাধারণ মানুষের জীবনের উপযোগী ক'রে বাস্তবভিত্তিক পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। তার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন, প্রয়োজন সর্বক্ষেত্রে সর্বাত্মক পরিবর্তন। নতুন পাঠ্যক্রম তাই মৌলিক সমস্যার সমাধানে সফল হবে না, এ হ'ল, *"old wine in a new bottle."**

---

* পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যক্রম অনুসরণে লিখিত।—লেখক

বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি

তৃতীয় পর্ব

পাঠটীকা [Lesson Plan]

"আমাদের শিক্ষার সহিত
জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের
সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।
কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে?
বাংলাভাষা বাংলা সাহিত্য।"

—শিক্ষার হেরফের

॥ রবীন্দ্রনাথ ॥

পাঠটীকা

[Lesson Plan]

শিক্ষা আজ আর গতানুগতিক পথ ধ'রে কৃত্রিম ও যান্ত্রিক পথে চলে না। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ শিক্ষাকে তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। ফলে নতুন শিক্ষাদান-পদ্ধতির উদ্ভাবন হ'য়েছে, সৃষ্টি হ'য়েছে পদ্ধতি-বিজ্ঞান (Methodology)। প্রচলিত শিক্ষা শ্রেণী-পাঠন (Class teaching) ব্যবস্থার অনুযায়ী পরিকল্পিত হয়েছে। শ্রেণী-শিক্ষাকে সার্থকতামণ্ডিত ক'রতে হ'লে প্রতিটি শ্রেণীর প্রতিটি class এর জন্য পাঠ-পরিকল্পনা (Lesson Plan) ও পাঠটীকা প্রণয়ন প্রয়োজন। সম্পূর্ণরূপে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান ক'রতে হবে। শিক্ষক সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে শ্রেণীকক্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠদান করবেন। তিনি কি পড়াবেন, কি ভাবে পড়াবেন, কোন্ পদ্ধতি অনুযায়ী পড়াবেন, তা আগে থেকেই স্থির ক'রতে হবে। দৈনিন্দিন শ্রেণীশিক্ষা পরিচালনার জন্য এই যে প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা, এরই লিখিত বৈজ্ঞানিক রূপকে বলা হয় পাঠটীকা বা পাঠ-পরিকল্পনা। একটি সুনির্দিষ্ট ছক-এ পরিকল্পনা ক'রে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের জন্য প্রস্তুত হবেন।

পাঠটীকা কি ?

প্রচলিত শ্রেণীশিক্ষায় **পাঠটীকার প্রয়োজন** আছে। কারণ পাঠ-পরিকল্পনা না থাকলে পাঠদান লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। শ্রেণীশিক্ষাকে ত্রুটিমুক্ত করতেও পাঠটীকার প্রয়োজন আছে। কারণ পাঠটীকার মাধ্যমে পরিকল্পনা অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া যায়। শিক্ষকের প্রস্তুতির জন্য পাঠটীকার প্রয়োজন। শ্রেণী-পরিচালনা ও শিক্ষাদান-কার্য সুসম্পন্ন করতে শিক্ষকের পাঠটীকার প্রয়োজন। পাঠটীকা বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের অনুযায়ী হয়। কাজেই পাঠটীকার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। সুতরাং পাঠটীকা হবে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও মান অনুযায়ী। শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি, পূর্বজ্ঞান, শিক্ষাগত অগ্রগতি, গ্রহণ-ক্ষমতা প্রভৃতি বিচার ক'রে তাদের উপযোগী করে পাঠটীকা রচনা করা হয়। প্রত্যেকটি Period-এর সীমিত সময়ের ব্যাপ্তিকালের মধ্যে পাঠদান যথাযথভাবে সম্পন্ন ক'রতে হ'লে পাঠটীকার প্রয়োজন। শিক্ষাদানকে কিভাবে সরল ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, তা পাঠটীকা প্রণয়নের সময় বিচার করা হয়। শ্রেণীশিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠটীকার গুরুত্ব তাই অনস্বীকার্য।

পাঠটীকার প্রয়োজনীয়তা

হার্বার্টের (Herbert) শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী পাঠটীকার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। তিনি বলেন, জন্মের সময় শিশুর মন থাকে শূন্য। প্রকৃতি ও সমাজের সংস্পর্শে শিশু যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই শিশুর মানসিক

বিকাশ ঘটে। মনের দু'টি ক্ষমতা থাকে,—(১) পরিবেশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে উপস্থাপিত উপকরণগুলিকে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করার ক্ষমতা (Perception); (২) উপলব্ধিগুলিকে আয়ত্ত ক'রে নিজের মধ্যে গ্রহণ করার ক্ষমতা (Assimilation)। পুরাতন পূর্ব-সঞ্চিত ধারণা ও চিন্তার প্রয়োগ ক'রে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে নিত্য নতুন ধারণা মন আয়ত্ত করে। এই আয়ত্তীকরণকে বলা হয় সমবেক্ষণ (Apperception)। **এই পুরাতন ধারণার সাহায্যে নতুন ধারণার আয়ত্তীকরণ অর্থাৎ সমবেক্ষণবাদের উপরেই হার্বার্টের শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠিত।** পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের সম্প্রসারণ দ্বারাই জ্ঞান অর্জিত হয়। হার্বার্টের মতে শিশুকে যে নতুন জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় করানো হবে, সেই জ্ঞানকে তার পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে দেওয়া চাই। নতুন বিষয় আয়ত্ত করবার উপযুক্ত পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানরাশি শিশুর আছে কি না—তা দেখতে হবে। শিশুর জানা বিষয়ের সঙ্গে সমন্বিত ক'রে নতুন বিষয়ের উল্লেখ ক'রলেই নতুন বিষয় সম্পর্কে শিশুর মনে আগ্রহ বা ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হবে। তাই নতুন পাঠ শুরু করবার পূর্বে শিক্ষককে সেই নতুন পাঠের সঙ্গে সুকৌশলে ছাত্রের আয়ত্তীকৃত পুরাতন জ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়ে দিতে হবে। তখন নতুন জ্ঞান আয়ত্ত করা শিশুর পক্ষে সহজ হবে।

হার্বার্টের শিক্ষাদর্শন

আমাদের মনে কোন ধারণা গঠিত হ'লে, দু'টি ব্যাপার ঘটে। প্রথমে কোন বস্তুর মূর্তি মনের সামনে আসে, মন তখন তাতে নিবিষ্ট হয়। একে বলা হয় মনোনিবেশ (concentration)। তারপর নতুন বস্তুটির সঙ্গে পূর্ব-সঞ্চিত আয়ত্তীকৃত ধারণার সংযোগ হয়ে মনে নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়। কোন বস্তুর প্রতি মন নিবিষ্ট হ'লে বস্তুটি মনের সামনে ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠতে থাকে। বস্তুটি মনে যতই সুস্পষ্ট হ'তে থাকে, ততই মনের পূর্ব-সঞ্চিত ধারণাগুলির সঙ্গে তার সংযোগ ঘটতে থাকে এবং ব্যক্তির চিন্তাধারার সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। চিন্তাবৃত্তে (circle of thought) পড়লেই মন নতুন ধারণাকে সাজিয়ে গুছিয়ে মনের পূর্ব-সঞ্চিত একই ধারণাগুলির সঙ্গে এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে রাখে। তারপর প্রয়োজনমত বিশেষ শ্রেণীভুক্ত সেই ধারণা বা অভিজ্ঞতাকে সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। তাই দেখা যায় যে, হার্বার্টের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর হ'ল :—

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে হার্বার্টের চারিটি স্তর

(১) **সুস্পষ্টতা (Clearness)**
(২) **সংযোগ (Association)**
(৩) **শ্রেণীভুক্তকরণ (Classification or Systematisation)**
(৪) **প্রয়োগ-পদ্ধতি (Method)**

হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বের এই চারটি স্তরকে তাঁর অনুগামীরা কিছুটা পরিবর্তিত ক'রে পাঁচটি সোপানে দাঁড় করান। সুস্পষ্টতা (Clearness) স্তরটি শিক্ষাক্ষেত্রে বই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই স্তরটিকে ভেঙে জিলার (**Ziller**) আয়োজন (**Prepara-**

tion) ও উপস্থাপন (Presentation) এই দু'টি অংশে ভাগ করেন। হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বকে অনুসরণ ক'রে তাঁর অনুগামীরা **পঞ্চসোপান শিক্ষাপদ্ধতির** (**Five Formal Steps of Instruction**) সৃষ্টি করেন। এই পাঁচটি সোপান বা স্তর হ'ল—

(১) **প্রস্তুতি বা আয়োজন** (**Preparation**)
(২) **উপস্থাপন** (**Presentation**)
(৩) **তুলনা** (**Comparison**)
(৪) **সূত্রগঠন** (**Generalisation**)
(৫) **প্রয়োগ ও অভিযোজন** (**Application**)

হার্বার্টের নির্দেশিত আদর্শ অনুযায়ী বর্তমানে পাঁচটি সোপানকে সংক্ষিপ্ত ক'রে তিনটি সোপানে পরিবর্তিত ক'রে পাঠটীকা রচনা করা হয়। এই তিনটি সোপান হ'ল— (১) আয়োজন (Preparation), (২) উপস্থাপন (Presentation), (৩) অভিযোজন (Application)। হার্বার্টের পঞ্চ সোপানের তুলনা, সূত্রগঠন—এই দু'টি সোপানকে উপস্থাপন পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছে।

পাঠটীকা প্রণয়নের বিভিন্ন শর্ত

শ্রেণীর উপযুক্ত করে পাঠটীকা রচনা করতে হবে। শ্রেণীভেদে শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা পৃথক হয়। পাঠটীকাও সেই অনুযায়ী হবে। পাঠটীকা রচনার সময় তাই শিক্ষার্থীদের মানগত অবস্থা বিচার ক'রতে হবে। শিক্ষাদানের বিভিন্ন Period-এর ব্যাপ্তিকাল বিভিন্ন ধরনের থাকে। তাই পাঠটীকা রচনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শিক্ষাদানের জন্য কতখানি সময় পাওয়া যাবে। কোন্ ঋতুতে পাঠদান করা হ'চ্ছে সে কথাও পাঠটীকা প্রণয়নের সময় মনে রাখতে হবে। কারণ গ্রীষ্মকালে শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণে ক্লান্তি কম সময়ে আসে। কোথায় কোন্ শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হবে, তাও পাঠটীকায় উল্লিখিত থাকবে। ব্যাখ্যা, বর্ণনা, বিশ্লেষণ কোথায় কি রকম হবে তা নির্দেশিত থাকবে। বিভিন্ন প্রশ্ন, বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার, উদাহরণ ইত্যাদি কোথায় কিভাবে ব্যবহৃত হবে, তা পাঠটীকায় স্থান পাবে। শিক্ষার্থীকে পাঠ-গ্রহণে কতখানি সক্রিয় করা যায়, তার প্রতিফলন পাঠটীকায় পড়বে। জীবনমুখী ও বাস্তবধর্মী শিক্ষার কথাও পাঠটীকা রচনার সময় বিচার-বিবেচনা ক'রতে হবে।

উদ্দেশ্য

পাঠটীকায় শিক্ষাদানের **উদ্দেশ্য** (**Aim**) স্থির ক'রে নিতে হবে। উদ্দেশ্যহীন শিক্ষাদান সফল হ'তে পারে না। উদ্দেশ্য দু'প্রকার,—মুখ্য বা প্রত্যক্ষ, গৌণ বা পরোক্ষ। পাঠদানের বিষয়বস্তু যাতে শিক্ষার্থীরা যথাযথ গ্রহন ক'রতে পারে, তা হ'ল পাঠদানের **প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য**। আর শিক্ষার্থীদের ভাষা ব্যবহারে দক্ষ করা ; তাদের সাহিত্যানুরাগী করা ; তাদের চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, গ্রহণক্ষমতা, কল্পনা-প্রবণতা ইত্যাদির উন্মেষ ও বিকাশ-সাধন হ'ল পাঠদানের **পরোক্ষ উদ্দেশ্য**। পাঠটীকায় তাই পাঠদানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্যকে স্থান দিতে হবে।

শিক্ষাদানের সময় কি কি **শিক্ষাসহায়ক উপকরণ** (**Teaching Aids**) ব্যবহার করা যাবে, তাও পাঠটীকায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাবে। শিক্ষাকে আকর্ষণীয় ও সার্থক ক'রে তুলতে শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপকরণ দু'ধরনের; চক্, ডাস্টার, মানচিত্র প্রভৃতি শ্রেণীকক্ষের **সাধারণ উপকরণ**; আর বিভিন্ন সময় যে সব chart, graph, ছবি, মডেল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ ব্যবহার করা হবে, সেগুলিকে **বিশেষ উপরকণ** বলে। উপকরণগুলি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা-সহায়ক হবে, এবং সেগুলি শিক্ষাদান-কার্যে সাহায্য করবে। পাঠটীকায় তাই উপকরণগুলি যথাযথভাবে স্থান পাবে।

উপকরণ

পাঠগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের মনকে প্রস্তুত ক'রবার আয়োজন করতে হবে। কাজটি কঠিন। কারণ এই আয়োজন বা প্রস্তুতির উপরই পাঠদানের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর ক'রছে। বিদ্যালয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে, আর, একজনের পর একজন শিক্ষক এসে এক-একটি বিষয় পড়িয়ে দিয়ে যান। কাজেই একটি বিষয় থেকে শিক্ষার্থীদের মনকে সরিয়ে এনে আলোচ্য পাঠে তাদের মনকে স্থিতিশীল ক'রতে হবে। তাই পাঠটীকার অয়োজন-স্তর খুব গুরুত্বপূর্ণ। **আয়োজন** (**Preparation**) স্তরে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষাও করা হয়। কারণ, পুরাতন জ্ঞানের সাহায্যেই শিক্ষার্থীরা নতুন জ্ঞান আহরণ করে। পূর্বজ্ঞান-পরীক্ষা ও আলোচ্য পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য আয়োজন-স্তরে কৌতূহলোদ্দীপক কতকগুলি প্রশ্ন করা হয়। অনেকে এই স্তরে নাটকীয়তা সৃষ্টি ক'রেও শিক্ষাথীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। পাঠটীকায় আয়োজন-স্তর তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আয়োজন

পাঠদানের উপযুক্ত পরিবেশ ও মানসিকতা সৃষ্টি ক'রে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের কাছে **পাঠ-ঘোষণা** (**Announcement**) করেন। পাঠটীকায় তাই সুনির্দিষ্টভাবে পাঠ-ঘোষণার স্তর থাকবে।

পাঠঘোষণা

এর পর আসে **উপস্থাপন** (**Presentation**) পর্যায়। উপস্থাপন হল পাঠটীকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। কারণ এই সময় শিক্ষার্থীদের সামনে বিষয়বস্তুর আলোচনা উপস্থাপিত করা হয়। উপস্থাপন পর্যায়ে তাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে বিশেষভাবে স্থান দেওয়া হয়—

॥ এক ॥ **বিষয়বস্তু অনুযায়ী যথাযথ পদ্ধতি নির্বাচন করে সেই পদ্ধতি অনুসারে পাঠদানের পরিকল্পনা।**

॥ দুই ॥ **শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলির ব্যবহার।**

॥ তিন ॥ **বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীদের মান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন।**

॥ চার ॥ **সহজ, সরল, বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, বর্ণনা, বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে বিষয়বস্তুর সার্থক আলোচনা।**

॥ পাঁচ ॥ **ধারাবাহিকভাবে বিষয়বস্তুর সুশৃঙ্খল পরিবেশন।**

॥ ছয় ॥ বিষয়বস্তুকে ব্যঙ্গ, কৌতুক, নাটকীয়তা প্রভৃতি সহযোগে আকর্ষণীয় ক'রে উপস্থাপন।

॥ সাত ॥ প্রয়োজন হ'লে উদাহরণের ব্যবহার ও গল্পচ্ছলে শিক্ষাদান।

॥ আট ॥ পাঠদানে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

উপস্থাপন-পর্যায়ে তাই পরিকল্পনা ও চিন্তাভাবনা অনুযায়ী সতর্কভাবে পাঠ-টীকা রচনা ক'রতে হবে। উপস্থাপন-পর্যায়ে যথাযথ বোর্ডের ব্যবহার ক'রতে হবে।

অভিযোজন

নির্দিষ্ট পাঠ শিক্ষার্থীরা কতখানি আয়ত্ত ক'রেছে, বা, যা আয়ত্ত ক'রেছে তা তারা প্রয়োগ ক'রতে পারে কিনা, তার পরীক্ষা করা হয় **অভিযোজন (Application)** স্তরে। এই স্তরে শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়।

বাড়ীর কাজ

পাঠদানের শেষ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কতকগুলি **বাড়ীর কাজ (Home task)** দেওয়া হয়। কারণ 'বাড়ীর কাজ' হ'ল শ্রেণীশিক্ষার পরিপূরক। বাড়ীতে পড়াশুনা, অনুশীলন ও চর্চা ছাড়া শিক্ষার্থীদের পক্ষে পাঠগ্রহণ কখনই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। তাই পাঠটীকায় 'বাড়ীর কাজে'র উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

বাংলাভাষায় ও সাহিত্যের পাঠটীকা প্রণয়নের সময় সমগ্র বিষয়ের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষাদানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বের দিক্‌টা মনে রাখতে হবে। যেমন,—

কবিতা

[এক] **কবিতা-শিক্ষাদান :** কবিতার সরব পাঠ ও আবৃত্তির উপর জোর দিতে হবে। কবিতা পাঠ ক'রে শিক্ষর্থীর যেন ছন্দোবোধ ও রসানুভূতি সম্ভব হয়। কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর অলোচনাই কবিতা-শিক্ষাদানের মূল কথা নয়। কবিতা-শিক্ষাদানে তাই রসানুভূতি-মূলক পাঠের পথ ধ'রতে হবে।

গদ্য

[দুই] **গদ্য-শিক্ষাদান :** গদ্য-শিক্ষাদানে শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধির দিকে জোর দিতে হবে। প্রতি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ, যতি-চিহ্ন অনুযায়ী পাঠ, শব্দ-ব্যবহারের কৌশল, যুক্তি-বিন্যাস সম্বন্ধে ধারণা প্রভৃতিকে গদ্য-শিক্ষাদানের সময় গুরুত্ব দিতে হবে। গদ্যের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু একটি প্রধান বিষয়। গদ্য-রচনার সাহিত্য-গুণও লক্ষ্য ক'রতে হবে।

ব্যাকরণ

[তিন] **ব্যাকরণ-শিক্ষাদান :** আরোহী পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষাদান করতে হবে। কতকগুলি উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ ক'রতে হবে। সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই সূত্র নির্মাণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রতে পারবে। **আগে উদাহরণ, পরে সূত্র—এটিই ব্যাকরণ-শিক্ষাদানের মূল কথা।** এক্ষেত্রে সংগৃহীত উদাহরণগুলি শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ও জানা শব্দ থেকে সুনির্বাচিত হওয়া চাই।

রচনা

[চার] **রচনা-শিক্ষাদান**ঃ শিক্ষার্থীরা যাতে সুষ্ঠু ও শুদ্ধ ভাষার ব্যবহার ক'রে সৃজনশীল সাহিত্যধর্মী রচনা লিখতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সৃজনশীল সাহিত্য রচনার দিকে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেতে হবে।

ভাবসম্প্রসারণ

[পাঁচ] **ভাবসম্প্রসারণ**ঃ ভাবসম্প্রসারণ অনেকটা রচনাধর্মী বিষয়। শিক্ষার্থী যাতে মূল ভাবটিকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা ক'রে সম্প্রসারণ করে, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সাবলীল ও স্বাধীনভাবে ভাষা ব্যবহার ক'রবে ও নিজস্ব রচনারীতি ব্যবহার করবে।

দ্রুতপঠন

[ছয়] **দ্রুতপঠন**ঃ অনেকটা দ্রুতভাবে দ্রুতপঠন শিক্ষা দিতে হবে। কোন একটি বিষয় দ্রুত শিক্ষাদান ক'রে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু গ্রহণে সহায়তা করা হ'ল দ্রুতপঠন শিক্ষাদানের কাজ। দ্রুতপঠন-শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি ক'রতে হবে।

সাহিত্যের ইতিহাস

[সাত] **সাহিত্যের ইতিহাস শিক্ষাদান**ঃ এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস জানবে, বিভিন্ন লেখকের রচনা-রীতি ও সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে অবহিত হবে। ফলে, শিক্ষার্থীদের সাহিত্যনুরাগ বাড়বে। তবে এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ইতিহাসের প্রতি **বিশ্বস্ততা** প্রয়োজন।

অনুবাদ

[আট] **অনুবাদ-শিক্ষাদান**ঃ ইংরাজী থেকে বাংলায় অনুবাদ নতুন পাঠ্যক্রমে নতুন ক'রে অন্তভূত হ'য়েছে। কেবলমাত্র আক্ষরিক অনুবাদ নয়,—ভাবের স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল অনুবাদ প্রয়োজন। অনূদিত অংশ যেন ভাষা-ব্যবহার ও রচনা-রীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়।

পাঠটীকা—১

দেখব এবার জগৎটাকে

—কাজী নজরুল ইসলাম

"থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন করে।
কিসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে।
কেমন করে বীর ডুবুরি সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনে,
কেমন করে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গ পানে।"

বিদ্যালয়ের নাম—
শ্রেণী—পঞ্চম
ছাত্রসংখ্যা—৪০ জন
গড় বয়স—১০ + বৎসর
সময়—৩৫ মিনিট
তারিখ—
শিক্ষক—

বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিশেষ পাঠ—কবিতা
সাধারণ পাঠ—"দেখব এবার জগৎটাকে"
—নজরুল ইসলাম
পাঠক্রম—*১। প্রথম স্তবক
২। দ্বিতীয় স্তবক
৩। তৃতীয় স্তবক
আজকের পাঠ—* চিহ্নিত অংশ

উদ্দেশ্য—

॥ এক ॥ কবিতাটির বিষয়বস্তু উপলব্ধি করিতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
॥ দুই ॥ কবিতা-পাঠে ছাত্রছাত্রীদের অনুরাগী করা।
॥ তিন ॥ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জগৎকে জানবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র করা।
॥ চার ॥ শিক্ষাথীদের কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধন করা।

উপকরণ—

॥ এক ॥ চক্ ডাস্টার প্রভৃতি সাধারণ উরকরণ।
॥ দুই ॥ ডুবুরিদের মুক্তা-সংগ্রহের একটি চিত্র।

আয়োজন—শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য ও আজকের পাঠের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে,—

॥ এক ॥ আমাদের দেশের কোন বিদ্রোহী কবির নাম কর।
॥ দুই ॥ তাঁর লেখা কয়েকটি কবিতার নাম কর।
॥ তিন ॥ তোমাদের মধ্যে কে কে কোথায় কোথায় বেড়াতে গিয়েছ ?
॥ চার ॥ কোথাও বেড়াতে যেতে ভাল লাগে কেন ?

পাঠ-ঘোষণা—আজ আমরা কাজী নজরুল ইসলামের 'দেখব এবার জগৎটাকে' কবিতার প্রথম স্তবকটি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রব।

উপস্থাপনঃ—ছন্দ, যতি, মিল, উচ্চারণ ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে আলোচ্য অংশটির ভাবমধুর আদর্শ সরব পাঠ দেওয়া হবে। তারপর ২।৩টি ছাত্রকে আলোচ্য অংশটিকে আবৃত্তির মত ক'রে পড়তে বলা হবে। পাঠে বা আবৃত্তিতে তাদের ভুল থাকলে তার সংশোধন করা হবে। কবিতাটি পাঠদানের সময় আবৃত্তির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

কাজী নজরুলের জীবনী ও কবিত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

দুরূহ ও কঠিন শব্দগুলির অর্থ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা শব্দগুলি তাদের খাতায় তুলে নেবে। যেমন,—বদ্ধ>ঘেরা, যুগান্তর>অন্য যুগ, ঘূর্ণিপাক>যা ঘুরে ঘুরে পাক খায়, দেশান্তর>বিভিন্ন দেশ, লাখে লাখে>লক্ষে লক্ষে অর্থাৎ অনেক সংখ্যায়, ডুবুরি>যারা ডুব দিয়ে সমুদ্রতল থেকে মণিমুক্তা আহরণ করে, সেঁচে>সিঞ্চন করে ইত্যাদি।

এবার আলোচ্য অংশটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ ক'রে নিয়ে আলোচনা করা হবে,—

প্রথম পর্যায়—"থাকব নাকো......ঘূর্ণিপাকে।"

প্রশ্ন— ॥ **এক** ॥ কবি কোথায় থাকতে নিষেধ ক'রেছেন?
॥ **দুই** ॥ বদ্ধ ঘরে না থেকে কবি কি করতে বলেছেন?
॥ **তিন** ॥ মানুষ কোথায় ঘুরছে?
॥ **চার** ॥ মানুষ কোথা থেকে কোথায় ঘুরছে?

বাঁধাধরা জীবনের মধ্যে জীবনের সত্যিকার রূপ দেখা যায় না। কবি তাই বদ্ধ ঘরের সীমানা ছেড়ে সমস্ত জগৎকে দেখতে বলেছেন। এই জগতের মানুষ এক বিস্ময়কর জীব। সে যুগ থেকে যুগান্তরে ঘুরে ঘুরে চ'লেছে। সৃষ্টি ক'রছে নতুন নতুন সভ্যতা ও সমাজ।

দ্বিতীয় পর্যায়- 'দেশ হতে দেশ দেশান্তরে........মরণ-যন্ত্রণাকে।'

প্রশ্ন— ॥ **এক** ॥ মানুষ কোথা থেকে কোথায় ছুটে চলেছে?
॥ **দুই** ॥ অসংখ্য বার কেন মৃত্যু বরণ করে?
॥ **তিন** ॥ মৃত্যু যন্ত্রণাকে মানুষ কেন সাদরে বরণ করে?
॥ **চার** ॥ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মানুষ সমাজকে কি দিয়ে যায়?

সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য মানুষ বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ায়। প্রচুর পরিশ্রম ক'রে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অসংখ্য বীর সাদরে মৃত্যু বরণ করে। তাদের জীবনের বিনিময়ে সমাজ ও সভ্যতা উপকৃত হয়।

তৃতীয় পর্যায়—"কেমন করে বীর ডুবুরি……স্বর্গ পানে।"

প্রশ্ন— ॥ **এক** ॥ মুক্তা কোথা থেকে পাওয়া যায় ?

॥ **দুই** ॥ কে মুক্তা সংগ্রহ করে ?

॥ **তিন** ॥ ডুবুরি কিভাবে মুক্তা সংগ্রহ করে ? (ছবিটি দেখানো হবে)

॥ **চার** ॥ কাকে 'দুঃসাহসী' বলে ?

॥ **পাঁচ** ॥ মানুষ আকাশে কি ভাবে উড়ে চলে ?

ডুবুরিরা জীবনকে তুচ্ছ ক'রে অতল সাগরের তল থেকে মুক্তা সংগ্রহ ক'রে আনে। কত দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায়, কত মানুষের পরিশ্রমে ও জীবনদানে আজ আকাশে উড়োজাহাজ চালানো সম্ভব হ'য়েছে। এইভাবে মানুষের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ও জীবনমরণ পরিশ্রমে সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে চলেছে।

আজকের পাঠ্য কবিতাংশটিকে নীরব পাঠ করার জন্য শিক্ষার্থীদের ৩ মিনিট সময় দেওয়া হবে। তারপর শিক্ষার্থীদের যদি কোন প্রশ্ন থাকে, তবে তা উপস্থিত ক'রবার আহ্বান জানানো হবে।

বোর্ডের কাজ : শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় আজকের পাঠের নিম্নরূপ সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা তা খাতায় তুলে নেবে।

সারাংশ : জগৎ বিশাল। এই বিশাল বিশ্বজগৎকে জানবার জন্য কবি ছেলে-মেয়েদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। বদ্ধ জীবন যাপন না করে বিশ্বজগৎকে জানতে হবে। জানতে হবে কেমন করে মানুষের সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। যুগে-যুগে দেশে-দেশে মানুষ কত পরিশ্রম ক'রেছে। এমনকি, জীবনকে তুচ্ছ ক'রেও তারা সভ্যতার অগ্রগতির জন্য চেষ্টা ক'রেছে। মানুষের কল্যাণে অসংখ্য বীর জীবন দান ক'রেছেন। ডুবুরিরা জীবনকে তুচ্ছ ক'রে সমুদ্রের তল থেকে মুক্তা সঞ্চয় করে, কত দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ফলে আজ আকাশে মানুষ চলাচল ক'রছে। এর সবকিছুই জানতে হবে।

অভিযোজন : শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে :—

॥ **এক** ॥ ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকতে ভাল লাগে না কেন ?

॥ **দুই** ॥ মানুষের এই সভ্যতা কিভাবে গড়ে উঠেছে ?

॥ **তিন** ॥ লক্ষ লক্ষ বীর কেন প্রাণ দান করে ?

॥ **চার** ॥ মুক্তা কিভাবে সংগ্রহ করা হয় ?

॥ **পাঁচ** ॥ দুঃসাহসিক কাজকর্ম তোমার কেমন লাগে ? কেন লাগে ?

বাড়ীর কাজ : শিক্ষার্থীরা বাড়ী থেকে কবিতাংশটি মুখস্থ ক'রে আসবে।

পাঠটীকা—২
কপোতাক্ষ নদ

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

"সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে ! -
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে !
আর কি হে হবে দেখা ? যতদিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারিরূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে।"

বিদ্যালয়—	বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
শ্রেণী—ষষ্ঠ 'ক'	বিশেষ পাঠ—কবিতা
ছাত্রছাত্রী সংখ্যা—৩৮ জন	সাধারণ পাঠ—"কপোতাক্ষ নদ" —মধুসূদন দত্ত
গড় বয়স—১২ + বৎসর	
সময়—৪০ মিনিট	পাঠক্রম—*১। প্রথম ৮ ছত্র
তারিখ—	২। শেষ ৬ ছত্র
শিক্ষয়িত্রী—শ্রীমতী শুক্লা বসুরায়	আজকের পাঠ—*চিহ্নিত অংশ

॥ উদ্দেশ্য ॥

॥ এক ॥ রসসঞ্চারী পাঠের মাধ্যমে কবিতাটির মর্মার্থ, অর্থগৌরব ও রস-মাধুর্য উপলব্ধি ও উপভোগ করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।

॥ দুই ॥ ছাত্রছাত্রী সরব আবৃত্তি ও নীরব পাঠের শক্তির বিকাশসাধন, শব্দসম্ভার-বৃদ্ধি ও ভাষা-প্রয়োগে দক্ষ করা।

॥ তিন ॥ কবিতা-পাঠে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহী ও অনুরাগী করা।

॥ চার ॥ শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদির বিকাশ-সাধনে সহায়তা করা।

॥ পাঁচ ॥ মধুসূদনের কাব্য-কীর্তি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

॥ উপকরণ ॥ :

॥ এক ॥ চক, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

॥ দুই ॥ মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিকৃতি।

॥ আয়োজন ॥ :

আজকের পাঠ ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ করা ও তাদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নের অবতারণা করা হবে ;—

॥ এক ॥ বাংলা দেশের কোন্ কবি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ?

॥ দুই ॥ তাঁর লেখা কয়েকটি কবিতার নাম কর।

॥ তিন ॥ মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে কী জান ?

॥ চার ॥ বাংলা কবিতায় বিখ্যাত হ'য়েছে এমন কয়েকটি নদীর নাম কর।

॥ পাঠঘোষণা ॥ :

আজ আমরা মধুসূদন দত্তের লেখা 'কপোতাক্ষ নদ' শীর্ষক সনেট জাতীয় কবিতা-টির প্রথম ৮ ছত্র আলোচনা ক'রে তার বিষয়বস্তু ও কাব্যরস গ্রহণ ক'রবো।

॥ উপস্থাপন ॥ :

সরব পাঠ—কবিতাটির ছন্দ, যতি, উচ্চারণ ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের মনকে পাঠের প্রতি আগ্রহী ক'রে তোলার জন্য শিক্ষক মহাশয় অংশটির একটি আদর্শ সরব পাঠ দেবেন। পরে ৩।৪ জন শিক্ষার্থীকে আলোচ্য কবিতাটির সরব পাঠ ক'রতে দেওয়া হবে। ভুল হ'লে তা সংশোধন ক'রে দেওয়া হবে।

কবি-পরিচিতি—মধুসূদন দত্তের জীবন ও সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। শিক্ষক মহাশয় এই সময় কবির প্রতিকৃতিটি ছাত্রছাত্রীদের দেখাবেন।

রচনা-বৈশিষ্ট্য ও পটভূমি—'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি কবির অন্যান্য কবিতা থেকে পৃথক্ ধরনের। কবিতাটির প্রতি ছত্রের শেষে অন্ত্য মিল নেই। এই জাতীয় ছন্দকে 'অমিত্রাক্ষার ছন্দ' বলে। কবিতাটি চৌদ্দ লাইনের বলে একে 'চতুর্দশপদী কবিতা' বলে।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন ফরাসী দেশের ভার্সাই শহরে বসে জন্মভূমির কপোতাক্ষ নদের কথা স্মরণ করে কবিতাটি লেখেন। এই সময় কবি অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে ছিলেন। তিনি লিখেছেন—

"সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।"

শব্দার্থ-আলোচনা– ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতায় আজকের পাঠের অন্তর্গত কঠিন শব্দগুলির অর্থ আলোচনা করা হবে। এক্ষেত্রে বোর্ডের ব্যবহার করা হবে।

সতত—সব সময়, দুগ্ধস্রোতোরূপী —দুধের স্রোতের ন্যায়,
বিরলে—নির্জনে, নিশা—রাত্রি, ভ্রান্তি—ভুল।

বিষয়বস্তুর আলোচনা—সমগ্র কবিতাটিকে দু'টি অংশে ভাগ ক'রে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পাঠদান করা হবে ;—

প্রথম অংশ :—"সতত……ছলনে !—"

প্রশ্ন— ১) কার কথা কবির 'সতত' মনে হয় ?
(২) সব সময় কার 'কলকল' শব্দে কবি ভুল করেন ?
(৩) নিশার স্বপ্নে মানুষ কি শোনে ?
(৪) কবি তাঁর কান জুড়ান কিভাবে ?

আলোচনা :—কপোতাক্ষ নদের কথা কবির সর্বদাই মনে পড়ে। লোকে রাত্রির স্বপ্নে যেমন মায়াযন্ত্রের ধ্বনি শোনে, তেমনি কপোতাক্ষ নদের কলকলধ্বনিতে কবির শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়।

দ্বিতীয় অংশ :—"বহুদেশে……স্তনে !"

প্রশ্ন—(১) 'বঙ্গদেশে' কবি কি দেখেছেন ?
(২) কবির 'স্নেহের তৃষ্ণা' কার জলে মেটে ?
(৩) 'জন্মভূমি-স্তনে' 'দুগ্ধ স্রোতোরূপী' কে ?
(৪) কবি কিভাবে এই উপমাটি প্রয়োগ করেছেন।

আলোচনা :—বহুদেশে কবি অনেক নদনদী দেখেছেন। কিন্তু তাঁর অন্তরের তৃষ্ণা কপোতাক্ষ নদের জল ছাড়া আর কারও জলে মেটে নি। এই নদের জল যেন কবির দেশজননীর স্তনের ক্ষীরধারা।

কবিতাটির নীরব পাঠে জন্য ছাত্রছাত্রীদের ২।৩ মিনিট সময় দেওয়া হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকলে তার উত্তর দেওয়া হবে।

বোর্ডের কাজ : ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় আজকের পাঠের নিম্নরূপ সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। তারা তা খাতায় তুলে নেবে।

সারাংশ—"কপোতাক্ষ নদের কথা কবির সব সময় মনে পড়ে। কবি যেখানেই থাকুন না কেন, এই নদের কলধ্বনি তাঁর কানে বাজে। তিনি অনেক নদনদী দেখেছেন। কিন্তু কবির মন ভরে নি। এই নদের জল যেন কবির দেশমাতার স্তনের দুগ্ধক্ষীর।"

॥ **অভিযোজন** ॥ : ছাত্রছাত্রীরা আজকের পাঠ কতটা অনুধাবন করছে, তা' জানবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে ;—

॥ **এক** ॥ মধুসূদন দত্ত এইরূপ একটি কবিতা লিখলেন কেন ?
॥ **দুই** ॥ কপোতাক্ষ নদের প্রতি কবির এই ভালবাসা কেন ?
॥ **তিন** ॥ কবিতাটি তোমার কেমন লাগলো ? কেন ভাল লাগলো ?
॥ **চার** ॥ কবিতাটির ছন্দ ও রচনাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কি জান ?

॥ **গৃহকাজ** ॥ শিক্ষার্থীরা বাড়ী থেকে কবিতাটি মুখস্থ ক'রে আবৃত্তির উপযোগী ক'রে প্রস্তুত হয়ে আসবে।

পাঠটীকা—৩

ভারতের শিক্ষা

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র-বেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফল-স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।"

বিদ্যালয়—
শ্রেণী—সপ্তম 'খ'
ছাত্রীসংখ্যা—৩৬
গড় বয়স—১৩+ বৎসর
সময়—৪০ মিনিট
তারিখ—
শিক্ষয়িত্রী—শ্রীমতী শুক্লা বসুরায়

বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিশেষ পাঠ – কবিতা
সাধারণ পাঠ—'ভারতের শিক্ষা'
—রবীন্দ্রনাথ
পাঠক্রম—* ১। প্রথম স্তবক (প্রথম ৯ ছত্র)
২। দ্বিতীয় স্তবক (শেষ ৫ ছত্র)
আজকের পাঠ—* চিহ্নিত অংশ।

॥ উদ্দেশ্য ॥

১। রসসঞ্চারী পাঠের মাধ্যমে কবিতাটির মর্মার্থ, অর্থগৌরব উপভোগ করতে ছাত্রীদের সহায়তা করা।

২। কবিতা-পাঠে ছাত্রীদের অনুরাগী করা।

৩। ছাত্রীদের চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, ভাষাগত দক্ষতা ইত্যাদি ক্ষমতার বিকাশসাধনে সহায়তা করা।

৪। ছাত্রীদের রবীন্দ্রকাব্যের প্রতি আগ্রহী ও অনুরাগী করা।

॥ উপকরণ ॥

শ্রেণীকক্ষে সাধারণ উপকরণ।

॥ আয়োজন ॥

পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা ও আজকের পাঠে ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নগুলি করা হবে :—

(১) আমাদের কোন্ কবি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ?
(২) তাঁকে 'কবিগুরু' এবং আর কি আখ্যায় ভূষিত করা হয় ?
(৩) তোমাদের জানা কয়েকটি রবীন্দ্র-কবিতার পরিচয় দাও।
(৪) রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি ?

॥ **পাঠঘোষণা** ॥ আজ আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতের শিক্ষা' শীর্ষক কবিতাটির প্রথম স্তবক আলোচনা ক'রে তার মর্মার্থ গ্রহণ করবো।

॥ উপস্থাপন ॥

সরব পাঠ—কবিতাটির ছন্দ, যতি, উচ্চারণ ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ছাত্রীদের মনকে পাঠের প্রতি আগ্রহী করবার জন্য শিক্ষক মহাশয় সমগ্র অংশটির একটি আদর্শ সরব পাঠ দেবেন এবং ছাত্রীরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। পরে ৩।৪ জন ছাত্রীকে আলোচ্য অংশটির সরব আবৃত্তি ক'রতে বলা হবে ; তাদের ভুল হ'লে সংশোধন করে দেওয়া হবে।

কবি-পরিচিতি—কবির জীবন ও সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে ছাত্রীদের বয়স ও বুদ্ধি অনুযায়ী আলোচনা করা হবে।

রচনা-বৈশিষ্ট্য—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি প্রধানতঃ কবি ছিলেন। তাঁর কবিতাবলীর মধ্যে বিচিত্র ভাবের সমাবেশ দেখা যায়। পরাধীন ভারতের নিরীহ মানুষকে অতীত ভারতের ঐতিহ্য ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করবার জন্য তিনি 'স্বদেশ ও সংকল্প' নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আলোচ্য কবিতাটি ঐ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

শব্দার্থ আলোচনা—ছাত্রীদের সহযোগিতায় আজকের পাঠের অন্তর্গত কঠিন শব্দগুলির আলোচনা করা হবে। এক্ষেত্রে বোর্ডের ব্যবহার করা হবে।

নৃপতি—রাজা　　অরি—শত্রু
শর—তীর　　ব্রহ্ম—ভগবান
চিতে—হৃদয়ে　　সংহারিতে—হত্যা করতে
বিস্তার—ছড়ানো

বিষয়বস্তুর আলোচনা—ছাত্রীরা আলোচ্য অংশটি ২ ৩ বার পড়বে। তারপর তাদের কতকগুলি প্রশ্ন করা হবে ; এবং তাদের সহায়তায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর আলোচনা নিম্নরূপভাবে অগ্রসর হবে। আলোচনার স্থবিধার জন্য আলোচ্য অংশটিকে ২টি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া হবে।

প্রথম পর্যায়ঃ "হে ভারত........সংহারিতে।"

প্রশ্ন—১। কবিতায় কবি কাকে উদ্দেশ ক'রেছেন ?

২। অতীত ভারতবর্ষ রাজাকে কি করতে শিক্ষা দিয়েছে ?

৩। বীরগণ ধর্মযুদ্ধে কি করতেন ?

৪। অতীত ভারত থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই ?

আলোচনা—কবি এখানে ভারতের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরেছেন। প্রাচীন ভারতের রাজাগণ ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন ; তাঁরা ভোগ-বিলাসিতা ত্যাগ করে দরিদ্রবেশ ধারণ করতেন। বীরগণ পরাজিত শত্রুকেও ক্ষমা করতেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ "কর্মীরে........অনাথে।"

প্রশ্ন—১। প্রাচীন ভারত কর্মীকে কি শিক্ষা দিয়েছে ?

২। প্রাচীন ভারত গৃহীকে কি শিক্ষা দিয়েছে ?

আলোচনা—প্রাচীন ভারতে মানুষ কাজ ক'রে ফলের আশা করেনি—ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে তারা জীবনের পথে এগিয়ে যেতো। গৃহীরা প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, দীন দুঃখী সকলের সঙ্গে মিলে মিশে জীবন কাটাতো।

নীরব পাঠের জন্য ছাত্রীদের ২।৩ মিনিট সময় দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকলে শিক্ষয়িত্রী তার উত্তর দেবেন।

বোর্ডের কাজ—ছাত্রীদের সহযোগিতায় আজকের পাঠের নিম্নরূপ সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং ছাত্রীরা তা খাতায় তুলে নেবে।

সারাংশ—প্রাচীন ভারতের নৃপতিবর্গ ত্যাগ ও সাম্যের আদর্শে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁরা ভোগ ও বিলাসিতার পথ ত্যাগ ক'রে সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করতেন। বীর যোদ্ধাগণ পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করতেন। কর্মীরা যোগ-সাধনার মাধ্যমে ভগবানে বিশ্বাসী ছিলেন। গৃহীরা সকল মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করতেন।

অভিযোজন—ছাত্রীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে।

(১) প্রাচীন ভারতের নৃপতিদের আদর্শ সম্বন্ধে কি জান ?

(২) প্রাচীন ভারতের কাছ থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই ?

(৩) আমাদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি ?

বাড়ীর কাজ—ছাত্রীরা বাড়ী থেকে কবিতার প্রথম স্তবকটি আবৃত্তির উপযোগী ক'রে মুখস্থ ক'রে আনবে।

পাঠটীকা—৪

কবিতা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

"বিদ্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেম কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য বলে পেয়ে সে মহাপর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে।—
দানে বারি নদীরূপা বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত বাস পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরুদল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল-কুল দশদিশ ভরে;
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।"

বিদ্যালয়—
শ্রেণী—অষ্টম
ছাত্রসংখ্যা—৩৭
গড় বয়স—১৩+ বৎসর
সময়—৪০মিনিট
তারিখ—
শিক্ষক—

বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিশেষ পাঠ—কবিতা
আজকের পাঠ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(মধুসূদন দত্ত)

উদ্দেশ্য : ॥ এক ॥ 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কবিতাটি উপলব্ধি করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

॥ দুই ॥ মধুসূদন দত্তের সনেটের রূপনির্মিতি সম্বন্ধে ছাত্র ছাত্রীদের অবহিত করা।

॥ তিন ॥ কবিতা-পাঠে ছাত্রছাত্রীদের অনুরাগী করা।

॥ চার ॥ ভাষা ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করা।

॥ পাঁচ ॥ কবিতার শিল্প-সৌন্দর্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।

॥ ছয় ॥ শিক্ষার্থীদের মধ্যে কল্পনাশক্তি ও অনুভূতির বিকাশ-সাধন।

উপকরণ : ॥ এক ॥ চক্, ডাস্টার প্রভৃতি শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

॥ দুই ॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একখানি মডেল বা প্রতিকৃতি।

আয়োজন : শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য ও আজকের কবিতা-পাঠে শিক্ষার্থীদের কৌতূহলী করবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে ;—

॥ এক ॥ কাকে 'বিদ্যাসাগর' বলা হয় ?

॥ দুই ॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কি জান ?

॥ তিন ॥ তাঁর উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর পরিচয় দাও।

পাঠঘোষণা : আজ আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' সনেটটি পাঠ করবো এবং তার রূপনির্মিতি, বিষয়বস্তু, শিল্পসৌন্দর্য ও রসচেতনা উপলব্ধি করবো।

উপস্থাপন : ছন্দ, যতি, উচ্চারণ ও ভাব অনুযায়ী শিক্ষক মহাশয় 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' সনেটটি শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করবেন। ২।৩ টি ছেলেমেয়েকেও কবিতাটি সুন্দর করে আবৃত্তি করতে বলা হবে, ভুল হলে সংশোধন করে দেওয়া হবে।

তারপর কবিতার লেখক মধুসূদন দত্তের জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। এই পর্যায়ে বাংলা সনেট সম্বন্ধে বলা হবে।

কবিতার অন্তর্গত কঠিন কঠিন শব্দগুলিকে অর্থসমেত বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে,—হিমাদ্রি—হিমালয়, হেমকান্তি—সূর্য কিরণে স্বর্ণ-আভাযুক্ত তুষাররাশি, সুবর্ণ—স্বর্ণ, গিরীশ—হিমালয়, নদীরূপা বিমলা কিঙ্করী—নদীগুলি হিমালয়ের পূতচরিত্রা দাসী, পরিমল—সৌরভ, ফুল-কুল—ফুলরাশি, শীতল-শ্বাসী ছায়া—যে ছায়া শীতলতা দান করে, বনেশ্বরী—সুশীতল ছায়াকে কবি বনের ঈশ্বরী বলে কল্পনা করেছেন।

কবিতা রচনার ঐতিহাসিক পটভূমি—জীবনের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ করে বিদ্যাসাগর দীনদুঃখীর দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করবার চেষ্টা করতেন। কবি মধুসূদন দত্ত

একবার অত্যন্ত দুঃসময়ে বিদ্যাসগরের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। কবি যখন ফরাসী দেশে ছিলেন, তখন তিনি আর্থিক অনটনের চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিলেন। আর্থিক দুরবস্থার জন্য কবির তখন কারাগারে যাওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় বিদ্যাসাগরের প্রেরিত আর্থিক সাহায্য তাঁকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল। কবি তাই এই কবিতায় বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর ঋণ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

কবিতাটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ ক'রে আলোচনা করা যেতে পারে :—

প্রথম পর্যায়—"বিদ্যার সাগর তুমি······অম্লান কিরণে।"

প্রশ্নাবলী :

॥ এক ॥ বিদ্যার সাগর বলে কে বিখ্যাত হ'য়েছিলেন ?
॥ দুই ॥ 'করুণার সিন্ধু' কাকে বলা হয়েছে ? কেন বলা হয়েছে ?
॥ তিন ॥ সূর্যকিরণে পর্বত কিভাবে উজ্জ্বল হয় ?
॥ চার ॥ এখানে পর্বতের সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে ?

বিদ্যাসাগর অসীম করুণাসাগর ছিলেন। দীন-দুঃখীর দুর্দশা দূর ক'রবার জন্য তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। সূর্যের কিরণে পর্বতের তুষার-রাশি যেমন উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়, তেমনি বিদ্যাসাগরের করুণারাশিও বিখ্যাত হয়ে আছে।

দ্বিতীয় পর্যায়—"কিন্তু ভাগ্য-বলে·········গিরীশ"

প্রশ্নাবলী : ॥ এক ॥ 'সুবর্ণ চরন' অর্থ কি ?
॥ দুই ॥ 'গিরীশ' শব্দটির অর্থ কি ?
॥ তিন ॥ পর্বতে আশ্রয় নিলে কি হয় ?

কবি এখানে বিদ্যাসাগরকে হিমালয় পর্বতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পর্বতের আশ্রিত ব্যক্তিই কেবলমাত্র জানতে পারে যে, সে আশ্রয়ের গুণ কতখানি। মধুসূদন দত্তও তেমনি বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে তাঁর গুণরাশি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

তৃতীয় পর্যায়—"কি সেবা তার·········ক্লান্তি দূর করে"

প্রশ্নাবলী :

॥ এক ॥ পর্বতে জল কোথায় পাওয়া যায় ?
॥ দুই ॥ পর্বতে জল বা আহার্য কিভাবে পাওয়া যায় ?
॥ তিন ॥ পর্বতগাত্রে আশ্রিত ব্যক্তিকে দাসরূপে সেবা করে কে ?
॥ চার ॥ পর্বতে দশ দিক ভ'রে সৌরভ দান করে কে ?
॥ পাঁচ ॥ পর্বতে দিনের সময় ছায়া দান করে কে ?
॥ ছয় ॥ কিভাবে ক্লান্তি দূর হয়ে নিদ্রা আসে ?
॥ সাত ॥ পর্বতে আশ্রিত ব্যক্তি কিভাবে বিভিন্ন রকম সেবা পায় ?

পর্বতে আশ্রিত ব্যক্তি নানাভাবে সেবা ও সুবিধা পেয়ে থাকে। পর্বতের নদীগুলি পানীয় জল দান করে, গাছগুলি থেকে আহার্য হিসাবে ফল পাওয়া যায়।

ফুলের সৌরভ মন-প্রাণ ভরিয়ে দেয়। দিনের তাপে বনের ছায়া ক্লান্তি দূর ক'রে নিদ্রা আনে। তাই পর্বতে আশ্রিত ব্যক্তির কোন অসুবিধা নেই। কবি এখানে বিদ্যাসাগরকে পর্বতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবি অসহায় হয়ে পর্বতরূপী বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে উপকার পেয়েছেন। কবিতায় কবি তাই বিদ্যাসাগরের ঋণ স্বীকার ক'রেছেন।

এরপর শিক্ষার্থীদের বিদ্যাসাগরের মডেল বা ছবিটি দেখানো হবে। শিক্ষার্থীদের তিন মিনিট সময় দেওয়া হবে কবিতাটি নীরবে পাঠ করার জন্য। তারপর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বান করা হবে।

বোর্ডের কাজ—শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় আজকের পাঠের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা তা খাতায় তুলে নেবে।

সারাংশ—"বিদেশে থাকাকালীন মধুসূদন দত্ত দারুন দুর্দিনে বিদ্যাসাগরের সাহায্য পেয়েছিলেন। সনেটধর্মী এই কবিতায় তিনি তা স্বীকার করেছেন। মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে 'করুণার সিন্ধু' বলেছেন,—হিমালয় পর্বতের সঙ্গে তুলনা ক'রেছেন। পর্বতের আশ্রিত ব্যক্তি নদী থেকে জল পায়, গাছের ফল খাদ্য হিসাবে পায়, ফুলের সৌরভ পায় ও রৌদ্রতাপে গাছের ছায়া পায়। তেমনি বিদ্যাসাগরের কাছে আশ্রিত ব্যক্তি অনেক সুবিধা পেত। মধুসূদন দত্ত বিপদের সময় বিদ্যাসাগরের সাহায্য পেয়েছিলেন।"

অভিযোজন—শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে ;—

॥ এক ॥ মধুসূদন দত্ত এই রকম একটি কবিতা লিখলেন কেন ?
॥ দুই ॥ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পর্বতের তুলনা কিভাবে করা হ'য়েছে ?
॥ তিন ॥ কবিতাটির মধ্যে বিদ্যাসগেরের জীবনের কোন্ দিক্ তুলে ধরা হ'য়েছে ?
॥ চার ॥ কবিতাটি তোমার ভাল লাগলে, কেন ভাল লাগে ? খারাপ লাগলে, কেন খারাপ লাগে ?
॥ পাঁচ ॥ কবিতাটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা কর।

বাড়ীর কাজ—শিক্ষার্থীরা বাড়ী থেকে কবিতাটি ভাল করে মুখস্থ করে আনবে।

পাঠটীকা—৫

কবিতা

তুই বিঘা জমি

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"শুধু বিঘা দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবি গেছে ঋণে
বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।'
কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই,
চেয়ে দেখো মোর আছে বড় জোর মরিবার মত ঠাঁই।'
শুনি রাজা কহে, 'বাপু, জান তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘা প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে', কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পানি
সজল চক্ষে, 'করুন রক্ষে গরিবের ভিটাখানি।
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!'
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌন ভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে।'
পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রী, সকলি বিক্রী মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায়, আছে যার ভূরি ভূরি—
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম, মোরে ভগবান রাখিবে না মোহ গর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু'বিঘার পরিবর্তে;
সন্ন্যাসী বেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য—
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোহর দৃশ্য।
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই দুই বিঘা জমি।
হাটে মাঠে বাটে এই মত কাটে বছর পনেরো ষোলো—
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হল।"

বিদ্যালয়— বিষয় —বাংলাভাষা ও সাহিত্য
শ্রেণী—নবম বিশেষ পাঠ—কবিতা
ছাত্রসংখ্যা—৩০ সাধারণ পাঠ— 'দুই বিঘা জমি' (রবীন্দ্রনাথ)
গড় বয়স —১৪ + বৎসর পাঠক্রম * ॥ এক ॥ প্রথম দুই স্তবক
সময়—৪০ মিনিট ॥ দুই ॥ তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক
তারিখ— ॥ তিন ॥ পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবক
শিক্ষক— ॥ চার ॥ সপ্তম ও অষ্টম স্তবক
আজকের পাঠ— * চিহ্নিত অংশ

উদ্দেশ্য ঃ

প্রত্যক্ষ—॥ এক ॥ 'দুই বিঘা জমি' কবিতার বিষয়বস্তু উপলব্ধি ক'রতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
॥ দুই ॥ গরীবের উপর জমিদারের অত্যাচার ও জননী জন্মভূমির প্রতি মানুষের টান উপলব্ধি করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

পরোক্ষ—॥ এক ॥ কবিতাটির ভাব, রস, ধ্বনি, শিল্প, সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।
॥ দুই ॥ কবিতা পাঠে শিক্ষার্থীদের অনুরাগী করা।
॥ তিন ॥ শিক্ষার্থীদের মধ্যে কল্পনাশক্তি ও চিত্রধর্মিতার বিকাশ সাধন।

উপকরণ—চক, ডাস্টার প্রভৃতি শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

আয়োজন ঃ শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য ও আজকের পাঠের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে :—

॥ এক ॥ বাংলা সাহিত্যের কোন্ কবি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ?
॥ দুই ॥ তাঁর লেখা কয়েকটি কবিতার নাম কর।
॥ তিন ॥ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম কর।

পাঠ ঘোষণা—আজ আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতার দুইটি স্তবক আলোচনা ক'রে তার বিষয়বস্তু ও কাব্যগন্ধ গ্রহণ করবার চেষ্টা করব।

উপস্থাপন ঃ

কবি-পরিচিতি—কবির জীবন ও সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

সরব পাঠ—ছন্দ, যতি, মিলের প্রতি লক্ষ্য রেখে কবিতাটির একটি আদর্শ সরব পাঠ দেওয়া হবে ; কবিতার এই আবৃত্তির মধ্যে শুদ্ধ উচ্চারণ ও ভাবের অনুযায়ী আবেগ-কম্পিত সুরের প্রতিফলন থাকবে। ২।৩টি ছাত্রছাত্রীকে কবিতাটির সার্থক সরব পাঠ ক'রতে বলা হবে। তাদের পাঠের ভুল থাকলে তা সংশোধন ক'রে দেওয়া হবে। কবিতাটি শিক্ষাদানকালে সরব পাঠের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হবে।

কঠিন শব্দের আলোচনা—কঠিন কঠিন শব্দগুলি ও তার অর্থ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা তা খাতায় তুলে নেবে। ভুই—ভূমি, ভূস্বামী—জমিদার, ক্রূর—নিষ্ঠুর, ডিক্রী—আদালতের হুকুম, ভূধর—পর্বত।

আজকের পাঠ্য অংশটির কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ ক'রে বিষয়বস্তুর আলোচনা করা হবে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠদান অগ্রসর হবে।

প্রথম পর্যায়—"শুধু বিঘে দুই······ওটা দিতে হবে।"

প্রশ্ন ঃ ॥ এক ॥ উপেনের কত বিঘা জমি ছিল ?
॥ দুই ॥ উপেনের বাকী জমি কোথায় গেল ?
॥ তিন ॥ জমিদারবাবু উপেনকে কি বললেন ?
॥ চার ॥ উপেন তার উত্তরে কি বলল ?
॥ পাঁচ ॥ জমিদারবাবুর দু'বিঘে জমির প্রয়োজন কেন ?

উপেনের মাত্র দু'বিঘে জমি অবশিষ্ট আছে। বাকী সবই ঋণে গেছে। একদিন জমিদারবাবু ব'ললেন যে, তিনি ঐ দু' বিঘে জমি কিনে নেবেন। উপেন তখন ব'লল যে, জমিদারবাবুর অনেক জমি আছে কিন্তু তার ঐটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু জমিদারবাবু যে বাগানখানা ক'রছেন তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান ক'রতে ঐ দু'বিঘে জমি প্রয়োজন, কাজেই ওটা তাঁর চাই-ই।

দ্বিতীয় পর্যায়—"কহিলাম তবে············সে দেখা যাবে।"

প্রশ্ন ঃ ॥ এক ॥ উপেন জোড়হাত ক'রে কি বলল ?
॥ দুই ॥ জমিদার রক্তচক্ষু ক'রে কি উত্তর দিলেন ?
॥ তিন ॥ জমিদারের কথার মধ্যে কি প্রকাশ পেয়েছে ?

উপেন তখন জোড়হাত করে তার ভিটে-মাটিকে রক্ষা ক'রতে অনুরোধ ক'রল। এই মাটিতে পূর্ব পুরুষেরা বড় হ'য়েছেন; কাজেই এই মাটির সঙ্গে তার প্রাণের যোগ আছে। জমিদার তখন রেগে নিষ্ঠুর হাসি হেসে প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ঘোষণা ক'রলেন।

তৃতীয় পর্যায়—"পরে মাস দেড়ে············পরিবর্তে।"

প্রশ্ন ঃ— ॥ এক ॥ দেড় মাস পরে উপেনের কি হল ? কেন এমন হল ?
॥ দুই ॥ ছত্রগুলিতে জমিদারের শ্রেণীতে চরিত্রের কোন্‌দিক প্রকাশিত হয়েছে ?
॥ তিন ॥ রাজার ধনদৌলত কোথা থেকে আসে ?
॥ চার ॥ উপেন এই ঘটনাকে কিভাবে গ্রহণ করল ?

দেড় মাস পরে উপেনকে ভিটে মাটি ছেড়ে পথে পথে বের হ'তে হ'ল। কারণ তার দু'বিঘে জমি মিথ্যা দেনার দায়ে নীলাম হ'য়ে গেছে। এই পৃথিবীতে গরীবদের উপর অত্যাচার ও শোষণ ক'রেই বড়লোকেরা তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে। উপেন এই ঘটনাকে ভগবানের দান হিসাবে গ্রহণ ক'রল। সংসারের মোহজালে আবদ্ধ

রাখবেন না বলেই ভগবান উপেনকে দু'বিঘার পরিবর্তে সারা বিশ্বভুবনে ঘুরে বেড়ানোর পথ ক'রে দিলেন। কারণ ভিটেমাটি ছাড়া হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া উপেনের আর কোন পথ নেই।

ব্যাখ্যা'—'এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি—
রাজার হস্তে করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি "

অংশটি নানাভাবে উদাহরণ যোগে সহজ ক'রে ব্যাখ্যা করা হবে।

চতুর্থ পর্যায় – "সন্ন্যাসী বেশে……বাসনা হল।"

প্রশ্নঃ— ॥ এক ॥ উপেন কিভাবে দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াল ?
॥ দুই ॥ বিভিন্ন জায়গায় উপেন কি কি দেখল ?
॥ তিন ॥ কিন্তু উপেন কি ভুলে থাকতে পারেনি ?
॥ চার ॥ শেষ পর্যন্ত উপেনের মনে কি হল ?

ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে উপেন সন্ন্যাসীর বেশে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ালো, বিভিন্ন স্থানে সে কত সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ী ও দৃশ্য দেখল। কিন্তু পর্বত, সাগর, নগর ও বিজন বনে ঘুরে বেড়ানোর সময় সে কিছুতেই তার দু'বিঘে জমির কথা ভুলে থাকতে পারে নি। ১৫।১৬ বছর এইভাবে ঘুরে ঘুরে একবার তার দেশে ফিরে আসবার ইচ্ছা হ'ল।

আলোচ্য অংশটি নীরব পাঠ করার জন্য শিক্ষার্থীদের ৪ মিনিট সময় দেওয়া হবে। তারপর শিক্ষার্থীদের কোন প্রশ্ন থাকলে তা আহ্বান করা হবে।

বোর্ডের কাজ – শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় আজকের পাঠের নিম্নরূপ সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে, শিক্ষার্থীরা তা খাতায় তুলে নেবে।

সারাংশ—"উপেনের দুই বিঘা পরিমাণ ভিটেমাটি ছিল। জমিদার বাগান করবেন বলে সেটুকু কিনে নিতে চাইলেন। উপেন বিক্রী করতে রাজী না হওয়ায় জমিদার অন্য উপায়ে তা দখল করবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। কিছুদিন পরে উপেনের জমি মিথ্যা দেনার দায়ে নীলাম হয়ে গেল। এইভাবেই জমিদারের অত্যাচার গরীব মানুষের উপর নেমে আসে। উপেন সন্ন্যাসীর বেশে বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ালো। ১৫।১৬ বছর পরে একদিন দেশে ফিরে আসবার ইচ্ছা হ'ল।"

অভিযোজন—ছাত্রছাত্রীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে— ॥ এক ॥ জমিদার মহাজনের ধনদৌলত কি ভাবে বেড়ে ওঠে ?
॥ দুই ॥ উপেন কি ভাবে ভিটেমাটি ছাড়া হ'ল ?
॥ তিন ॥ ব্যাখ্যা কর "এ জগতে, হায়,……ধন চুরি।"

বাড়ীর কাজ—'দুই বিঘা জমি' কবিতার প্রথম দু'টি স্তবক বাড়ী থেকে ভাল করে মুখস্থ ক'রে আনতে শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেওয়া হবে।

পাঠটীকা—৬

গদ্যাংশ

বিদ্যালয়—
শ্রেণী—ষষ্ঠ (গ)
ছাত্রসংখ্যা—৩০
গড় বয়স—১১+ বৎসর
সময়—৩৫ মিনিট
তারিখ—
শিক্ষক—

বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিশেষ পাঠ—গদ্য
সাধারণ পাঠ—রুইদাস—খগেন্দ্র মিত্র
পাঠক্রম :—
* ॥ এক ॥ প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ
॥ দুই ॥ চতুর্থ থেকে দশম অনুচ্ছেদ
॥ তিন ॥ একাদশ থেকে ষোড়শ অনুচ্ছেদ
আজকের পাঠ—*চিহ্নিত অংশ

উদ্দেশ্য— ॥ এক ॥ 'রুইদাস' গল্পটি পড়ে তার নীতিকথা উপলব্ধি ক'রতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
॥ দুই ॥ গল্পটির বিষয়বস্তু গ্রহণ করতে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করা।
॥ তিন ॥ গদ্য সাহিত্যের প্রতি শিক্ষার্থীদের অনুরাগী করা।
॥ চার ॥ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষা-ব্যবহারের জ্ঞান বৃদ্ধি ক'রতে সাহায্য করা।
॥ পাঁচ ॥ শিক্ষার্থীদের চিন্তা, বুদ্ধি, অনুভূতি-শক্তির বিকাশ সাধন করা।

উপকরণ—চক, ডাস্টার প্রভৃতি শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

আয়োজন—আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে,— ॥ এক ॥ সাধু-সন্ন্যাসীরা কাকে ভজন পূজন করেন ?
॥ দুই ॥ কেন তাঁরা ভগবানের আরাধনা করেন ?
॥ তিন ॥ ভগবানের পূজা-অর্চনা করে কি লাভ হয় ?

পাঠঘোষণা—"আজ আমরা ভক্তি-ভাবনার উপর লেখা খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রুইদাস' গদ্যাংশের প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ আলোচনা ক'রব।"

উপস্থাপন :

সরব পাঠ—রচনাটির যতি, উচ্চারণ ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষক আবেগকম্পিত কণ্ঠে গদ্যাংশটির একটি আদর্শ সরব পাঠ দেবেন। তারপর ৩।৪টি ছেলেমেয়েকে আলোচ্য অংশটির সরব পাঠ ক'রতে বলা হবে। ভুল হ'লে তা সংশোধন ক'রে দেওয়া হবে।

লেখক-পরিচিতি—লেখক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনী ও সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

রচনা-বৈশিষ্ট্য—ভগবৎপ্রেমমূলক ভক্তিরসাশ্রিত এই গল্পরচনাটি নীতি-মূলক। ছোটগল্পের রূপকল্পে 'রুইদাস' লেখা হ'লেও এটি সার্থক ছোটগল্প হ'তে পারে নি।

শব্দার্থ আলোচনা—কঠিন কঠিন শব্দগুলির অর্থ ছাত্রদের সহযোগিতায় উদ্ধার ক'রে বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা তা খাতায় তুলে নেবে। যেমন,—

অস্পৃশ্য—অশুচি, দূষিত—কলুষিত, অঙ্গস্পর্শে—দেহের ছোঁয়ায়, আরাধ্য—যাঁকে আরাধনা বা পূজা করা হয়, অভিষেক—স্নান, পাদোদক—পা ধোয়া জল, ব্যথিত—দুঃখিত।

বিষয়-বস্তুর আলোচনা—আজকের পাঠ্য অংশটিকে আলোচনার সুবিধার জন্য দু'টি ভাগে ভাগ ক'রে সেই অনুযায়ী বস্তুর আলোচনা হবে।'

প্রথম পর্যায়—'দিন আর চলে না।........কোনও বাধা হয় না।'

(প্রথম অনুচ্ছেদ)

শিক্ষার্থীরা অংশটি ২।৩ বার পড়বে। তারপর তাদের কতকগুলি প্রশ্ন পর পর করা হবে। এইভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর আলোচনা হবে।

প্রশ্ন— ॥ **এক** ॥ রুইদাসের দিন চলে না কেন?
॥ **দুই** ॥ লোকে জুতো কেনে না কেন?
॥ **তিন** ॥ রুইদাস বাজারে গিয়ে কি করে?
॥ **চার** ॥ সে সন্ধ্যায় কি করে?
॥ **পাঁচ** ॥ সে কারও ঘরে প্রবেশ করে না কেন?
॥ **ছয়** ॥ নিতান্ত অভাবের দিনেও রুইদাস ভিক্ষায় যায় না কেন?
॥ **সাত** ॥ রুইদাস ঘরের মধ্যে কি করে?
॥ **আট** ॥ তার ভজনে বাধা পড়ে না কেন?

দেশে অন্ন নেই বলে লোকে জুতো কেনে না। ফলে, বাজারে রুইদাসের জুতো বিক্রী হয় না। সন্ধ্যায় সে বৈষ্ণবের বাড়ীর বাইরে জুতো রেখে আসে। তার স্পর্শে পবিত্রতা নষ্ট হবে বলে সে ঘরের মধ্যে যায় না। নিতান্ত অভাবের দিনেও সে ভিক্ষায় যায় না, কারণ তাতে ঘর অপবিত্র হয়ে যেতে পারে। সে ঘরের কোণে গোপনে দেবতার অর্চনা করে।

দ্বিতীয় পর্যায়—"দারিদ্র্য যতই পীড়া দেয়........বল।" (২, ৩ অনুচ্ছেদ)

অংশটি শিক্ষার্থীরা ১।২ বার পড়বে; তারপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর আলোচনা হবে।

প্রশ্ন— ॥ **এক** ॥ দুঃখ ও ক্ষুধার জালার মাধ্যমেও রুইদাস কি করতো?
॥ **দুই** ॥ এমন সময় কে এলেন?
॥ **তিন** ॥ রুইদাস তখন কি করলো?

॥ চার ॥ ফলে তার কি হল ?
॥ পাঁচ ॥ তিনি কি বললেন ?

ক্ষুধা, অভাব ও অনটনে যতই রুইদাসের দুঃখ বাড়ে, ততই সে ভগবানের ভজন-পূজনের উপর বেশী জোর দেয়। তখন এক সাধু এলেন, রুইদাস তাঁর পা ধুইয়ে সেই জল পান ক'রলো। সাধু সন্তুষ্ট হয়ে রুইদাসের দুঃখ দূর করতে চাইলেন।

ব্যাকরণের আলোচনা—(ক) বিপরীতার্থক শব্দ বল—আঁধার, অচল, দুঃখ। (খ) বাক্য রচনা কর—নিতান্ত, যথাশক্তি, করুণা।

নীরব পাঠ—অংশটি নীরবে পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের ৩ মিনিট সময় দেওয়া হবে।

বোর্ডের কাজ—ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় আজকের পাঠের সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে, তারা তা খাতায় তুলে নেবে।

সারাংশ—"রুইদাসের জুতোর ব্যবসা চলছিল না। দেশে অন্নের অভাবের জন্য বাজারে তার জুতো বিক্রী হতো না। সন্ধ্যায় সে গোপনে বাড়ীর বাইরে জুতো রেখে আসতো। নিতান্ত অভাব হলেও সে অপরের বাড়ীতে যেত না, পাছে তার স্পর্শে গৃহ অপবিত্র হ'য়ে যায়। ঘরের কোণে সে গোপনে ভগবানের আরাধনা ক'রতো। দারিদ্র্য ও ক্ষুধার জ্বালা বাড়লেও সে পূজা-অর্চনা চালিয়ে যেতে লাগল। একদিন এক সাধু এলেন। রুইদাস তাঁর পা ধুইয়ে দিল। সাধু সন্তুষ্ট হয়ে রুইদাসের দুঃখ দূর ক'রতে চাইলেন।"

অভিযোজন—শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে,—

॥ এক ॥ রুইদাসের অভাব ছিল কেন ?
॥ দুই ॥ সে অপরের বাড়ীতে যেত না কেন ?
॥ তিন ॥ রুইদাস গোপনে কি করতো ?
॥ চার ॥ সাধু এলে কি অবস্থার সৃষ্টি হল ?

বাড়ীরকাজ—শিক্ষার্থীরা বাড়ী থেকে ভাল ক'রে গদ্যাংশটি পড়ে আসবে।

পাঠটীকা—৭

বিদ্যালয়—
শ্রেণী—ষষ্ঠ 'গ'
ছাত্রসংখ্যা—৩৬
গড় বয়স—১২ + বৎসর
সময়—৪০ মিনিট
তারিখ—
শিক্ষয়িত্রী—শ্রীমতী শুক্লা বসুরায়

বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিশেষ পাঠ—গদ্য
সাধারণ পাঠ—বিদূষক—রবীন্দ্রনাথ
পাঠক্রম ও আজকের পাঠ—
সমগ্র ছোটগল্পটি

॥ উদ্দেশ্য ॥

॥ এক ॥ রসসঞ্চারী পাঠের মাধ্যমে ছোট গল্পটির মর্ম, অর্থগৌরব ও রস-মাধুর্য উপভোগ করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

॥ দুই ॥ বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে ছাত্রদের সহায়তা করা।

॥ তিন ॥ শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি, বিচারক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি, ভাষা-দক্ষতা ইত্যাদি ক্ষমতার বিকাশ-সাধনে সহায়তা করা।

॥ চার ॥ ছোটগল্প-পাঠে ছাত্রদের উৎসাহিত করা।

॥ উপকরণ ॥

চক্, ডাস্টার ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

॥ আয়োজন ॥

আজকের পাঠে ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ও তাদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নগুলি করা হবে ;—

॥ এক ॥ আমাদের কোন্ কবিকে 'বিশ্বকবি' বলা হয় ?

॥ দুই ॥ এদেশের কোন্ কবি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ?

॥ তিন ॥ তাঁর কি কি কবিতা ও ছোটগল্প তোমরা পড়েছো ?

॥ পাঠঘোষণা ॥

আজ আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'বিদূষক'-এর বিষয়বস্তু, রসসৌন্দর্য ও গল্পরস সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

॥ উপস্থাপন ॥

সরব পাঠ—ছোটগল্পটি যতি, উচ্চারণ ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার্থীদের মনকে পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য শিক্ষয়িত্রী সমগ্র ছোট গল্পটির একটি

আদর্শ সরব পাঠ দেবেন ; পরে ২।৩ জন ছাত্রকে আলোচ্য অংশটির সরব পাঠ করতে দেওয়া হবে। ভুল হ'লে তা সংশোধন করে দেওয়া হবে।

লেখক-পরিচিতি—লেখকের জীবন ও সাহিত্য-কীর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

রচনা-বৈশিষ্ট্য—প্রকৃতিগত বিচারে 'বিদূষক' একটি ছোটগল্প। এই গল্পটির মধ্য দিয়ে লেখক অত্যাচারীকে ধিক্কার দিয়েছেন অন্যায়কে তুলে ধরেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে অসহায় ভারতবাসীদের উপর ইংরেজ শাসকবর্গের অন্যায় অত্যাচারের রূপই তিনি রূপকচ্ছলে 'বিদূষক' ছোটগল্পটির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

শব্দার্থ আলোচনা—ছাত্রদের সহযোগিতায় আজকের পাঠের অন্তর্গত কঠিন শব্দগুলির অর্থ আলোচনা করা হবে। এক্ষেত্রে বোর্ডের ব্যবহার করা হবে।

কাঞ্চী—দক্ষিণ ভারতের একটি স্থান	শিবির—ছাউনি
বলেশ্বরী—শক্তির দেবী	প্রসাদ—অনুগ্রহ
বিদূষক—রাজসভার হাস্যরসিক	অবোধ—অবুঝ
সারি – line	বিধাতা—ভগবান

বিষয়বস্তুর আলোচনা—আজকের পাঠ্য ছোটগল্পটি আলোচনার সুবিধার জন্য চারটি অনুচ্ছেদকে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করে একে একে ছাত্রদের সহযোগিতায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হবে,—

প্রথম পর্যায় ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

শিক্ষয়িত্রী ছোটগল্পগুলির প্রথম দু'টি অনুচ্ছেদ আদর্শ সরব পাঠের মাধ্যমে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরবেন। তারপর নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মাধ্যমে পাঠদানে অগ্রসর হবেন,—

(১) কাঞ্চীর রাজা কোন্ স্থান জয় করতে গেলেন ?
(২) জয়ী হয়ে তিনি কি নিয়ে এলেন ?
(৩) দেশে ফেরবার পথে তিনি কোন্ মন্দিরে গেলেন ? সেখানে গিয়ে কি করলেন ?
(৪) পথের ধারে তিনি কি করলেন ?
(৫) ছেলেরা কি খেলা করছিল ?
(৬) রাজার প্রশ্নের উত্তরে ছেলেরা কি বললেন ?
(৭) উত্তরে রাজা, মন্ত্রী ও বিদূষক কি ক'রলেন ?

আলোচনা—এখানে ছোটগল্পটির প্রথম দুটি অনুচ্ছেদের বিষয়বস্ত ছাত্রদের সহযোগিতায় আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদ।

শিক্ষয়িত্রী এই দু'টি অনুচ্ছেদের আদর্শ সরব পাঠ দেবেন। তারপর ছাত্রদের সহযোগিতায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠদানে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন—(১) রাজা কি হুকুম ক'রছেন?
(২) রাজা সেনাপতিকে কি বললেন?
(৩) সন্ধ্যাবেলা এসে সেনাপতি রাজাকে কি বললো?
(৪) সেনাপতির খবর শুনে মন্ত্রী কি বললো? পুরোহিত কি বললো?
(৫) বিদূষক কেন রাজার কাছে বিদায় চাইলো?

আলোচনা—ছাত্রদের সহযোগিতায় আলোচ্য অংশটির বিষয়বস্তুর আলোচনা করা হবে।

নীরব পাঠ—এর পর ছোটগল্পটি নীরবে পাঠ করবার জন্য ছাত্রদের ৩।৪ মিনিট সময় দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের গল্পটি সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাস্য থাকলে শিক্ষয়িত্রী ধৈর্য সহকারে তার উত্তর দেবেন।

ব্যাকরণ আলোচনা—

পদান্তর: জয়—জয়ী মুখ-মৌখিক রক্ত—রক্তিম গম্ভীর—গাম্ভীর্য
গাছ—গেছো

লিঙ্গান্তর: রাজা-রাণী বিশ্বেশ্বর—বিশ্বেশ্বরী
ছেলে—মেয়ে সঙ্গী—সঙ্গিনী।

বোর্ডের কাজ—

শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় আজকের পাঠের সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং ছাত্রেরা তা খাতায় তুলে নেবে।

অভিযোজন—

আজকের পাঠ ছাত্রেরা কতখানি অনুধাবন ক'রেছে, তা পরীক্ষা করবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হ'বে;

(১) রাজার চরিত্র সম্বন্ধে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।
(২) বিদূষক রাজসভা ছেড়ে চলে যেতে চাইলেন কেন?
(৩) বিদূষক মানুষটিকে তোমার কেমন লাগে?
(৪) গল্পটি তোমার কেমন লাগলো?

বাড়ীর কাজ—

বাড়ী থেকে গল্পটি ভাল ক'রে পড়ে আসতে ছাত্রদের বলা হবে।

পাঠটীকা—৮

গদ্যাংশ

বিদ্যালয়ের নাম—
শ্রেণী—দশম
ছাত্রসংখ্যা—৩০ জন
গড় বয়স—১৫ + বৎসর
সময়—৪০ মিনিট
তারিখ—
শিক্ষক—

বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিশেষ পাঠ—গদ্য
সাধারণ পাঠ—'মন্ত্রশক্তি'
—প্রমথ চৌধুরী
আজকের পাঠ—প্রথম ১২টি অনুচ্ছেদ

উদ্দেশ্য—॥ এক ॥ 'মন্ত্রশক্তি' গদ্যাংশে লেখকের বক্তব্য উপলব্ধি ক'রতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

॥ দুই ॥ ভাষা-ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করা।

॥ তিন ॥ প্রমথ চৌধুরীর রচনাশৈলী বুঝতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

॥ চার ॥ বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি ক'রতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা ও গদ্য সাহিত্যের প্রতি তাদের অনুরাগী করা।

॥ পাঁচ ॥ শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, যুক্তিবিন্যাস, বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি ক্ষমতার বিকাশ-সাধনে সহায়তা করা।

উপকরণ—শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

আয়োজন—আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ও তাদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে,—

॥ এক ॥ সাপুড়েরা কি ভাবে সাপ ধরে?

॥ দুই ॥ ওঝা কিভাবে সাপে-কাটা রোগীকে সারিয়ে তোলে?

॥ তিন ॥ যাদুকর বিড় বিড় ক'রে কি বলে?

॥ চার ॥ মন্ত্রের সাহায্যে যে সব কাজ কর্ম করা হয়, তা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য?

পাঠ-ঘোষণা—আজ আমরা প্রমথ চৌধুরীর স্মৃতিচারণমূলক রচনা 'মন্ত্রশক্তি' আলোচনা ক'রে মন্ত্রের প্রকৃত শক্তি সম্বন্ধে জানবো।

উপস্থাপন—

সরব পাঠ—শিক্ষক যতি, উচ্চারণ ও ভাবের অনুসরণ ক'রে আজকের পাঠ্যাংশটির সার্থক সরব পাঠ দেবেন। তারপর ৩/৪টি ছেলেমেয়েকে অংশটির সার্থক সরব পাঠ ক'রতে বলা হবে; ভুল হলে সংশোধন ক'রে দেওয়া হবে।

লেখকপরিচিতি ঃ—প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

রচনা বৈশিষ্ট্য ঃ—'মন্ত্রশক্তি' গদ্যাংশটির রচনারীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। এটি একটি স্মৃতিচারণমূলক গদ্যরচনা। সার্থক ছোটগল্পের মেজাজও এর মধ্যে আছে। রচনাটির মধ্যে লেখকের style, রচনাশৈলী, বর্ণনাভঙ্গী ও যুক্তিবিন্যাস চমৎকারভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে।

কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ আলোচনা ঃ—আজকের পাঠের অন্তর্গত কঠিন কঠিন শব্দগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। শব্দগুলির অর্থও বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে।

হাড়কাঠ—যে কাঠে বলি দেওয়া হয়।
কবন্ধ—মাথা-বিহীন দেহ বা ধড়।
ব্রহ্মদৈত্য—বড় দৈত্য।
পাটনি—মাঝি।

বিষয়বস্তুর আলোচনা ঃ—আলোচ্য অংশটিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ ক'রে তার এক-একটি পর্যায় পড়া হবে এবং তার উপর কতকগুলি প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের করা হবে। এইভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান অগ্রসর হবে। বার বার প্রশ্ন ক'বার জন্য শিক্ষার্থীরাও মনোযোগী ও আগ্রহী হবে, পাঠগ্রহণ সম্বন্ধে তাদের সচেতনতা বাড়বে। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়বস্তুর আলোচনা হ'তে পারে ঃ—

॥ **এক** ॥ কোথায় লাঠি-খেলার ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল ?
॥ **দুই** ॥ সেখানে লেঠেলরা কেন জমায়েত হ'য়েছিল ?
॥ **তিন** ॥ কে লেঠেলদের সর্দার ছিল ?
॥ **চার** ॥ তার চেহারা বর্ণনা কর।
॥ **পাঁচ** ॥ নায়েব কাকে লাঠি খেলা দেখানোর জন্য অনুরোধ ক'রলো ?
॥ **ছয়** ॥ উত্তরে সে কি বললো ?
॥ **সাত** ॥ ঈশ্বর লাঠি-খেলা ছেড়েছিল কেন ?

ব্যাকরণ আলোচনা ঃ—

(ক) নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাস বল ঃ—
গৌরবর্ণ, ব্রহ্মদৈত্য, অসম্মত, মন্ত্রশক্তি।

(খ) নিম্নরেখ পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ—
এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে শাস্ত্র পড়ে নয়।
মন্ত্রশক্তিতে তোমরা বিশ্বাস কর না।
সকলে মিলে যুক্তি করলে।

নীরব পাঠ ঃ—আলোচ্য গদ্যাংশটি নীরবে পাঠ করবার জন্য শিক্ষার্থীদের পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হবে।

বোর্ডের কাজ ঃ—ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় আজকের পাঠের সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা তা খাতায় তুলে নেবে।

অভিযোজন ঃ—শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য ও আজকের পাঠ তারা কতখানি আয়ত্ত ক'রেছে, তা জানার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে,—

॥ **এক** ॥ লেঠেলদের কাজ কি ?
॥ **দুই** ॥ ঈশ্বর লাঠিখেলা কেন ছেড়ে দিয়েছিল ?
॥ **তিন** ॥ সত্যিই কি ঈশ্বর মন্ত্র জানতো ?
॥ **চার** ॥ মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে তোমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত কর।

বাড়ীর কাজ—শিক্ষার্থীরা বাড়ী থেকে গদ্যাংশটি কয়েক বার পড়ে আসবে ; এবং 'ঈশ্বর কেন লাঠি-খেলা ছেড়েছিল ?'—প্রশ্নটির উত্তর বাড়ী থেকে লিখে আনবে।

পাঠটীকা—৯

ব্যাকরণ

বিদ্যালয়—
শ্রেণী—পঞ্চম
ছাত্রসংখ্যা—৪০
গড় বয়স—১০+ বৎসর
সময়—৪০ মিনিট
তারিখ—
শিক্ষক—

বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিশেষ পাঠ—ব্যাকরণ
পাঠ্যক্রম—পদ-পরিচয়
আজকের পাঠ—পদ-পরিচয়

উদ্দেশ্য :

॥ **প্রত্যক্ষ** ॥ * বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পদগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা।

॥ **পরোক্ষ** ॥ * বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অনুরাগী করা।
* ভাষা শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
* শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ-সাধন।

উপকরণ :

॥ **এক** ॥ চক্, ডাস্টার প্রভৃতি শ্রেণী-কক্ষের সাধারণ উপকরণ।

॥ **দুই** ॥ পাঁচটি পদের উদাহরণ বিশ্লেষণের পাঁচটি chart।

আয়োজন :

শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য ও আলোচ্য পাঠে তাদের আগ্রহ-সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে—

॥ **এক** ॥ বর্ণ কাহাকে বলে ?
॥ **দুই** ॥ শব্দ কাহাকে বলে ?
॥ **তিন** ॥ কতকগুলি শব্দের উদাহরণ দাও।
॥ **চার** ॥ বাক্য কাহাকে বলে ?
॥ **পাঁচ** ॥ বাক্যের মধ্যে শব্দগুলির কাজ কি ?

পাঠ-ঘোষণা :

"আজ আমরা বাংলা ভাষার বিভিন্ন পদগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে 'পদ-পরিচয়' লাভ করবো।"

উপস্থাপন :

বিভিন্ন পদের বিভিন্ন উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হবে। তারপর সেই উদাহরণগুলি থেকে আরোহী পদ্ধতিতে সূত্র

নির্মাণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। উদাহরণগুলি শিক্ষার্থীর মান অনুযায়ী তাদের অভিজ্ঞতা ও পরিচিতির মধ্যে থেকে গ্রহণ ক'রতে হবে। যথাযথ স্থানে chart-এর ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণগুলি বোর্ডে লিখে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রয়োজন-মত রঙিন চক ব্যবহার করতে হবে।

॥ **বিশেষ্য পদ** ॥

যদু, রাম—ব্যক্তির নাম
সন্ধ্যা, রেবা—মেয়ের নাম
সরস্বতী, দুর্গা—দেবীর নাম
লণ্ডন, কলিকাতা—শহরের নাম
বাইবেল, রামায়ণ—ধর্মগ্রন্থের নাম
তিস্তা, গঙ্গা—নদীর নাম
হিমালয়—পর্বতের নাম
জল, খাতা, কলম—বস্তুর নাম
মানুষ, হরিণ—জাতির নাম
ভ্রমণ ভোজন—কর্মের নাম
দল, শ্রেণী—সমষ্টির নাম
ভাল, ক্ষমা, সততা দুঃখ—গুণ বা অবস্থার নাম।

সূত্র ঃ—"কোন কিছুর নাম বোঝালে তাকে বিশেষ্য পদ বলে।"

এই সময় শিক্ষার্থীদের বিশেষ্য পদের chart-টি দেখানো হবে। সূত্রটি বোর্ডে লেখা হবে। এরপর সূত্রটিকে প্রয়োগ করবার জন্য শিক্ষার্থীদের কতকগুলি বিশেষ্য পদের উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করতে (অর্থাৎ কিসের নাম বোঝাচ্ছে) বলা হবে।

॥ **সর্বনাম পদ** ॥

রবি ভাল ছেলে। **সে** প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসে।
('রবি'র পরিবর্তে ব্যবহৃত)

রেবা ভাল মেয়ে। **সে** নিয়মিত পড়া করে।
('রেবা'র পরিবর্তে ব্যবহৃত)

রামবাবু ভাল লোক। **তিনি** সকলকে ভালবাসেন।
('রামবাবু'র পরিবর্তে ব্যবহৃত)

আমরা তোমাদের দলকে দুই গোলে হারিয়ে দিয়েছি।
তোমরা চুপ করে বসে থাকো।
তাঁরা আজ কলকাতা যাবেন।
আমি তোমাকে দেখে নেব।
কারা গণ্ডগোল করছে?

সূত্র ঃ—"বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে সব পদ ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে সর্বনাম পদ বলে।"

সূত্রটি বোর্ডে লেখা হবে, chart দেখানো হবে। শিক্ষার্থীরা সর্বনাম পদের উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে বাক্যে প্রয়োগ করবে।

॥ বিশেষণ পদ ॥

লাল গোলাপ—গোলাপের (বিশেষ্য পদ) গুণ প্রকাশ করছে।
ভাল ছেলে— ছেলের গুণ প্রকাশ করছে।
দশ টাকা— টাকার সংখ্যা প্রকাশ করছে।
প্রচুর মাছ— মাছের পরিমাণ প্রকাশ করছে।
ঘুমন্ত শিশু— শিশুর অবস্থা প্রকাশ করছে।

সূত্র ঃ—"যে পদের দ্বারা বিশেষ্যর গুণ, পরিমাণ, সংখ্যা ও অবস্থা প্রভৃতি বোঝায়, তাকে বিশেষণ পদ বলে।"

সূত্রটি বোর্ডে লেখা হবে, সংশ্লিষ্ট Chart-টি শিক্ষার্থীদের দেখানো হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের পরিচয় ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে আরও কতকগুলি বিশষণ পদের উদাহরণ সংগ্রহ করবে, এবং সেগুলিকে উক্ত সূত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করবে।

॥ অব্যয়পদ ॥

বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম পদকে বিভক্তি-যোগে, লিঙ্গ ও বচন-ভেদে পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু নিম্নলিখিত পদগুলিকে বিভক্তি, বচন বা লিঙ্গের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা যায় না।

কিন্তু, এবং, ও, দ্বারা, ছি, হায়, থেকে, বা, আর, সুতরাং, যদি, তবু, তবে, অথবা, ওরে, উঃ, বাঃ, কেন, অতি, তো, মধ্যে।

* এই পদগুলিকে সংক্ষিপ্ত বা সম্প্রসারিত করা যায় না।
* এই পদগুলির সঙ্গে প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগে নতুন শব্দ তৈরি করা যায় না।
* লিঙ্গের ক্ষেত্রে এই পদগুলির পরিবর্তন নেই।
* বচনভেদে এই পদগুলিকে পরিবর্তন করা যায় না।

সূত্র ঃ—"যে পদ বিভক্তি, বচন ও লিঙ্গ-ভেদে পরিবর্তিত (ব্যয়) হয় না, তাদের অব্যয় পদ বলে।"

সূত্রটি বোর্ডে লেখা হবে, সংশ্লিষ্ট Chart-টি দেখানো হবে। অব্যয় পদের শিক্ষাদানের সময় অবরোহ-পদ্ধতি (সূত্র থেকে উদাহরণ) অধিকতর কার্যকরী। তবে উদাহরণগুলিকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। শিক্ষার্থীরা অব্যয় পদের বিভিন্ন উদাহরণ সংগ্রহ করবে এবং সেগুলি বাক্যে ব্যবহার করবে।

॥ ক্রিয়াপদ ॥

রাম **পড়িতেছে**। গাড়ী **যায়**।
শ্যাম **খেলিতেছে**। বায়ু **বয়**।
ট্রেন **চলিতেছে**। ছবি **দেখ**।
রেবা **হাসিতেছে**। ছড়া **লেখ**।

বড় অক্ষরের শব্দগুলির মাধ্যমে কোন কিছু 'করা' বোঝাচ্ছে।

সূত্র ঃ—"যে পদের দ্বারা কোন কিছু করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।"

সূত্রটি বোর্ডে লেখা হবে, সংশ্লিষ্ট chart-টি শিক্ষার্থীদের দেখানো হবে। তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে ক্রিয়াপদের বিভিন্ন উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে বাক্যে প্রয়োগ করবে।

বোর্ডের কাজ ঃ—বোর্ডে উদাহরণগুলির ব্যাখ্যা করা হবে সূত্রগুলি লিখে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা তা খাতায় তুলে নেবে।

অভিযোজন ঃ—শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে,—

॥ **এক** ॥ পদ কয় প্রকার ও কি কি ?
॥ **দুই** ॥ বিশেষ্য পদ কাকে বলে ?
॥ **তিন** ॥ বিশেষণ পদের সংজ্ঞা দাও।
॥ **চার** ॥ ক্রিয়া পদ কাকে বলে ?
॥ **পাঁচ** ॥ প্রতি পদের পাঁচটি করে উদাহরণ দাও।

বাড়ীর কাজ—শিক্ষার্থীরা বাড়ী থেকে বিভিন্ন পদের সংজ্ঞাগুলি আয়ত্ত ক'রবে এবং প্রতি পদের ১০টি উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে তা খাতায় লিখে আনবে।

পাঠটীকা—১০

ব্যাকরণ

বিদ্যালয়—
শ্রেণী—ষষ্ঠ
ছাত্রসংখ্যা—৩০
গড় বয়স—১১+ বৎসর
সময়—৪০ মিনিট
তারিখ—
শিক্ষক—

বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিশেষ পাঠ—ব্যাকরণ
পাঠ-পরিচয়—স্বরসন্ধি
পাঠক্রম—
*১। স্বরসন্ধির প্রথম কয়েকটি সূত্র।
২। স্বরসন্ধির শেষ কয়েকটি সূত্র।
আজকের পাঠ—*চিহ্নিত অংশ

উদ্দেশ্য ঃ

॥ মুখ্য ॥ * বাংলা সন্ধির বিশেষত্ব ও রীতিগুলি গ্রহণ করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

॥ গৌণ ॥ * ব্যাকরণ-পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করা।
* ভাষা-ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করা।
* শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, প্রকাশ-ক্ষমতা ইত্যাদির বিকাশ-সাধনে সহায়তা করা।

উপকরণ ঃ

॥ সাধারণ ॥ চক, ডাস্টার প্রভৃতি সাধারণ উপকরণ ও রঙিন চক থাকবে।

॥ বিশেষ ॥ স্বরসন্ধির বিভিন্ন সূত্রের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ ক'রে বড় বড় অক্ষরে লেখা বিভিন্ন chart.

আয়োজন ঃ ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান-পরীক্ষার জন্য ও আলোচ্য পাঠের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে,—

॥ এক ॥ বর্ণ কাকে বলে?
॥ দুই ॥ স্বরবর্ণ কাকে বলে?
॥ তিন ॥ 'দেব' শব্দটিতে কতগুলি বর্ণ আছে?
॥ চার ॥ 'আলয়' শব্দটিতে কতগুলি বর্ণ আছে?
॥ পাঁচ ॥ 'দেবালয়' শব্দটিতে কতগুলি বর্ণ আছে?

পাঠ-ঘোষণা ঃ "আজ আমরা বিভিন্ন উদাহরণ বিশ্লেষণ ক'রে স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বর-বর্ণের মিলনে যে পরিবর্তন হয়, তার কয়েকটি সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করবো।"

উপস্থাপন :—

॥ প্রথম সূত্র ॥ অ+অ=আ আ+অ=আ

অ+আ=আ আ+আ=আ

কতকগুলি উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা হবে।

(ক) নব (অ)+(অ) অন্ন=নবা (আ) ন্ন ∴ অ+অ=আ

নর (অ) + (অ) অধম=নরা (আ) ধম ∴ অ+অ=আ

(খ) দেব (অ)+(আ) আলয়=দেবা (আ) লয় ∴ অ+আ=আ

জল (অ)+(আ) আশয়=জলা (আ) শয় ∴ অ+আ=আ

(গ) মহা (আ)+(অ) অরণ্য=মহা (আ) রণ্য ∴ আ+অ=আ

দুর্গা (আ)+(অ) অষ্টমী=দুর্গা (আ) ষ্টমী ∴ আ+অ=আ

(ঘ) মহা (আ)+(আ) আশয়=মহা (আ) শয় ∴ আ+আ=আ

বিদ্যা (আ)+(আ) আলয়=বিদ্যা (আ) লয় ∴ আ+আ=আ

প্রশ্ন :—

॥ এক ॥ 'নব' শব্দের শেষে ও 'অন্ন' শব্দের প্রথমে কি কি বর্ণ আছে?

॥ দুই ॥ এই দুটি বর্ণ মিলিত হ'য়ে 'নবান্ন' শব্দটিতে কোন্ বর্ণে পরিণত হ'য়েছে?

॥ তিন ॥ 'দেব' শব্দের শেষে ও 'আলয়' শব্দের প্রথমে কি কি বর্ণ আছে?

॥ চার ॥ এই দু'টি বর্ণ মিলিত হ'য়ে 'দেবালয়' শব্দটিতে কোন্ বর্ণে পরিণত হ'য়েছে?

॥ পাঁচ ॥ 'মহা' শব্দের শেষে ও 'অরণ্য' শব্দের প্রথমে কি কি বর্ণ আছে?

॥ ছয় ॥ এই দু'টি বর্ণ মিলিত হ'য়ে 'মহারণ্য' শব্দটিতে কোন্ বর্ণে পরিণত হ'য়েছে?

॥ সাত ॥ 'বিদ্যা' শব্দের শেষে ও 'আলয়' শব্দের প্রথমে কি কি বর্ণ আছে?

॥ আট ॥ এই দু'টি বর্ণ মিলিত হ'য়ে 'দেবালয়' শব্দটিতে কোন্ বর্ণে পরিণত হ'য়েছে?

এইভাবে বিভিন্ন উদাহরণ বিশ্লেষণ ক'রে শিক্ষক বোর্ডে সেগুলি লিখবেন। বিশ্লেষণের সময় রঙিন চক ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রশ্নগুলির মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চিন্তা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তিকে ব্যবহার করবেন। তারপর বিভিন্ন উদাহরণ সমন্বিত (এই সূত্রের উপর) Chart শিক্ষার্থীদের দেখাবেন। শিক্ষার্থীরাও বিভিন্ন শব্দ ও উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে সেগুলি বিশ্লেষণ ক'রবে।

প্রশ্ন :—তাহলে স্বরসন্ধির প্রথম সূত্রটি কি হবে?

॥ সূত্র ॥ "অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ কার হয়, আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।"

শিক্ষকমহাশয় শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় এই সূত্রটি গ্রহণ ক'রে সেটিকে বোর্ডে লিখবেন। প্রতিটি শিক্ষার্থী তা খাতায় তুলে নেবে।

॥ দ্বিতীয় সূত্র ॥

ই+ই=ঈ ঈ+ই=ঈ

ই+ঈ=ঈ ঈ+ঈ=ঈ

কতকগুলি উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা হবে।

(ক) গিরি (ই)+(ই) ইন্দ্র=গিরী (ঈ) ন্দ্র ∴ ই+ই=ঈ

রবি (ই)+(ই) ইন্দ্র=রবী (ঈ) ন্দ্র ∴ ই+ই=ঈ

(খ) প্রতি (ই)+(ঈ) ঈক্ষা=প্রতী (ঈ) ক্ষা ∴ ই+ঈ=ঈ

পরি (ই)+(ঈ) ঈক্ষা=পরী (ঈ) ক্ষা ∴ ই+ঈ=ঈ

(গ) শচী (ঈ)+(ই) ইন্দ্র=শচী (ঈ) ন্দ্র ∴ ঈ+ই=ঈ

সতী (ঈ)+(ঈ) ঈশ=সতী (ঈ) শ ∴ ঈ+ঈ=ঈ

প্রশ্ন ঃ—

॥ এক ॥ 'রবি' শব্দের শেষে ও 'ইন্দ্র' শব্দের প্রথমে কোন্ কোন্ বর্ণ আছে?

॥ দুই ॥ সে দু'টি বর্ণ মিলে 'রবীন্দ্র' শব্দটিতে কোন্ বর্ণে পরিণত হ'য়েছে?

॥ তিন ॥ 'পরি' শব্দের শেষে ও 'ঈক্ষা' শব্দের প্রথমে কোন্ কোন্ বর্ণ আছে?

॥ চার ॥ সে দু'টি বর্ণ মিলে 'পরীক্ষা' শব্দটিতে কোন্ বর্ণে পরিণত হ'য়েছে?

॥ পাঁচ ॥ 'শচী' শব্দের প্রথমে ও 'ইন্দ্র' শব্দের শেষে কোন্ কোন্ বর্ণ আছে?

॥ ছয় ॥ সে দু'টি বর্ণ মিলে 'শচীন্দ্র' শব্দে কোন্ কোন্ বর্ণ আছে?

॥ সাত ॥ 'সতী' শব্দের শেষে ও 'ঈশ' শব্দের প্রথমে কোন্ কোন্ বর্ণ আছে?

॥ আট ॥ এই দু'টি বর্ণ মিলে 'সতীশ' শব্দে কোন্ বর্ণে পরিণত হ'য়েছে?

এইভাবে বিভিন্ন উদাহরণ বিশ্লেষণ ক'রে (বোর্ডে) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে বা সূত্রে উপনীত হবেন,—

সূত্র ঃ— ই কার কিংবা ঈ-কারের পর ই কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈ-কার হয়। ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।'

সূত্রটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। আরও কতকগুলি সমধর্মী উদাহরণকে সূত্রে প্রয়োগ ক'রে দেখানো হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় হবে।

॥ তৃতীয় সূত্র ॥

উ+উ=উ উ+উ=ঊ

উ+ঊ=ঊ ঊ+ঊ=ঊ

কতকগুলি উদাহরণ সংগ্রহ করে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা হবে।

(ক) মরু (উ)+(উ) উদ্যান=মরূ (ঊ) দ্যান ∴ উ+উ=ঊ

কটু (উ)+(উ) উক্তি=কটূ (ঊ) ক্তি ∴ উ+উ=ঊ

(খ) লঘু (উ)+(ঊ) ঊর্মি=লঘূ (ঊ) র্মি ∴ উ+ঊ=ঊ

(গ) বধু (ঊ)+(উ) উৎসব=বধূ (ঊ) ৎসব ∴ ঊ+উ=ঊ

(ঘ) ভূ (ঊ)+(ঊ) ঊর্ধ্ব=ভূ (ঊ) র্ধ্ব ∴ ঊ+ঊ=ঊ

প্রশ্ন ঃ

॥ **এক** ॥ 'মরু' শব্দের শেষে ও 'উদ্যান' শব্দের প্রথমে কোন্ কোন্ বর্ণ আছে ?
॥ **দুই** ॥ এই দুটি বর্ণ মিলিত হয়ে 'মরূদ্যান' শব্দে কোন্ বর্ণে পরিণত হয়েছে ?
॥ **তিন** ॥ 'লঘু' শব্দের শেষে ও 'ঊর্মি' শব্দের প্রথমে কোন্ কোন্ বর্ণ আছে ?
॥ **চার** ॥ এই দু'টি বর্ণ মিলে 'লঘূর্মি' শব্দে কোন্ বর্ণে পরিণত হয়েছে ?
॥ **পাঁচ** ॥ 'বধূ' শব্দের শেষে ও উৎসব' শব্দের প্রথমে কোন্ কোন্ বর্ণ আছে ?
॥ **ছয়** ॥ এই দু'টি বর্ণ মিলে 'বধূৎসব' শব্দে কোন্ বর্ণ সৃষ্ট হয়েছে ?
॥ **সাত** ॥ 'ভূ' শব্দের শেষে ও 'ঊর্ধ্ব' শব্দের প্রথমে কোন্ কোন্ বর্ণ আছে ?
॥ **আট** ॥ এই দুটি বর্ণ মিলে 'ভূর্ধ্ব' শব্দে কোন্ বর্ণ সৃষ্ট হয়েছে ?

বোর্ডে রঙিন চকের মাধ্যমে উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ ক রে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় নিম্নরূপ সূত্রে উপনীত হবেন ;—

সূত্র ঃ—"উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঊ-কার হয়। ঊ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।"

সূত্রটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা তা খাতায় তুলে নেবে। তারপর শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে অনুরূপ কতকগুলি উদাহরণ সংগ্রহ করে সেগুলির মাধ্যমে সূত্রকে যাচাই করা হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় হবে। প্রয়োজন মত Chart ব্যবহার করা হবে।

অভিযোজন ঃ—শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে—

॥ **এক** ॥ আ-কারের সঙ্গে অ-কার যুক্ত ক'রলে কি হয় ?
॥ **দুই** ॥ ই কারের সঙ্গে ই-কার যুক্ত ক'রলে কি হয় ?
॥ **তিন** ॥ উ-কারের সঙ্গে উ-কার যুক্ত ক'রলে কি হয় ?
॥ **চার** ॥ স্বরসন্ধির প্রথম সূত্রটি কি ?
॥ **পাঁচ** ॥ স্বরসন্ধির দ্বিতীয় সূত্রটি কি ?
॥ **ছয়** ॥ স্বরসন্ধির তৃতীয় সূত্রটি কি ?
॥ **সাত** ॥ সন্ধি বিচ্ছেদ কর—মহানন্দ, মণীন্দ্র, নরাধম, শশাঙ্ক, অধীশ্বর, কবীন্দ্র।
॥ **আট** ॥ সন্ধি যুক্ত কর :—রত্ন+আকর, শচী+ইন্দ্র, মধ্য+অহ্ন, সুধী+ইন্দ্র।

বাড়ীর কাজ ঃ শিক্ষার্থীদের বাড়ী থেকে প্রতিটি সূত্রের উপর ৮।১০টি উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে সেগুলি বিশ্লেষণ ক'রে আনতে বলা হবে।

পাঠটীকা—১১

ব্যাকরণ

বিদ্যালয়—
শ্রেণী—নবম
ছাত্রসংখ্যা—৩০
গড় বয়স—১৪+ বৎসর
সময়—৪০ মিনিট
তারিখ —
শিক্ষক—

বিষয়—বাংলাভাষা ও সাহিত্য
বিশেষ পাঠ – ব্যাকরণ (সমাস)
পাঠক্রম—
১। সমাসের সাধারণ আলোচনা
২। দ্বন্দ্ব সমাস
৩। দ্বিগু সমাস
৪। কর্মধারয় সমাস
*৫। বহুব্রীহি সমাস
৬। তৎপুরুষ সমাস
৭। নিত্য সমাস ও অন্যান্য আলোচনা।

আজকের পাঠ —* চিহ্নিত অংশ

উদ্দেশ্য :—

॥ এক ॥ বহুব্রীহি সমাস ও তার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে অবহিত হ'তে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।
॥ দুই ॥ ব্যাকরণ পাঠে শিক্ষার্থীদের অনুরাগী করা।
॥ তিন ॥ ভাষা-ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করা।
॥ চার ॥ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ও বিশ্লেষণী শক্তির বিকাশ-সাধন।

উপকরণ :—

॥ এক ॥ চক, ডাস্টার প্রভৃতি শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।
॥ দুই ॥ বহুব্রীহি সমাসের শ্রেণীবিভাগের একটি *Chart*

আয়োজন : শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য ও আলোচ্য পাঠে তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে,—

॥ এক ॥ সমাস কাকে বলে ?
॥ দুই ॥ ব্যাসবাক্য ও সমস্ত পদ কাকে বলে ?
॥ তিন ॥ দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে ?
॥ চার ॥ কতগুলি পদে সমাস হয় ?
॥ পাঁচ ॥ সমস্তপদের অর্থ কি রকম হয় ?

পাঠ-ঘোষণা :—"আজ আমরা 'বহুব্রীহি সমাসে'র সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করবো।"

উপস্থাপন ঃ—বহুব্রীহি সমাসের বিভিন্ন উদাহরণ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হবে। এই উদাহরণগুলিকে বোর্ডে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হবে। শিক্ষার্থীরা সেগুলি পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি ক'রবে। তারপর সম্পূর্ণ আরোহী পদ্ধতিতে সূত্রে বা সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হবে।

পীত (হলুদ) অম্বর (পোশাক) যাহার=পীতাম্বর (শ্রীকৃষ্ণ)
দশ (১০) আনন (মুখ) যাহার=দশানন (রাবণ)
বীণা (বাদ্যযন্ত্র) পাণিতে (হাতে) যাহার=বীণাপাণি (সরস্বতী)
ত্রি (তিন) লোচন (চোখে) যাহার=ত্রিলোচন (শিব)

সূত্র—"যে সমাসে সমস্ত পদ দু'টির কোনটির অর্থ প্রধানভাবে না বুঝিয়ে অন্য কোন অর্থ বুঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।"

সূত্রটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা সেটিকে খাতায় তুলে নেবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে এবং পরিচিত শব্দ থেকে বহুব্রীহি সমাসের বিভিন্ন উদাহরণ সংগ্রহ ক'রবে এবং সেগুলিকে ব্যাখ্যা করবে। তারপর বহুব্রীহি সমাসের বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগের আলোচনার মধ্যে যাওয়া হবে।

॥ সমানাধিকরণ বহুব্রীহি ॥

গৌর (ফর্সা) অঙ্গ (শরীর) যাহার=গৌরাঙ্গ (শ্রীচৈতন্য)
নীল (রং বিশেষ) কণ্ঠ (গলা) যাহার=নীলকণ্ঠ (শিব)
পীত (হলুদ) অম্বর (পোশাক) যাহার=পীতাম্বর (কৃষ্ণ)
সু (সুন্দর) হৃদয় (মন) যাহার=সুহৃদ (বন্ধু)

	প্রশ্ন	**উত্তর**
॥ **এক** ॥	উল্লিখিত ব্যাসবাক্য সমূহে পূর্ব-পদ কি পদ ?	বিশেষণ
॥ **দুই** ॥	উল্লিখিত ব্যাসবাক্যগুলিতে উত্তর পদ কি পদ ?	বিশেষ্য
॥ **তিন** ॥	ব্যাসবাক্যগুলিতে পূর্ব-পদগুলিতে কি বিভক্তি আছে ?	প্রথমা
॥ **চার** ॥	ব্যাসবাক্যগুলিতে উত্তর পদগুলিতে কি বিভক্তি আছে ?	প্রথমা

সূত্র—"যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব-পদ বিশেষণ, উত্তর-পদ বিশেষ্য ; কিন্তু পূর্ব-পদে ও উত্তর-পদে সমান বিভক্তি থাকে, তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি বলে।"

সূত্রটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা তা খাতায় তুলে নেবে। তারপর শিক্ষার্থীরা সমানাধিকরণ বহুব্রীহির কতকগুলি উদাহরণ নিজেরাই খুঁজে বের করবে।

॥ ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ॥

শূল (ত্রিশূল) পাণিতে (হাতে) যাহার—শূলপাণি (শিব)
বীণা (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) পাণিতে (হাতে) যাহার—বীণাপাণি (সরস্বতী)
বজ্র(thunder) পাণিতে (হাতে) যাহার—বজ্রপাণি (ইন্দ্র)
পদ্ম (ফুল বিশেষ) নাভিতে (পেটের মধ্যস্থলে) যাহার—পদ্মনাভ (বিষ্ণু)

প্রশ্ন		উত্তর
॥ এক ॥	উপরের ব্যাসবাক্যগুলিতে পূর্ব পদ কি পদ ?	বিশেষ্য
॥ দুই ॥	উপরের ব্যাসবাক্যগু'লতে উত্তর-পদ কি পদ ?	বিশেষ্য
॥ তিন ॥	ব্যাসবাক্যগুলিতে পূর্ব-পদে কি বিভক্তি ?	প্রথমা
॥ চার ॥	ব্যাসবাক্যগুলতে উত্তর-পদে কোন্ বিভক্তি ?	সপ্তমী ('তে')

সূত্র—"যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব-পদ ও উত্তর-পদ উভয় পদই বিশেষ্য, কিন্তু উভয়-পদে বিভক্তির পার্থক্য থাকে তাকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি বলে।"

সূত্রটি বোর্ডে লেখা হবে। শিক্ষার্থীরা খাতায় তুলে নেবে। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই ব্যধিকরণ বহুব্রীহির কতকগুলি উদাহরণ খুঁজে বের করবে।

॥ ব্যতিহার বহুব্রীহি ॥

পরস্পর হাতে হাতে যে যুদ্ধ—হাতাহাতি
পরস্পর খুনে খুনে যুদ্ধ—খুনাখুনি
পরস্পর লাঠিতে লাঠিতে যুদ্ধ – লাঠালাঠি
পরস্পর কেশ ধরে যুদ্ধ—কেশাকেশি
পরস্পর কানে কানে কথা—কানাকানি
পরস্পর চোখে চোখে দেখা—চোখোচোখি

প্রশ্ন—

॥ এক ॥ উদাহরণগুলিতে কত জনের কাজকর্ম বোঝাচ্ছে ?
॥ দুই ॥ উদাহরণগুলিতে কত জনের কার্য প্রয়োজন হ'য়েছে ?
॥ তিন ॥ একই পদ কতবার ব্যবহৃত হ'য়েছে ?
॥ চার ॥ সমাসবদ্ধ পদগুলির মধ্যে ও অন্তে কোথায় 'আ' ও কোথায় 'ই' যুক্ত হয় ?

সূত্র—"একই বস্তু বা উপায় অবলম্বন ক'রে পরস্পর একই জাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন ক'রলে একই পদের পুনরাবৃত্তিতে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমান হয়।"

সূত্রটি বোর্ডে লেখা হবে, শিক্ষার্থীরা তা খাতায় তুলে নেবে। ব্যতিহার বহুব্রীহির কতকগুলি উদাহরণ সংগ্রহ ক'রতে শিক্ষার্থীদের বলা হবে।

॥ মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি ॥

॥ এক ॥ দেখন-**মাত্র** হাসি যাহার=দেখন-হাসি।
॥ দুই ॥ চাঁদের মতো **সুন্দর** মুখ যার=চাঁদমুখ
॥ তিন ॥ বৃষের মত **বৃহৎ** স্কন্ধ যাহার=বৃষস্কন্ধ
॥ চার ॥ দশ হাত **পরিমাণ** যাহার=দশহাতি
॥ পাঁচ ॥ মৃগের মত **সুন্দর** নয়ন যাহার=মৃগ-নয়না (স্ত্রীলিঙ্গ)

প্রশ্ন—(ক) এক নম্বর ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত 'মাত্র' শব্দটি সমস্তপদে কি হয়েছে ?
(খ) দুই নম্বর ব্যাসবাক্যে 'সুন্দর' শব্দটি সমস্তপদে কোথায় গেল ?

(গ) তিন ও চার নম্বর ব্যাসবাক্যে 'বৃহৎ' ও 'পরিমাণ' শব্দ দু'টি সমস্তপদে আছে কি ?

সূত্র—"যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত পদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে।"

সূত্রটি বোর্ডে লেখা হবে। শিক্ষার্থীরা তা খাতায় তুলে নেবে। অনুরূপ কতকগুলি উদাহরণ শিক্ষার্থীরা খুঁজে খুঁজে বের করবে।

॥ **নঞর্থক বহুব্রীহি** ॥

নাই লাজ যাহার—নিলাজ
বে (নাই) ই-মান (বিশ্বাস) যাহার—বেইমান
নাই পুত্র যাহার—অপুত্রক
নাই রাজা যে দেশে—অরাজক
নাই আদি যাহার—অনাদি

সূত্র—"নঞর্থক কোন অব্যয় পদের সঙ্গে যখন বিশেষ্য পদের বহুব্রীহি সমাস হয় তখন তাকে নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস বলে।"

সূত্রটি বোর্ডে লেখা হবে। শিক্ষার্থীরা তা খাতায় তুলে নেবে। শিক্ষার্থীরা অনুরূপ কতকগুলি উদাহরণ খুঁজে খুঁজে বের ক'রবে।

বহুব্রীহি সমাসের শ্রেণীবিভাগমূলক নিম্নলিখিত Chart-টি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হবে ;—

বহুব্রীহি সমাস

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি	ব্যধিকরণ বহুব্রীহি	ব্যতিহার বহুব্রীহি	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি	নঞর্থক বহুব্রীহি
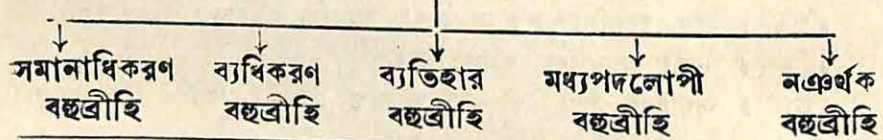
বোর্ডের কাজ :—বোর্ডে উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করা হবে, সূত্রগুলি লিখে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা তা খাতায় তুলে নেবে।

অভিযোজন :—শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে,—

॥ **এক** ॥ বহুব্রীহি সমাস কয় প্রকার ও কি কি ?
॥ **দুই** ॥ সামানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাসের তুলনা কর।
॥ **তিন** ॥ ব্যতিহার বহুব্রীহি কাহাকে বলে ? উদাহরণ দাও।
॥ **চার** ॥ নঞর্থক বহুব্রীহি ও নঞ্ তৎপুরুষ সমাসের মধ্যে পার্থক্য কি ?

বাড়ীর কাজ :—শিক্ষার্থীরা বাড়ী থেকে বহুব্রীহি সমাস ও তার বিভিন্ন বিভাগের উপর ভাল ক'রে পড়ে আসবে। এবং প্রতিটি বিভাগের ১০টি ক'রে উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে তার ব্যাসবাক্য লিখে আসবে।

পাঠটীকা—১২

রচনা

বিদ্যালয়—
শ্রেণী—অষ্টম
ছাত্রসংখ্যা—৩৬
গড় বয়স—১৩+ বৎসর
সময়—৪০ মিনিট
তারিখ—২৪।১।৭৩
শিক্ষক—

বিষয়—বাংলাভাষা ও সাহিত্য
বিশেষ পাঠ—রচনা
আজকের পাঠ—"বঙ্গে শরৎ"

উদ্দেশ্য ঃ

প্রত্যক্ষ—॥ **এক** ॥ 'বঙ্গে শরৎ' রচনাটি লিখতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
॥ **দুই** ॥ বঙ্গে শরতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

পরোক্ষ—॥ **এক** ॥ ভাষা-ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে তোলা।
॥ **দুই** ॥ সৃজনশীল সাহিত্য-সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।
॥ **তিন** ॥ শিক্ষার্থীদের মধ্যে কল্পনা-শক্তির বিকাশ সাধন করা।

উপকরণ ঃ

সাধারণ—চক, ডাস্টার প্রভৃতি শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

বিশেষ—॥ **এক** ॥ 'বঙ্গে শরৎ'-এর প্রাকৃতিক দৃশ্য সমন্বিত একখানি চিত্র।
॥ **দুই** ॥ শরৎকালের সম্বন্ধে লেখা কয়েকটি কবিতার উল্লেখযোগ্য ছত্রকে বড় বড় ক'রে সুন্দরভাবে লেখা Art paper.

আয়োজন ঃ

শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা ও আলোচ্য পাঠের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নলিখিত কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্নগুলি করা হবে ;—

॥ **এক** ॥ কয় মাসে বৎসর হয় ?
॥ **দুই** ॥ কত মাসে এক ঋতু হয় ?
॥ **তিন** ॥ ঋতু কয়টি ? কি কি ?
॥ **চার** ॥ ঋতুগুলির পর পর নাম বল।
॥ **পাঁচ** ॥ বর্ষাকালের প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা কর।

পাঠ-ঘোষণা ঃ

আজ আমরা 'বঙ্গে শরৎ' সম্বন্ধে আলোচনা করবো, এবং 'বঙ্গে শরৎ' সম্বন্ধে একটি রচনা-লেখায় এগিয়ে যাবো।

উপস্থাপন :

বঙ্গে শরৎ : Points—॥ এক ॥ ভূমিকা ; ॥ দুই ॥ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ; ॥ তিন ॥ শরতের উৎসব ; ॥ চার ॥ শরতের উপকারিতা ; ॥ পাঁচ ॥ শরতের অপকারিতা ; ॥ ছয় ॥ উপসংহার।

পদ্ধতি— শিক্ষক মহাশয় *Points*গুলি বোর্ডে লিখে দেবেন। তারপর প্রতিটি *Point* ধ'রে শিক্ষক নানারকম প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠদানে অগ্রসর হবেন। শিক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবে। শিক্ষাদানকালে শিক্ষক বিভিন্ন উদাহরণ ও কবিতার ছত্র ব্যবহার ক'রবেন। তারপর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় রচনা লিখবে। লেখার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব চিন্তাধারা ও ভাষাশৈলী ব্যবহার ক'রবে। রচনার *Points* অনুযায়ী শিক্ষক নিম্নলিখিতভাবে অগ্রসর হবেন :—

(ক) ভূমিকা :

॥ এক ॥ বর্ষাকালের পর কোন ঋতু আসে ?
॥ দুই ॥ কোন্ কোন্ মাস নিয়ে শরৎকাল ?
॥ তিন ॥ বর্ষাকালের পর শরৎকালে কি রকম প্রাকৃতিক পরিবর্তন হয় ?

(খ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী :

॥ এক ॥ শরৎকালে আকাশের অবস্থা কি রকম ?
॥ দুই ॥ শরৎকালে কি কি ফুল ফোটে ?
॥ তিন ॥ শরৎকাল সম্বন্ধে কি কি কবিতা জান ?
(এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 'বঙ্গে শরৎ' কবিতা দু'টি আলোচনা ক'রতে হবে।)
॥ চার ॥ শরৎকালের ধানগাছ ও অন্যান্য গাছপালার অবস্থা কি রকম থাকে ?
॥ পাঁচ ॥ শরৎকালে কাশবনের অবস্থা কি রকম ? শিউলি ফুলের সৌন্দর্য কি রকম ?
॥ ছয় ॥ কোন্ সময় থেকে শিশির পড়তে শুরু হয় ?

(গ) শরতের উৎসব :

॥ এক ॥ শরৎকালে কি কি উৎসব হয় ?
॥ দুই ॥ দুর্গাপূজা সম্বন্ধে কি জান ?
॥ তিন ॥ লক্ষ্মীপূজা সম্বন্ধে কি জান ?
॥ চার ॥ শ্যামাপূজা সম্বন্ধে আলোচনা কর।
॥ পাঁচ ॥ শরৎকালের অন্যান্য উৎসব (বিশ্বকর্মাপূজা, দীপান্বিতা ইত্যাদি) সম্বন্ধে কি জান ?
॥ ছয় ॥ দুর্গাপূজায় বাংলাদেশের সর্বত্র কি রকম উৎসবে মুখরিত হ'য়ে পড়ে ?
॥ সাত ॥ এই উৎসবে আমাদের মনের অবস্থা কি হয় ?

(ঘ) শরতের উপকারিতা ঃ

॥ এক ॥ শরতের জলবায়ু কি রকম ?

॥ দুই ॥ শরতে কি কি ফসল উৎপন্ন হয় ?

॥ তিন ॥ শরৎকালে বাংলাদেশে রাস্তাঘাটের অবস্থা কেমন থাকে ?

॥ চার ॥ নদী-নালার অবস্থা কেমন থাকে ? তাতে কি কি সুবিধা হয় ?

(ঙ) শরতের অপকারিতা ঃ

॥ এক ॥ বাংলাদেশে কোন্ সময় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী করে দেখা দেয়।

॥ দুই ॥ ধান-চাল প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যের দাম কোন্ সময় বেশী হয় ?

॥ তিন ॥ শরৎকালে বাংলাদেশে ঘরে ঘরে মানুষের হাতে কাজকর্ম কি রকম থাকে ?

॥ চার ॥ শরৎকালে মানুষের মধ্যে এত অভাব ও দৈন্য কেন দেখা দেয় ?

(চ) উপসংহার ঃ

॥ এক ॥ অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও 'বঙ্গে শরৎ' সকলের এত প্রিয় কেন ?

॥ দুই ॥ শরৎকাল তোমার কেমন লাগে ?

এরপর বিভিন্ন সংকেত (*Points*) সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন ক'রে বিষয়বস্তুর উপর তাদের দখল, ভাষা-ব্যবহার, বর্ণনা-কৌশল, চিন্তাভাবনার প্রতিফলন প্রভৃতি সম্বন্ধে জানা হবে।

॥ এক ॥ 'বঙ্গে শরৎ' রচনার 'ভূমিকা' অংশ কিরূপ হবে ?

॥ দুই ॥ শরৎকালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা কর।

॥ তিন ॥ শরৎকালে বাংলাদেশের উৎসবগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

॥ চার ॥ শরতের শোভা মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে ?

॥ পাঁচ ॥ শরতে উৎসব বাঙালীদের জাতীয় জীবনে কি রকম আনন্দ-চেতনার সৃষ্টি করে ?

॥ ছয় ॥ শরৎকালের উপকারিতাগুলি বর্ণনা কর।

॥ সাত ॥ বাংলাদেশের শরৎকালের অপকারিতাগুলি কি কি ?

॥ আট ॥ শরৎকাল তোমার কেন ভাল লাগে, তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা কর।

বোর্ডের কাজ ঃ—শিক্ষক রচনা-সংকেতগুলি বোর্ডে লিখে দেবেন। মূল রচনার উপর বিভিন্ন উদ্ধৃতি ও কবিতার ছত্র বোর্ডে লিখে দেবেন।

অভিযোজন ঃ—শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ খাতায় 'বঙ্গে শরৎ' রচনাটি লিখতে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সংকেতের উপর অনুচ্ছেদ সহকারে সুশৃংখলভাবে রচনা লিখবে। রচনায় যতিচিহ্ন ও অনুচ্ছেদ যথাযথভাবে রক্ষা ক'রতে হবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনা-শক্তিকে

নিয়ে রচনার কাজে এগিয়ে যাবে। শিক্ষার্থীরা ঠিকমত রচনা লিখছে কি না শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের কাছে কাছে ঘুরে ঘুরে তা দেখা হবে। প্রয়োজনমত শিক্ষার্থীদের রচনা লিখতে সাহায্য করা হবে। শিক্ষার্থীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে নিজেদের স্বাধীন ও সৃজনশীল চিন্তাধারাকে রচনার মধ্যে প্রতিফলিত ক'রবে।

বাড়ীর কাজ :—'বঙ্গে শরৎ' রচনাটি বাড়ী থেকে ভাল ক'রে লিখে আনতে শিক্ষার্থীদের বলা হবে।

পাঠটীকা—১৩

দ্রুতপঠন

বিদ্যালয়—
শ্রেণী—দশম
ছাত্রসংখ্যা—৩০
গড় বয়স—১৭ + বৎসর
সময়—৩৫ মিনিট
তারিখ—
শিক্ষক—

বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিশেষ পাঠ—দ্রুতপঠন
সাধারণ পাঠ—
'ছুটি'—রবীন্দ্রনাথ
আজকের পাঠ—
সমগ্র গল্পটি

উদ্দেশ্য :

॥ এক ॥ 'ছুটি' গল্পের তাৎপর্য ও রসাস্বাদনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
॥ দুই ॥ ছোটগল্পপাঠে শিক্ষার্থীদের অনুরাগ সৃষ্টি করা।
॥ তিন ॥ শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করা ও তাদের কল্পনা ও অনুভূতির বিকাশে সাহায্য করা।

উপকরণ :—সাধারণ

আয়োজন—আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে ;—

॥ এক ॥ কোন্ কোন্ গল্প তোমরা পড়েছ ?
॥ দুই ॥ বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন গল্প-রচয়িতার নাম কর।
॥ তিন ॥ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোটগল্পের নাম কর।
॥ চার ॥ ছুটি পেলে তোমাদের এত ভাল লাগে কেন ?

॥ পাঁচ ॥ গ্রীষ্ম বা পূজার ছুটি পেলে তোমাদের কেমন লাগে ?
॥ ছয় ॥ মৃত্যুকে জীবনের ছুটি বলা যায় কেন ?
॥ সাত ॥ ছুটি পেলে তোমাদের কি করতে ইচ্ছে করে ?

পাঠ-ঘোষণা—"আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পটি আলোচনা ক'রবো ও তার রসাস্বাদনে চেষ্টা ক'রবো।"

উপস্থাপন :

* ৪।৫টি ছেলেমেয়ে ক্রমান্বয়ে 'ছুটি' গল্পটি সার্থকভাবে সরব পাঠ ক'রবে।

* রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সাধারণভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

* গল্পটির ভাব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। ছেলেমেয়েরা ছুটি ভালবাসে। বিদ্যালয় জীবনের বন্দীত্ব থেকে তারা 'ছুটি'র মাধ্যমে মুক্তি পায়। ছুটির দিনগুলিতে নিজস্ব পরিবেশে তারা আনন্দ, হাসি, গান, খেলাধুলা ও অফুরন্ত স্বাধীনতায় নিজেকে উজাড় করে দিয়ে প্রকাশ করে। কিন্তু ছুটির দিনগুলিতেও যদি কোন শিশুকে তার অবাঞ্ছিত স্থানে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে সে নিজেকে অসহায় মনে করে। এই পরিস্থিতিতে শিশু যখন অত্যাচরের সম্মুখীন হয়, তখন তার জীবন বেদনাময় হ'য়ে উঠে। 'ছুটি' গল্পের নায়ক ফটিকের মধ্যেও তাই হ'য়েছিল। এর পরিণতি যে করুণ ও মর্মস্পর্শী হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তা 'ছুটি' গল্পের মাধ্যমে তুলে ধ'রেছেন।

* গল্পটির ভাব ও তাৎপর্য যথাযথভাবে গ্রহণ করবার জন্য নিম্নলিখিত সংকেত বা Pointগুলি বোর্ডে লিখে দেবেন,—

(১) ফটিকের দুষ্টুমি ও খেলাধুলা, (২) গ্রাম্য পরিবেশে ফটিকের স্বাধীনতা, (৩) কিশোর বয়সের ধর্ম, (৪) মামার আগমনে অবস্থার পরিবর্তন, (৫) মামার বাড়ীতে ফটিকের অবস্থা, (৬) বাড়ীতে ফিরে আসবার জন্য ফটিকের আগ্রহ, (৭) ফটিকের জ্বর, (৮) খালাসীদের জল মাপবার অভিজ্ঞতা, ফটিকের প্রলাপ—তার তাৎপর্য, (৯) 'ছুটি' কথার তাৎপর্য।

* দ্রুত নীরব পাঠ ক'রে বিষয়বস্তু আয়ত্ত ক'রবার জন্য শিক্ষার্থীদের ৬।৭ মিনিট সময় দেওয়া হবে।

* বিষয়বস্তু ও তাৎপর্য গ্রহণ করবার জন্য শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে,—

॥ এক ॥ ফটিকের খেলাধুলা বর্ণনা কর।
॥ দুই ॥ ফটিক কিরূপ দুষ্টুমি ক'রতো ?
॥ তিন ॥ ফটিকের দুষ্টুমি-ভরা জীবনে কিরূপ প্রাণ-চাঞ্চল্য ছিল ?
॥ চার ॥ মামার আগমনের চিত্র বর্ণনা কর।
॥ পাঁচ ॥ মামার আগমনে ফটিকের কি হল ?

॥ ছয় ॥ মামার বাড়ীতে যাওয়ার সময় খালাসীদের জল মাপার ঘটনা বর্ণনা কর।
॥ সাত ॥ মামার বাড়ীতে ফটিকের অবস্থা বর্ণনা কর।
॥ আট ॥ ফটিকের বাড়ী আসবার আগ্রহ কি রকম ছিল ?
॥ নয় ॥ ফটিকের হারিয়ে-যাওয়া ও অসুস্থ হ'য়ে ফেরার ঘটনা বর্ণনা কর।
॥ দশ ॥ ফটিকের অসুস্থ অবস্থার প্রলাপ কিরূপ ছিল ?
॥ এগারো ॥ ফটিকের 'মৃত্যু' ও 'ছুটি' গল্পের তাৎপর্য বর্ণনা কর।

অভিযোজন—শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে ;—

॥ এক ॥ ফটিকের ছোট বেলাকার চরিত্র বর্ণনা কর।
॥ দুই ॥ মামার বাড়ীতে ফটিকের অবস্থা বর্ণনা কর।
॥ তিন ॥ ফটিকের অসুস্থতা ও প্রলাপ সম্বন্ধে কি জান ?
॥ চার ॥ 'ছুটি' গল্পের তাৎপর্য বর্ণনা কর।
॥ পাঁচ ॥ ফটিকের মৃত্যুর মাঝে গল্পের তাৎপর্য কতখানি হ'য়েছে ?
॥ ছয় ॥ গল্পটি তোমাদের ভাল লাগলো কেন ?
॥ সাত ॥ ফটিকের চরিত্র বর্ণনা কর।

বাড়ীর কাজ—শিক্ষার্থীরা বাড়ীতে 'ছুটি' গল্পটি কয়েকবার পড়বে, এবং গল্পটি কেন ভাল লাগলো, সে সম্বন্ধে প্রতি শিক্ষার্থী ১০।১২টি বাক্য লিখে আনবে।

পাঠটীকা—১৪

সাহিত্যের ইতিহাস

বিদ্যালয়
শ্রেণী—দশম
ছাত্রসংখ্যা—৩০
গড় বয়স—১৫ + বৎসর
সময়—৪০ মিনিট
তারিখ—
শিক্ষক—

বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিশেষ পাঠ—সাহিত্যের ইতিহাস
সাধারণ পাঠ—কাব্যে মধুসূদন

আজকের পাঠ—মধুসূদন দত্তের কাব্য

উদ্দেশ্য ঃ

॥ এক ॥ বাংলা কাব্যধারায় মধুসূদনের অবদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

॥ দুই ॥ মধুসূদনের কাব্য-রীতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

॥ তিন ॥ শিক্ষার্থীদের কল্পনা ও চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন করা।

উপকরণ ঃ

॥ এক ॥ চক, ডাস্টার প্রভৃতি শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

॥ দুই ॥ মধুসূদনের কাব্যগুলির কালানুক্রমিক তালিকার নিম্নরূপ রেখাচরিত্র ঃ

মধুসূদন দত্তর কাব্য-সৃষ্টি

১৮২৪—কবির জন্ম

১৮৪৮, ১৮৪৯—Captive Lady, Visions of the Past

১৮৬০—তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য

১৮৬১—মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা-কাব্য

১৮৬২—বীরাঙ্গনা-কাব্য

১৮৬৬—চতুর্দশপদী কবিতাবলী

১৮৭৪—কবির মৃত্যু

আয়োজন—আজকের পাঠের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের কৌতূহল বৃদ্ধির জন্য ও তাদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে ;—

॥ এক ॥ বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন আধুনিক কবির নাম কর।

॥ দুই ॥ 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা', 'বঙ্গভাষা', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', 'আত্মবিলাপ', 'কবিগুরু-বন্দনা' প্রভৃতি কার লেখা ?

॥ তিন ॥ তাঁর লেখা আর কয়েকটি কবিতার নাম কর।

॥ চার ॥ মধুসূদন দত্তর লেখা কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম কর।

পাঠ-ঘোষণা—আজ আমরা মধুসূদন দত্তর কাব্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করবো। বাংলা কাব্য-ধারায় মধুসূদনের অবদান ও তাঁর কাব্য-রীতি সম্বন্ধে অবহিত হব।

উপস্থাপন ঃ

বিষয়বস্তুর আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে নিম্নলিখিতভাবে পাঠদান অগ্রসর হবে,—

বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
কবিজীবনী—কবির বিরাট প্রতিভা। চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব দোষগুণের চমৎকারিত্বে ভরা। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা, খ্রীষ্টধর্মের আকর্ষণ, বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা। ইংরেজীতে কবিতা লিখে কবি কাব্যজীবন শুরু ক'রেছিলেন। পরে বাংলা কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। জীবন সম্পর্কে তাঁর বিরাট ধারণা ছিল। তিনি বিদেশে থাকাকালীন প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। ফলে তাঁকে নানাভাবে অসুবিধায় পড়তে হ'য়েছিল। বহু কষ্ট, দুঃখ ও অভিমানের মধ্যে কবি দেহত্যাগ করেন। জন্ম—১৮২৪, মৃত্যু—১৮৭৪।	॥ এক ॥ মধুসূদন দত্তর জীবনী বর্ণনা কর।
কাব্যরচনা—মধুসূদন প্রতিভাধর কবি ছিলেন। তাঁর কতকগুলি রচনায় বাংলা কাব্য সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। কবির ইচ্ছা ছিল যে, তিনি মিল্টনের মত বড় কবি হবেন। ২টি ইংরেজী কাব্যও তিনি রচনা ক'রেছিলেন। তারপর মত পরিবর্তন করেন। তিনি কতকগুলি নাটকও রচনা করেন। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী প্রধান। মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' বাংলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট প্রহসন। এ ছাড়াও তিনি বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সংযোজন করেন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বছর কবির	॥ দুই ॥ মধুসূদনের কাব্য-রচনার পরিচয় দাও।

বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
সাহিত্য-সৃষ্টির স্বর্ণযুগ। এই সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রধান প্রধান রচনাগুলি লিখেছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে তিনি ইংরাজী সনেটের অনুসরণে বাংলা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন। এটিও উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টি। মধুসূদনের কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রীতির সংমিশ্রণ হয়েছিল। তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার স্পর্শে বাংলা কাব্য-সাহিত্য সমৃদ্ধ হ'য়েছিল।	॥ তিন ॥ মধুসূদনের কাব্য-রচনার স্বর্ণযুগ কোন্‌টি ?
ইংরেজী রচনা—বিলেত গিয়ে সাহেব হওয়া ও মিল্টনের মত কবি হওয়া ছিল মধুসূদনের কৈশোর জীবনের স্বপ্ন। মাদ্রাজে থাকাকালীন তাই তিনি ২টি ইংরেজী কাব্য রচনা করেন। সে দু'টি হল,—Captive Lady, Visions of the Past। কিন্তু তিনি আশানুরূপ প্রশংসা পেলেন না। তখন তিনি বাংলায় কাব্য-সাহিত্য রচনায় আকৃষ্ট হন।	॥ চার ॥ মধুসূদনের ইংরেজী রচনার পরিচয় দাও।
তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য—১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা মহাকাব্যিক (Epicling) জাতীয় রচনা ; মাঝে মাঝে গীতি-কবিতার রেশ আছে। কাব্যটি বর্ণনাময় ও ভাব-প্রধান, ঘটনা খুব বেশী নেই। তিলোত্তমা মধুসূদনের কাব্যের উপেক্ষিতা। ছন্দঃপ্রবাহ ও ধ্বনিঝংকার কাব্যের মূল বস্তু।	॥ পাঁচ ॥ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য সম্বন্ধে কি জান ?
মেঘনাদবধ কাব্য—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—দুই খণ্ডে, ৯টি সর্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা, মহাকাব্য জাতীয় রচনা। বীররসে রচনা করবার প্রতিশ্রুতি থাকলেও করুণ রস প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রীতির মিলন হয়েছে। নায়ক মেঘনাদ, রাবণকেও নায়ক বলা হয়। মহাকাব্যটি দ্বি-নায়কত্বের লক্ষণযুক্ত। মেঘনাদ কবির 'a fine fellow', রাবণ 'a grand fellow ; 'I hate Ram and his rabble',—রাম সম্বন্ধে এই হ'ল কবির ধারণা। রাম-রাবণ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা স্বীকৃত হয় নাই। সমস্ত কাব্যটি ওজস্বিতায় ভরা।	॥ ছয় ॥ মেঘনাদবধ-কাব্য সম্বন্ধে কি জান ?
ব্রজাঙ্গনা-কাব্য—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। রাধার বিরহকে কেন্দ্র ক'রে বৈষ্ণব পদাবলীর রীতিতে লেখা ব্রজাঙ্গনা সার্থক গীতিকাব্য। ছন্দ ও মাত্রার ক্ষেত্রে কবি বৈচিত্র্য সৃষ্টি ক'রেছেন।	॥ সাত ॥ ব্রজাঙ্গনা-কাব্য কোন্ জাতীয় রচনা ?

বিষয়বস্তু	পদ্ধতি
বীরাঙ্গনা কাব্য—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। Ovid-এর অনুকরণে লেখা পত্র-কাব্য। ১১টি পত্র আছে—বিভিন্ন পৌরাণিক নায়িকার লেখা। আরও কতকগুলি অসম্পূর্ণ পত্র আছে। বীরাঙ্গনা সার্থক গীতিকবিতার মধ্যে পড়ে—যদিও এটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। কবি Lyric ক্ষমতাকে এই কাব্যে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। এটি মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা, অনেক জায়গায় নাটকীয়তাও আছে। ছন্দ, আবেগ, ভাষা, নাটকীয়তা, গীতিরস ইত্যাদি মিলে বীরাঙ্গনা সার্থক কাব্যসৃষ্টি।	॥ আট ॥ বীরাঙ্গনা কাব্যের পরিচয় দাও।
চতুর্দশপদী কবিতাবলী—১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত অধিকাংশ রচনা ফ্রান্সে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৬০ থেকেই কবি সনেটের অনুকরণে চতুর্দশপদী কবিতা লেখার সূত্রপাত করেছিলেন। কবির অন্তর-অনুভূতির বেদনা-বিধুর আর্তি এই সনেটগুলিতে রূপ পেয়েছে। কবির প্রায় ১০২ খানি সনেট আছে। মধুসূদন বাংলা সনেটের প্রথম সার্থক কবি।	॥ নয় ॥ বাংলা সনেট সম্বন্ধে কি জান ?
অন্যান্য কবিতা—কাব্যগ্রন্থের বাইরে মধুসূদন মাঝে মাঝে কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ফরমায়েসি রচনা! 'আত্মবিলাপ' ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কবিতা।	॥ দশ ॥ মধুসূদনের অন্যান্য কবিতার পরিচয় দাও।

বোর্ডের কাজ—শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আজকের পাঠের নিম্নরূপ সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা তা খাতায় তুলে নেবে।

সারাংশ—বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৪) একজন প্রতিভাধর কবি। ১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী Captive Lady, Visions of the Past রচনা করেন। পরে তিনি বাংলায় কাব্য নাটক রচনা ক'রতে প্রবৃত্ত হন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৮৬১-তে মেঘনাদবধ-কাব্য ও ব্রজাঙ্গনা-কাব্য রচিত হয়। ১৮৬২-তে বীরাঙ্গনা কাব্য রচিত হয়। ১৮৬৩-তে তাঁর 'চতুর্দশপদী' কবিতাবলী প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও তাঁর আরও কয়েকটি কবিতা আছে।"

অভিযোজন: শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে,—

॥ এক ॥ মধুসূদনের জীবনের স্বপ্ন কি ছিল ?

॥ দুই ॥ তাঁর লেখা মহাকাব্যটির বিস্তৃত পরিচয় দাও।

॥ তিন ॥ মধুসূদনের বীরাঙ্গনা-কাব্য সম্বন্ধে কি জান ?

॥ চার ॥ তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীর পরিচয় দাও।

বাড়ীর কাজ: মধুসূদনের কাব্যকীর্তি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা বাড়ীতে ভাল ক'রে পড়াশুনা ক'রবে, আলোচনা ক'রবে।

পাঠটীকা—১৫

ভাবসম্প্রসারণ

বিদ্যালয়—
শ্রেণী—অষ্টম
ছাত্রসংখ্যা—৩৬
গড় বয়স—১৩+ বৎসর
সময়—৩০ মিনিট
তারিখ—
শিক্ষক—

বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিশেষ পাঠ—ভাবসম্প্রসারণ
আজকের পাঠ—
"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

উদ্দেশ্য :

॥ **এক** ॥ আজকের পাঠের মর্ম ও তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রে তাকে নিজের ভাষায় সম্প্রসারিত ক'রতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

॥ **দুই** ॥ শিক্ষার্থীদের ভাষা-জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

॥ **তিন** ॥ শিক্ষার্থীদের কল্পনা-শক্তি ও চিন্তা-শক্তির বিকাশ সাধন।

॥ **চার** ॥ সৃজনশীল রচনায় শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।

উপকরণ : সাধারণ

আয়োজন : আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে,—

॥ **এক** ॥ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কি জান ?
॥ **দুই** ॥ তিনি সব মানুষের সেবা করতেন কেন ?
॥ **তিন** ॥ ভগবান কি ?
॥ **চার** ॥ তিনি কোথায় থাকেন ?

পাঠ-ঘোষণা : "আজ আমরা স্বামী বিবেকানন্দের লেখা—
'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'
—অংশটির আলোচনা ক'রে মূল ভাবটিকে সম্প্রসারিত ক'রবো।"

উপস্থাপন—

* শিক্ষক মূল অংশটি বোর্ডে স্পষ্ট করে লিখে দেবেন।
* অংশটি ২।৩ বার স্পষ্ট করে পড়া হবে, যাতে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে মূল ভাবটি গ্রহণ ক'রতে সুবিধা হয়।
* মূল ভাবটিকে যাতে শিক্ষার্থীরা ভালভাবে গ্রহণ ক'রতে পারে, তাৎপর্য যাতে পরিষ্কার ক'রে গ্রহণ করতে পারে, তার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নগুলি করা হবে,—

॥ এক ॥ মন্দিরে কে থাকে ?
॥ দুই ॥ মস্‌জিদে কি হয় ?
॥ তিন ॥ গির্জায় কি হয় ?
॥ চার ॥ ভগবান কে ও কি ?
॥ পাঁচ ॥ ভগবান কোথায় থাকেন ?
॥ ছয় ॥ মানুষ ভগবানের পূজা-অর্চনা করে কেন ?
॥ সাত ॥ মানুষ কোথা থেকে এসেছে ?
॥ আট ॥ মানুষ সৃষ্টি করেছে কে ?
॥ নয় ॥ মানুষকে ঘৃণা করলে কি ভগবানকে পাওয়া যায় ?
॥ দশ ॥ ভগবানকে 'জগৎ-পিতা' বলা হয় কেন ?
॥ এগারো ॥ ভগবানকে অবহেলা করে মন্দিরে বসে পূজা-অর্চনা করলে কি ভগবানকে পাওয়া যায় ?
॥ বারো ॥ ভগবান কোথায় বিরাজ করেন ?
॥ তের ॥ 'শুচি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন ?
॥ চোদ্দ ॥ মনীষীরা মানুষকে ভালবাসতেন না, ঘৃণা করতেন ?
॥ পনের ॥ মানুষের সেবা ক'রলে কি হয় ?
॥ ষোল ॥ মন্দিরে-মস্‌জিদে-গির্জায় ভগবানের আরাধনা না করে আমরা যদি জীবকে ভালবাসি তবে কেমন হয় ?

* মূল অংশটি আর একবার স্পষ্ট ক'রে পড়ে দেওয়া হবে।
* ২।৩টি ছেলেমেয়েকে অংশটির মূল কথা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলতে বলা হবে।

অভিযোজন—এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের খাতায় মূল অংশটির ভাবসম্প্রসারণ ক'রে লিখবে। শিক্ষক মহাশয় ঘুরে ঘুরে দেখবেন, শিক্ষার্থীরা ভাবসম্প্রসারণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

॥ এক ॥ যথাযথভাবে যতি-চিহ্ন স্থাপন।
॥ দুই ॥ উপযুক্তভাবে অনুচ্ছেদ রচনা।
॥ তিন ॥ সহজ, সরল ও সাবলীলভাবে ভাষা ব্যবহার।
॥ চার ॥ মূল ভাবটির যথাযথ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।
॥ পাঁচ ॥ ভুল তথ্য বা ভুল বিশ্লেষণ চলবে না।
॥ ছয় ॥ ভাবসম্প্রসারণ যেন অসম্পূর্ণ না থাকে।
॥ সাত ॥ লেখার মধ্যে শিক্ষার্থীর নিজস্বতা প্রকাশিত হবে, লেখবার পর শিক্ষার্থীদের খাতাগুলি সহানুভূতি সহকারে যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে সংশোধন করে দেওয়া হবে।

বাড়ীর কাজ—শিক্ষার্থীরা বাড়ী থেকে সুন্দর করে অংশটির ভাবসম্প্রসারণ ক'রে লিখে আনবে।

পাঠটীকা—১৬

অনুবাদ

বিদ্যালয়—
শ্রেণী—দশম
ছাত্র সংখ্যা—৩২
গড় বয়স—১৫ + বৎসর
সময়—৩০ মিনিট
তারিখ—
শিক্ষক—

বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিশেষ পাঠ—ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ
আজকের পাঠ—
"A day……my heart"

উদ্দেশ্য ঃ

॥ এক ॥ মূল অংশটিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
॥ দুই ॥ শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করা।
॥ তিন ॥ শিক্ষার্থীদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করা।
॥ চার ॥ শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি ও সৌন্দর্য-চেতনার বিকাশ সাধন করা।

উপকরণ ঃ

॥ এক ॥ চক, ডাস্টার প্রভৃতি শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।
॥ দুই ॥ মূল অংশটি বড় বড় হরফে লেখা একটি art paper।

আয়োজন ঃ

শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য ও আজকের পাঠের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে—

॥ এক ॥ রবিনসন ক্রুশো কে ছিলেন ?
॥ দুই ॥ তাঁর সম্বন্ধে কি জান ?

পাঠ-ঘোষণা ঃ

আজ আমরা নিম্নলিখিত অংশটিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করবো,—"A day or two later I suddenly came upon a strange sight, and one that filled me with fear, for in the sand was the print of a man's foot ! For a moment I stood thunder-struck. I listened. I looked around. I could hear nothing—I could see nothing. Again I looked at the footprint. There it was : I could see the mark of the toes, heel, and all. How it came there I could not imagine, and full of terror, hardly knowing what I did, I fled home; mistaking every bush and tree for someone chasing me.

I could not sleep, nor dared I stir out of my castle for days, lest some Savage should capture me. However, I gained a little courage and went with much dread to make sure that the footprint was not my own. I measured my foot against it. Mine was not nearly so large. A stanger, may be a savage must have been on shore, and fear again filled my heart."—*Robinson Crusoe*

উপস্থাপন :

অংশটির অনুবাদ করবার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পাঠদান করা হবে ;—

॥ এক ॥ Art paper-এ লেখা মূল অংশটি শিক্ষার্থীদের দেখানো হবে।

॥ দুই ॥ অংশটি স্পষ্ট ও শুদ্ধ করে ধীরে ধীরে পড়ে দেওয়া হবে।

॥ তিন ॥ কঠিন কঠিন শব্দগুলির অর্থ শিক্ষার্থীদের সহযো গতায় বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে—

Suddenly—আকস্মিকভাবে, strange sight—অদ্ভুত দৃশ্য, moment—মুহূর্ত, thunder-struck—বজ্রাহত, footprint—পদচিহ্ন, toe—পায়ের আঙুল, heel—গোড়ালি, imagine—কল্পনা করা fled—পালিয়ে যাওয়া, mistake—ভুল, bush—ঝোপ, chase—পশ্চাদ্ধাবন করা, dare—সাহসী হওয়া, stir out—উত্তেজিত হয়ে বাইরে আসা, castle—প্রাসাদ, savage—অসভ্য, বর্বর ; capture—বলপূর্বক অধিকার করা, gain—লাভ, সংগ্রহ ; courage—সাহস, dread—আতঙ্ক, stranger—বহিরাগত, shore—উপকূল।

॥ চার ॥ মূল অংশটি আর একবার পড়ে দেওয়া হবে।

॥ পাঁচ ॥ রবিনসন ক্রুশোর কাহিনী সংক্ষেপে শিক্ষার্থীদের বলা হবে।

॥ ছয় ॥ মূল অংশটি থেকে ছোট ছোট বাক্য বা ব্যাকাংশ নির্বাচন ক'রে সেগুলিকে অনুবাদ ক'রতে শিক্ষার্থীদের বলা হবে। যেমন—

A day or two later—দু' একদিন পরে।

I suddenly came upon a strange sight—আকস্মিকভাবে আমি এক অদ্ভুত দৃশ্যের সম্মুখীন হলাম।

that filled me with fear—যা আমাকে ভয়াতুর করলো।

in the sand was the print of a man's f ot—বালুকাভূমিতে একজন মানুষের পদচিহ্ন আঁকা ছিল।

for a moment I stood thunder-struck—মুহূর্তের জন্য আমি বজ্রাহতের মত দাঁড়ালাম।

I listened—আমি শুনলাম। I looked around—আমি চারিদিকে দেখলাম।

I could hear nothing—আমি কিছুই শুনতে পেলাম না।

I could see nothing—আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

Again I looked the footprint—আবার আমি পদচিহ্নটির দিকে তাকালাম।

I could see the mark of the toes, heel and all—আমি পায়ের আঙ্গুল, গোড়ালি ও সব কিছু দাগ দেখতে পেলাম।

How it came there I could not imagine—এটা কিভাবে সেখানে এল তা আমি আন্দাজ করতে পারলাম না।

I fled home—আমি বাড়ীতে পালিয়ে এলাম।

someone chasing me—কেউ আমার পিছনে ধাওয়া করছে।

I could not sleep—আমি ঘুমোতে পারলাম না।

nor dared I stir out my castle for days—কয়েকদিনের জন্য আমি আমার ঘরের বাইরে বেরুতে পরেলাম না।

some savage should capture me—কোন অসভ্য আমাকে আক্রমণ ক'রবে।

I gained a little courage—আমি কিছুটা সাহস সংগ্রহ করলাম।

to make sure that the foot-print was not my own—এটা নিশ্চিত হতে যে পদচিহ্নটি আমার নিজেরই ছিল না।

I measured my foot against it—তার সঙ্গে আমি আমার পায়ের পরিমাপ করলাম।

Mine was not so large—আমারটা অত বড় ছিল না।

A stranger must have been on the shore—একজন বহিরাগত নিশ্চয়ই উপকূলে এসেছিল।

fear again filled my heart—আমি আবার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হলাম।

এইভাবে বিভিন্ন বাক্য বা বাক্যাংশের অনুবাদ করা হবে। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে এই জাতীয় অনুবাদ করা যেতে পারে। মাঝে মাঝে বোর্ডের ব্যবহার করতে হবে। অনুবাদগুলির note শিক্ষার্থীরা যথাসম্ভব খাতায় তুলে নেবে।

॥ **সাত** ॥ অনুবাদ করবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কথা মনে রাখতে হবে,

(ক) মূল অংশের মত যথাস্থানে অনুচ্ছেদ রচনা করতে হবে।

(খ) বিভিন্ন শব্দের অর্থকে যথাসম্ভব মেনে চলতে হবে।

(গ) মূল অংশের ভাব ও বিষয়কে গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) অনূদিত অংশের ভাষা সাবলীল হবে।

(ঙ) কেবল আক্ষরিক অনুবাদ যথেষ্ট নয়, ভাবানুবাদেরও প্রয়োজন আছে।

(চ) অনূদিত অংশের মধ্যে সাহিত্যগুণ ও অনুবাদকের নিজস্ব রচনাশৈলীর প্রতিফলন করতে হবে।

॥ **আট** ॥ শিক্ষার্থীদের রবিনসন ক্রুশোর সার্থক অনুবাদ গ্রন্থ পড়তে বলা হবে।——

অভিযোজন—শিক্ষার্থীরা মূল অংশটি ধরে প্রত্যেকে নিজ নিজ খাতায় অনুবাদ রচনা ক'রবে। শিক্ষক মহাশয় ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনমত তিনি বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে অনুবাদ-কর্মে সাহায্য করবেন। এই সব খাতাগুলিকে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের বাইরে নিয়ে গিয়ে তাঁর অবসরমত দেখে দেবেন, ভুল হ'লে সংশোধন ক'রে দেবেন। এই সংশোধন সম্পূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে হবে।

বাড়ীর কাজ—শিক্ষার্থীরা আরও চিন্তা ক'রে বাড়ী থেকে ভাল ক'রে অংশটির অনুবাদ ক'রে লিখে আনবে এবং রবিনসন ক্রুশোর সার্থক অনুবাদ গ্রন্থ পাঠাগার থেকে সংগ্রহ ক'রে পড়ে আসবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এড. পরীক্ষার পাঠটীকার

প্রশ্নাবলী

১৯৬৬ (ক) ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি'। কবিতাটির আট ছত্র উদ্ধৃত করিতে হইবে।

(খ) অষ্টম শ্রেণীতে 'সমাস'।

(গ) নবম শ্রেণীতে পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্গত একটি গল্প।

(ঘ) দশম শ্রেণীতে সাহিত্যের ইতিহাস—চণ্ডীমঙ্গল প্রসঙ্গ।

১৯৬৭ (ক) সপ্তম শ্রেণীতে রবীন্দ্রনাথের যে-কোন একটি কবিতা (যাহা আপনি উক্ত শ্রেণীর পাঠ্য বলিয়া বিবেচনা করেন)। নির্বাচিত কবিতার অন্ততঃ আট ছত্র পর পর উদ্ধৃত করিতে হইবে।

(খ) অষ্টম শ্রেণীতে শব্দ-বিভক্তি।

(গ) নবম শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ।

(ঘ) দশম বা একাদশ শ্রেণীতে সাহিত্যের ইতিহাস 'বাংলা উপন্যাস' প্রসঙ্গ।

১৯৬৮ (ক) নবম শ্রেণীতে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা প্রভাত মুখোপাধ্যায় রচিত যে কোনো একটি গল্প (যাহা আপনি নিজে ঐ শ্রেণীর পাঠোপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন)।

(খ) অষ্টম শ্রেণীতে তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি সমাস।

(গ) দশম শ্রেণীতে নিম্নলিখিত শব্দগুলির কারণ প্রদর্শনপূর্বক শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচার—পৌরোহিত্য, সায়াহ্ন, ইতিমধ্যে, কল্যাণীয়েষু, নিরোগ, দূরারোগ্য, যাত্রীদল, দাশরথী।

(ঘ) একাদশ শ্রেণীতে সাহিত্যের ইতিহাস হইতে 'কবি মধুসূদন'।

১৯৬৯ (ক) একাদশ শ্রেণীতে সাহিত্যের ইতিহাস হইতে 'বাংলা উপন্যাস'।
(খ) দশম শ্রেণীতে রবীন্দ্রনাথ রচিত যে-কোন একটি কবিতা যাহা আপনি ঐ শ্রেণীতে পাঠোপযোগী বিবেচনা করেন; কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবেন।
(গ) নবম শ্রেণীতে বাংলা ব্যাকণের (এই শ্রেণীর উপযোগী) যে কোন একটি প্রসঙ্গ।
(ঘ) অষ্টম শ্রেণীতে একটি রচনা। রচনার বিষয় আপনি নিজেই নির্বাচন করিবেন।

১৯৭০ (ক) ষষ্ঠ শ্রেণীতে—একটি সংবাদমূলক প্রবন্ধ রচনা।
(খ) সপ্তম শ্রেণীতে—সমাসের সাধারণ আলোচনা।
(গ) অষ্টম শ্রেণীতে—ক্রিয়াপদের 'বর্তমান কাল'।
(ঘ) দশম শ্রেণীতে—যে কোন একটি কবিতা বা কবিতাংশ; ঐ কবিতা বা কবিতাংশ উদ্ধৃত করিবেন।
(ঙ) একাদশ শ্রেণীতে—সাহিত্যের ইতিহাস হইতে 'ছোটগল্প' প্রসঙ্গ।

১৯৭১ (ক) সপ্তম শ্রেণীতে—'ফেরিওয়ালা' বা 'ডাকপিওন' সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা।
(খ) অষ্টম শ্রেণীতে—ক্রিয়া পদের 'অতীত কাল'।
(গ) নবম শ্রেণীতে—যে কোন একটি কবিতা বা কবিতাংশ; ঐ কবিতা বা কবিতাংশ উদ্ধৃত করিতে হইবে।
(ঘ) দশম শ্রেণীতে—বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের বিভিন্ন উপাদন।
(ঙ) একাদশ শ্রেণীতে—সাহিত্যের ইতিহাস হইতে 'মঙ্গলকাব্য'।

১৯৭২ (ক) সপ্তম শ্রেণীতে একটি রচনা। রচনার বিষয় আপনি নিজেই নির্বাচন করিবেন।
(খ) অষ্টম শ্রেণীতে বাংলা ব্যাকরণের (এই শ্রেণীর উপযোগী) একটি বিষয়।
(গ) নবম শ্রেণীতে ভাবসম্প্রসারণ :
"মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।" (রবীন্দ্রনাথ)
(ঘ) দশম শ্রেণীতে একটি ছোট কবিতা বা কবিতাংশ।
(কবিতাটি উদ্ধৃত করিতে হইবে।)
(ঙ) একাদশ শ্রেণীতে সাহিত্যের ইতিহাস হইতে 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' প্রসঙ্গ।

১৯৭৩ (ক) ষষ্ঠ শ্রেণীতে একজন প্রখ্যাত কবির একটি কবিতা বা কবিতাংশ। (কবিতা বা কবিতাংশটুকু উদ্ধৃত করিতে হইবে।)
(খ) অষ্টম শ্রেণীতে একটি রচনা। রচনার বিষয় আপনি নিজেই নির্বাচন করিবেন।
(গ) দশম শ্রেণীতে বাংলা ব্যাকরণের (এই শ্রেণীর উপযোগী) একটি বিষয়।
(ঘ) একাদশ শ্রেণীতে ভাব সম্প্রসারণ :
'সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে।
(রবীন্দ্রনাথ)

১৯৭৪ (ক) সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী একটি কবিতা বা কবিতাংশ (কবিতাটি বা বা কবিতাংশটি উদ্ধৃত করিতে হইবে)।
(খ) অষ্টম শ্রেণীতে ভাব-সম্প্রসারণ :—
"রাত্রি এনে দাও তুমি দিবসের চোখে
আবার জানাতে তারে নবীন আলোকে"। (রবীন্দ্রনাথ)
(গ) নবম শ্রেণীতে বাংলা ব্যাকরণের একটি বিষয় (এই শ্রেণীর উপযোগী)।
(ঘ) দশম শ্রেণীতে একটি রচনা (রচনার বিষয় নিজেই নির্বাচন করুন)।

১৯৭৫ (ক) নবম অথবা দশম শ্রেণীর উপযোগী যে কোন কবিতা বা কবিতাংশ (উদ্ধৃতি সহ)।
(খ) সপ্তম অথবা অষ্টম শ্রেণীর পঠনীয় ব্যাকরণাংশের উপযোগী যে কোন বিষয়।
(গ) ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী যে কোন রচনা।

১৯৭৬ (ক) ৭ম শ্রেণীর উপযোগী একটি কবিতা বা কবিতাংশ (উদ্ধৃতি সহ)।
(খ) ৮ম শ্রেণীর উপযোগী একটি রচনা।
(গ) ৯ম শ্রেণীর পঠনীয় ব্যাকরণের একটি বিষয়।

১৯৭৭ (ক) সপ্তম শ্রেণীর পঠনীয় ব্যাকরণের একটি বিষয়।
(খ) অষ্টম শ্রেণীর উপযোগী একটি রচনা।
(গ) নবম শ্রেণীর জন্য 'ন্যায়দণ্ড' (রবীন্দ্রনাথ) কবিতাটি।

১৯৭৮ (ক) সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী একটি রচনা।
(খ) অষ্টম শ্রেণীর উপযোগী ব্যাকরণের একটি বিষয়।
(গ) দশম শ্রেণীর জন্য রবীন্দ্রনাথের 'প্রার্থনা' কবিতা।